অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৮১

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১৪ এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
অরিজিৎ কুমার
টেকনোপ্রিণ্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

সহ সম্পাদক
অজয় সরকার

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

একশো পঞ্চাশ টাকা

প্রাসঙ্গিক

রচনাবলীর এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লেখকের দুটি প্রেমের উপন্যাস—তৃষ্ণার জল ও রাজ অতিথি, একমাত্র নাট্যসংকলন চতুরালি, একমাত্র কিশোর উপন্যাস পাহাড়ী এবং রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে স্থানপ্রাপ্ত কবিতাবলির পরবর্তী পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছ।

এর মধ্যে তৃষ্ণার জল, রাজ অতিথি ও পাহাড়ী সম্বন্ধে আমাদের মতামত রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের প্রাসঙ্গিকে আমরা ইতোপূর্বেই জানিয়েছি। এখানে আমরা মূলত আলোচনা করব লেখকের নাটিকাবলি ও কবিতা নিয়ে। নূতনা রাধা (৪৩) থেকে পাহাড়ী (৪৪) ও চতুরালি (৫৫) হয়ে রাজ অতিথি (৭৮) পর্যন্ত লেখকের যে সাহিত্যিক বিবর্তন সেই বিবর্তনের মূল নান্দনিক কথাটি হল—তারুণ্য; তারুণ্য ও যৌবন।

'মুক্তমতি তাঁর রচনার, তা এখনো তারুণ্যে স্পন্দিত।'—বীতশোক ভট্টাচার্য

'তারুণ্য তাঁর স্বভাবধর্ম, আজীবন তারুণ্যের চর্চা করেছেন। যৌবনদীপ্তি এখনও বিচ্ছুরিত লেখার প্রতিটি ছত্রে।'—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকৃতই সাহিত্যসৃষ্টিতে যৌবনদীপ্তি তাঁর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। মহাশ্বেতা দেবী যথার্থ বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে শৈশব আছে, প্রৌঢ়ত্ব আছে, নিখাদ নির্ভেজাল যৌবন নেই। অন্নদাশঙ্কর ব্যতিক্রম।' বস্তুত শুধু সাহিত্যসৃষ্টিতে যৌবনদীপ্তি নয়, লেখকের যৌবনে বিশ্বাস সর্বব্যাপক ও বহুদূরপ্রসারী। কী শিল্পদৃষ্টিতে, কী জীবনদর্শনে, কী জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই অন্নদাশঙ্কর যৌবনে বিশ্বাসী। আর এই বিশ্বাস থেকেই তিনি দুর্মরভাবে আশাবাদীও। চঞ্চল শুধু তাঁর পাহাড়ী উপন্যাসের তরুণ নায়কই নয়, চাঞ্চল্য অন্নদাশঙ্করের প্রাণও—'আমি চঞ্চল হে, সুদূরের পিয়াসী।'

তাঁর এই সুদূরের পিপাসার এবং জীবনদর্শনের সবচেয়ে প্রগাঢ় ও সবচেয়ে অন্তরঙ্গ প্রকাশ কবিতায়। কিন্তু কবিতার আলোচনার আগে তাঁর নাটকের কথা কিছু বলে নিতে চাই। লেখকের নাটিকাগুলি তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির সঙ্গে যেন এক প্রকার বিপ্রতীপ সম্পর্কে আবদ্ধ। গল্পগুলি সিরিয়স, নাটিকাকটি ক্যামিও। গল্পগুলি ধারাবাহিক বিকাশের, নাটকগুলি স্ট্যাকাটো ধরনের। গল্পগুলি জীবনধারণ ও জীবন-মরণ সমস্যার গল্প, নাটককটি ঝামেলা ও মুশকিল আসানের নাটক।

এই নাটিকাগুলি স্বাদে ও মেজাজে লেখকের প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ প্রকৃতির পরিহাস পর্যায়ের গল্পের সমতুল্য। তেমনি ব্যঙ্গ কৌতুক অসঙ্গতি নিয়ে মুচকি-হাসির লেখা। কখনো কখনো পরশুরামের কথা মনে পড়ে। ছড়ানাটিকা জনরব-ও এই গোত্রের। তেমনি কমিক। শ্লেষাত্মক হলেও আসলে দিলখোলা ও প্রাণখোলা।

লেখক নিজেদের নাটক বলতে যে প্রকার নাটকের কথা বলেছিলেন এই নাটিকা-

গুলি সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তার অন্ত নাম কমিউনিটি থিয়েটার। আমাদের যেমন সার্বজনিক বারোয়ারি পূজা, ইউরোপে তখন তেমনি কমিউনিটি থিয়েটার—গ্রামের বা শহরের সকলেই অভিনয় করে বা করায়, সকলে চাঁদা দেয়, সকলেই তদ্বির করে। সপ্তাহে একখানি নতুন নাটক হয়তো ছয় রাত্রি অভিনয় হয়, গোটা দুয়েক ম্যাটিনি সমেত মোট আটবার।

এই থিয়েটারের সমস্তই ছোট। স্টেজ ছোট, প্রেক্ষাগৃহ ছোট, নাটক ছোট। অভিনেতা-অভিনেত্রী সদস্য-সাধারণের ভিতর থেকেই নির্বাচন করতে হবে। এই থিয়েটারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সদস্য-সাধারণের আত্মোৎকর্ষ। 'আপনি আমি নাটকও লিখব, পোষাকও তৈরি করব, স্টেজও সাজাব, আসবাবও বানাব, টিকিটও বিক্রী করব, রিহার্সালও তদারক করব, অভিনয়ও করব, সমালোচনাও করব।' সদস্য-সাধারণের ঘরোয়া ব্যাপার—ক্লাব বললেও হয়, পরিবার বললেও চলে। সদস্য-সাধারণের ভিতর থেকে নির্বাচিত হয় একটি মণ্ডলী। তার কাজ নাটক নির্বাচন করা, কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে স্থির করা, স্টেজ সাজানো, পোষাক সংগ্রহ করা, টিকিট বেচা, বিজ্ঞাপন দেওয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অর্থ সাহায্য করা ইত্যাদি।

এই প্রকার থিয়েটারকে লেখক লিটল থিয়েটার নাম দিয়েছিলেন। তা অ্যামেচার থিয়েটারের চেয়ে উঁচু দরের। লিটল থিয়েটার প্রতিদিন নাট্য চর্চা করে, ছুটির দিনে একটু তামাসা দেখায় না। তার জন্ত প্রতি সপ্তাহে টাটকা নাটক চাই, টাটকা সাজসজ্জা চাই, নিজস্ব অভিনেতা অভিনেত্রী চাই। সুদূর ১৯৩০ সনে লেখক লিখেছিলেন, 'নাটকের জন্ত ভাবনা নেই। প্রথম শ্রেণীর নাটক কোনো দেশে বাশি বাশি গজায় না। তিন মাসে একখানা প্রথম শ্রেণীর ও বারোখানা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নাটক লিখে উঠতে আমরা (সকলে মিলে) পারব।' লেখকের এই নাটিকাগুলি যেন ওই প্রকার নাটক। কমিউনিটি থিয়েটারের নাটক। শহরে পল্লীতে, ছাত্রাবাসে, স্যানেটোরিয়ামে অভিনয় করার জন্ত রচিত নাটক। এই নাটকের পূর্বসূরী হিশেবে লেখক রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ যে সব ছোট ছোট নাটক লিখেছিলেন সেগুলির কথা বলেছেন। 'সেগুলি তাঁরা আমাদের জন্তেই লিখেছেন—আমরা যে একদিন আসব সে বার্তা তাঁরা দিব্য কর্ণে শুনেছিলেন।'

আজ থেকে ষাট বছর আগে অন্নদাশঙ্কর লিটল থিয়েটারের এই যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা পরে উৎপল দত্ত প্রভৃতির দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। লেখক পরবর্তীকালে নাট্যচর্চার সময় আর পাননি, তবে তাঁর নাট্যপ্রীতি ও ছড়ার দক্ষতা মিলে তাঁকে দিয়ে ব্যালাড বা গীতিনাট্য লিখিয়ে নিয়েছে, ব্যালাড আরো লেখার ইচ্ছেও তাঁর আছে। নাটক আর না লিখলেও পরেও তিনি নাটক সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেছেন,

মতামত জানিয়েছেন। ১৯৫৬ সনে রচিত অসাধারণ মূল্যবান এ রকম একটি লেখা সংযোজন হিশেবে নিচে উদ্ধৃত করলাম—

নাটকের কথা

অন্নদাশঙ্কর রায়

(নির্বাচিত অংশ)

যাদের নিয়ে নাটক লিখছি তারা আপন আপন জীবন ভোগ করছে, কর্ম ভোগ করছে, বাঁচছে। তারা বাইরের লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে বাঁচছে না। তারা সচেতন নয় যে বাইরের লোক দেখছে। সচেতন হলে তাদের জীবনটাই হতো অভিনয়। অর্থাৎ নিজেদের মতো করে বাঁচত না তারা, বাঁচার ভান করে যেত বাইরের লোকের খাতিরে। তা হলে যা হতো তা নাটক নয়। তা রঙ্গ।

এই পার্থক্যটুকু সব সময় মনে রাখতে হবে। নাটক হচ্ছে তাই যার পাত্রপাত্রীরা আপনার জীবন আপনি বাঁচে। দর্শকের রুচি অনুসারে নয়, নীতি অনুসারে নয়, খুশি অনুসারে নয়। দর্শক বলে কেউ আছে কিনা সে খবরে তাদের কাজ নেই। তারা তাদের আপনাদের জীবনলীলা নিয়ে তন্ময়। এই তন্ময়তা থেকে কত রকম পরিস্থিতির উদ্ভব। সেইখানেই নাটকের নাটকত্ব। কতক পরিস্থিতি আছে যার পরিণতি মর্মান্তিক হতে বাধ্য। কারও সাধ্য নেই যে তাকে রমণীয় করে। লেখক সেক্ষেত্রে নিরুপায়। তার হাত দিয়ে ট্র্যাজেডী আপনি আপনাকে লিখছে। কর্ম বা অ্যাকশন থেকেই কর্মফল বা ট্র্যাজেডী।

জীবনে আমরা প্রত্যহ এ দৃশ্য দেখছি। নাটক আমাদের চোখের সুমুখেই ঘটে যাচ্ছে। ঘটছে আমাদের চেনা মানুষদের জীবনে। আমাদেরই জীবনে। চোখ কান খোলা রাখলে নাটক লেখার উপাদান খুঁজতে হয় না। কিন্তু লিখতে গিয়ে নাটককে মাটি করি, রঙ্গ করে তুলি। কেন ? তার কারণ বাইরের লোককে দেখানোর প্রশ্ন ওঠে। তাদের মর্জির প্রশ্ন ওঠে। তাদের রজত-খণ্ডের প্রশ্ন ওঠে। আবার অভিনেতা অভিনেত্রীর মেজাজ বুঝে কাজ করতে হয়। তাঁরা বিমুখ হলে নাটকের যবনিকা ওঠে না। দর্শক দর্শন পায় না।

নাটক প্রথমত নাটক হবে। দ্বিতীয়ত অভিনয়যোগ্য হবে। কিংবা প্রথমত অভিনয়-যোগ্য হবে। দ্বিতীয়ত নাটক হবে। যেদিক থেকেই বিচার করা হোক-না কেন নাটক হবে নাটক। রঙ্গ নয়। সাধারণত আমরা যাকে নাটক বলে জানি তা নাটকই নয়, তা রঙ্গ। তার ষোলো আনাই অভিনয়। এক আনাও জীবন নয়। জীবনকে অনুকরণ করলেই তা জীবন হয়ে ওঠে না। জীবন যে নিয়মে চলে দর্শকের হস্তক্ষেপ তাকে সে নিয়ম থেকে ভ্রষ্ট করে। কিংবা অভিনেতা অভিনেত্রীর হস্তক্ষেপ। কিংবা প্রযোজকের

হস্তক্ষেপ। যার যা পরিণাম তা অক্ষুণ্ণ থাকে না। হস্তক্ষেপের দরুন ক্ষুণ্ণ হয়।…বাইরের হস্তক্ষেপ সংগত নয় নাটকে।

কিন্তু সাধারণত যা অসংগত তাই সকলে মিলে সম্ভব করে। তাতে হয়তো রঙ্গের স্বাদ পাওয়া যায়। নাটকের নয়। দীর্ঘকাল পরে এক-আধখানা সত্যিকার নাটক লেখা হয়। তার অভিনয় হয় কিনা সন্দেহ। …লেখকের সঙ্গে পাঠকের মন মেলে। কিন্তু প্রযোজকের মন মেলে না, অভিনেতার মন মেলে না, দর্শকের মন মেলে না।…

অপরপক্ষে যাঁরা রঙ্গালয়ের (থিয়েটারের) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁরা প্রযোজক অভিনেতা ও দর্শকের মন জানেন, কিন্তু পাঠকের মনের সঙ্গে অপরিচিত। তাঁদের রচনা হয়তো চার শ রাত ধরে অভিনীত হয়। কিন্তু সাহিত্য বলে গণ্য হয় না। কারণ ওটা নাটক নয়, রঙ্গ। নাটক হলে পাঠক থাকত। পাঠক থাকলে নাটক হতো। মোটামুটি নাটকের এই বৈশিষ্ট্য। আর দর্শক জুটলে রঙ্গ হয়। রঙ্গ হলে দর্শক জোটে। মোটামুটি রঙ্গের এই লক্ষণ। বলা বাহুল্য একই রচনা নাটক ও রঙ্গ দুই হতে পারে। কচিৎ এমন ঘটে যে লেখকও থিয়েটারের লোক, যেমন শেক্‌স্‌পীয়ার বা মোলিয়ের। কেমন করে দর্শকের মন পেতে হয়, অভিনেতার মন পেতে হয়, প্রযোজকের মন পেতে হয় সে বিষয়ে তাঁদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মন পেতেও তাঁরা নিপুণ। বস্তুত রঙ্গালয়ের অভিজ্ঞতা না থাকলে লেখকের পক্ষে অভিনয়যোগ্য নাটক লেখা দুষ্কর।

…(অর্থাৎ দরকার) প্রযোজক অভিনেতা ও দর্শকের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ স্থাপন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সঙ্গে নিবিড় সাযুজ্য। জীবন ও জীবনের অভিনয় উভয়ের প্রতি উভয় চক্ষু খোলা রাখতে হবে। তার কমে চলবে না।

এর জন্যে চাই দেশের বৃহত্তর জীবনের বহুমুখী আয়োজন। সেই সঙ্গে চাই রাতের পর রাত অনন্যকর্মা অভিনেতা অভিনেত্রীর দ্বারা অধিষ্ঠিত থিয়েটার। …যাঁরা ঠিক এমেচার নন। ঠিক প্রোফেশনাল নন। মাঝামাঝি।…এমেচারদের যোগ্যতা থাকলে কী হবে, প্রচুর অবসর নেই। সারাদিন অন্যত্র খেটেখুটে এসে তাঁদের শরীর মন শ্রান্ত। রিহার্সলের জন্যে দম থাকে না। জীবিকার জন্যে কে কোথায় ছিটকে পড়ে। দল ভেঙে যায়। কনটিনিউইটি বা ক্রমান্বয় ভঙ্গ হয়। এমেচারদের ভিতর থেকে বড়ো আর্টিস্ট উঠে আসেন, কিন্তু সেই বড়ো আর্টিস্ট যদি প্রোফেশনাল না হতে পান তা হলে তাঁর বিকাশ সেইখানেই শেষ। এমেচার গোষ্ঠী চিরকাল থাকবে, থাকা উচিত। কিন্তু যে দেশের সব আর্টিস্ট এমেচার বা ভবঘুরে সে দেশের লোক কোনো কালেই নাট্যকলাবিৎ হবে না। সে দেশের নাট্যকলা অর্ধ-বিকশিত থেকে যাবে। দৈবাৎ এক-আধখানা ভালো নাটক লেখা হবে হয়তো, কিন্তু সে নাটক রঙ্গালয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না। …পাঠক মাত্রেরই সাধ দর্শক হতে। সে সাধ মিটবে না। ভালো নাটক সে সাধও মেটাতে চায়।

পারেও। আমরা তাহলে কী করব ?

সম্প্রতি দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। সঙ্গীত নাটক আকাদেমির দ্বারা সেমিনারের কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকার সুযোগ মিলেছিল। (সেখানে) এ নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হলো। সারা ভারত জুড়ে উৎসাহের উদ্যমের বান এসেছে। দেখে আনন্দ হলো। দুঃখও হলো এইজন্যে যে অনেকে সরকারের কাছে হাতী ঘোড়া আশা করেছেন। কপালে আছে নিরাশা। তার চেয়ে জনসাধারণের দ্বারস্থ হলে কাজ বেশী হতো। দিল্লীর দোষই এই যে সেখানে যে যায় তার দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হয়। হওয়া উচিত কিন্তু নিম্নমুখী। কবে যে আমাদের শিল্পীদের শিক্ষা হবে! শুনে তাজ্জব লাগল যে সরকার এত কিছু করে দেবে কিন্তু কথা বলবে না। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আর দেদার টাকা দুই মিলে যাবে সরকারী দরবারে। ধন্য!...

শোনা যায় মহাবীর আলেকজাণ্ডার এক সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি ? সাধু উত্তর দিয়েছিলেন, দয়া করে আপনার ছায়াটা সরিয়ে নিন। সরকারের কাছে শিল্পীমাত্রেরই সেই একই অনুরোধ। দয়া করে তাঁর ছায়াটা সরিয়ে নিলেই শিল্পী স্বচ্ছন্দ হয়।...সরকার যদি সদয় হন তবে নাট্যকলার পূর্ণ বিকাশের পথে যত রকম বাধা আছে সব একে একে অপসারিত করুন। আমোদ কর তুলে দিন।

কিন্তু সরকার মা বাপ হবেন আর শিল্পী স্বাধীন হবে এর মধ্যে কোথাও একটা ফাঁকি আছে। আমাদের থিয়েটারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। যেমন দাঁড়িয়েছে ইংলণ্ডের থিয়েটার। সে দেশে লিলিয়ান বেলিস-এর মতো মহিলা জন্মেছেন। সারা জীবন পরিশ্রম করে তিনি ওল্ডভিক থিয়েটারটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ওল্ডভিক লাভের জন্যে চালানো হয় না। তার পিছনে কোনো অর্থলোলুপ মালিক নেই। অতি দরিদ্রদের নাট্যপিপাসা মেটানোর জন্যেই তার সৃষ্টি। তার প্রধান অবলম্বন শেক্‌স্‌পীয়ার। বরং বলা যেতে পারে শেক্‌স্‌পীয়ারকে দীনজনলভ্য করার জন্যেই তার সৃষ্টি। অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রোফেসনাল, কিন্তু তাঁদের অর্থলালসা নেই। নাটক যে একপ্রকার মিশন তা লিলিয়ান বেলিস প্রমাণ করে দিয়েছেন। তেমন প্রমাণ আরো আছে।

আমরা আশা রাখব যে আমাদের দেশে অনেকে থিয়েটারকে ধর্ম করবে, তার জন্যে আত্মনিবেদন করবে। দীনতম দর্শকের প্রয়োজনের উপর লক্ষ রাখতে হবে। উচ্চতম নাট্যকারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। এ রকম দু-চারটি সম্প্রদায় থাকলেই যথেষ্ট। এঁরাই অগ্রণী।

অন্নদাশঙ্করের জীবনবেধ যদি তাঁকে গদ্যাভিমুখী করে থাকে, তাঁর জীবনবোধ তাহলে

তাঁকে কাব্যাভিমুখী করেছে। তাঁর নিজের ভাষায়, 'কবিতার গভীর ব্যাপ্তি, তা যে কোনো ভাবে হয়, যে কোনো ছন্দে, এমন কি গদ্যেও। আমি কিছুকালের জন্ম ম্যান অব্ অ্যাকশন হয়েছিলুম, কিন্তু মূলত আমি ম্যান অব্ থট। আমার সব কিছুই ইচ্ছাকৃত, চিন্তাকৃত। কবিতা কিন্তু কবির কাছে থটের চাইতে বেশি কিছু দাবি করে। এর জন্ম নিয়মিত সময় দেওয়া চাই। চাকরিতে জড়িয়ে পড়ে আমি সময় যদি-বা পাই মুড পাইনে, স্বতঃস্ফূর্তি পাইনে। অমনি করে কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক কেটে যায়। চাকরি থেকে বেরিয়ে এসেও নানা কাজে হাত দিই। কবিতা হয় উপেক্ষিতা। তার বৈরী হয় গদ্য। প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প। বছরে একটা কবিতাও আসে না।'

'But nothing satisfies the soul like poem. Light verse is no substitute for serious poetry. My ears were trained in my childhood when I was called upon to read aloud the Chandimangal by Kavikankan. As I grew up I outgrew Kavikankan, Jayadeva, Vidyapati, Chandidas and Govindadas and came under the spell of Rabindranath and Satyendranath. At a later date I myself became a Romantic poet of my own.'

'The creative fire has burned within me ever since the age of twenty when I made my appearance as a Romantic poet in Oriya. The poetic gift that I once had I have neglected for too long. Now that I am comparatively free to devote my remaining years to poetry (among promises to keep are some poems and some ballads) I wonder whether the Muse whom I have neglected will not be cold to my overtures.'

'কবিতাই আমার সবচেয়ে প্রিয়। আসলে আমি জাতকবি। কবি নিছক কবিতাকার নন, তিনি অনেক কিছু। কবি মনীষী, কবি দার্শনিক, শঙ্করাচার্য বলেছেন—কবি ক্রান্তদর্শী। আমি যদি আরও কিছুদিন বাঁচি অথবা পুনর্জন্ম বলে যদি কিছু থেকে থাকে, আমি জানি না, তাহলে আবার আমি কবিই হব, শুধু কবিতাই লিখব, আর কিছু না।'

তাঁর গল্প ও উপন্যাসের যে সুবিস্তৃত কক্ষপথ ও আন্তর্জাতিক মানসিকতা তাঁর কবিতা সেই তুলনায় অনেক ব্যক্তিগত ও মূলত নিজস্ব অক্ষ বরাবরই তার ঘূর্ণন কিন্তু তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মের ভারকেন্দ্রটিকেই ধারণ করে আছে তাঁর কবিতা। কবিতা লিখে নিজেকে প্রস্তুত না করলে যেমন পাস্তেরনাক ডক্টর জিভাগোর মতো উপন্যাস লিখতে পারতেন না, অন্নদাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর কাব্যাদর্শ তাঁর কথাসাহিত্যিক সত্তাকে অনেকখানি

ও বহুদূর অবধি প্রভাবিত করেছে।

লেখকের আপন ভাষায়, 'আমি বহুজনের জীবনে বহুকাল ধরে জীবনলাভ করতে চাই। সীমার ভিতর অসীমকে পুরতে জানাই আর্টের বিষয়। আমি মনে করি, সর্বোচ্চ সত্যকে জানতে গেলে মিষ্টিক অনুভূতিও চাই। শুধু ইন্টেলেক্ট দিয়ে হয় না।' অন্নদাশঙ্করের মতো একজন আধুনিক, নাগরিকমনা ও যুক্তিবাদী ব্যক্তির জীবনে এই মিস্টিসিজম কার্যকর হয়েছে মূলত কবিতার মধ্য দিয়ে। কবিতার মধ্য দিয়েই তিনি আধুনিক জীবনের মধ্যে বৈষ্ণব রসের মরমীয় আস্বাদনকে সার্থক করে তুলেছেন।

প্রকৃতই অন্নদাশঙ্কর রায় জাতকবি, কাব্যই তাঁর স্বধর্ম। জয়দেব আদি কবিরাই তাঁর স্বগণ—

তবু যদি হয় পেতেই উপাধি
আমার স্বগণ জয়দেব আদি।
পদ্মাবতী চরণ চারণ
চক্রবর্তী আমি একজন।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে একটি প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর কবিতা কেন উপেক্ষিতা তার কারণ সন্ধান করেছিলেন। দেখেছিলেন, সাহিত্য বলতে একদা শুধু কাব্যই বোঝাত। পরে আরও নানান ফর্ম্যাট এল। তখন প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে কবিতা হটে গেল, একচেটে কারবার হলে হটত না। এখন অধিকাংশ পাঠকই আর কবিতা পড়ে না। 'কিন্তু লোকে না পড়লে বাস্তবিক মনে লাগে। আমরা অনেকেই কবি হয়ে সাহিত্যের আসরে এসেছিলুম, আসরে বসে দেখলুম কবিতার আদর নেই। তখন গল্প উপন্যাসের বায়না নিলুম। বেচারি কবিতা হলো কাব্যের উপেক্ষিতা। এ যেন একজনের প্রেমে পড়ে আর-একজনের কাছে বরপণ নেওয়া। প্রেমের সুখ বিয়ের সুখ দুই সুখ গেল। সংসার ধর্ম, জৈব ধর্ম, এ-সব কর্ম করে যশ ও অর্থ এল। তারপর কালেভদ্রে এক-আধ ছত্র কবিতা লেখা গেল। কিংবা গতর খাটিয়ে রাত জেগে কবিতা লেখাও চলল, উপন্যাস লেখাও। গায়ের জোরে লিখলে কারিগরি থাকে, যাদুকরী থাকে না। অবশ্য যাদের বহুমুখী প্রতিভা তাদের কথা আলাদা। তারা বহুজনের প্রেমিক, একজনের পতি নয়।'

লেখকের এই উপমাকে আমি একটু পাল্টে বলব, অন্নদাশঙ্কর রায় নিজে বহুজনের প্রেমিক হয়েও একজনের পতি। কবিতার। কবিতাই তাঁর সখী, প্রেমিকা ও জীবন-সঙ্গিনী। তবে ও তবু কবিতা কেন উপেক্ষিতা? আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষটিই তো জীবনে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হন। এটাই স্বাভাবিক। কবিতা তাঁর স্বকীয়া, তিনি কবিতার স্বকীয়।

কবি ও তাঁর স্বকাল প্রবন্ধে (১৯৫৬) অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন, কবি তাঁর স্বকালের হলেও কবির বাণী একবার উচ্চারিত হলে চিরকালের। অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে তার অমোঘ যাত্রা। কেমন আমাদের কবির বাণী ?

১. 'সহজ সরল হোক বাণী মোর সূর্য্যালোকসম'

(কেহ না জানুক তার কত জ্বালা আদিতে অন্তরে।)

২. 'সরস সবুজ হোক বাণী মোর দূর্বাদলসম'

(কেহ না জানুক তার কী আবেগ অঙ্কুরে শিখরে।)

প্রথম পংক্তি যদি কবির উক্তি তো দ্বিতীয় পংক্তি যেন প্রেমিকের উক্তি। ভবিষ্যের চিত্তে প্রস্ফুটিত হতে চেয়েছেন রসিক-প্রেমিক অন্নদাশঙ্কর প্রেমের মাধ্যমে যেমন তেমনি কবিতার মাধ্যমেও।

ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

তৃষ্ণার জল

সম্পাদক তাকে প্রথম আলাপেই আপনার করে নেন। বলেন, 'এতদিন তোমার লেখার ভিতর দিয়ে তোমার অন্তরের রূপ দেখেছি। এখন দেখছি তোমার বাইরের রূপ। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের আরো একটা সম্পর্ক আছে, প্রবাহন। তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদ্যাধর আমার গৃহিণীর পাতানো বোনের ভাইপো। সেই সুবাদে তুমিও আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।'

প্রবাহন হেসে বলে, 'এতদিন আমি মনে মনে মক্স করে এসেছিলুম, 'হেমন্তদা'। এবার থেকে তা হলে মেসোমশায় ?'

'উহুঁ। মেসোমশায় নয়। পিসেমশায়। না, তাই বা কী করে হবে ? আচ্ছা, তুমি আমাকে মেসোমশায় বলে ডাকতে পারো, প্রবাহন। মাঝখান থেকে আমার আরো একটি শ্যালিকারত্ন লাভ হলো। তুমি তো সুলেখক বলে নাম করেছ। বল দেখি বাংলাভাষার মধুরতম পদ কোন্‌টি ?' তিনি ধাঁধার মতো করে বলেন।

প্রবাহন ধাঁ করে জবাব দিতে পারে না। অন্যমনে থাকে। সত্যি কি নাম হয়েছে ?

'বলতে পারলে না তো ? কী করে পারবে ? বিয়ে তো হয়নি। তবে আমিই বলি। প্রথম প্রথম মনে হবে, বৌ। পরে বুঝবে, শালী।' হেমন্তবাবু নিজেই দেন ধাঁধার জবাব।

নীতির দিক থেকে পিউরিটান না হলেও রুচির দিক থেকে প্রবাহন প্রায় ব্রাহ্ম। শালী বললে কি শালীনতা থাকে ? সে মনে মনে কানে আঙুল দেয়।

'বহুবিবাহ তো উঠে যাবার দাখিল। এই আমাদের ক্ষতিপূরণ। বহুপত্নীক হতে যদি না পারি বহুশালীক হতে চাওয়া কি অন্যায় ?' হেমন্তবাবু সকৌতুকে সুধান।

প্রবাহন জানত না যে ভদ্রলোকের একটিও শালী নেই। শালীর সাধ বৌতে মেটে না। তার দরুন তাঁর মনে একটা খেদ ছিল। কৌতুক থেকে করুণরসের অবতারণা হয়।

হেমন্তবাবু বলে যান, 'একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা। এ আমি খুব মানি। আমার ভাগ্যে দরী নয়, সুন্দরী। তা সত্ত্বেও আমার জীবনটা একটা ট্র্যাজেডী।'

ট্র্যাজেডী শুনে প্রবাহন হকচকিয়ে যায়। মনে মনে হায় হায় করে। পরে হেমন্তবাবুর ব্যাখ্যা শুনে তার মুখে হাসি ফোটে।

'আমি না পারলুম বর্মা যেতে, না বিলেত যেতে। গেলে আমিও কি একখানা 'শ্রীকান্ত' বা একখানা 'দেশী ও বিলাতী' লিখতে পারতুম না? আমাদের এই পর্দাশাসিত দেশে অন্দরমহলের বাইরে তুমি কোন্ নারীর সঙ্গে মিশবে, প্রবাহন, যে নারীচরিত্র আঁকবে? বৌকে নিয়ে কাব্য লেখা চলে, নভেল বা গল্প লেখা চলে না। তাঁকে নিয়ে তুমি কবিতা লিখতে পারো দুটি দশটি, কিন্তু তেইশখানা নভেল যদি লিখতে চাও তবে তোমার এক একটি শালীই হবে তোমার এক একটি তিলোত্তমা মৃন্ময়ী শৈবলিনী ইন্দিরা শান্তি। জানো তো, সম্পাদনার অবকাশে আমিও উপন্যাস লিখি। কিন্তু আমার সৃষ্টি তেমন শক্তিশালী হয় না। শালী নেই যে শক্তি জোগাবে।'

প্রবাহন ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। তেইশখানা নভেল। সে তো একখানা লিখতেও ডরায়। নইলে তার হাতে মালমশলা নেই তা নয়। তাকে নারীচরিত্রের জন্যে বিদেশে যেতে কেউ মানা করছে না। স্বদেশের পর্দাশাসিত সমাজের বাইরেও ব্রাহ্মসমাজ আছে, ইঙ্গবঙ্গ সমাজ আছে। বিয়ে না করেও মেলামেশা করা যায়, তবে বেশীদিন বা বেশীদূর নয়।

সুচতুর সম্পাদক এতক্ষণ ধরে গৌরচন্দ্রিকা বিস্তার করছিলেন যার জন্যে তা তিনি অবশেষে ফাঁস করেন। তাঁর মাসিকপত্রের জন্যে একখানা উপন্যাস চাই। প্রবাহনকেই লিখতে হবে। মাসে মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে। এক আধ কিস্তি খেলাপ করলে তিনি কিছু মনে করবেন না। আরম্ভ করতে সে যতখুশি সময় নিক।

'একবার আরম্ভ করে দিলে দেখবে নভেল চলছে তার নিজের দমে। তোমাকে শুধু কলমটা ধরে থাকতে হবে, যেমন রাশ ধরে থাকতে হয় পাহাড়ী ঘোড়ার। চড়াই উৎরাই পার হয়ে সে তোমাকে পৌঁছে দেবে একদিন দেবপ্রয়াগে বা যোশীমঠে। হাঁ, তুমি পারবে। কোনো ভয় নেই তোমার। আমি রয়েছি পেছনে।' তিনি অভয় দেন।

'আমার যে শ্যালিকা নেই, মেসোমশাই। আমি নায়িকা পাব কোথায়?' প্রবাহন তার মোক্ষম অজুহাত দেখায়।

'তা হলে তুমি তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। অবশ্য চোখ বুজে নয়। প্রথমেই খোঁজ নেবে শালী আছে কি না। ক'টি শালী। দেখতে শুনতে কেমন। বধূনির্বাচন তো সকলেই করে। শ্যালিকা নির্বাচনই শক্ত। সে কাজে যার দক্ষতা তার জীবনটা একটা [illegible]। সাহিত্যে যদি অমর হতে চাও তোমার নারীচরিত্রের খুঁটি ভরিয়ে নিতে হবে শালীচরিত্র দিয়ে। তোমার টলস্টয় কী করেছিলেন? বিয়ে না করলে ওয়র অ্যাণ্ড পীসের নাটাশা [illegible] পেতেন কোথায়? নিজের শালী না থাকলে কাকে মডেল করে [illegible] কী [illegible] সৃষ্টি!' হেমন্তবাবু তাঁর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন।

প্রবাহন স্বীকার করে। কিন্তু সেইসঙ্গে বলে, 'নভেল লিখতে হলে যদি বিয়ে করতে
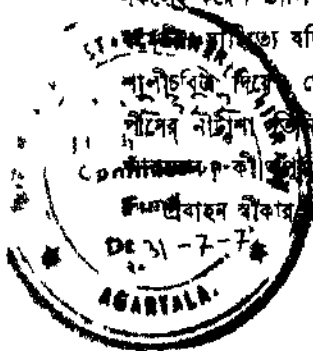
হয় তবে আমি আপনাকে ধরাছোঁয়া দিচ্ছিনে, মেসোমশায়। নভেল লেখার জন্মেই হোক আর সংসার পাতার জন্যেই হোক যে-কোনো একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্মে বিয়ে আমার নীতি ও রুচি বিরুদ্ধ। তা বলে আমি ভীষ্ম নই। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বাধা আছে।'

হেমন্তবাবুকে জিজ্ঞাসু দেখে সে বলে যায়, 'উপন্যাস বলতে বোঝায় একরাশ বানানো মিথ্যা। ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলা। মাটির প্রতিমার আপাদমস্তক ডাকের সাজ। তিনদিন ঢাকঢোল পিটিয়ে হৈচৈ। চারদিনের দিন বিসর্জন। পরে একদিন খড় বেরিয়ে পড়ে। কেউ ফিরেও তাকায় না। এই জিনিসের জন্মে আমি করব আমার জীবন ক্ষয়! জীবনে কত কী করবার আছে! সাহিত্যে কত কী বলবার আছে। 'আমি নাবব মহা-কাব্য সংরচনে। এই কথাটি আছে মনে।' একালের মহাভারত কি রামায়ণ। যদি জীবনদেবতার আশীর্বাদ পাই।'

'মহাকাব্য আজকাল পদ্যে লেখা হয় না, প্রবাহন। লিখতে হয় গদ্যে। তখন তারই নাম হয় উপন্যাস। তোমার রামায়ণ মহাভারতও তাই। বাল্মীকী বেদব্যাস আসলে ছিলেন কথাসাহিত্যিক। তোমার কবিতাও আমরা ছাপব। ছেপেওছি। কিন্তু উপন্যাস না হলে কি মাসিকপত্র চলে? উপন্যাসের জন্মে পাঠকপাঠিকাদের এই যে ব্যাকুলতা এটা ছেলেবেলার সেই রূপকথার জন্যে রাত জেগে থাকা। ঠাকুমা দিদিমারা যাদের নিত্য নূতন রূপকথা শোনাতেন তারাই এখন বড়ো হয়ে নিত্য নতুন উপাখ্যান শুনতে চায়। আমরাই তাদের ঠাকুমা দিদিমা। তুমি আর আমি।'

প্রবাহন শুনতে থাকে, 'রূপকথায় এখন বিচিত্র চাতুর্য ও কারুকার্য। তার উপাদানের কিছুটা হচ্ছে কল্পনা, কিছুটা বাস্তব, কিছুটা আবার কথকতা বা স্টোরি-টেলিং। তা ছাড়া কিছুটা হয়তো কামনাপূরণ বা উইশ ফুলফিলমেণ্ট। কিছুটা হয়তো গল্পের মরাল বা লেখকের বাণী। এতকিছু নিয়ে যে উপন্যাস তাতে সত্য নেই, কে বলবে? তবে সে সত্য বিধাতার সৃষ্টি নয়, মানুষের সৃষ্টি। কৌশল জানা থাকলে বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে হুবহু এক।'

'আর আমি দেব সত্যাভাস? বিশ্বাসভঙ্গ হবে না?'

'লোকে তোমার কাছে চাইবে স্টোরি। স্টোরি যদি দিতে না পারো কাছে ঘেঁষবে না। তখন তোমার সত্য নিয়ে তুমি করবে কী? শিকেয় তুলে রাখবে? না, প্রবাহন, তুমি স্টোরিও দেবে, সত্যও দেবে। ময়রা যেমন রসও দেয়, গোল্লাও দেয়। উপন্যাস হচ্ছে সুস্বাদু ও সুপরিপাচ্য রসগোল্লা।'

'আর তুমি', তিনিই যোগ করেন, 'তার নবীন ময়রা।'

প্রবাহন তা শুনে খুশি না হয়ে পারে? তা সত্ত্বেও তার মন মানে না। সে হচ্ছে

চায় কবি, লিখতে চায় কবিতা, কিন্তু সম্পাদকের পাল্লায় পড়ে হতে যাচ্ছে উপন্যাসকার।

কথাবার্তার দম ফুরিয়ে এসেছিল, একটু পরে সে উঠত, এমন সময় প্রবেশ করেন জলখাবারের ট্রে হাতে করে প্রিয়দর্শনা এক মহিলা। সম্পাদকের দিক থেকে অসমবয়সিনী, সুতরাং গৃহিণী নন। প্রবাহনের দিক থেকেও অসমবয়সিনী, সুতরাং কন্যা নন। অন্ধকার হয়ে আসছে, চেনা চেনা ঠেকলেও চেনা যায় না।

ট্রে নামিয়ে রেখে ওঁর প্রথম কাজ হয় আলোর সুইচ টিপে আলো জ্বালানো আর ফ্যানের সুইচ টিপে ফ্যান চালানো। অবশ্য নমস্কার বিনিময়ের পরে। নিঃশব্দে।

সম্পাদক হাঁ হাঁ করে ওঠেন। 'ও কী! ও কী করছ, রানী! নভেম্বরের মধ্যভাগে ফ্যানের হাওয়া! তাও ভর সন্ধ্যায়! অতিথির সামনে বসে বাতাস করতে চাও তো ও ঘর থেকে হাতপাখা নিয়ে এস।'

'আপনার নিজের সর্দির ধাত বলে ভুলে যাচ্ছেন, জামাইবাবু, যে আপনার অতিথি সবে ওদেশ থেকে ফিরেছেন। নিশ্চয় গরম লাগছে।'

'তাই তো। কথাটা তো মাথায় আসেনি। তুমি আমাকে মাফ করবে তো, প্রবাহন? আমি একটু সরে বসি। কেমন?'

প্রবাহন এতক্ষণ নীরবে ঘামছিল, তবু মাথা নেড়ে বলে, 'না, না, আমার তেমন কোনো কষ্ট হয়নি। আপনার সঙ্কোচের কারণ নেই, মেসোমশায়। গরম যা লাগবার তা বম্বেতে নেমে লেগেছে। রেলপথেও। তার তুলনায় কলকাতা তো ইটালীর দাক্ষিণাত্য।'

দাক্ষিণাত্য বলতেই ভদ্রমহিলা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। আর প্রবাহনেরও মনে হয় কোথাও যেন তাঁকে দেখেছে।

'এই যাঃ। এখনো তোমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। আমার পরম স্নেহের পাত্র প্রবাহন, যার কথা আজ সকালে সবিস্তারে বলেছি। আর আমার প্রিয়তমা শালী সুদেষ্ণা।'

'আমার কথা সবিস্তারে বলবেন না, জামাইবাবু?' পাল্টা দেন সুদেষ্ণা দেবী। আর প্রবাহনের দিকে সহাস্যে তাকান।

'রানীর স্বামী, বুঝলে প্রবাহন, একজন কীর্তিমান পুরুষ। গত মহাযুদ্ধে চন্দননগর থেকে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে যাঁরা একহাত লড়েন শাক্যসিংহ তাঁদের একজন। ভার্দুনের মাঠে কামানের মুখে তাঁর একটা হাতই উড়ে যায়। ফরাসীরা তাঁকে যুদ্ধের পর পুরস্কার দেয় এমন একটা পদ যা ফরাসীদের জন্যেই সংরক্ষিত। এখন তিনি একহাতে যা কামাচ্ছেন আমরা তা দুইহাতেও কামাতে পারিনে। রানী, কিছু মনে কোরো না, ভাই।'

'আপনি এসব কথা বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার করগুপ্ত।' রানী আবেদন করেন।

প্রবাহন এতক্ষণে চিনতে পেরেছিল। আশ্বাস দেয়, 'না, মিসেস গোস্বামী।'

তু'জনের চোখে মুখে পরিচয়ের স্বীকৃতি। আজকের পরিচয়ের নয়, তু'বছর আগেকার। তু'রাত একদিন ট্রেনের কামরায় সহযাত্রী হয়েছিল ওরা। দাক্ষিণাত্যের পথে।

'মিসেস গোস্বামী! কই, আমি তো নামের সঙ্গে পদবী বলিনি। না ওর, না ওর স্বামীর। তোমরা কি তা হলে পূর্ব-পরিচিত? কবে? কোথায়? কেমন করে?' ঔপন্যাসিকের কৌতূহল জাগ্রত হয়।

'সে অনেক কথা, জামাইবাবু।' রানী এবার ফ্যান বন্ধ করে হাতপাখা এনে প্রবাহনের সামনে এসে বসেন। বাতাস করতে করতে বলেন, 'আপনি কিন্তু আমাকে নিরাশ করেছেন, মিস্টার করগুপ্ত।'

'আমার অপরাধ?' প্রবাহন উৎকর্ণ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে।

'না, না, আপনি খান। সব খাবার বাড়ীতে তৈরি। দিদি ওই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এখন গেছেন কাপড় কাচতে। এরপরে ঠাকুরঘরে ঢুকবেন। কী ভাগ্যি আমি খবর পেয়েছিলুম যে প্রবাহন করগুপ্ত আসছেন চা খেতে। খুব দেরি হয়ে গেল আপনার। না?'

'না, না, দেরি কিসের? যে বাড়ীর যা নিয়ম। কিন্তু ওই যে বলছেন নিরাশ হয়েছেন, ওর মানে কী, মিসেস গোস্বামী?'

'মানে আর কী? ওদেশ থেকে পিকচার পোস্টকার্ড পাঠালে কত ভালো লাগত আমার! সেবারকার দক্ষিণাপথ যাত্রা চিরস্মরণীয় হতো। আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি যে জীবনে দ্বিতীয়বার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। সত্যি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আজ আপনাকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।'

প্রবাহন কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করে। 'দেখুন, মিসেস গোস্বামী, আপনি তো সেবার আমাকে আপনার পূর্ণ পরিচয় দেননি। আমি তো জানতুম না যে আপনার প্রথম নাম সুদেষ্ণা ও আপনাদের ঠিকানা চন্দননগর। আপনার স্বামীর নামও কি জানতুম?'

'সেকথা ঠিক। তবু আমার ধারণা ছিল সম্পাদকের কেয়ারে আমার নামে একখানা পিকচার পোস্টকার্ড আসবে। একই মাসিকপত্রে আমার অক্ষম রচনাও তো বেরোয়। যদিও আপনার চোখে পড়বার মতো নয়। রানী গোস্বামী নামেই লিখি।'

'পড়েছি। পড়েছি। কেমন যেন একটা বিষাদের সুর!' প্রবাহনের মনে পড়ে যায়।

'আমার ভাগ্য!' তিনি কী মনে করে মুখ ফিরিয়ে নেন।

প্রবাহন তার কৈফিয়তের জের টেনে বলে, 'স্বপ্নচালিতের মতো কেটে গেল ওদেশের দুটো বছর। আমি যেন এক স্লীপওয়াকার। ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন অথচ স্বপ্নের মধ্যে

সচল। পিকচার পোস্টকার্ড পেলে শুধু পোস্টকার্ডই পেতেন, পিকচার পেতেন না।'

সুদেষ্ণা জানতে চান, 'আপনার মনের পিকচার বলছেন?'

'আমার মনের প্লেটে জগতের পিকচার। রূপমুগ্ধের মতো দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছি, রূপসী প্রকৃতির পশ্চাদ্ধাবন করে ওকে নয়নসাৎ করেছি, নয়নের অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়েছি আমার অন্তরের অন্তঃপুরে। সেখানে সে আমার একার। অন্তঃপুরে গেলেই আমি তার দেখা পাই। তা হলে আর বাইরে যাই কেন? এখন চুপচাপ একঠাঁই বসতে চাই। বসব আর ভিতরের দরজা খোলা রাখব। আর লিখব। মেসো-মশায় বলছেন নভেল লিখতে। নভেল লেখা মানে তো বাইরের দরজা খোলা রাখা, বাইরের দিকে তাকানো। মানুষকে নিয়ে তার কারবার, প্রকৃতিকে নিয়ে নয়। আমার পরিকল্পনার সঙ্গে মিলছে না তাঁর প্রস্তাব। সেইজন্যে কথা দিতে দ্বিধা বোধ করছি।'

'কথা না দিলে আমি দুঃখ পাব, প্রবাহন।' রানীর দিকে ফিরে আপীল করেন সম্পাদক, 'রানী ভাই, তুমি একটু বল না পাঠিকাদের হয়ে তোমার চেনা এই লেখক বন্ধুটিকে। যদিও জানিনে কবে কোথায় কেমন করে তোমাদের পরিচয় হলো।'

'আপনার প্রস্তাব আমি সানন্দে সমর্থন করছি, জামাইবাবু। মিস্টার করগুপ্ত, আপনি এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না। হাতের সরস্বতী পায়ে ঠেলতে নেই। আপনার কাছে আমরা চাই জীবনের গভীরতম সত্য আর মরণের গোপনতম রহস্য। সাহিত্যের নিত্য-কালের নিঃশ্রেয়স। অবশ্য যদি আপনার নিজের উপলব্ধি হয়। উপন্যাসের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ওর চেয়ে খাটো নয়। অগভীর বা ত্বক্‌-গভীর কাহিনী পড়তে পড়তে অরুচি ধরে গেছে।' বলেন সুদেষ্ণা দেবী।

হেমন্তবাবুর অন্য মত। তিনি চান বাজারচলতি উপন্যাস।

'ইচ্ছে করলে তুমি সীরিয়াস নভেল লিখতে পারো, প্রবাহন, কিন্তু ওরই মধ্যে একটু কমিক রিলিফ থাকলে ভালো হয়। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিতেও যেমন কমিক রিলিফ থাকে। তোমার উপন্যাসের তাতে ক্ষতি হবে না, আর আমার পত্রিকার তাতে বৃদ্ধি হবে। কবে কর্মস্থলে যাচ্ছ? কালকেই? বেশ, বেশ। চাকরিতে তোমার উন্নতি হোক। তোমার কর্মজীবনের উপর আমাদের কোনো দাবী নেই। শুধু তোমার অবসরের উপরেই দাবী। কলকাতা এলে যেন আবার দেখা হয়।' হেমন্তবাবু বিদায়ের ইঙ্গিত করেন।

॥ দুই ॥

প্রবাহনকে এত স্বল্প সময়ের জন্যে পেতে সুদেষ্ণার অনিচ্ছা। 'ও কী ! আপনি উঠছেন কেন ? আবার কবে দেখা হবে কে জানে ! হয়তো আর হবেই না। আমরা মেয়েরা পরাধীন প্রাণী। আর সরকারী চাকুরেদের পরাধীনতা যে কী জিনিস তা আপনিও টের পাচ্ছেন। কী অদ্ভুতভাবে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় !'

'দ্বিতীয় দেখাটাও কম অদ্ভুত নাকি ?' প্রবাহন আরো কিছুক্ষণ বসতে রাজী হয়।

'অদ্ভুতভাবে' শুনে হেমন্তবাবুও প্রুফের বাণ্ডিল সরিয়ে রেখে তাঁর রিভল্ভিং চেয়ারটাতে আরেকবার পাক খান। 'অদ্ভুত' শুনে তিনি উৎসুক হন।

'আপনার কি মনে নেই, জামাইবাবু, যে সেবার পুরী থেকে ফেরার সময় আমাকে বেজওয়াডা, হায়দরাবাদ, মানমাদ, নাগপুর ঘুরে হাওড়া আসতে হয় ? সরাসরি সংযোগ ছিন্ন। নদীতে বান। তিন জায়গায় ভাঙন। পনেরো দিন লাগবে সারাতে সঙ্গে আমার মেয়ে আর আমাদের সরকারবাবু। মাদ্রাজ মেল মাদ্রাজ ফিরে যাচ্ছিল, আমরা তিনজনে থার্ড ক্লাসে উঠে বসি। সরকারবাবুর থার্ড ক্লাস টিকিটের খাতিরেই আমাদের থার্ড ক্লাসে ওঠা। টিকিট চেকার বলেন, ও কী ! আপনাদের দু'জনের যে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট। আমি বলি, সেকেণ্ড ক্লাসে একা ভ্রমণ করতে আমার সাহস হয় না। লেডিজ একদম ফাঁকা। আর অন্যান্য কামরায় সব অচেনা পুরুষ। চেকার বলেন, তা বলে আপনারা থার্ড ক্লাসে সারা রাত সারা দিন কষ্ট পাবেন। তাও একদিন একরাত নয়, চার রাত চার দিন !'

'হাঁ, আমার মনে আছে, চেকার এসে আমাকে ধরে নিয়ে যান আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিতেই আমি আপনাদের দুজনকে আমার কামরায় উঠতে অনুরোধ করি। আমি ছাড়া তাতে আরো একজন ছিলেন, তিনি অবাঙালী। আমরা বাঙালীরাই হলুম মেজরিটি। বেশ গল্প করতে করতে আর দৃশ্য দেখতে দেখতে কেটে যায় দু'রাত একদিন। আমি নেমে যাই ট্রেন বদলের পর সেকেন্দরাবাদে। বম্বে গিয়ে জাহাজ ধরতে। বাকী পথটা আপনাদের কীভাবে কাটবে কল্পনা করতে চিন্তিত হই।'

'মন্দ কাটেনি। সন্ধ্যার আগে মানমাদে পৌঁছে যাই। সেখান থেকে বম্বে মেল। লেডিজে সঙ্গিনীর অভাব হয় না। তবে বাংলার অভাব অনুভব করি। তার থেকে আপনার অভাব।' সঙ্কোচের সঙ্গে বলেন সুদেষ্ণা দেবী।

'আমি কিন্তু', প্রবাহন বলে, 'আপনার অভাব বোধ করি অন্য কারণে। দুরন্ত

উদরাময় নিয়েই ট্রেনে উঠতে হয় আমাকে। নইলে জাহাজ ফেল করতুম। সঙ্গে এক বোতল ঘোল। আপনি না থাকলে আমাকে ফুটোনো জল দিত কে, হবলিক্স দিত কে! বলতে গেলে সারিয়ে তুলত কে! আপনিই আমার তারিণী। কিংবা সারিণী।'

'সারিণী!' সম্পাদক তারিফ করে বলেন, 'কথাটা তো বেশ লাগসই হে! আমি কিন্তু এটা চুরি করলুম আমার নতুন উপন্যাসের জন্যে। খবরদার, তুমি ব্যবহার করতে পারবে না।'

সুদেষ্ণা বলেন, 'ওটুকু যে-কোনো মানুষ যে-কোনো মানুষের জন্যে করে। ওটা কিছু নয়। কিন্তু একটি অসহায় নারীকে ও তার কন্যাকে পথের কষ্ট থেকে উদ্ধার করা তার চেয়ে বড়ো জিনিস। আপনি তো আপনার লোয়ার বার্থও ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে যখন টের পাই যে আপনার পেটের অসুখ তখন আমিই আপার বার্থে যেতে উদ্যত হই। তখন সেই দক্ষিণী ভদ্রলোক—আহা! তাঁর মঙ্গল হোক!—দয়া করে আপার বার্থে যান।'

হেমন্তবাবু সুদেষ্ণার ভাব থেকে বুঝতে পারেন যে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়াই তাঁর অভিপ্রায়। তখন তিনিই গা তোলেন। বলেন, 'দেখি আমার ঘরের লোকটি কী করছেন।'

সুদেষ্ণা পরিহাস করেন, 'তিনি আজকের এই কাব্যের উপেক্ষিতা।'

হেমন্তবাবু তার উত্তরে পাল্টা দেন, 'তিনি নন, আমিই উপেক্ষিত। এমন জমে গেছ যে তৃতীয় একজনের উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলে গেছ, রানী।'

খবরটা প্রবাহনেরও গায়ে লাগে। সে বলে, 'অনুমতি দেন তো আমিও আজ উঠি'।

'না, না, আপনার সঙ্গে আমার আরো কথা ছিল। কে জানে কবে আবার দেখা হবে! এ জীবনে এই শেষ দেখা কি না কে জানে। আমি তো কলকাতায় থাকিনে। থাকি চন্দননগরে। একদিক থেকে কাছে। আরেকদিক থেকে দূরে। কেননা নিজের বলতে এখানে কোনো আস্তানা নেই। আত্মীয় যদিও অনেক তবু কার কখন সুবিধে কার কখন অসুবিধে সে খবর না জেনে আপনি এসেছেন শুনেই ছুটে আসা যায় না।'

প্রবাহন যতই ভাবছিল ততই ভেবে অবাক হচ্ছিল। তার বিদেশ যাত্রার ক্ষণে যে মহিলা তাকে কতক পথ এগিয়ে দেন তার প্রত্যাবর্তনের সময় তিনিই কিনা এসেছেন তাকে প্রত্যুদ্গমন করতে। কী আশ্চর্য যোগাযোগ।

'আপনি ছুটে আসবেন কেন, আমিই ছুটে আসব, যদি ছুটি মেলে। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে হবে আমাকে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে।' প্রবাহন বলে।

'বড়দিনের বন্ধে যদি আপনার আসা হয় আমাকে জানালে আমিও আসব। অন্তত চেষ্টা করব। এমনিতেই মাঝে মাঝে আসি কেনাকাটা করতে। কিন্তু ছুটির দিনে নয়

বলে আপনাকে কাজকর্ম ফেলে আসতে বলব না।'

'বড়দিনের বন্ধে আমি আসবই। আশা করি আপনিও পারবেন আসতে।'

'বড়দিনের দিন নয়। ফরাসীরা ছাড়বে না। উৎসবে যোগ দিতে বলবে। কিন্তু পরে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

দু'চার কথার পরে সুদেষ্ণা দেবী বলেন, 'দু'বছর বাদে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছেন ? মানে আমার চেহারায় ?'

'সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে তত ফরসা মনে হচ্ছে না।'

'সেটা', তিনি নির্লিপ্তভাবে বলেন, 'বিলেতফের্তাদের দেশে ফিরে দৃষ্টিবিভ্রম। সবাইকে তাঁদের চোখে কালো দেখায়। কিন্তু তা নয়। আমার জীবনে শোক এসেছে।' বলতে বলতে তাঁর চোখ সজল হয়ে ওঠে।

'শোক !' প্রবাহনের মুখ দিয়ে কথা সরতে চায় না।

'পুরী থেকে ফিরে দেখি মেজ ছেলের মেনিনজাইটিস। কোনো মতেই বাঁচানো গেল না। পথে তিন দিন দেরি না হলে হয়তো তাকে নিজের হাতে শুশ্রূষা করে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারতুম। নয়তো এটুকু সান্ত্বনা থাকত যে আমি তো আমার মাতৃকর্তব্য করেছি। আপনি তো অনেক পড়েছেন, অনেক দেখেছেন, বলতে পারেন কেন এমন হয় ? ভগবান কেন এমন নির্দয় ? না তিনিও তাঁর নিয়মের কাছে অসহায় ? না আমারি পাপে এ সর্বনাশ ? না ওরই পূর্বজন্মের কর্মফল ?'

কী বলবে প্রবাহন ! কীই বা পারে বলতে। মৌন সমবেদনায় ব্যথার ব্যথী হয়।

'দু'বছর হয়ে গেল, একটা দিনও শান্তি পাইনি। যে ক'টি বেঁচে বর্তে আছে তাদের কাঙালের মতো আঁকড়ে ধরে বসে আছি। কিন্তু ওকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারতুম ! এক এক সময় মনে হয় ওর পিছন পিছন ধাওয়া করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু এদের ফেলে কী করে যাই ?'

প্রবাহন কী ভেবে বলে, 'আসুন, একসঙ্গে একটু প্রার্থনা করা যাক। মনে মনে।'

সেদিন প্রার্থনার শেষে সুদেষ্ণা দেবী প্রবাহনের দুটি চোখের উপর দুটি চোখ রেখে বলেন, 'অন্তর ভরে গেল ভাষাতীত ভাবে। কী বললেন আপনি ভগবানকে, জানতে পারি কি ?'

'বললুম, তুমি আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও কেন ? তুমি কি জানো না আমার কী চাই ? আমার চাই সঙ্গ। তোমার সঙ্গ। আর যাই কর আমাকে নিঃসঙ্গ কোরো না। মৃত্যু দিতে চাও, বেশ। তাই হোক। কিন্তু সেইসঙ্গে তোমার সঙ্গ যেন দাও। আমাকে নিঃসঙ্গ কোরো না। তুমি যদি সঙ্গে থাক আমি মরতেও রাজী। তুমি আমার হাত ধরে থাকলে আমি মরণসাগর পার হয়েও বেঁচে থাকব।'

সুদেষ্ণার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তখন প্রবাহন আস্তে আস্তে বলে, 'তা হলে আসি, মিসেস গোস্বামী।'

'না, আর আপনাকে ধরে রাখব না আজ। শুধু একটি কথা। একটা কিছু পাতানো যায় না?' তিনি কাতরভাবে বলেন।

'একটি আত্মার সঙ্গে আর একটি আত্মার প্রকৃত সম্পর্ক কী কেউ বলতে পারে না। সমাজের মুখ চেয়ে যেটা পাতায় সেটা হয়তো সত্যিকার সম্পর্ক নয়। লোক দেখানো একটা সম্পর্ক নিয়ে আমি করব কী?' প্রবাহন পাশ কাটাতে চায়।

'ওতে পরকে আপন করে। এটা তো মানবেন?' তাঁর চাউনিও কাতর।

'তা হয়তো করে। যদিও সব সময় নয়। সাধারণত ওটা একটা শিষ্টাচার।' প্রবাহন বলতে পারত তান।

'আচ্ছা, আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার যেটা পছন্দ।' অভিমানের স্বরে বলেন সুদেষ্ণা।

'আমার উপর ছেড়ে দিলে আমি কোনো এক অপারিবারিক সম্পর্ক পাতাতে চাইব। যেমন চোখের বালি বা দেখন হাসি। অনেকদিন থেকে আমার সাধ একজনের সঙ্গে তৃষ্ণার জল পাতানো। সে হবে আমার তৃষ্ণার জল, আমি হব তার তৃষ্ণার জল।' প্রবাহন ভয়ে ভয়ে বলে।

'না, না। ও সম্পর্ক নয়।' তিনি আঁতকে ওঠেন।

'তা হলে ওইসব দিদি-টিদি মাসি-টাসি পাতাতে আমার উৎসাহ নেই। ওর মধ্যে একটিমাত্র সম্পর্ক আমাকে উৎসুক করে। বৌদিদি।' প্রবাহন আগ্রহ দেখায়।

'বেশ তো। সেই ভালো। এখন থেকে আমি আপনার রানী বৌদিদি।' তাঁর মুখে হাসি ফোটে। মনে মনে এই যেন তিনি চেয়েছিলেন।

রানী বৌদিকে দেখে মনে হয় তাঁর বুকে অনেকদিনের অনেক কথা জমেছে, সেসব মুখ ফুটে বলার জন্যে তিনি প্রবাহনের মতো একজন দরদী শ্রোতা খুঁজছিলেন, আজ তাকে পেয়েছেন ও সহজে ছাড়বেন না। প্রবাহনেরও তাতে অরুচি নেই। মেয়েদের কনফিডেন্স পাবার দুর্লভ সৌভাগ্য তার জীবনে বার বার এসেছে। তার জন্যে অবশ্য এক একজনের সঙ্গে এক একরকম সম্পর্ক পাতাতে হয়েছে। তার 'দ্বিতীয় মা' ও তার 'বোন' ইংরেজ বলে ব্যতিক্রম নন।

সেদিন রানী বৌদি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, মেসোমশায় ও মাসিমাকে দেখে থেমে যান। তাঁদের সঙ্গে দু'চার মিনিট কথা বলে প্রবাহন সেদিনকার মতো বিদায় নেয়। রানী বৌদির বক্তব্য অব্যক্ত রয়ে যায়।

'তা হলে তুমি তোমার সরকারী কর্মে যোগ দিয়ে ও বাংলোয় গুছিয়ে বসে

মাসখানেক বাদে একটু অবসর পেলেই উপন্যাসটা আরম্ভ করে দিচ্ছ তো, প্রবাহন? সম্পাদক প্রশ্নসূচকভাবে ফরমাস করেন।

'একটা বলবার মতো স্টোরি পেলে ও আমি ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না বুঝলে আপনার নির্দেশ আমি খুশি হয়ে মান্য করব, মেসোমশায়। তবে আপনাকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে।'

'সানন্দে। পরে যখন তুমি কলকাতা আসবে তখন টেকনিক নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা হবে। ও ছাড়া তোমাকে শেখাবার মতো বিদ্যে আমার নেই, যদি তুমি সত্যি আমার কাছে শিখতে চাও, প্রবাহন।'

তাঁকে বেশ বিচলিত মনে হয়। তিনি আরো বলেন, 'আমি জানি আমাদের দিন গেছে। তোমাদের এগিয়ে দিয়েই আমাদের ছুটি। তোমরা আমাদের পরাস্ত করলে আমরাই সব আগে বাহবা দেব। শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্।'

প্রবাহন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। তিনি তার কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, তবে প্রথম পাঠ আজ এইখানেই শুরু হয়ে থাক। উপন্যাস যখন লিখতে বসবে তখন মনে রাখবে যে, সব সময় কিছু হাতে রাখতে হয়। আরব্য উপন্যাসের শেহের জাদীর মতো। রাত ফুরোবে, কিন্তু কাহিনী ফুরোবে না। পাঠকের কৌতূহল গোড়ায় যেমন ছিল শেষেও তেমনি থাকবে। তাকে আবার শুনতে হবে।'

॥ তিন ॥

যৌবনের সেই মধুর দিনগুলিতে পথে ঘাটে মণিমুক্তা ছড়ানো ছিল। প্রতিদিন কত নতুন মুখের সঙ্গে মুখোমুখি হতো, কত নতুন হাতের সঙ্গে হাত ছোঁয়াছুঁয়ি। কত নতুন মন ও নতুন হৃদয় ক্ষণকালের জন্যে উন্মোচিত হতো।

অমৃত। অমৃত। উপন্যাসের সাধ্য কী যে এদের সব ইকে ধরে রাখে। এর জন্যে চাই তুলি আর ক্যানভাস। বিরাট ক্যানভাস। আর অখণ্ড অবসর।

জেলার সদরে গিয়ে রাজকর্মে যোগ দিয়ে প্রবাহন হৃদয়ঙ্গম করে যে, আর-সব সমস্যার সমাধান সম্ভব, কিন্তু অখণ্ড অবসর নৈব নৈব চ। তার আপনার বলতে কোনো সময়ই নেই। সমস্তটাই সরকারের। রাজকার্য যখনি এসে উপস্থিত হবে তখনি তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, নইলে সে দুর্বাসা মুনির মতো অভিশাপ দিয়ে ট্র্যাজেডীর অবতারণা করবে।

ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে টেনিস খেলছে। হঠাৎ হাজির হয় এক টেলিগ্রাম। তিনি তো খেলা ফেলে চললেনই, ধরে নিয়ে গেলেন প্রবাহনকেও। কারণ সে তাঁর কাছে শিক্ষানবিশ। দেখুক সে, দেখে শিখুক, কেমন করে অ্যাকশন নিতে হয়।

'কারগুপ্টা', ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বলেন, 'আপনি হলে কী করতেন? কী হুকুম দিতেন? পুলিশ পাঠাতেন, না নিজেই সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করতেন, দরকার হলে গ্রেপ্তার করতেন?'

কী ভয়ঙ্কর কর্তব্য! প্রবাহন ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে যে তাকে তালিম করে তোলা হচ্ছে একশো রকম দায়িত্বের জন্যে। সে যেন শতভুজ। চাষবাস, আদমসুমারি, নদীনালা, চৌকিদারি, মামলা মোকদ্দমা, খাজনা আদায়, কিছুই তার কাছে পরধর্ম নয়, যদিও প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা একটা বিভাগ আছে। সে হয়তো অধিকবয়সে কোনো একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবে, কিন্তু আপাতত তার কাজ হচ্ছে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। নিছক কলম চালানোর জন্যে অন্য লোক আছে। প্রবাহনকে নিতে হবে সিদ্ধান্ত, নিতে হবে তৎক্ষণাৎ। আর সে সিদ্ধান্ত বলবৎ করতে হবে। সম্ভব হলে তৎক্ষণাৎ। গড়িমসির মার্জনা নেই, ভুলচুকের আছে।

'কারগুপ্টা', মিস্টার স্কট তাকে ডেকে পাঠান, 'হিজ এক্সেলেন্সী এলে এই হলঘরটাতে দরবার করবেন। এই আমার মত। আপনার মত কী?'

প্রবাহন বললেই পারে, 'আপনার চেয়ে আমি কি ভালো বুঝি?'

কিন্তু তাঁর ও তার একই সার্ভিস। মতের প্রশ্ন যদি ওঠে তিনি ও সে সমান স্বাধীন। ইচ্ছা করলে তিনি তার মত অগ্রাহ্য করতে পারেন। সে একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'দেয়ালগুলোর রং চটে গেছে। ক্লাইভের আমলের বাড়ী।'

'আহ্! সেকথা কি আমি ভাবিনি মনে করেন?' এই দেখুন তিন রকম রং আনিয়ে রেখেছি। কোন্‌টা আপনার মতে মানানসই?'

দু'জনের দুই মত। শেষে তৃতীয় রংটাই উভয়ের মনোনয়ন পায়। নীল রঙেরই একটা শেড। আইভরি ব্লু।

প্রশাসন যদিও শুকনো কাঠ তবু তার ভিতরেও রসের আস্বাদন মেলে। সে আর কিছু নয়, মানুষের সরকারী বা দরকারী চেহারার আড়ালে সবদিনের সবকালের মানুষ। প্রত্যেকেই যেন একটি চরিত্র। অফিসার, কেরানী, চাপরাশি কেউ কারো চেয়ে কম মানুষ নয়। অনেক সময় উকিলের চেয়ে মুহুরী আরো ইন্টারেস্টিং। দারোগার চেয়ে আসামী। সাক্ষী দিতে যারা আসে তাদের মধ্যে মেয়েরাই আরো ইন্টারেস্টিং। মোক্তারের জেরায় তারা টলে না। প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিকের ধার ধারে না। একটা প্রশ্ন করলে আরেকটা উত্তর দেয়।

এরাই তাকে ঔপন্যাসিক করে ছাড়বে। প্রবাহন মনে মনে ভাবে। কিন্তু এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লোকে নালিশ করে বা আদালতে আসে আর এত মিথ্যা বলে যে ওসব নিয়ে উপন্যাস লিখলে মানবজীবনের সার সত্য প্রকাশ পায় না। পায় তার অসারত্ব। সার সত্যের জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়। তাঁবু গাড়তে হয়। প্রথম বছরটা সদর থেকে বেরোবার সুযোগ বড়ো একটা জোটে না। পরে জুটবে।

বন্ধু নিশীথকেও একই স্টেশনে নিয়োগ করা হয়। দুই বন্ধুতে মিলে ঘরসংসার করে। সংসার প্রবেশ সেই প্রথম। প্রবাহনের কাছে সংসার প্রবেশ একটা বিভীষিকা। সংসারী হলে কবির কবিত্ব চলে যায়। প্রেমিকের প্রেম। স্বাধীনের স্বাধীনতা। কিন্তু নিশীথ তার সঙ্গী হওয়ায় আস্তে আস্তে ভয় ভেঙে যায়।

সঙ্গী থাকলেও প্রবাহনের নিঃসঙ্গ বোধ হয়। বিয়ে করতে রাজী হলে এখনি বিয়ে হয়ে যায়, একটার পর একটা সম্বন্ধ আসছে। কিন্তু সে রকম বিয়ে সে করবে না। সে করবে ভালোবেসে বিয়ে। কখনো বা সে প্রেমে পড়েছে, অপর পক্ষ পড়েনি। কখনো বা অপর পক্ষ প্রেমে পড়েছে, সে পড়েনি। কখনো দু'পক্ষে প্রেম, কিন্তু অলঙ্ঘ্য বাধা।

বিয়ের আশা নেই উপলব্ধি করলেও ভালোবাসার শেষ নেই। সে তার আপন নিয়মে চলে। আপনি নিঃশেষ না হলে তাকে জোর করে নিবৃত্ত করা যায় না। জোর করা উচিতও নয়। হৃদয়কে একবার একজনকে দিয়ে তার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার মতো যন্ত্রণা আর নেই। এমন যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে একবার যে গেছে সে কি দ্বিতীয়বার যেতে চায়! একটা অব্যক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে প্রবাহনের অন্তর। আবার তাকে সেই যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ফিরে পেতে হবে তার হৃদয়। কিন্তু জোর করে নয়। প্রেম যখন আপনি নিঃশেষ হবে তখন। বিয়ের আশা নেই বলে দুটি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা তো কম মূল্যবান নয়। কেন তা হলে সে ভালোবাসার অকালসমাপ্তি ঘটাবে? হৃদয় ফিরিয়ে নেবার কথা উঠবেই বা কেন? শূন্যতা কি ভালো?

নিজের কাছে সে তার এ জিজ্ঞাসার উত্তর পায় না? প্রেম যদি সত্য হয়ে থাকে, যদি উভয়ের অন্তরে থাকে তা হলে বিয়ের আশা নেই বলে প্রেমের অন্তর্ধান হবে কেন? এ কেমনতর প্রেম যে বিয়ের আশা নেই দেখে অমনি উধাও হয়ে যায়?

প্রবাহন মনে মনে পরাজয় স্বীকার করে। বলে, আমারি দোষ। আমার দেহে আগুন লেগেছে। কোথায় পাব সে জল যাতে অঙ্গ জুড়ায়? প্রিয়ার কাছে না মেলে তো আর কার কাছে মিলবে? বিয়ে করলেই কি সে আমাকে ভালোবাসবে? বধূ হলেই কি সে আমার প্রেমিকা হবে? আর আমি? আমার দেহ আর মন আমি দু'জনকে দু'ভাগ করে দিতে পারব না। যে নেবে সে আমার মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহও নেবে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও। তেমনি আমিও যার মন পাব তার দেহও পাব। যার

দেহ পাব তার মনও। পূর্ণ মিলন হতে আমি বঞ্চিত হতে চাইনে। হলে আমার জীবনটাই অপূর্ণ।

এই অপূর্ণতাবোধ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকবে। তাই একদিন না একদিন একজনের না একজনের সঙ্গে তৃষ্ণার জল পাতাতেই হবে। যার সঙ্গে মিলনের জন্যে দেহমন ব্যাকুল। তার সঙ্গে থাকবে না বিবাহের বাধা। কিন্তু আমার হৃদয় যদি আমার হাতে না থাকে তা হলে সে বাধা বিয়ের বাধাকেও হার মানায়। হৃদয় ফিরে পাবার কথা এইজন্যেই ওঠে।

প্রবাহন যাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে তিনি অসমবয়সিনী। তাঁর বিয়ের বয়স কবে পার হয়ে গেছে, এখন আর তৃষ্ণা নেই, তৃষ্ণার জল চান না। প্রবাহনকে তিনি তৃষ্ণার জল দেবেন না। তা বলে তাঁর নিজের হৃদয় তিনি ফিরিয়ে নেবেন না।

প্রেম প্রবাহনের জীবনে বার বার এসেছে, তাকে বার বার কাঁদিয়েছে। কিছুতেই সে সব দিক মেলাতে পারে না। একটা না একটা কিছু কম পড়ে বা বিজোড় হয়। আরো আগে যাঁকে ভালোবাসত তিনি সমবয়সিনী, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিতা। তাঁর মুক্তির আয়োজন করা গেল তো তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানবতী। অবশেষে আপনাকেই মুক্ত করে নিতে হলো। আপনার হৃদয়কেও। এর পরে সে আর কোনো নারীকে ধরাছোঁয়া দিতে চায় না। স্বাধীন থাকতে পেলে বাঁচে। তাই অন্য একজনের অযাচিত প্রেম সাড়া না পেয়ে ফিরে যায়। হাঁ, সেও কাঁদিয়েছে।

এই তো সেদিন কলকাতায় পৌঁছেই তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যায়। এর মধ্যে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি অপরের বধূ। তার বন্ধু নন। তার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা বলেন। অতি সন্তর্পণে। একঘর মানুষের সামনে। বোধহয় আত্মরক্ষার খাতিরে। কিংবা আত্মসংবরণের। চোখে চোখে কথা হবে যে, তারও উপায় নেই। চোখ তোলেন না। হঠাৎ যদি চোখাচোখি হয় তবে চমকে ওঠেন। যেন কেউ ধরে ফেলেছে। না, নিছক বন্ধুতায় আর তাঁর প্রয়োজন নেই। প্রবাহন হতভম্ব হয়ে ফিরে আসে। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা কি সম্পূর্ণ পর হয়ে যায়? কে জানে, হয়তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। নয়তো ক্ষমাহীন অভিমান।

যারা গেছে তাদের জন্যে আপসোস করে কী হবে? ভুলে যাওয়াই ভালো নয় কি? বোঝাপড়া এ জীবনে হবে না। হবার নয়। ভুল বোঝাবুঝি নিয়েই জীবন। একটিমাত্র হৃদয় নিয়ে মানুষ করবে কী? ক'জনকে দেবে? যাকে দেবে না, বা দিয়ে ফেরৎ নেবে, সে রাগ পুষে রাখবেই। অথবা বিরাগ। হয়তো বা অনুরাগ। আশা করা যাক সে একদিন উদাসীন ও বীতরাগ হবে।

॥ চার ॥

বড়দিনের বন্ধে স্টেশনত্যাগের অনুমতি পেয়ে নিশীথ ও প্রবাহন কলকাতা যায়। নিশীথদের বাড়ীতেই ওঠে ওর বন্ধু।

রানীবৌদির কাছ থেকে আর কোনো খবর না পেয়ে প্রবাহন ধরে নিয়েছিল যে তাঁর কলকাতা আসা হবে না। হঠাৎ তাঁর দূত এসে হাজির। তিনি যে-বাড়ীতে উঠেছেন সে-বাড়ীর মোটর সমেত। প্রবাহন শোনে তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তবে সে যদি এখন সময় না পায় কখন পাবে সেকথা বললে পরে আবার গাড়ী এসে নিয়ে যাবে। প্রবাহন এক মিনিট ভেবে নিয়ে বলে, আচ্ছা, অন্য এনগেজমেন্ট টেলিফোনে ক্যানসেল করে সে আসছে।

রানীবৌদি বলেন, 'এর মধ্যেই তোমার রং মলিন হয়ে এসেছে, ঠাকুরপো।'

'তেমনি আপনার রং আরো ফরসা।' প্রবাহন হেসে বলে।

'কে জানে, ভাই। আর আমার ওদিকে খেয়াল নেই। কেউ যদি ভাবে আমি কালীর মতো কালো হয়ে গেছি তাতেও আমার কিছু আসে যায় না। বুলা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপের জাঁকও চলে গেছে। যা দেখে ওরা আমাকে ঘরে এনেছিল তার কতটুকু আর বাকী।'

এটাও তাঁর আরেক দিদির বাড়ী। ইনি মামাতো নন, মাসতুতো। এখানে আরো বেশী জায়গা, আরো বেশী আরাম। বেল টিপলেই চাকর ছুটে আসে। অর্ডার নিয়ে যায়।

'তারপর, কী খাবে, বল? চপ কাটলেট আনিয়ে দেব?' বৌদি বলেন।

'আপনি যা খাবেন আমি তাই খাব।' প্রবাহন বলে।

'তা কি হয়! তুমি সাহেব মানুষ। তোমার খানা আর আমার খাওয়া কি এক? আজকাল ঠাকুরকে না দিয়ে তাঁর প্রসাদ না করে আমি কিছু মুখে দিইনে।'

'বেশ তো, আমিও তাই মুখে দেব। আমার ভালো করেই জানা আছে যে ঠাকুরকে যেমন পরিপাটি করে ভোগ দেওয়া হয় মানুষকে তেমন নয়, যদি না তিনি হন তেমনি কোনো একজন কেষ্ট বিষ্টু।' প্রবাহন হাসে।

'ছি ছি, ঠাকুরপো, ঠাকুরদেবতার নামে অমন কথা বলতে নেই। পাপ হয়। আমি আমার ঠাকুরকে যা দিই তা অতি সামান্য নাড়ু কি মোয়া কি বাতাসা, তার সঙ্গে ফলমূল আর দুধ।'

'তা হলে তাই দিন আপনার ঠাকুরপোকে।' প্রবাহন আগ্রহ দেখায়।

'পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ো না যে বৌদি খাওয়াতে জানে না। জানি সবই,

কিন্তু এ বাড়ী আমার নয়, আর অর্ডার দিলে যদিও সমস্ত কিছু পাওয়া যায় তবু আপন হাতে রেঁধে খাওয়ানোর ব্যবস্থা নেই। এরপরে আমি যেখানে ওঠার কথা ভাবছি সেখানে থাকবে ? আসবে তুমি সে বাড়ীতে ? সামনের সরস্বতী পুজোর ছুটিতে ?'

প্রবাহন কথা দিতে পারে না, কারণ সে নিজে কোথায় উঠবে তাই জানে না।

'কেন, আমাদের সঙ্গে উঠবে। সবাই খুব খুশি হবে।' বৌদি বলেন, 'পিসিমাকে তোমার কথা বলেছি। তোমার লেখা পড়েছেন।'

'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো। চোখে দেখলে হতাশ হবেন, যেমন হয়েছেন আমার সাহিত্যিক বন্ধু স্বনন্দ।'

'এর উত্তরে পিসিমা বলবেন, খোকা বলেই ভালোবাসি, ভালো বলে নয়। অত্যন্ত স্নেহশীলা নারী, দেখবে কত আদর করবেন।' বৌদি আশ্বাস দেন।

প্রবাহন ভেবে বলে, 'আমারও এক দাদা আছেন এখানে। সম্পর্কিত নন, পাতানো। তাঁর ওখানে ওঠার জন্যে তিনি বার বার বলে রেখেছেন। কেন, তা আন্দাজ করেছি। তাই ধরাছোঁয়া দিচ্ছিনে। এবার দিইনি। এরপরে বোধহয় এড়ানো যাবে না।'

বৌদি তাঁর কৌতূহল দমন করতে পারেন না। ফিস ফিস করে বলেন, 'ব্যাপার কী ? বিবাহযোগ্যা—'

প্রবাহনও ফিস ফিস করে বলে, 'আপনার মেয়েলি ইনটুইশন অমোঘ। দাদার নয়, দাদা এখনো কুমার। তাঁর এক বন্ধুর দাদার।'

'তা হলে আর দেরি কেন ? বিয়ে যখন করতেই হবে একদিন না একদিন। তোমরা ছেলেরা কেন বোঝ না যে মেয়েরা তোমাদের মতো অপেক্ষা করতে পারে না। রূপ বল, রং বল, দু'দিনের ইন্দ্রধনু। দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। তখন কে বিয়ে করবে শুধু গুণ দেখে ?' বৌদির যেন নিজেরি কন্যাদায়। কন্যা যখন আছে তখন বছর কয়েক পরে কন্যাদায়ও কপালে আছে।

'বিয়ে যে আমি করব না কোনোদিন তা নয়। তেমন কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আমার নেই। কিন্তু তার আগে জানতে হবে কে আমার তৃষ্ণার জল, কার আমি তৃষ্ণার জল। শুধু জানতে হবে তাই নয়। সত্য করে জানতে হবে। মৃগতৃষ্ণাও অনেক সময় নদীর জলের মতো দেখায়।' প্রবাহন অভিজ্ঞের মতো বলে।

'তুমি এই বয়সে এত কথা জানলে কী করে ?' বৌদি জেরা করেন।

'না জানলে আমি লেখক হলুম কিসের দৌলতে ? যদি শুনতে চান একদিন বলব। কিন্তু আজ নয়, বৌদি। আজ আমার মন ভারাক্রান্ত। নভেল লেখার কথা ভাবছি। হেমন্ত মেসোমশায় তাগাদা দিয়েছেন। দেখা করতে গেলেই বলবেন, কই, কী এনেছ ?

এবার কিন্তু আমি দেখা করব না। আপনি কি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে প্লট সম্বন্ধে আমি মনঃস্থির কবতে পারিনি ?' প্রবাহন তাঁর শরণ নেয়।

'আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলার কে। ভাববেন আদিখ্যেতা করছি। না, ঠাকুরপো, এ যাত্রা আমি তোমার তারিণী বা সারিণী নই। তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করে বলছ না কী নিয়ে তুমি লিখতে গিয়ে মনঃস্থিব করতে পারছ না।'

'ওটা হলো লেখকেব সীক্রেট। এখন থেকে যদি বলে দিই আপনি আমার নভেল পড়বেন না। আমি একটি পাঠিকা হাবাব। কিছুদিন সবুব ককন, ছাপাব অক্ষবে দেখবেন কী লিখেছি।' প্রবাহন তাঁব ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দেয়।

'তা হলে তুমি বিশ্বাস করে বলবে না আমাকে ? তোমাব সঙ্গে আড়ি। আব আমি তোমাব কাছে কোনোদিন কিছু চাইব না। আড়ি, আড়ি—'

'তিনবার নয়।' প্রবাহন দু'হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'কে আপনাকে অবিশ্বাস কবছে, বৌদি ? কিন্তু সমস্যাটা ঘোবতর কঠিন ও জটিল। যদি আপনাব অত ধৈর্য থাকে তো শুনতে আজ্ঞা হোক। এখন কথা হচ্ছে, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি ?'

'থাক, অত গৌবচন্দ্রিকা কবতে হবে না। আমি এমন কী একটা মানুষ যে আমাকে তুমি ভয় কববে। তুমি, যে একজন নরমুণ্ডেব কর্তা।' বৌদি তাব দিকে প্রসাদেব থালা বাড়িয়ে দেন।

'চমৎকাব। প্রসাদ আমি অনেকদিন খাইনি, খেতে পাইনি। কিন্তু এত কিছু যদি পসাদ হয় তো এক পেয়ালা চা কেন প্রসাদ হবে না ?' প্রবাহন বঙ্গ করে।

'ঠাকুরকে কেউ কখনো চা উৎসর্গ করে বলে শুনিনি। তবে চা যদি তুমি চাও তো অর্ডার দিতে পাবি।' বৌদি চাকরকে ডেকে পাঠান বেল টিপে।

'ঠাকুব ছাড়া আব কি কেউ নেই, আব কোনো গুরুজন, যিনি ওটাকেও প্রসাদ করে দিতে পারেন ?' প্রবাহন দুষ্টুমি করে বলে।

'চা আমি ছেড়ে দিয়েছি, ঠাকুরপো।' রানীবৌদি ভাবী গলায় বলেন, 'বুলাব জন্যে যা যা ছেড়েছি তাব মধ্যে চা কফি কোকো এগুলোও পড়ে। যা না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না কেবল সেই ক'টি জিনিসই আমি খাই। ঠাকুবকে অবশ্য আবো কিছু বেশী দিতে হয়, সেটা বিলিয়ে দিই।'

'তা হলে, থাক, বৌদি। চা দিতে হবে না। যদিও চায়ের সময় এক পেয়ালা চা না পেলে কেমন অসোয়াস্তি লাগে।' প্রবাহন অকপটে বলে।

'আচ্ছা, তোমার খাতিরে আজ আমি চা খাব। ঠাকুর তো একথা বলেন না যে তাঁব জন্যে মানুষকে কষ্ট দিতে হবে।' বৌদি দু'জনেব মতো অর্ডার দেন।

কথাবার্তা একটু একটু করে জমে ওঠে। প্রবাহন বলে, 'যে কাহিনীটা আমার মাথায়

ঘুরছে সেটা সম্পূর্ণ অমূলক। চরিত্রগুলি বিশুদ্ধ কল্পনা। উপন্যাসের গোড়ায় এটা ঘোষণা করতে চাই। নয়তো পাঠকপাঠিকারা ঠাওরাবেন সব সত্যি।'

বৌদি সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন, 'হুঁ।'

'নায়কের নাম খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান। মহাভারতের কঙ্ক নামটি কী রকম?'

'চলবে না।' বৌদি এ কথায় খারিজ করেন।

'আর নায়িকার নাম প্রমদ্বরা?' প্রবাহন জিজ্ঞাসুভাবে তাকায়।

'অচল। আমার বাবা আমার নাম পুরাণ থেকে নিয়ে যে ভুল করেছেন তার জন্যে রোজ আমার গা জ্বালা করে।' তিনি গম্ভীরভাবে বলেন।

'সেইজন্যেই কি আপনি ও নামে লেখেন না, বৌদি?' প্রবাহন জানতে চায়।

'আমার ডাকনামটাই এখন আমার প্রকাশ্য নাম। রানী গোস্বামী বললে যত লোক আমাকে চেনে সুদেষ্ণা দেবী বললে তার সিকির সিকিও নয়। শুনবে একবার কেমন মজা হয়েছিল? সেইবারই, যেবার তোমার সঙ্গে সেকেন্দরাবাদে ছাড়াছাড়ি। অন্য ট্রেনের জন্যে স্টেশনে বসে আছি, হঠাৎ দেখি যে আমার একটা স্যুটকেস নেই। খোঁজ, খোঁজ। কুলীরা কেউ হদিস দিতে পারে না। সরকারবাবু গিয়ে রেলওয়ে পুলিশে এত্তেলা দেন। পরে সেটা আরেকজনের মালের সঙ্গে পাওয়া যায়। কুলীদেরই বোকামি।'

'তারপর?' প্রবাহন নিজের কাহিনী ভুলে পরের কাহিনীতে মেতে যায়।

'তারপর আমরা কলকাতা ফিরে ওকথা ভুলে যাই। বুলার সেই ঘটনার পর আর কোনো ঘটনা কি মনে রাখা যায়? শেষে নিজাম সরকার থেকে এক চিঠি এসে হাজির যার নামে চিঠি তিনি রানী সাহেবা অফ গোসাইন।'

'কী! কী! রানী সাহেবা অফ গোসাইন!' প্রবাহন লাফিয়ে ওঠে।

বৌদি হেসে বলেন, 'ডাকঘর খাম থেকে বুঝতে পারে না কে সেই রানী। ডাকপিয়ন ঘরে ঘরে ঘোরে। শেষে মালিকের সন্ধান মেলে। গোসাইনের রানী সাহেবা নিজামকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা উপঢৌকনও পাঠিয়ে দেন।'

প্রবাহন হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে। জানতে চায় কী ছিল সেই চিঠিতে।

'ছিল এই যে, পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও চুরির কিনারা করতে পারেনি। স্যুটকেসটা যে উদ্ধার করেছিল সে যে কাকে দিয়েছে তার স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। স্যুটকেসটি যদি রানী সাহেবা ফেরৎ না পেয়ে থাকেন তবে নিজাম সরকার অতিশয় দুঃখিত।'

প্রবাহন ও রানীবৌদি কিছুক্ষণ হাসাহাসি করার পর পূর্ব প্রসঙ্গ আবার ওঠে। হাসির দীপশিখা নিবে যায়।

'নায়কনায়িকার নাম পরে হবে। এখন কাহিনীর মূল সমস্যাটা কী নিয়ে তার একটা আভাস দেওয়া যাক।' প্রবাহন সেই হাতে নেয়। 'ওরা দু'জনেই দু'জনাকে

ভালোবাসে। সে ভালোবাসা যেমন প্রগাঢ় তেমনি গভীর। তবু ওদের বিয়ে হয় না। হতে পারে না। মেয়েটি বয়সে অনেক বড়ো।'

'ওমা, তাই নাকি? তা হলে কী হবে?' বৌদি ভাবনায় পড়েন।

'তা হলে এই হবে যে ছেলেটিকে সারাজীবন একনিষ্ঠভাবে ভালোবেসে যেতে হবে। কারণ প্রেম তাই বলে। তার নিজের জন্যে সে আর কোনো সুখ চাইবে না। শুধু প্রিয়ার সঙ্গসুখ। তা হলেই সে আদর্শ প্রেমিক। আর পাঠকপাঠিকারাও তাই চান। কিন্তু ছেলেটি ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে যে প্রেম কেবল অশরীরী নয়। সে চায় পূর্ণ মিলন। সে চায় মিলনসুখ। সে চায় সন্তানসুখ।' প্রবাহন একটু একটু করে স্বপ্নে ছাড়ে। তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়।

'তারপর?' রানী বৌদি অবাক হয়ে শোনেন। তাঁর মুখ সাদা হয়ে যায়।

'তারপর যে কী তাই আমি ভাবছি। ছেলেটি কি তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে চিরকুমার থেকে যাবে? না একদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁকে তাঁর ভাগ্যের হাতে সঁপে দেবে। কে জানে হয়তো তাঁর চেয়ে বেশী বয়সী কেউ একজন তাঁকে একদিন ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইবেন ও তিনি তাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করবেন। জগতে এমন যোগাযোগ কি হয় না, বৌদি?' প্রবাহন করুণভাবে তাকায়।

'তোমার যেমন উদ্ভট কল্পনা! আমার এত বয়স হলো, কোনোদিন আমি এমন অপরূপ ঘটনা দেখিনি। এসব অবাস্তব কাহিনী লিখে তুমি কোন্ সমস্যার সমাধান করবে? যে সমস্যা নেই সে সমস্যার?' তাঁকে বেশ বিচলিত মনে হয়।

'কিন্তু ধরুন যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে তবে প্রেমিকের কর্তব্য কি একনিষ্ঠ থাকা, না পূর্ণতর প্রেমের আশায় অপূর্ণ প্রেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলে থাকা? হয়তো আর কেউ আসবে না তার জীবনে। হয়তো তাকে চিরকুমারই থেকে যেতে হবে। প্রেমহীন বিবাহ তো করবে না।'

॥ পাঁচ ॥

কাহিনীটা রানী বৌদির মনঃপূত নয় বলে প্রবাহন আর এগোতে চায় না। 'ত্রিশঙ্কু' নামক উপন্যাস লিপিবদ্ধ হবার পূর্বেই অসমাপ্ত।

'তোমার কল্পনার জোর আছে, মানি। কী এক আজগুবি আষাঢ়ে গল্প! ওসব ছেড়ে একটা সত্যিকারের জীবনমরণের প্রশ্ন নিয়ে লেখ দেখি। এই যে একটি বারো

তেরো বছর বয়সের জলজ্যান্ত ছেলে হঠাৎ একদিন শূন্যে মিলিয়ে গেল, যেমন করে মিলিয়ে যায় কুয়াশা, এর মতো কথাবস্তু তুমি পাবে কোথায়, ঠাকুরপো? তখন থেকে আমার মনে ধাঁধা লেগেছে, এটা কি মায়ার জগৎ? যা কিছু দেখছি সবটাই কি মায়া? তা হলে কি তিনিই একমাত্র সত্য? তাঁকেই একমাত্র আপনার বলে জানতে হবে? এই কি তিনি জানাতে চান যে সত্য বলে আপনার বলে আর কাউকে জড়িয়ে থাকা ভুল? একমুঠো কুয়াশাকে জড়িয়ে থাকা যেমন।' বৌদি কম্পিতস্বরে বলেন।

'আমার মাকেও এই ধরনের কথা বলতে শুনেছি। এ জগতে কেউ কারো নয়। মিথ্যা সংসার। তোরা আমার কে? আমি তোদের কে? ওই গোপালই আমার ছেলে। কিন্তু তাঁর গোপালও কি তাঁকে ধরে রাখতে পারল?' প্রবাহন শুষ্ককণ্ঠে বলে।

'ওঃ তোমার মা নেই বুঝি। তবে তো তোমার খুব কষ্ট।' বৌদি যেন সমবেদনায় গলে যান।

'সে আজ অনেকদিনের কথা। এতদিনে সয়ে গেছে। কিন্তু আমার কথা থাক, বৌদি। মৃত্যু কোন্ পরিবারে ঘটেনি? তা বলে পরিবার কি মায়া? কোন্ সমাজে ঘটেনি? তা বলে সমাজ কি মায়া? তা হলে জগৎ বেচারা কী দোষ করল? সে কেন মায়া হবে? আর ভগবান কি আমাদের কেবল শোক দুঃখই দেন? সুখ সৌভাগ্য দেন না? বুলাকে কি তিনি আপনার কোলে দেননি? ও যে বারো তেরো বছর আপনার কোলে ছিল এ কি আপনার উপর কম করুণা, বৌদি? প্রতিদিন আমরা যে অমৃত পাচ্ছি তার তুলনায় একদিনের মৃত্যু কি ওজনে কম ভারী নয়? আর সেও যে অমৃত নয় তাই বা কেমন করে বলব?' প্রবাহন তাঁকে বোঝায়।

'পুত্রশোক তো পাওনি। পেলে বুঝতে।' তিনি অবুঝ।

প্রবাহনই এবার সমবেদনায় আপ্লুত হয়। মাতৃশোক দিয়ে পুত্রশোকের পরিমাপ হয় না। কী ভেবে বলে, 'থাক, তা হলে আমি এ জীবনে বিয়ে করব না।'

'সে কী! তুমি বিয়ে করবে না কোন্ দুঃখে! আচ্ছা, বাবু, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। সত্যি, আমার ঘাট হয়েছে। তোমার বয়সে তুমি হাসবে, খেলবে, গান শুনবে, সিনেমা দেখবে, ফুর্তি করবে। না পড়েছ এক শোকাকুলা নারীর পাল্লায় যার মুখে আর কোনো কথা নেই। বড়দিনের আমোদ আহ্লাদ ভালো লাগবে না বলে আমি একদিন আগে পালিয়ে এসেছি, তা জানো?' বৌদি তাকে বাতাস করতে করতে বলেন। আঁচল দিয়ে।

'ওঃ আপনাকে বড়দিনের অভিনন্দন জানাতে ভুলে গেছি, বৌদি। মেরি ক্রিস্‌মাস।' প্রবাহনের মুখে হাসি ফোটে।

'মেরি ক্রিস্‌মাস।' তিনি নিষ্প্রাণভাবে প্রতিধ্বনি করেন।

'ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। কেক কিনে আনা উচিত ছিল আমার। চলুন না, কোথাও গিয়ে ক্রিস্‌মাস কেক কিনে আনি। এ বাড়ীর বাচ্চাদের জন্যে।'

'কালকেই আমি ওদের কেক কিনে খাইয়েছি। তখন আমার খেয়াল ছিল না যে তোমার জন্যে এক ভাগ তুলে রাখা দরকার। তোমার তো মা নেই, কে তোমাকে যত্ন করে খাওয়াবে ? তবে নিজে ওসব মুখে দিইনে।'

'আমার মাও কম গোঁড়া ছিলেন না। কেক তো কেক, পাঁউরুটি পর্যন্ত বারণ। আচ্ছা, কেক নাই খেলেন, আসুন, এমনি একটু বড়দিনের বাজার ঘুরে আসি। মনটা ভালো থাকবে। সেটাবই দরকার বেশী।' প্রবাহন প্রস্তাব করে।

'ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি চুপচাপ একা বসে আছি কেন তা কি বুঝতে পারো না, ঠাকুরপো ? ওদের বয়সে ওদের ধর্ম আমোদ আহ্লাদ করা, আর আমার বয়সে আমার ধর্ম সেবা-পূজা করা। তবে জানিনে কেন তোমাকেও এর মধ্যে টানি। হয়তো তুমি যা খুঁজছ আমিও তাই খুঁজছি। কিন্তু অন্য অর্থে।'

প্রবাহন চমকে উঠে বলে, 'কী খুঁজছেন আপনি ?'

'তৃষ্ণার জল। কিন্তু ঐ যে বলেছি। তোমার অর্থে নয়। আমার প্রাণ যাতে জুড়োয় তা নরনারীর প্রেম নয়। এ হৃদয় গোপীর হৃদয়। গোপালকে দেখতে না পেলে এ শুকিয়ে যায়। তোমার মা যেমন গোপালকে ভালোবাসতেন। তোমার মা'র কথা আরেকটু বল।' তিনি শুনতে চান।

'মা ছিলেন সত্যিকার মা যশোদা। কিন্তু তাঁর ভালোবাসার মধ্যে উৎপাতও ছিল। দুধ খেতে আমার আপত্তি। তা তিনি জোর করে পুরো একগ্লাস দুধ আমাকে গেলাবেনই। তেমনি তাঁর সাধ ছিল ম্যাট্রিকের পরেই আমার বিয়ে দেবেন। বিয়ে দিয়ে বৌ আনবেন। বোধহয় প্রাণের ভিতরে আভাস পেয়েছিলেন যে আর বেশীদিন নেই। বৌ না হলে আমাকে দেখবে শুনবে কে ? আর ওদিকে আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দেবার তালে আছি। রূপকথার রাজপুত্রের মতো।'

'ওমা, তাই নাকি !' বৌদি রূপকথার নাম শুনে আরো উৎসুক হন।

'ভেলায় চড়ে ভেসে যাব এমন সময় মা আমাকে মুক্তি দিয়ে পরপারে পাড়ি দেন। বাবা আমাকে বাঁধতে চাননি, এখনো চান না। তবে তিনিও প্রত্যাশা করেন যে আমি একদিন বিয়ে করে বন্দী হব। মা থেকে বৌ এই যে প্রহরটি এটি প্রহরীহীন। প্রহরী না থাকায় আমি স্বাধীনভাবে প্রেমে পড়েছি। একাধিক বার। সুখের চেয়ে দুঃখই পেয়েছি বেশী। প্রেমের শাসনও কড়া হাতের শাসন। স্বাধীনভাবে প্রেমে পড়তে পারি, কিন্তু পড়ে দেখি স্বাধীনতা যায়। বাউলদের মতো আমিও গাইতে পারি, কাঁদতে জনম

গেল রে মোর কাঁদতে জনম গেল। কিন্তু, বৌদি, আপনি চেয়েছিলেন মার কথা শুনতে। আমার কথা নয়। বলতে বলতে বলা হয়ে গেল। আমি লজ্জিত।' প্রবাহন দুই হাত যোড় করে।

বৌদি অভিভূত হয়ে বলেন, 'এবার তোমার একটি প্রহরী চাই, তা হলে আর দুঃখভোগ করতে হবে না। সরস্বতীপুজার দিন তুমি তোমার তৃষ্ণার জল পেয়ে যাবে, ঠাকুরপো। আমাকেই সারাজীবন মরুভূমি আঁচড়াতে হবে, কোথাও যদি এককোঁটা তৃষ্ণার জল পাই। কিন্তু সে অর্থে নয়।' তিনি কাতরভাবে বলেন। তাঁর চাউনিতেও কাতরতা। প্রবাহনকে বিদায় দিতে কি তাঁর মন চায়!

সে তার কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে এইবার নভেল লেখায় হাত দেয়। 'ত্রিশঙ্কু' নয়, 'মুক্তির প্রহর' নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে লিখতে গেলে বেদনায় বুক টনটন করে। ব্যথার উপর হাত বুলোতে গেলে আরো ব্যথা করে। নৈর্ব্যক্তিকভাবে লিখতে হলে অন্য কোনো বিষয় বা পট চাই। ছিল তেমন একটি ধ্যান। একদিন তাকে রূপ দিতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে লেখা হয়ে যায় একটি অধ্যায়। তর সয় না। পাঠিয়ে দেয় সম্পাদকের দপ্তরে। যদি মঞ্জুর হয় আর পিছু হটবার জো নেই। এগিয়ে যেতে হবে, ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। কবে থামতে হবে, কোথায় থামতে হবে সরস্বতী জানেন। না, আর্টের প্রেমে পড়লে আর্টিস্টেরও স্বাধীনতা নেই। সেটা মায়া। সেখানেও হাসির চেয়ে কান্নার ভাগই বেশী।

সরস্বতী পূজার দিন নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল বানী বৌদির পিসিমার ওখানে। সেটা গ্রহণ করলে প্রবাহনের দাদা শ্যামবরণ ক্ষুণ্ণ হতেন। এমনি একবার দেখা করে আসতে রাজী হয় প্রবাহন। সন্ধ্যার পরে একসময়।

তা সত্ত্বেও বৌদি নিজের হাতে রেঁধে থালা সাজিয়ে রেখেছিলেন। ওজর আপত্তি শুনবেন না। 'তোমার তো মা নেই। আমরা না দেখলে কে তোমাকে দেখবে? অবশ্য যাঁর দেখবার কথা তিনি এলেন বলে।'

প্রবাহন আনমনা ছিল। উচ্চবাচ্য করে না। মনে হয় না তার কানে গেছে।

'ও কী, ঠাকুরপো? নীরব কেন? কনে দেখার আলোয় যাকে দেখে এলে তাকে না পেলে কথা বলবে না?' বৌদি কৌতূহলে অধীর হন।

'জানেন তো, বৌদি, ইংরেজদের প্রবাদ। প্রশ্ন করবে না, মিথ্যা শুনবে না।' প্রবাহন রহস্যময় করে বলে।

বৌদি তা শুনে বোবার মতো বসে থাকেন। আকণ্ঠ কৌতূহল। মেটাবার উপায় নেই। প্রশ্ন করলে যদি মিথ্যা শুনতে হয়।

শেষে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। 'আচ্ছা, মিথ্যাই না হয় শুনি। ওটাকে মনে

মনে ঘুরিয়ে নিলে সত্য পাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা, আপনি কী জানতে চান, বৌদি? কাজরীকে কেমন লাগল? বেশ ভালোই লাগল তাঁকে। জনরব যদি সত্য হয় আমাকেও তাঁর ভালো লেগেছে। এখন আপনিই বলুন আমাদের কী করা উচিত।' প্রবাহন সৌরিয়াসভাবে বলে।

'বিয়ে।' বৌদি ধাঁ করে বাঁধার জবাব দেন।

'ভালো লাগলেই যদি বিয়ে করতে হয় তবে আরো আগেই বিয়ে করতে পারতুম আরো কয়েকজনকে। মানবেন কি মানবেন না, বলুন, যে ভালো লাগা ও ভালোবাসা এক নয়।'

'কী করে বলব? ভালোবাসা কাকে বলে তা কি আমি বিয়ের আগে জানতুম না বিয়ের পরে জানলুম? স্বামীকে ভালোবাসা আমার কর্তব্য, কর্তব্যের অনুরোধে যা করা যায় তাকে তো ঔপন্যাসিকরা ভালোবাসা বলে মানতে চাইবেন না। তবে, হাঁ, ভালো লাগার উপর তেমন কোনো শাসন নেই। ভালো না লাগলে সোজা বলে দিই। আর কেউ যদি বলে তবে নালিশ করিনে। তোমার দাদাকে মাঝে মাঝে শুনিয়ে দিই যে আমাকে ওঁর যদি ভালো না লাগে উনি আরেকটি বিয়ে করলেই পারেন।'

'এই দেখুন, কোন্ কথার থেকে কোন্ কথা এল!' প্রবাহন অপ্রস্তুত হয়।

'তাহলে বিয়ে ও বাড়ীতে হচ্ছে না?' তিনি সামলে নিয়ে বলেন।

'বিয়ের আগে ভালোবাসা হওয়া চাই। কে আমার তৃষ্ণার জল, কার আমি তৃষ্ণার জল সেবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া চাই। এখন এসব কথা আমি বলি কী করে তাঁকে বা তাঁর গুরুজনকে? প্রথম আলাপে বলা যায় না, দ্বিতীয় আলাপেও না। তাঁরা অপমান বোধ করবেন। তা হলে কী বলা উচিত? সেইটেই ভাবছি, বৌদি।' প্রবাহন তাঁকে তার বিশ্বাসভাগী করে। সেদিনকার বিবরণ শোনায়।

'অমন কথা কখনো কাউকে বলতে নেই, ঠাকুরপো। কোর্টশিপ এদেশের রীতি নয়। ওঁরা বনেদী ঘর। চায়ের টেবিলে বসে কথা বলতে দিয়েছেন, এর বেশী আশা করা যায় না। তবে তোমার যদি বিয়েতে মত থাকে সেকথা জানালে তুমি দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে। সকলের সমক্ষে নয়, কতকটা নিরালায়। এই যেমন বটানিক গার্ডেনে বা চিড়িয়াখানায়। সঙ্গে একটি ছোট ভাই কি বোন থাকবে। তাকে কিছু পয়সা দিয়ে আইসক্রীম কি চীনেবাদাম কিনতে পাঠাবে।' বৌদি বলেন ফিসফিস করে।

'তা হলে আগে আমাকে বাগ্‌দান করতে হবে, তার পরে অন্য কথা? না, বৌদি, অমন করে আমার স্বাধীনতা আমি বিকিয়ে দিতে পারিনে। ও জিনিস শুধু প্রেমের জন্যেই বিকিয়ে দেওয়া যায়। সম্ভবপর প্রেমের জন্যে নয়, উপস্থিত প্রেমের জন্যে। সুযোগ দিলে আমাকে বিনা শর্তেই দিতে হবে।'

'তারপর যদি তুমি বিয়ে না কর তখন ?' বৌদি শিউরে ওঠেন।

'তখন তিনি আর কাউকে বিয়ে করবেন।' প্রবাহন হেসে বলে।

'উঃ! কী নৃশংস! একজনের সঙ্গে মেলামেশা করে আরেকজনকে বিয়ে করা কি এতই সহজ!' বৌদি একটু উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'তার চেয়ে ভালো গুরুজনের নির্বন্ধে চোখ বুজে বিয়ে করা। ভালোবাসা হয় হবে, না হয় না হবে। আমার মেয়ের আমি সাবেকী ধরনে বিয়ে দেব।'

প্রবাহন দুঃখ প্রকাশ করে। 'বেচারি বিনি! আমার উপন্যাস পড়ে সে যখন বিদ্রোহিণী হবে তখন ইলোপ করা ভিন্ন আর কোনো পথ খোলা থাকবে না তার সামনে। পশুপাখীরাও যে যার নিজের মেট বেছে নেয়, সে স্বাধীনতা তাদের জন্মস্বত্ব। অথচ একটি প্রাচীন সভ্য জাতির নরনারীর সে স্বাধীনতা নেই, সেটা তাদের জন্মস্বত্ব নয়। ওদিকে ইংরেজের সঙ্গে লড়বার সময় বলা হচ্ছে আমাদের জন্মস্বত্ব পূর্ণ স্বাধীনতা। হাসব না কাঁদব!'

বৌদি বেগতিক দেখে অন্য প্রসঙ্গে যান। 'উপন্যাসের প্রথম কিস্তি পাঠিয়েছ শুনছি। ছাপার হরফে কবে বেরোবে তারই আশায় বসে থাকতে হবে নাকি? কাছে নকল নেই? পড়ে ফেরৎ দিতুম।'

'কেমন করে জানব যে আপনি দেখতে চাইবেন, বৌদি? নকল আমি তৈরি করবার সময় পাইনি। মেসোমশায়ের টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম। এই সংখ্যায় বেরোবে। আরো কয়েকটা দিন সবুর করুন। যদি সত্যি পড়তে চান। জানি আপনার খুব খারাপ লাগবে।' প্রবাহন নম্রভাবে বলে।

'কে বলল খারাপ লাগবে? তুমি যদি জীবনমরণের অর্থ আমাকে বোঝাতে পারো তোমার উপন্যাস আমি ভক্তিভরে পাঠ করব। তোমার ভক্ত হব। কিন্তু তুমি কি তা করবে? যতরকম উদ্ভট কল্পনা নিয়ে আছো। বেশীবয়সী নায়িকার সঙ্গে কমবয়সী নায়কের প্রেম। মা গো।' বৌদির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

প্রবাহন তাঁকে আশ্বাস দেয় যে ওসব কাল্পনিক ব্যাপার নিয়ে সে লিখছে না। লিখছে বাস্তব সমস্যা নিয়ে। যে সমস্যা একালের তরুণতরুণীর কাছে জীবনমরণ সমস্যা। প্রেমের স্বাধীনতা। বিবাহের স্বাধীনতা। বিবাহভঙ্গের স্বাধীনতা। অন্য পতি গ্রহণের স্বাধীনতা

'কী! কী! কী বললে তুমি! অন্য পতি গ্রহণের স্বাধীনতা!' বৌদির মুখখানি লাল হয়ে যায়।

'কেন, এই তো একটু আগে আপনি বললেন আপনার স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন দেবা তেমনি দেবী।'

তিনি আরো রাগ করেন। উষ্মার সঙ্গে বলেন, 'চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে। অমন উপন্যাস লেখাও পাপ, পড়াও পাপ। দেবা যেমন হবে দেবী তেমনি হবে। কক্ষনো না। ওটা বিজাতীয় দৃষ্টান্ত।'

প্রবাহনের হাতে সময় ছিল না। ওদিকে শ্যামবরণদা ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন। সে বিদায় নমস্কার জানায়। সেইসঙ্গে রান্নার সুখ্যাতি করে।

'না, না, তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না।' বৌদি কাতরভাবে বলেন। তাঁর চাউনিও তেমনি কাতর।

'শ্যামবরণদা ইউরোপে পাঁচ বছর ছিলেন। তাঁর বরণ যদিও বিশেষ বদলায়নি তাঁর অভ্যাস বিলকুল বদলে গেছে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় তাঁর ডিনার। আমাকে আজ মাফ করবেন, বৌদি।'

'মাফ করতে পারি, কিন্তু তার একটি শর্ত আছে। তোমাকে দোলের সময় আসতে হবে। কেমন, রাজী?' বৌদি নাছোড়বান্দা।

'আমি তো রাজী, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান রাজী হলে হয়। আমার যাত্রাভঙ্গ করার জন্যে ওরা হয়তো নিজের নাক কেটে বসবে। হোলি খেলার পথ যদি রক্তিম না হয়ে রক্তাক্ত হয় তবে গুলী খেলার কথাটাও সেই থেকে উঠবে। পুলিশ নিয়ে টহল দেবে কে আমি যদি কলকাতা চলে আসি?'

বৌদি তা শুনে সন্ত্রস্ত হন। তাঁর মুখে কথা জোগায় না।

॥ ছয় ॥

'তোমার জন্যে চিন্তিত হয়েছিলুম, প্রবাহন।' শ্যামবরণদা তার হাত ধরে নিয়ে যান তেতালায় তাঁর ঘরে। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের পায়রার খোপ। তবে তাঁর খোপটা তুলনায় বড়ো। সেখানে তাঁর ইউরোপীয় স্টাইলের সজ্জা।

'কলকাতার যানবাহন ইংরেজের শাসন মানে না। এর মধ্যেই ওরা স্বরাজ পেয়ে বসে আছে। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ জনগণকে শৃঙ্খলমুক্ত করবে, না শৃঙ্খলামুক্ত করবে, এই হচ্ছে প্রশ্ন।' শ্যামবরণ উদ্বেগভরে বলে যান।

উদ্বেগ জিনিসটা তাঁর ধাতে। যে-কোনো সময় যে-কোনো বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ। পৃথিবীর আয়ু আর বেশীদিন নয়, মাত্র কয়েক লক্ষ কোটি বছর, তা শুনেও তিনি উদ্বিগ্ন। নীহারিকালোকের সুদূরপ্রসারীভাব তাঁকে উদ্বেগাকুল করেছে। তা হলে শুধু পৃথিবী

কেন, সূর্যও তো গেল।

সাহিত্যের, ইতিহাসের, বিজ্ঞানের আধুনিকতম গ্রন্থে তাঁর দেয়ালজোড়া বুকশেলফ ঠাসা। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার বই। ওসব পড়ে যে-কোনো যুবক যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. হতে পারে। দাদা কিন্তু ডক্টরেট চান না। তাই ইউরোপের পাঁচ বছর সেদিক থেকে বৃথা গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁকে চাকরি করতে হবে না। পৈত্রিক সম্পত্তিই যথেষ্ট।

গদীমোড়া সোফায় গা মেলে দেয় প্রবাহন। ওটাই ওর শয্যা। তথা আসন।

'অমন করে শুয়ে পড়লে কেন, প্রবাহন? ক্লান্ত?' দাদা সস্নেহে শুধান।

'দেহে নয়। মনে।' প্রবাহন বিশদ করে, 'কী সঙ্কট, বল দেখি! এমন সঙ্কটে কেউ পড়ে। বলতে হবে 'হাঁ' কি 'না'। যদি 'হাঁ' বলি তবে সেটা যে আমার আত্মার পক্ষে কত বড়ো পরাভব তা শুধু আমিই বুঝি, আর কেউ বুঝবে না। যার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক নেই, কোনোদিন হয় কি না সন্দেহ, তার সঙ্গে পরিণয় সম্পর্ক পাতাব? প্রেমে যাদের বিশ্বাস নেই, প্রেমের আস্বাদন যারা পায়নি, প্রেমের দুর্ভোগ পোহায়নি, পোড় খায়নি, বিদগ্ধ হয়নি তাদের কথা অবশ্য আলাদা। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। কিন্তু আমি যে প্রেমের পন্থ জানি, প্রেমের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি, আমার পক্ষে এরকম একটা প্রেমহীন বিবাহ কি আত্মিক পরাভব নয়?'

দাদা ততক্ষণে স্যুপে চুমুক দিতে শুরু করেছিলেন। বলেন, 'উঠে এস জলদি। স্যুপ জুড়িয়ে যাচ্ছে।' একটু থেমে জুড়ে দেন, 'তেমনি যৌবন। তোমার যৌবন, আমার যৌবন। আত্মা ছাড়া কি আর কিছু নেই মানুষের? তা হলে আহার কেন? নিদ্রা কেন? তিনটির দুটিকে যদি মেনে নিলে তৃতীয়টির বেলা অমন বৈরাগ্য কেন? আমিও মানি যে প্রেম না হলে বিবাহ সুখের হয় না, কিন্তু প্রেমের জন্যে বসে থাকাও কি সুখের? যৌবন দিন দিন বিদ্রোহী হবে, বিদ্রোহ দমনের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হবে, তখন ওইরকম একটি অষ্টাদশীকেই বিয়ে করতে হবে, কারণ এদেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি। মাঝখান থেকে বয়সের ব্যবধান বেড়ে যাবে। দেখছ না আমার নিজের অবস্থা? যাকেই পছন্দ হয় তার সঙ্গে তেরো-চোদ্দ বছরের তফাৎ। মনের মিল হবে কী করে? মানুষ তো কেবল রুটি খেয়েই বাঁচে না। যদিও রুটিটাই প্রাথমিক। মানুষ চায় মানুষের সঙ্গে দুটো মনের কথা বলতে। যার সঙ্গে জীবন কাটবে তার সঙ্গে মনের কথা বলাটাও অত্যাবশ্যক।'

ডিনারে সঙ্গ রাখার জন্যে প্রবাহন টেবিলে এসে হাজিরা দেয়। বিশেষ কিছু মুখে দেবার জন্যে নয়। দু'জায়গায় খেয়ে ওর পেট ভরে রয়েছে।

'তখনি তো তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলুম, ভায়া, বৌদির সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছ, যাও, কিন্তু কিছু খেয়ো না, খেলে পস্তাবে। তোমার জন্যে গ্রেট ইস্টার্ন থেকে

হ্যাম্পার আনিয়েছি। তুমি তো মুখে দেবে না, আমিই রেলিশ করে খাব। উপনিষদের সেই দ্বা সুপর্ণার মতো। একটি খায়, অপরটি দেখেই সুখী।' বলে তিনি কাঁটা চামচ বাগিয়ে ধরেন। যুদ্ধং দেহি।

'কী আপসোস!' প্রবাহন শুধু একবার চাখে।

'তা হলে তুমি এখন কী বলতে চাও? 'না'? তোমাকে ওঁরা রাতারাতি মনঃস্থির করতে বলছেন না। সময় নাও। বাবাকে চিঠি লেখ। সব দিক ভেবে যদি 'না' বলাই সাব্যস্ত হয় আমিই তোমার হয়ে জানাব। তুমি হয়তো ওইসব প্রেম ফ্রেমের অজুহাত দেবে। কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে আরো টাকার জন্যে ওটাও একটা চাল। আমি একবার পাত্রীব ঠিকুজিটা চেয়ে পাঠাব। তারপর সেটা ফেরৎ দিয়ে বলব, দুঃখিত। পাত্রের ঠিকুজির সঙ্গে মিলছে না। পাত্রের রাক্ষস গণ। ব্যস্, একদম ঠাণ্ডা।'

'কে বলল আমার রাক্ষস গণ?' প্রবাহন প্রতিবাদ করে।

'রাক্ষস গণ যদি না হয় তো আর কোনো অমিল খুঁজে বার করব। যদি 'না' বলতে হয় তবে প্রকারান্তরে বলাই ভালো। নয়তো ওঁরা হতাশ হবেন। তোমাকে তো গোড়াতেই বলেছি যে তোমাকেই ওঁরা চান। মেয়েটি যদিও তোমাকে চোখে দেখেনি তবু মনে মনে তোমাকেই ওর পছন্দ। অনেকদিন থেকে ও তোমার প্রতীক্ষায় আছে। নয়তো ওর বিয়ে হয়ে যেত কবে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত কেউ অরক্ষণীয়া থাকে! তোমাকে আমি বিলেতেও কাজরীব কথা বলেছি। আমাদের জানাশোনার মধ্যে ওর চেয়ে বুদ্ধিমতী আর নেই। ভাবে, প্রশ্ন করে, জানতে চায়, শিখতে চায়। তুমি ওর চিঠিও তো পড়েছ।' দাদা দুষ্টু হাসি হাসেন।

'চিঠি! কার চিঠি!' আকাশ থেকে পড়ে প্রবাহন। 'কাজরীর চিঠি আমি কস্মিন্ কালে পাইনি।'

'বিজুরি বলে ছোট্ট একটি মেয়ে তোমাকে চিঠি লিখত না? তোমার লেখার ছোট্ট একটি পাঠিকা।' দাদা টিপে টিপে হাসেন।

'বিজুরি আমার পরম স্নেহের পাত্রী। ওকেও আমি লিখতুম। কাজরী যে ওর দিদি সেটা আমি জানতুম না। আজকেই জানতে পেলুম চা খেতে গিয়ে।' প্রবাহন সবিস্ময়ে বলে।

'কিন্তু কখনো কি তোমার মনে হয়নি যে হাতের লেখাটা ছেলেমানুষের হলেও লেখার ধরণ ধারণ ষোড়শী সপ্তদশীর? কখনো কি তোমার মনে হয়নি যে লেখার পেছনে একটি কম্পিত হৃদয় আছে? যে হৃদয় তোমার সম্মুখে আসতে ভয় পায়। পাছে তুমি প্রত্যাখ্যান কর। মেয়েটি সত্যি খুব নিরাশ হবে। খুবই নিরাশ হবে। যদি তুমি ওকে বিয়ে না কর।' আবেগের সঙ্গে বলেন শ্যামবরণ।

প্রবাহন তখনো তার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিজুরির চিঠি তবে

বিজুরির চিঠি নয়, কাজরীর চিঠি। শিখণ্ডীর বাণ নয়, অর্জুনের বাণ। না, কখনো একথা মনে হয়নি।

'জীবনে কাউকেই নিরাশ করব না, এ কি কখনো সম্ভব?' প্রবাহন দুই হাত এলিয়ে দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে। 'একটি তো মোটে হৃদয়। কাকে ছেড়ে কাকে দিই? বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে, একই নামের দুই কন্যা আমাকে বিভিন্ন কালে ভালো-বেসেছেন। এখনো একজন—তাঁদের একজন নন—আমাকে ভালোবাসেন। তাঁদের ভালোবাসার প্রতিদান আমি দিইনি, এঁর ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছি। ভালোবাসা হলেই যদি বিয়ে করতে হয় তো এঁকেই আমার বিয়ে করা উচিত। কিন্তু সেটা তাঁর ইচ্ছা নয়। আমিও ভেবে দেখেছি যে বিয়ে করলে ভুল করব। অশরীরী প্রেম আমার কাছে অপূর্ব। তিনি কিন্তু সেইখানেই থামতে চান।'

'আমিও এর ভিতর দিয়ে গেছি, প্রবাহন।' দাদা সলজ্জভাবে বলেন। 'আমিও বিশ্বাস করি যে অশরীরী প্রেমই শুদ্ধ প্রেম। কবির কথায় 'নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।' কিন্তু তার জন্যে আমি কী হারাচ্ছি সেটাও তো হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। কোথায় আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, কোথায় আমার শিশু? কাদের নিয়ে আমি পরিতৃপ্ত হব? জীবনটা কি একা একাই কেটে যাবে? আর বিবাহিত প্রেমে কাম থাকতে পারে, তা বলে গন্ধ থাকবে? কাম কি সুগন্ধ হতে পাবে না? সংস্কৃত কাব্য পড়ে দেখো। তা যদি না হতো তবে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী পার্বতী কারো প্রেমকেই শুদ্ধ বলতে পারা যেত না, নিকষিত হেম বলতে পারা যেত না। কামগন্ধহীন তো নয়।'

'তার চেয়ে বল, কাম গন্ধহীন।' প্রবাহন প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলে, 'এখন কাজরীকে আমি কোন্ ভাষায় প্রত্যাখ্যান করি? ঠিকুজি কুষ্ঠির কথা ছেড়ে দাও। মিথ্যাচরণ আমি করব না। প্রত্যাখ্যানের ব্যথা বহন করতে হবে বেচারিকে। ও কি এ জীবনে আমাকে আর কোনোদিন ক্ষমা করবে! তারই জন্যে আমি অপেক্ষা করতে চাই যে আমার তৃষ্ণার জল, আমিই যার তৃষ্ণার জল। কাজরীর সঙ্গে তৃষ্ণার জল পাতানো যায় না। বিজুরির মতো কাজরীও আমার স্নেহের পাত্রী।'

॥ সাত ॥

'বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না।' যাদের সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে তারা 'বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ।' তাদের একজন না হলেও তাদেরি সঙ্গে শ্যামবরণের তুলনা।

কবে কিশোর বয়সে তিনি তাঁর বন্ধুর বোনের প্রেমে পড়েন। কন্যাটি ছিলেন বাগ্‌দত্তা। যথাকালে হন বিবাহিতা। কোনোদিন জানতেনও না যে শ্যামবাবু তাঁকে ভালোবাসেন ও বিয়ে করতে চান। শ্যাম ছিলেন অসম্ভব লাজুক ও মুখচোরা। কোনোদিন আভাসটুকুও দেননি যে তাঁর দিক থেকে ওটা ভাই-বোনের ভালোবাসা নয়, আর কিছু।

পরে যখন তাঁর বুক ফেটে যায় তখন তাঁর মুখ না ফুটলেও কেমন করে জানাজানি হয়ে যায় যে তিনি প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক। তখন সেই মজনু একদিন দেওয়ানা হয়ে ইউরোপ প্রয়াণ করেন ও সেখানে বসে প্রেম পাসরা ব্রত পালন করেন। পাঁচ বছর পরেও দেখেন হৃদয় তাঁর তেমনি অশান্ত ও অশাসিত। যদিও তাঁকে বাইরে থেকে দেখতে সৌম্য ও সমাহিত।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, আমাকে ভুলতে দাও, আমাকে ভোলাও। ভগবান একেবারে বধির। আর হৃদয়ও তেমনি অবুঝ। যেখানে লেশমাত্র আশা নেই, ভরসা নেই সেইখানেই সে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকবে। আর কারো দিকে তাকাবে না। লায়লা তখন পরস্ত্রী সন্তানবতী। শ্যামবরণকে নিয়ে তিনি করবেনই বা কী। শ্রীরাধা যা করেছিলেন? না, তেমনতর মতিগতি দু'জনের একজনেরও ছিল না। দু'জনেই শুদ্ধ শুচি অকলঙ্ক থাকতে চান। তা ছাড়া শ্যামবরণের প্রেম তাঁর একার ও বাসগন্ধ নাহি তায়।

দেশে ফিরে আসার পর থেকে গুরুজন তার বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছেন। আর তিনিও কৌশলে কাটান দিচ্ছেন ঐ যে কুষ্ঠি চেয়ে পাঠানো ও মিলিয়ে দেখা আর একটা না একটা খুঁত পেয়ে ফিরিয়ে দেওয়া এটা তাঁর নিজের বেলা পরখ করে প্রবাহনকে শেখানো। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হয়। কিন্তু লায়লার সঙ্গে মেলে না।

ক্রমেই তিনি উপলব্ধি করেন যে এ জগতে লায়লা ওই একটিই আছে। ওর জুড়ি নেই। তাই বলে যদি তিনি বিয়ের বয়স গড়িয়ে যেতে দেন তবে এ জন্মে তাঁর সাথী জুটবে না। তিনি কি তবে সাথীর জন্যে প্রেম বিসর্জন দেবেন?

হৃদয় তার আপন নিয়মে চলে। তাকে শাসন করবে কে? কার সাধ্য শাসন করে। তেমন-তেমন ভালোবাসা হলে সারাজীবন তাকে নিয়ে পোহায়। সাথী বলতে কেউ থাক আর নাই থাক। বিয়ে করলেও কি সে ভালোবাসা অমনি পাত্রান্তরিত হবে? কেন ভদ্রলোকের মেয়েকে ঘরে এনে দুঃখ দেওয়া! পছন্দ করে বিয়ে নয়, যদি নতুন করে ভালোবেসে বিয়ে করতে পারেন তবেই করবেন। কিন্তু কই, কোথায় সেই নারী যাকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবেন? সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালোবাসবেন? লায়লাকে ভুলিয়ে দেবে যে নারী? না ইউরোপে, না ভারতে কোথাও তার অলকের রেশ তার

অলঙ্করণের চিহ্ন নেই। যারা আছে তাদের পছন্দ হতে পারে, কিন্তু তারা কেউ তাঁকে টানে না। তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় না বাসরঘরে। তাঁর কান ধরে বিছানায় শোওয়ায় না।

সত্যি, ইউরোপের রঙ্গিনীরা এত ছেলেকে বাঁদর নাচায়, কিন্তু শ্যামবরণের কপাল-গুণে তার ধারে কাছেও আসে না। বোধহয় তাঁর কপালে এক অদৃশ্য কালিতে লেখা—'পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে।' থাকতো যদি কোনো চিত্রাঙ্গদা, কোনো প্রবলা নারী, তা হলে ওঁর সে দাগ মুছে দিত। কিন্তু ওরকম কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। যদিও তিনি কাকে কাবারে থিয়েটার ডান্স হল কোথায় না গেছেন! 'আমি যাই বঙ্গে আমার কপাল যায় সঙ্গে।' তেমনি শ্যামবরণের কপাল।

প্রবাহনের হৃদয়ও তেমনি অশান্তি। যাকে ভালোবেসে লেশমাত্র সুখ নেই, বরং সব দিক থেকে অ-সুখ, তাকেও সে ভালোবাসবে। কারণ ভালো না বেসে পারে না। 'আমাকে ভুলতে দাও, আমাকে ভোলাও'—এ নয় তার প্রার্থনা। কিন্তু তার কপালে বোধহয় বিধাতাপুরুষ স্বহস্তে লিখে রেখেছেন, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।' যেখানেই যায় সেখানেই কেউ না কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হয় কিংবা কারো না কারো প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণ অবশ্য সব সময় একই রকমের নয়। বিচিত্র রূপিণীর সঙ্গে বিচিত্র তার সম্পর্ক।

বহতা নদীর মতো কোথাও সে যেতে ডরায় না, কোথাও সে আটকে থাকে না। আটকে গেলেও একদিন না একদিন সে তার অবাধ গতি ফিরে পায়। সঙ্গে করে নিয়ে চলে বুকভরা তৃষ্ণা, সেই সঙ্গে গাঙ্‌ভরা তৃষ্ণার জল। তার পসরায় হাসির চেয়ে কান্নার ভাগই বেশী। সেইজন্যে দুঃখী বা দুঃখিনীদের সঙ্গেই তার অন্ত বনে।

কলকাতা থেকে ফিরে যাবার কিছুদিন পরে সে সম্পাদকের কাছ থেকে চিঠি পায়। দেখা করেনি কেন? টেকনিক নিয়ে আলোচনা বাকী। দ্বিতীয় কিস্তি যেন অবিলম্বে পাঠায়। ছেদ পড়ে গেলে বিপদ। পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে রানী বৌদির চিঠি। উপন্যাসের প্রথম কিস্তি পড়ে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ, অসামাজিক কিছু নয়। পড়ে ছেলেমেয়েরা বকবে না। মোটের উপর সুপাঠ্য ও স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস। যেমন অমুকচন্দ্রের অমুক। তবে বিজাতীয়তা দোষে দুষ্ট। এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

প্রবাহন মনে মনে হাসে। পাঠকদের বলে, পাঠিকাদেরও, একটিবার শুধু আমাকে লিখতে দাও অবাধে প্রাণ খুলে নিঃশেষে। একবার লেখা হয়ে গেলে আমি সব নির্যাতনের ঊর্ধ্বে। একবার পড়া হয়ে গেলে তোমরাও পারবে না অস্তিকে নাস্তি করতে। সব চেয়ে ভালো আদৌ না পড়া। কিন্তু পড়লে তো আমার পাল্লায় পড়লে। ছেলেধরাদের মতো আমি যে কোথায় নিয়ে যাব তার ঠিকানা নেই। একদিন দেখবে

যে তোমরা বড়ো হয়ে গেছ। তোমাদের বয়স বেড়ে গেছে, অভিজ্ঞতা বেড়ে গেছে, বসজ্ঞতা বেড়ে গেছে। হয়তো কিছু কিছু অনিষ্টও হয়েছে তোমাদের দু'দশজনের। আমার সঙ্গে সাঁতারে নেমে সবাই পারে পৌঁছয়নি, কেউ কেউ ডুবেছে। এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। নির্জীব যারা তাদের উচিত ঘাটে বসে জলের ঢেউ গোণা। আমার সঙ্গে ঝাঁপ না দেওয়া।

প্রবাহন এই মর্মে কয়েকটি কথা লিখে বৌদিকে পরামর্শ দেয় যেখানে খুশি দাঁড়ি টানতে। এই কথাটি ধরে নিতে যে তাঁর জন্যে কাহিনীর সেইখানেই ইতি। তেমনি যে পাঠকের যতদূর দৌড় ততদূর তাঁর জন্যে। লেখক যে মহাপ্রস্থানের পথে চলেছেন তার শেষপ্রান্তে হয়তো একজনমাত্র পাঠকই থাকবেন। সে পাঠক বা সে পাঠিকা যদি রানী বৌদি হন তো সে কৃতার্থ হবে, কিন্তু না হলেও সে অকৃতার্থ হবে না, কারণ তার হাতে সব সময়ই শেষ তাসখানি থাকবে ও সেটি সে যাঁর সঙ্গে খেলবে তেমন একজন পাঠক বা পাঠিকা কি এত বড়ো একটা দেশে মিলবে না? না মিললে তৈরি করে নিতে হবে।

বৌদি তা পড়ে ভরসা দেন যে তিনি শেষ পাতাটির শেষ শব্দটি অবধি পড়বেন ও তার পরে বিচার করবেন, তার আগে না। সে নিরঙ্কুশ হতে পারে। প্রবাহন যেন দোলের সময় আসতে চেষ্টা করে। এলে যেন বৌদির পিসিমার অতিথি হয়। তিনি বলে রেখেছেন ও তাঁর কথা না রাখলে নিরাশ হবেন।

দোলের সময় কী ভাগ্যি হিন্দু মুসলমানের সুমতি হয়। তারা প্রবাহনের ও নিশীথের যাত্রাভঙ্গ করে না। একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? প্রবাহন নিশীথের সঙ্গেই ওঠে। তবে দিদির পিসিমার ওখানে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ রাখে।

'তারপর, ঠাকুরপো, তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে?' বৌদি তার বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। 'শেষপর্যন্ত 'না' বলে দিলে? উঃ! কী নৃশংস!'

'উঁহু। 'না' বলবার ছেলে প্রবাহন বসগুপ্ত নয়। সে শিভালরি মানে। সে একজন নাইট। লেডীদের কখনো সে 'না' বলে না। তবে সে এমন ভাষায় কথা বলে যে লেডীরাই তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ত্রাহি ত্রাহি করেন। তখন সে এমন ভাব দেখায় যেন তারই বুক ভেঙে গেছে। এই দেখুন, কাজরী আমার বুকের পাঁজরগুলো কেমন ঝাঁজরি করে দিয়েছে। শুনছি এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে ওর বিয়ের সব ঠিক। কেবল কী নিয়ে দরকষাকষি চলেছে।' প্রবাহন শ্যামবরণের কাছে শোনা কথা শোনায়।

'আস্ত একটি পাগল!' বৌদি বলেন অনুকম্পাভরে। 'কিন্তু জানতে ইচ্ছে হয় কেমন করে এড়ালে? কেনই বা এড়ালে? আরো ভালো সম্বন্ধের আশায়?'

'বৌদি', প্রবাহন সীরিয়াস হয়ে বলে, 'বিয়ের ব্যাপারে আরো ভালো সম্বন্ধ আমার কাছে অর্থহীন। যে আমার সে অশিক্ষিতাও হতে পারে, অসুন্দরীও হতে পারে, কিন্তু

সে আমার। সে আর কারো নয়। যে মেয়ে অনায়াসেই আর কারো হতে পারে, কোনো একজন ব্যারিস্টারের বা ইন্‌জিনীয়ারের, সে আমার নয়, তাকে আমার জন্তে সৃষ্টি করা হয়নি। যে আমার সে হয়তো সহায়সম্বলহীন, কিংবা আমার জন্তেই সহায়সম্বল ত্যাগ করেছে, তা সত্ত্বেও বা সেইজন্তেই সে আমার।'

বৌদি তো শুনে থ! বলে কী এ পাগল! এমন পাগলের হাতে জেনেশুনে মেয়ে দেবে কোন্ পাগল! এর হাত ধরতে রাজী হবে কোন্ পাগলী! পাগলী না হয়ে থাকলে হতে কতক্ষণ!

বৌদি অন্তমনস্কভাবে বলেন, 'তা হলে সেই কথাই বলে পাঠালে?'

'না, বৌদি। তা হলে ওটা প্রত্যাখ্যানের মতো শোনাত। 'পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে।' কন্তাটি হয়তো শুনে আঘাত পেত। কাঁদত। অপমানে মুখ দেখাতে পারত না। আর নয়তো আশাবাদীর মতো অপেক্ষা করত। তা ছাড়া শ্যামবরণদা সাবধানী মানুষ। ওকথা তিনি চেপে যেতেন। বলতেন ঠিকুজি মিলছে না। পাত্রের রাক্ষস গণ।'

'সত্যি না কি?' বৌদি অবিশ্বাস করেন।

'গণ কাকে বলে তাই আমি জানিনে। কতকালের কুসংস্কার। কিন্তু শ্যামবরণদাকে আমি মিথ্যা বলার অবকাশ দিইনি। বলেছি, আমি কাকের বাসায় কোকিল। ডানা গজালে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব। আমার যে সঙ্গিনী হবে সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে উড়বে। সে যদি কোকিলের কোকিলা না হয়ে কাকের কাকী হতে চায় তবে ভালোবাসা পাবে। ভালো বাসা তার জন্তে নয়।' প্রবাহন বলে হেঁয়ালির ভাষায়।

'কিছুই বুঝলুম না, ঠাকুরপো। এর মানে কী, খুলে বলতে আপত্তি আছে?' বৌদি হকচকিয়ে যান।

'আপনি ভালো করেই জানেন যে আমি একজন সাহিত্যিক, সরস্বতী আমার ইষ্টদেবতা। পথ ভুলে চাকরির দুর্গে এসেছি, দুর্গা এখানকার দেবী, তাঁর একদিকে লক্ষ্মী, অন্তদিকে সরস্বতী। এক হাতে লক্ষ্মীপূজা, অন্ত হাতে সরস্বতীপূজা, আর পদোন্নতির জন্তে ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্তে শরীর মন দিয়ে শক্তিপূজা—এ জীবন আমার জন্তে নয়। তিন দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে কোন দেবতারই বর পাব না। কেই বা আমাকে মনে রাখবে? আমার কীর্তির চারটি লাইনও কি বেঁচে থাকবে? সেইজন্তেই বলে পাঠাই যে চাকরিতে আমার স্থিতি বেশীদিন নয়, আমাকে বিয়ে করলে ভিখারী শিবের হাত ধরতে হবে।' প্রবাহন পৌরাণিক ভাষায় বলে।

'ওঃ এই কথা!' বৌদি এতক্ষণে বুঝতে পারেন। কিন্তু বিশ্বাস করেন না যে প্রবাহন সত্যি সত্যি অমন সুখের বাসা ছাড়বে। অমন ভালো বাসা।

প্রবাহন তা আঁচতে পেরে বলে, 'কে জানে হয়তো কাকের বাসায় থাকতে থাকতে

আমিই ক্রমে ক্রমে কাক বনে যাব। কুহু কুহু ভুলে গিয়ে কা কা করব। দূর থেকে আমার দশা দেখে কাজরী আর তার গুরুজন ভাববেন আমি ওঁদের ধাপ্পা দিয়েছি। যাক, ওঁদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। ভাবী বরকে আমি বিলেতে দেখেছি। কলকাতায় ভালো বাসা আছে। অন্তরে ভালো বাসা আছে কি না অন্তর্যামী জানেন।'

'ভালোবাসা পাওয়া না পাওয়া মেয়েদের কপাল। ভালোবাসা দেওয়াটাই মেয়েদের হাতে। সেটা তারা দিয়ে যাবেই। স্বামী যেই হোক। ভালো বাসা নিয়ে কটাক্ষ করছ যে, ওটা না হলে মেয়েরা ঘর বাঁধবে কোথায়? ঘর বাঁধাই যখন ওদের কাজ। কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বেড়ানো শুনতে চমৎকার। কার্যকালে কাকের বাসাই শ্রেয়। কোকিলা তুমি পাবে কোনখানে? যাকেই বিয়ে করতে যাবে সে-ই একটি কাকী।' বৌদি পরিহাস করেন।

'তা হলে বিয়ে আমার কপালে লেখেনি।' প্রবাহন হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দেয়।

'না, অমন অলক্ষণে কথা আমি মুখে আনব না। আমি শুধু তোমাকে একটু বাস্তববাদী হতে বলব। এদেশে কিছুকাল বাস করলে তুমি আপনার থেকেই বাস্তববাদী বনবে। ওরই মধ্যে দেখেশুনে একটি বিয়ে করবে। দশটি দেখলে একটি মনে ধরবে। এটাই দুনিয়ার দস্তুর। কাজরীর গুরুজন কি ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি দেখেননি, ভেবেছ? না দেখে থাকলে দেখবেন। ওই ব্যারিস্টারই শেষ সুপাত্র নন। তুমি ধরে রাখতে পারো যে তাঁদের মেয়েকে তাঁরা অপাত্রে দেবেন না। ক্ষতি তুমি এমন কিছু করনি যে তোমাকে কেউ অপরাধী করবে বা অপবাদ দেবে। যাও, এখন ভালো ছেলের মতো চাকরি কর। পরে আরো ঢের ঢের সম্বন্ধ আসবে। চাও তো আমিও তোমার জন্যে চেষ্টা করতে পারি।' বৌদি ঘটকালি করতে অগ্রসর হন।

'বৌদি, রানী বৌদি, লক্ষ্মিটি, খবরদার অমন কাজ করবেন না। আমি তা হলে আর দেখা করতে আসব না।' প্রবাহন তর্জনী তুলে শাসায়।

'আবার কবে আসছ, বল। তোমার সঙ্গে আজে বাজে বকে সময়টুকু কাবার করে দিই। তারপর সারারাত ছটফট করি ভেবে যে কত বড়ো বড়ো কথা বলবার ছিল। শোনবার ছিল। আমারি দোষ।'

মনটাকে একটা উঁচু পর্দায় বাঁধতেই তাঁর ইচ্ছা। বই পড়ে তিনি তেমন শান্তি পান না। ঠাকুরঘরে বসে সেবাপুজা করেন। শান্তি হয়তো কিছু পান, কিন্তু মানুষের সত্য মানুষের কাছেই পাওয়া যায়, বিগ্রহের কাছে নয়। প্রবাহন যা বলে তা ওর স্বকীয় উপলব্ধি। পড়ে পাওয়া নয়। যদিও কাঁচা।

'প্রেমের পন্থ দিয়ে সৌন্দর্যের পন্থ দিয়ে চলতে চলতে জীবন-দেবতার সঙ্গ পেতে

পেতে চলেছি। এ পন্থও কোনোদিন ফুরোবে না, এ পাওয়াও কোনোদিন ফুরোবে না। কখনো পেছিয়ে পড়ি, কখনো পিছু হটি, কখনো বা বিচ্যুত হই। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। কিন্তু সব সময় জানি যে তিনি আমার হাত ধরেছেন। আমি তাঁর হাত ছেড়ে দিলেও তিনি কখনো আমার হাত ছেড়ে দেবেন না। আমাকে আবার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন। আমি পথ হারিয়ে ফেললেও হারিয়ে যাব না। যেখানেই থাকি না কেন সেখান থেকেই দেখতে পাব মাথার উপরে ধ্রুবতারা।' প্রবাহন চোখ বুজে ধ্যান করে।

'কিন্তু আরেকজন যদি তোমার হাত ধরে থেকে থাকে? একটি শিশু? সে যদি তোমার হাত থেকে শূন্যে ছিটকে পড়ে? কেমন করে তুমি জানবে যে সে হারিয়ে যাবে না? সে পথ ফিরে পাবে? সে আবার তোমার হাত ধরবে? অবশ্য তিনি মাথার উপর থাকতে কোনো ভয় নেই। এ প্রতীতি আমারও আছে। নইলে কবে পাগল হয়ে যেতুম!' বৌদি তাঁর আপনার কথা বলেন।

'পূর্ণের মধ্যে যারা আছে তারা হারিয়ে গেলেও পূর্ণের মধ্যেই থাকবে। জাহাজ থেকে যা পড়ে যায় তা সমুদ্রের গর্ভে থাকে। দেখতে পাইনে, এই যা দুঃখ। হয়তো একদিন দেখতে পাব। আশা হারিয়ে ফেলি কেন? অন্ধকার রাত্রেও আশা রাখতে হয় সে সূর্য আবার উঠবে।' প্রবাহন তাঁর মুখের দিকে তাকায়।

'হাঁ, সূর্য আবার উঠবে। তোমার কথাই সত্য হোক, ঠাকুরপো।' বলে তিনি উঠে গিয়ে আড়ালে চোখের জল ঝরান।

ফিরে এসে বলেন, 'তৃষ্ণার জল তোমার বেলা কেমন জানিনে, আমার বেলা চক্ষের জল মেশানো। কাঁদলেই প্রাণটা শীতল হয়। তৃষ্ণা তখনকার মতো মেটে। ইচ্ছে করে কেঁদে ভাসিয়ে দিই, কিন্তু কাঁদতে দিচ্ছে কে? সংসারের প্রত্যেকটি কর্তব্য বিধিমতো সম্পন্ন করতে হয়। আমি না করলে আর কেউ করবে না। তোমার যেমন আপিসের কর্তব্য।'

॥ আট ॥

জ্ঞানবরণ প্রত্যাশা করেছিলেন প্রবাহন ওঁর ওখানেই উঠবে। দেশে ফিরে এসে দেশের জন্যে কী কী করা যাবে তা নিয়ে যেসব জল্পনা কল্পনা বিদেশে বসে করা হয়েছিল সেসব এইবার রূপায়িত করার পালা। এক হাতে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারছেন না। প্রবাহন যদি হাত লাগায় তা হলে হয়তো পারবেন। টাকার অভাব নেই, অভাব

মানুষের। সবাই তো এখন রাজনীতির পেছনে ছুটেছে।

'তোমাকে আমি বলেছিলুম আমার এখানেই উঠতে, তা হলে অনেক বেশী সময় পাওয়া যেত। তা তুমি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? সাহিত্যিক মহলে?' শ্যামদা তার কাছ থেকে তার সময়ের হিসাব নেন।

সে চুপ করে থাকে। বৌদির কথা বলে না।

'সাহিত্য এখন একটা চড়ায় এসে ঠেকেছে। ইউরোপ থেকে কেউ কিছু শিখবে না, শিখতে চায় না, কারণ ইংরেজ আমাদের শত্রু। তা হলে শিখবে কার কাছ থেকে? সংস্কৃত কবিদের কাছ থেকে? তাঁরাও তো প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী ফিউডাল। মস্কো! মস্কো থেকে আসবে আলোক! যেমন মক্কা থেকে। আরে, মক্কা থেকে তোরা কী পেয়েছিলি যে মস্কো থেকে পাবি? পাবার যা সে তো ওই লণ্ডন প্যারিস রোম গ্রীস থেকে।' শ্যামদা গদীমোড়া চেয়ারে তলিয়ে যান।

'জনগণের দিক থেকে কি পাবার নেই কিছু?' প্রবাহন সুধায়।

'আছে বই কি। ওই লালন ফকির আর মদন বাউল। কিন্তু ওরা তোমার ইনটেলেকচুয়াল ক্ষুধা মেটাতে পারে না। এ জগৎ কেমন করে হয়েছে তার সম্বন্ধে ওদের কোনো ধারণাই নেই। এক একটি প্রাণীর বিবর্তন হলো কী করে সে রহস্য ওদের অজানা। থাক গে, প্রবাহন! জনগণের কাছে যারা যেতে চায় তারা যাকগে! সাহিত্যে যদি নতুন জোয়ার আনতে পারে তবে আনুক গে! কথা হচ্ছে, তুমি আমি কী করব? আমরা যারা রেনেসাঁসে বিশ্বাস করি তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব কি, যেহেতু ইংরেজের উপর রাগে অন্তরাত্মা জলছে?' শ্যামদার প্রশ্নটাই তাঁর উত্তর।

'কিন্তু সিনেমাযাত্রীদের ভিড় দেখে তো মনে হয় না যে মার্কিন ছবির উপর লোকের ঘেন্না ধরে গেছে। ফুটবল খেলার সময় লোকের উন্মাদনা দেখেও কি মনে হয় যে ইংরেজদের সকার কেউ এদেশে খেলবে না? অন্তরাত্মা জলছে সেটা ঠিক। কিন্তু অন্তরাত্মা একথাও বলছে যে আলু না খেলে বাবুদের একবেলাও চলবে না, তামাক না খেলে গাঁয়ের লোকেরাও জমি চষবে না, গিনিসোনা না পেলে গিন্নীরা হত্যে দেবেন।' প্রবাহন হাসতে হাসতে বলে।

শ্যামবরণদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, তোমার বন্ধু মীরার খবর কী? মীরা এখন কোথায়?'

প্রবাহন ক্ষণকালের জন্যে রাঙা হয়ে যায়। 'কী করে জানব? অনেকদিন ওর চিঠি পাইনি। ও যখন শোনে যে আমি আবার প্রেমে পড়েছি তখন ওর কলম বন্ধ হয়। আমারি বা এমন কী গরজ! ওসব কবে চুকে গেছে। তোমাকে কেউ বলেনি?'

'কই, তোমার নতুন করে প্রেমে পড়ার কথাও তো বলনি। ওদেশে থাকতে না

এদেশে ফিরে ?' শ্যামবরণ শুনতে উৎসুক হন।

'সেটাও তো পুরোনো হতে চলল। তুমি ততদিনে ইউরোপ ছেড়েছ। হাঁ, ওদেশে থাকতে।' প্রবাহন আরক্ত মুখে বলে।

'ওঃ। সেইজন্যে কাজরীকে প্রত্যাখ্যান করলে। এতক্ষণে বোঝা গেল রহস্য। আমাকে আগে জানালে ব্যাপার এতদূর গড়াতে দিতুম না। কাজরীকে দেখানোই হতো না।' শ্যামবরণ আপসোস করেন।

'তোমাকে না বলার আরো কারণ ছিল। তুমি শুনে সুখী হতে না যে ভালোবাসা অন্ধ, সে বয়সের বাছবিচার করে না, বেশী বয়সী নারীর সঙ্গে বিয়ের বাধা থাকতে পারে, প্রেমের বাধা নেই। চমকে উঠলে যে। এমনটি কি কোথাও কখনো ঘটেনি?' প্রবাহন রেনেসাঁসবাদীকে চেপে ধরে।

'আমার সংস্কারে বাধে। কিন্তু তুমি করতে চাও কি? বিয়ে?' তিনি অবিশ্বাসের স্বরে বলেন।

'ওটাও চুকে গেছে, শ্যামবরণদা। না, বিয়ে নয়। আমার প্রস্তাব উনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা বন্ধু। তবে ভালোবাসা এখনো নিবে যায়নি। নিবে যাবেই। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান হৃদয় যদিও এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করতে পারে তবু দেহের থেকে দেহের দূরত্ব অতিক্রম করা যায় না। দেহই এক্ষেত্রে নিয়ামক।' প্রবাহন দেহবাদীর মতো বলে।

'যা বলেছ। তোমার দেখছি বরাত মন্দ। মীরাও তোমার হলো না। ফিরে গেল তার স্বামীর ঘর করতে। শিশুর দাবী মেনে। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'র শেষটা দেখেছ? হাঁ, ওই রকমই হয়। মধুসূদনরাই জেতে, কুমুরাই হারে। পরাজিত আত্মা। কিন্তু ইউরোপে অমন হয় না। অপরাজিত আত্মা। তুমি নভেল লিখছ, প্রবাহন। নায়িকাকে জিতিয়ে দিয়ো।' শ্যামদা পরামর্শ দেন।

'আমার এক এক সময় মনে হয় যে মীরা পরাজিত নয়, আমিই পরাজিত। অসিধার সহজ কথা নয়, স্বামীর সঙ্গে থাকলে ব্রতভঙ্গ হবেই। বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া সন্তান গর্ভে থাকলে সম্ভবপর, তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ছ'মাস পরে আর সাজে না। তা বলে ওর শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাওয়া আমার বুকে পুলক সঞ্চার করে না। আমি আর বিশ্বাস করতে পারিনে যে মীরা কোনোদিন মুক্ত হবে, হয়ে আমাকে বররূপে বরণ করবে ও আমার সন্তানের জননী হবে। আমার ক্রমে সন্দেহ হয় যে ও আর নতুন করে বিয়ে করতে বা মা হতে চায় না। চায় কেবল প্রেম। সেও আবার পরকীয়া প্রেম। কামগন্ধহীন।' প্রবাহন তিন বছর আগের যুগে ফিরে যায়।

'একটি সংস্কারবদ্ধ হিন্দু সধবার পক্ষে ও ছাড়া আর কিছু স্বাভাবিক হতো কি?

তুমিই বল।' শ্যামবরণ দরদী শ্রোতার মতো সুধান।

'কিন্তু ও যে বিদ্রোহিণী। ও যে আগুনের ফুলকি। ও যে আর-সকলের মতো নয়। ওকে তো আমি চিনি।' প্রবাহন কৈফিয়ৎ দেয়।

'ভুল চিনেছ, বলছিনে। ওর বয়সের মেয়েদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের প্রেরণা এসেছে। ওই একমাত্র নয়। কিন্তু পরিবারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যত কঠিন সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া তার শতগুণ কঠিন। ওকে নিয়ে তুমি করতে কী? ডিভোর্স হিন্দুদের হয় না। কাজেই বিয়ে তোমাদের হতো না। সব পেয়েও তুমি ওকে আপনার করতে পারতে না। ও তোমাকে স্বামীর অধিকার দিত না। যেটা হতো সেটা ওই পরকীয়া প্রেম। বিবাহের কাঠামোর ভিতরে থেকে। স্বামীর কাছে ফিরে যাবার পথঘাট খোলা রেখে। যাই বল, নিষ্কাম নয়। তবে ওর সঙ্গে মাতৃত্বের সম্বন্ধও নেই।' দাদা সখেদে বলেন।

প্রবাহন স্বীকার করে। বলে, 'বুঝি সবই। তবু আমার মনে হয় যে আমিই প্রেমের পরীক্ষায় হেরে গেছি। প্রেম আমার কাছে প্রত্যাশা করেছিল অনন্তকাল প্রতীক্ষা। অপরিসীম ধৈর্য। অপার ক্ষমা। তা যদি আমি পারতুম ও আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ত। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করত।'

শ্যামবরণদা হেসে ওঠেন। 'এই বিদ্যা নিয়ে তুমি উপন্যাস লিখবে! এই তোমার নারীচরিত্রজ্ঞান! খুব চেনো মেয়েদের মন! রিয়ালিজম আর আইডিয়ালিজমে ঘোঁট পাকিয়ে বসে আছো।'

তিনি বিদগ্ধের মতো করুণ কণ্ঠে বলেন, 'মেয়েরা হচ্ছে রিয়ালিস্ট। ছেলেদের মতো আইডিয়ালিস্ট নয়। প্রেমে পড়লেও কোন্ পুরুষের কতদূর দৌড় সেটা বুঝে নিয়ে তারপরে মালা দেয়। বা দেয় না। তুমি বোধহয় উপন্যাস পড়ে প্রেমে পড়েছিলে। আমিও তাই। উপন্যাস যারা লেখে তারাও তোমার আমার মতো রোমান্টিক।'

ভালোবাসা এমন এক আগুন যা নিবেও নেবে না। নিবে গেছে ভাবা যেমন ভুল নিবে যাবে ভাবাও তেমনি। প্রবাহন তার অন্তর অন্বেষণ করে দেখতে পায় মীরার প্রতি প্রেম যেন ছাইচাপা আগুন। তার বরাত ভালো যে মীরা এখন কারাগারে। আর বিয়াট্রিসের প্রতি প্রেম যেন দূর আকাশের নক্ষত্র। জ্বালাময় নয়, জ্যোতির্ময়। তা হলে চুকে যাওয়া বলতে কী বোঝায়? বোঝায় এই যে প্রবাহন এখন মুক্ত পুরুষ। সে আর-কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে ও বিয়ে করতে পারে।

'তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ, প্রবাহন।' দাদা তাকে আশ্বাস দেন। 'পেলেও যাকে রাখতে পারতে না তাকে না পাওয়াই ভালো। তাতে অনেক দুঃখ বাঁচে। ধরো, কেউ যদি তোমাকে একটা সাদা হাতী দিত তুমি পারতে পুষতে! তোমার চাওয়াটাই

অবাস্তব। ভালোবেসেছ, বেশ করেছ। ভালোবাসা যদি পেয়ে থাক সেটাও বেশ। কিন্তু বিয়ে! মধুর রসের আস্বাদন। অপত্যসুখ। ঘরসংসার। এসব কিন্তু বেশ নয় যদি বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়। তার চেয়ে অবিবাহিত রয়ে যাওয়াই শ্রেয়।'

'অবিবাহিত রয়ে যাওয়া তো অবিকশিত রয়ে যাওয়া। গোলাপের কুঁড়িকে ফুটতে না দিয়ে বোতামের গর্তে গুঁজে দেওয়া। বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলে ভালোবাসায় যদি নিবৃত্তি না থাকে তবে ভালোবাসার জনকে বিয়ে করতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। প্রিয়াকে স্ত্রীরূপে পাওয়াই আমার জয়। যে প্রিয়া নয় তার স্বামী হওয়াই পরাজয়। দুঃখের ভয়ে, বিচ্ছেদের ভয়ে আমি পশ্চাৎ অপসরণ করিনি। করেছি অন্য কারণে। তা বলে জীবধর্ম বা সংসারধর্মের তাগিদে আমি পরাজয় বরণ করব না।' প্রবাহন তার সংকল্প জানায়।

'যাচ্ছ তো মফঃস্বল স্টেশনে সারাজীবন কাটাতে।' শ্যামবরণ তাকে জ্ঞান দান করেন। 'সেখানে যার গৃহিণী নেই তার জীবনে নারী নেই। কলকাতায় তবু দূর থেকে একটু সুরভি মেলে, কাছে গেলে দুটি কথা, ভাগ্যে থাকলে একটু পরশ। মফঃস্বলে কড়া পর্দা। ঘোমটার আড়ালে বা বোরকার ভিতরে একটি মানুষ আছে না একবস্তা আলু আছে তাই তুমি বুঝতে পারবে না। জীবধর্ম সংসারধর্ম দূরের কথা তোমার সৌন্দর্যবোধও মাথায় উঠবে। কার ছবি আঁকবে তুমি? কাকে নিয়ে গল্প লিখবে? কার সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা কইবে? সাধে কি মানুষ দেখেশুনে বিয়ে করতে রাজী হয়? এমন কি চোখ বুজে বিয়ে করতেও রাজী। কাকে বিয়ে করছে তাও জানে না। একটি পুতুলকে না একটি বালিশকে।'

'সে মফঃস্বল আজকাল আর নেই,' প্রবাহন আশ্বাস দেয়। 'তবে সেটা প্যারিসও নয় যে বিয়ে না করেও দিব্যি একসঙ্গে থাকা যায়।'

ইউরোপের প্রসঙ্গ উঠলে শ্যামবরণ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষত প্যারিসের নাম শুনলে তাঁর দশা হয় চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার মতো। 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!'

'আঃ প্যারিস!' তিনি গদগদ হয়ে বলেন, 'প্যারিসে থাকলে কি তোমাকে তৃষ্ণার জলের জন্যে ভাবতে হতো? তোমার তখন একমাত্র ভাবনা কী করলে কর্মফল এড়ানো যায়। কর্মেই তোমার অধিকার, মা ফলেষু কদাচন। কিন্তু ফল যদি ধরে তা হলে কী উপায়! চতুর ফরাসী জাতি এর যা উত্তর দিয়েছে তা ফরাসী বিপ্লবের মতো আরো একটা বিপ্লব। বোধহয় সেই সময় থেকেই বা তারো আগে থেকে।'

'দেখা যায় ওদের জনসংখ্যা একশো বছরেও বাড়েনি। যেমনকে তেমন।' প্রবাহন মনে মনে তারিফ করে। কিন্তু কারণটা সম্বন্ধে নীরব থাকে।

'তোমার মনে আছে কি, প্রবাহন, প্রথম যেদিন তুমি প্যারিসে নেমে ল্যাটিন

কোয়ার্টারে ঘরের সন্ধানে বেরোও ? আমার সঙ্গে তুমি যেখানেই যাও জিজ্ঞাসুর মতো আমার দিকে তাকাও। আমি বলি, চুপ, চুপ, পরে তোমাকে বলব। পরে তোমাকে বলি যে দু'জনের বাসযোগ্য ঘর দম্পতীদের জন্যেই তৈরি। তা ওরা বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন। এক কোণে ওই যে আয়োজনটা ওটা হাত-পা ধোবার জন্যে নয়। ডুশ নেবার জন্যে।' শ্যামবরণ হাসি চাপতে পারেন না। প্রবাহনের অজ্ঞতার কথা ভেবে। বেচারা প্যারিসে নবাগত।

'প্যারিস কিন্তু টলস্টয়ের একটুও ভালো লাগেনি। তিনি একদৌড়ে পালান। প্রকাশ্য রাস্তায় গিলোটিন করতে দেখে যেমন শক পান তার চেয়ে কম নয় শিল্পীদের ঘরকন্না দেখে। দু'দুটি পুরুষের এক-একটি নারী বা এক-একটি পুরুষের দু'-দুটি নারী।' প্রবাহন বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে।

'এখন কিন্তু ওটা বেআইনী। দু'জনের সঙ্গে দু'জায়গায় ঘর করা চলে, কিন্তু এক জায়গায় নয়। খরচ কিছু বাড়ল এই যা তফাৎ। তুমি কি ভাবছ মানুষের স্বভাব শুধরে গেল ? দেহ যখন আছে তখন দেহের যাবতীয় উপসর্গও আছে। কিন্তু ফরাসীরাও বিবাহে বিশ্বাস করে। ওরাও দেখে শুনেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়। বিবাহের সঙ্গে বিষয়সম্পত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পারিবারিক বিষয়সম্পত্তি তো আর যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। বিয়ের সময় দেহ মন আত্মার চেয়ে পণ যৌতুক দায়ভাগের গুরুত্ব কম নয়। রাজকন্যা নিয়ে তুমি রাখবে কোথায়, খাওয়াবে কী, যদি না পাও অর্ধেক রাজত্ব ? একটিকে চাইলে আরেকটিকেও চাইতে হয়।' শ্যামবরণদা সকৌতুকে বলেন।

অপ্রিয় সত্য। ফরাসীদের মতো সুসভ্য জাতিও তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। যদিও তাদের দেশের সাহিত্য পড়লে মনে হবে যে নরনারী কেবল মন দেওয়ানেওয়া করে বা আধুনিক হয়ে থাকলে দেহ দেওয়ানেওয়া। অত বড়ো একটা যুদ্ধের ফলেও সম্পত্তিভিত্তিক বিবাহের পরিবর্তে প্রেমভিত্তিক বিবাহ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। তার চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে বিবাহবর্জিত সহবাস। যাতে সন্তানের সম্মানিত স্থান নেই। সন্তানহীন বন্ধ্যা সম্পর্ক কি সর্বতোভাবে সৃষ্টিশীল হতে পারে ? হলে একটা বিশেষ বয়সের পরে আর নয়।

'সেকথা সত্যি।' শ্যামবরণদা বলেন, 'প্যারিসের শিল্পীমহলের বক্তব্য হলো আমার নিজের জীবন আমি নিজের মতো করে বাঁচতে চাই। নইলে আমার নিজের শিল্প আমার নিজের মতো করে সৃষ্টি করতে পারব না। বিয়ে করলে নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচা যায় না। সুতরাং নিজের শিল্প নিজের মতো করে সৃষ্টি করা যায় না। এর থেকে আসে বিবাহবর্জিত সহবাস। যদি অপরপক্ষ রাজী হয়। যুদ্ধের আগে যারা রাজী হতো তাদের সংখ্যা কম। আর নয়তো তারা নিম্নস্তরের। যুদ্ধের পরে সে দুঃখ

নেই। কিন্তু সন্তানের জন্যেও তো নারীর মনে পুরুষেরও মনে প্রার্থনা আছে। সৃষ্টির সঙ্গে তারও তো প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। তুমি কি মনে করেছ ওরা মহান কিছু সৃষ্টি করতে পারবে? নূতনত্ব আর মহত্ত্ব কি একই কথা?'

প্রবাহনও নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু সৃষ্টি করতে চায় যা চির নূতন। বিয়ে যদি করে তবে নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে কি? তা বলে নারীবঞ্চিত জীবনও তার কাম্য নয়। সেটা সৃষ্টিশীলও নয়। প্রশ্নের উত্তর কি তবে বিবাহবর্জিত সহবাস? হয়তো একটা বিশেষ বয়সপর্যন্ত, 'হাঁ।' তারপরে কিন্তু, 'না।' সন্তানের জন্যে প্রার্থনা যার নেই তেমন শিল্পী সে নয়। সন্তানহীন বন্ধ্যা সম্পর্কও সৃষ্টিশীলতার অনুকূল হতে পারে, যেখানে সমাজ বা প্রকৃতি বিরূপ। যেখানে তেমন কোনো বাধা নেই সেখানে উর্বরতাই সৃষ্টিশীলতার সহায়।

॥ নয় ॥

যুদ্ধের নাম মুখে আনতে না আনতেই যুদ্ধ এসে হাজির। মহাযুদ্ধ নয়, মহান যুদ্ধ। তার প্রথম ধাপ লবণ সত্যাগ্রহ। ভারত মহাসাগরের দিকে মার্চ করে যান গান্ধী আর তাঁর পিছন পিছন মার্চ করে যায় ভারতময় অসংখ্য নরনারী। হাঁ, নারী। তেমন সুযোগ তারা ইতিহাসে পায়নি। গেল, গেল, মনুসংহিতা গেল! এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

স্কট ততদিন ফার্লো নিয়ে বিলেত চলে গেছেন। তাঁর জায়গায় অফিসিয়েট করছেন সিনিয়র ডেপুটি, মুখার্জি। সরকারী কাজকর্মে চৌকষ। তেমনি খেলাধূলায় ওস্তাদ। তেমনি ইংরেজী বলতে কইতে ও লিখতে বাহাদুর। কিন্তু সাহেবিয়ানায় পাকা নন। আত্মসম্মান বাঁচিয়ে চলেন, সাহেব মহলে পা বাড়ান না। সামাজিক মতবাদে রক্ষণশীল। কিন্তু ধর্মে উদার। ঠাকুরদেবতার ধার ধারেন না। বাইরে কড়া, ভিতরে স্নেহশীল।

সন্ধ্যাবেলা টেনিসের পর বিলিয়ার্ডস তাঁর প্রিয় খেলা, তাঁর দুই সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিশীথ প্রবাহনেরও। তাদের তিনি অনায়াসেই হারিয়ে দেন, আবার যত্ন করে শিখিয়েও দেন। বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেলে নিজের মোটরে করে ফিরিয়ে দেন।

রাত হলেই শেয়াল ডেকে ওঠে। হুক্কা হুয়া। হুক্কা হুয়া। হুয়া হুয়া হুয়া হুয়া। এতদিন সকলে জানত যে ওটা শেয়ালের ডাক। কিন্তু বিলিয়ার্ডস খেলতে খেলতে একদিন শোনা গেল পাশের ঘরে ব্রিজ খেলতে খেলতে একদল ইংরেজ প্ল্যান্টার বলছেন, 'ওরা আবার আসছে।'

'কারা আবার আসছে?' মুখার্জি জিজ্ঞাসা করেন।

'ওই যারা আজ মার্চ করে যাচ্ছিল আর থেকে থেকে চিৎকার করছিল, গান্ধী মাতরম্।' হ্যারিসন বলেন।

'গান্ধী মাতরম্! হা হা! গান্ধী মাতরম্ নয়, বন্দে মাতরম্।' তিনি শুধরে দেন।

'ওহ্। একই জিনিস। একই রকম শুনতে। ব্যাণ্ডি মাটরম্।' টমসন মন্তব্য করেন।

ডিকসন খেলতে খেলতে আবার হুক্কাহুয়া শুনে আবো বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আপনি তো এ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট! আপনি কি ওদের থামাতে পারেন না?'

মুখার্জি বসিকতা করে বলেন, 'মানুষকে জেলে পুরতে গিয়ে জেল এখন অন্ধকূপ। শেয়ালকে জেলে পুরতে হলে এই ক্লাবটাকেই জেল বানাতে হবে। আপনারা রাজী?'

তা শুনে সাহেবদের নেশা ছুটে যায়। মানুষ নয়, শেয়াল! সারাদিন মার্চ দেখে দেখে আর স্লোগান শুনে শুনে ওঁদের মাথায় ঘুরছিল মার্চ আর স্লোগান। খাল বিল খানা খন্দ সব জায়গায় নাকি নিমক পাওয়া যাচ্ছে। নিমক তৈরির জন্যে মার্চ করে যাওয়া হচ্ছে সেইসব স্থানে। যেই নিমক তৈরি করা অমনি গ্রেপ্তার আর চালান। হাকিমরা যদি নিমকের আস্বাদ নিতেন তা হলে বুঝতেন ও জিনিস নুন নয়। ওর স্বাদ নোনতা নয়। কিন্তু পুলিশের মতে ওরই নাম নুন। কে এখন এক্সপার্টের কাছে নিমকের নমুনা পাঠায়! ততদিনে রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। আগে তো আন্দোলনটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনো, তারপরে অন্য কথা।

কিন্তু জেল ভর্তি হতে হতে অন্ধকূপ দেখে কর্তারা ভাবনায় পড়েন। তা হলে কি লাঠি চার্জ করে জেলযাত্রীর সংখ্যা কমাতে হবে? না গ্রেপ্তারের ভিড়িক বন্ধ করে ওদের ওই মার্চ আর স্লোগান উপেক্ষা করতে হবে? উপেক্ষা করলে কি ওরা আশকারা পাবে না? ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুট হয়েছে। কে জানে আশকারা পেলে ওই আন্দোলন-কারীরাও হয়তো সর্বত্র লুটপাট করে বেড়াবে। এর থেকে আসে মৃদু যষ্টিচালনা। যাতে জেলের পথে ভিড় কমে। আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে।

'কারগুপ্টা,' মুখার্জি বলেন ইংরেজীতে, 'দেখছেন তো আমাদের দশা। যদি কড়া হাতে আন্দোলন দমন করি দেশের লোক বলবে আমরা দেশদ্রোহী। আমাদের গুলী করে মারা উচিত। যদি নরম হয়ে উপেক্ষা করি তা হলে পুলিশ থেকে আমাদের নামে রিপোর্ট যাবে আমরা রাজদ্রোহী। তখন প্রমোশন বন্ধ, বদলি অবধারিত, হয়তো ডিমোশন। এই দোটানা মুসলমানদের মধ্যে নেই। ওরাই লাফ দিয়ে আমাদের পদগুলো নেবে। দু'জনের ঝগড়ায় তৃতীয়জনের লাভ। হিন্দুরা ইংরেজদের পেছনে লেগে দেশটাকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এইসব আন্দোলনকারী কি জানে তারা কার অধীনতা থেকে কার অধীনতায় যাচ্ছে?'

প্রবাহনের মন বিমর্ষ। হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্য এমনি করেই বেড়ে যাচ্ছে। আর ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্বন্ধটাও দিন দিন এমন তিক্ত হয়ে উঠছে যে হিন্দু অফিসারদের ওরা সহ্য করতে পারছে না। নেহাৎ যদি এঁরা দেশদ্রোহীর মতো আচরণ না করেন। যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কী হবে, আরো এক পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। সেটার নাম দেশদ্রোহিতা। তার পরীক্ষক ওইসব প্ল্যান্টার আর পুলিশওয়ালা।

'মিস্টার মুখার্জি,' প্রবাহন বলে, 'এই আন্দোলনে যদি ইংরেজ হটে যায় তো এর পরের আন্দোলনে মুসলমানও হটবে। কিন্তু কেনই বা ওরকম হবে? সম্মানজনক সমাধানও তো সম্ভব। গান্ধীজীর মনের কথাও তাই।'

মুখার্জি খুশী হন না শুনে। বলেন, 'তা হলে এ আন্দোলন সমর্থন করেন আপনি!'

'ইতিহাসে নিমকের জন্যে লড়াই কি এই প্রথম দেখলেন, মিস্টার মুখার্জি? নিমক এমন এক জিনিস যার অভাবে শরীর দুর্বল হয়, আহারে রুচি হয় না। যাকে একচেটে করলে দেশকেও দাবিয়ে রাখা যায়। পরদেশকেও ইচ্ছামতো নোয়ানো যায়। ইংরেজও সেটা জানে। গান্ধীও সেটা বোঝেন।' প্রবাহন উত্তর দেয়। সে জানে ওটা একটা মৌল অধিকার।

'কিন্তু স্বরাজের সম্ভাবনা কতটুকু? স্বাধীনতা কি অমনি করেই হবে?' তিনি সন্দিহান।

'কেন, মেয়েরা কি এর মধ্যেই স্বাধীনা হয়নি?' প্রবাহন দুষ্টুমি করে বলে।

'হাঁ, ওইখানেই তো আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ। শারদা আইনকে আমি মনে করি সর্বনাশের সোপান, আপনি মনে করেন স্বর্গলাভের সরণি। কিন্তু এই লবণ সত্যাগ্রহের ফলে প্রশাসনের দিক থেকেও সর্বনাশ হতে বসেছে। জেলখানায় যে জেনানা ফাটক আছে তাতে জনা দশেক মেয়ের কায়ক্লেশে আঁটতে পারে। সেখানে এখন দু'শো জন মহিলা। সব ভদ্রঘরের। কোথায় এঁদের স্নানের বন্দোবস্ত, কোথায় শৌচের! খাবার না হয় বাইরে থেকে আনিয়ে দেওয়া যাবে।' মুখার্জি তাঁর দুর্ভাবনার কারণ বলেন।

'তা হলে ওঁদের হয় ছেড়ে দিন, নয় সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান। ওখানে জায়গা হওয়া সম্ভবপর।' প্রবাহন পরামর্শ দেয়। অবশ্য তাঁর অনুমতি নিয়ে।

এর দিন কয়েক বাদে ওর নামে এক চিঠি এসে হাজির। যুক্ত প্রদেশের নাইনি সেণ্ট্রাল জেল থেকে। কী ব্যাপার! এ কি সেই পরামর্শের পরিণাম?

খুলে দেখে, মীরা দেবীর স্বাক্ষর। চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা, অন্য কারো হাতের। প্রবাহনের দেশে ফেরার খবর মীরা যথাকালে পেয়েছিল, কিন্তু দেশের কাজ ঘাড়ে নিয়ে অবধি তার একদণ্ড বিশ্রাম ছিল না। জেলে এসে এই প্রথম একটু নিশ্বাস ফেলার

ফুরসৎ পাচ্ছে। এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু শ্রম বলতে ভাঁড়ারের হিসাব রাখা। সেদিক থেকে তার কোনো অভিযোগ নেই। তার একমাত্র নালিশ তার সহকর্মিণীদের সি-ক্লাসে দিয়ে তাকে কেন বি-ক্লাসে দেওয়া হয়েছে? এর উত্তর দিতে পারেন বিচার-কারী ম্যাজিস্ট্রেট, জেল কর্তৃপক্ষ নয়। কিন্তু তাঁকে এখন কোথায় এখানে পাচ্ছে? জেলা থেকে তাকে জেলান্তরিত করা হয়েছে। জেল থেকেও জেলান্তরিত।

মীরার চিঠি পেলে এককালে তার শিরায় শিরায় আগুন ধরে যেত। এখন তেমন নয়। বোঝে মীরা প্রাণ খুলে লিখতে পারেনি। নইলে আগুন ধরিয়ে দিত ঠিক। তবে মীরাও বোঝে সে আগুন দ্বিতীয়বার জ্বলবে না। জীবনে অন্য নারী এসেছে। এখন ওরা বন্ধু। বন্ধুর বার্তা পেয়ে বন্ধু সুখী। প্রাপ্তিস্বীকার করে শুভকামনা জানায়। দু'লাইনের চিঠি।

তা হলে এইভাবে ওর মুক্তির সমস্যা মিটল? খাঁচার পাখী আবার বনের পাখী হলো? শিশু ওকে ধরে রাখতে পারল না, স্বামী ওকে পথ ছেড়ে দিল, শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ থেকে বাধা এল না, সমাজের দিক থেকেও না। দশ বছর ধরে ও মুক্তির তপস্যা করেছে, আরো আগে থেকে মুক্তির ধ্যান করেছে। পিতামাতার নির্বন্ধে অল্পবয়সে বিবাহিতা বালিকা বিষয়সম্পত্তির মোহে মুগ্ধ হয়নি, সে চেয়েছে তার দাম্পত্য শয্যার থেকে মুক্তি। জ্বলেছে, জ্বালিয়েছে তার স্বামীকে। দগ্ধেছে, দগ্ধিয়েছে তার বন্ধুদের। কেউ তাকে মুক্ত করতে পারেনি, প্রবাহনও না। মুক্তির সংগ্রামের মাঝখানে হঠাৎ ঘটে মাতৃত্ব। তার স্বামীর মোক্ষম চাল। পাখী আর উড়তে পারে না। খাঁচায় বন্ধ থাকে।

প্রকারান্তরে গান্ধীই ওকে মুক্তি দিলেন। ওর মতো অসংখ্য পাখীকে। কিন্তু জেলও তো একটা খাঁচা। আরো বড়ো একটা খাঁচা। তা হলে মুক্তি হলো কোথায়! হলো এক খাঁচার থেকে খাঁচান্তরে যাওয়া। কিন্তু জেলখানায় সে সমগ্র দেশের প্রতীক। সমগ্র দেশটাই একটা জেল। সেখানে গান্ধী, মোতিলাল, সরোজিনী, জবাহরলাল, সুভাষ, মীরা সকলে একনৌকায়। সেখানে শিকল পরেই শিকল থেকে মুক্তি। আর ঘরে? ঘরে যাদের সঙ্গে একনৌকায় তারা একদল খাঁচার পাখী। খাঁচার বাইরে কী আছে জানে না। জানতে চায় না। উড়তে তাদের ভয়। তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তার মনেও ভয়। এই সত্যাগ্রহ তার সে ভয় ভেঙে দিয়েছে।

বেচারি কোনোদিন জেলখানা দেখেনি। রোমান্টিক বলে দূর থেকে মনে হতে পারে, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে রক্ত হিম হয়ে যায়। প্রবাহনের জেলদর্শন হয়েছে। একবার মুগাজির সঙ্গে। একবার তাঁর নির্দেশে। কিন্তু সে গেছে স্বাধীন মানুষের মতো। বন্দীর মতো নয়। যতক্ষণ সেখানে থেকেছে ততক্ষণ ফিরে আসার জন্যে আকুলিবিকুলি করেছে। কে জানে যদি ফিরে আসতে না পায়! লৌহকপাট যদি আর না খোলে।

এমন যে জেলখানা সেখানে মীরা বেচারিকে থাকতে হবে পুরো একটি বছর। দু'দিনেই সকল রোমান্স জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে। তখন কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া। কখনো জেল কর্মচারীদের সঙ্গে, কখনো অন্যান্য বন্দী বা বন্দিনীদের সঙ্গে। তুচ্ছ সামগ্রীর জন্যে উচ্চ ভাবনা ছাড়তে হবে। একটা সাবানের জন্যে বা এক শিশি সুগন্ধি তেলের জন্যে।

মীরার জন্যে কী করতে পারে প্রবাহন! অত দূর থেকে! এলাহাবাদে তার এক উকিল বন্ধু আছেন। তাঁকে চিঠি লেখে। তিনি যদি একটু খোঁজ খবর নেন, অনুমতি পেলে দেখা করেন। খারে কাছে ওর কোনো আত্মীয় তো নেই। ওর স্বামী অবশ্য শিশুকে নিয়ে দেখতে ও দেখাতে যাবেন। অনেক দূর থেকে। আর প্রবাহন? সে যাবে না। কেন যাবে?

॥ দশ ॥

মীরা মুক্ত হয়ে তাকেও মুক্ত করে দিয়েছে। মুক্ত পুরুষের মতো সে তার স্বকীয় সিদ্ধান্ত নেবে। কাকে ভালোবাসবে, কাকে বিয়ে করবে, চাকরি করবে কি না, কবে ছাড়বে, কোন দেশে বাস করবে এসব প্রশ্নের উত্তর একে একে দেবে। কে জানে হয়তো প্যারিসই আছে তার কপালে। একালের কামরূপ। সেখানে তার প্রেমের অভাব হবে না। এখন মাটি করেছে বাংলা সাহিত্যের সংসারে জড়িয়ে পড়ে। প্যারিসে বসে বাংলা সাহিত্য হয় না। টুর্গেনিভ ভেবেছিলেন রুশ সাহিত্য হয়। সেটা ভুল। রুশ সাহিত্যের পক্ষে ইয়াসনায়া পলিয়ানা শ্রেয়। তেমনি বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শান্তিনিকেতন অথবা বাংলার কোনো গ্রাম।

মনটাকে আপাতত খোলা রাখা যাক। চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্যারিসে চলে যাওয়াও একটা সম্ভাবনা। সাহিত্য অপেক্ষা করতে পারে, যৌবন অপেক্ষা করবে না, প্রেম অপেক্ষা করবে না। শ্যামবরণের মতো অন্তহীন পায়চারি, আশা নেই তবু রাত ভোর করে দেওয়া প্রবাহনের জন্যে নয়। অবিকল লায়লার মতো আর একটি নারী যদি থাকেও সে নারী কি শ্যামবরণের জন্যে বসে আছে নাকি? তেমনি অবিকল মীরার মতো একটি নারীও কি প্রবাহন পাবে? সেদিক থেকে সে শ্যামবরণের তুলনায় স্বাধীন। বিশেষ একটি প্রতিমা তার মনশ্চক্ষে নেই। সে সাকারবাদী হয়ে যে-কোনো প্রতিমার উপাসক হতে রাজী, যদি তিনি তার সঙ্গে তৃষ্ণার জল পাতান। সে হবে তাঁর তৃষ্ণার জল, তিনি হবেন তার তৃষ্ণার জল। কে তিনি, কী তাঁর জাত, কী তাঁর ধর্ম, কোন দেশে তাঁর

বসতি এসব গণনা তার জন্যে নয়। তবে আগুনে হাত দিয়ে ঠেকে শিখেছে যে বিবাহিতা নারী আর নয়, অসমবয়সিনী আর নয়। তাঁদের কারো দিক থেকে সঙ্কেত এলে তার পক্ষে সাড়া দেওয়া খুবই কঠিন হবে। বড়োই বিব্রত হবে সে। প্রেমাকুলা নারীকে প্রত্যাখ্যান করা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কাজরী যদি পরিণয়াকুলা না হয়ে প্রণয়াকুলা হতো তা হলে কি প্রবাহন ওকে প্রত্যাখ্যান করত?

কাজরীর বিয়েতে শ্যামবরণদা যোগ দেন। প্রবাহনকে ওঁরা কার্ড পাঠাননি। পাঠালে সেও যেত। মনে মনে সে তাঁর সুখ সৌভাগ্য ও সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন কামনা করে। চান্দা সাহেব প্রবাহনের চেয়ে যোগ্যতর পাত্র। বয়সেও বড়ো। রাজযোটক।

বিয়ের প্রস্তাব আরো এসেছিল। সে ধরাছোঁয়া দেয়নি। পাত্রী দেখতে চায়নি বা যায়নি। ফোটো ফিরিয়ে দিয়েছে। সবাইকে বলেছে যে চাকরি করতে তার ইচ্ছে নেই। তাঁরা ধরে নিয়েছেন ওটা দেশের জন্যে ত্যাগবাসনা। হয়তো আরেকটি সুভাষ বোস। তেমনি ভীষ্মপ্রতিম।

এলাহাবাদের সেই বন্ধুটি একদিন মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে প্রবাহনকে তার বিবরণ লিখে পাঠান। ভালোই আছে মীরা। সাহসের সঙ্গে জেলের দুঃখকষ্ট সহ্য করছে। ওটা তো জেল নয়, ওটা যুদ্ধক্ষেত্র। ওখান থেকে মুচলেকা দিয়ে পালিয়ে আসাটা রণে ভঙ্গ দেওয়া। তাও করেছে কতক বন্দিনী। না করে পারে? বাড়ীতে কাচ্চাবাচ্চা রেখে এসেছে যে। মীরারও মন খারাপ তার কোলের ছেলেটির জন্যে। তাকে মনের জোর জোগান মহেশ্বরী দেবী, তার সহবন্দিনী। সে ভদ্রমহিলা মীরার কাছে প্রবাহনের গল্প শুনে ওর উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন। ওকে চিঠি লিখতে চান। শেষে ওর কোনো অনিষ্ট হবে না তো? সরকার যদি বলে, জেলখানা থেকে কারা ওকে অতবার চিঠি লেখে ও কেন?

একদিন সত্যি সত্যি আসে জেল থেকে তাঁর চিঠি। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে লেখা। লিখেছেন, 'আপনি আমার ভাই, আমি আপনার বোন। ভাই বোনকে কত কিছু উপহার দেয়। আপনি আমাকে একটি উপহার দিন। আমি চাই একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন মর্ত্য। যার জন্যে আমি আমার জীবন দিতে চাইব। সংসার আমার আর ভালো লাগে না। স্বামীকে বলে এসেছি আমার আশা ছেড়ে দিতে। আবার বিয়ে করতে। ফিরে গিয়ে আমি একটি আশ্রম খুলব। দেশের অভাগিনী মেয়েদের বুকে সাহস জোগাতে হবে। স্বরাজের লড়াই তো একমাত্র নয়। এর পরে আরো জবর লড়াই আসবে।'

পড়তে পড়তে প্রবাহনের চোখে জল আসে। এরাই ধরিত্রীর লবণ। মহেশ্বরীর মতো এমনি সব নারী। এমনি সব পুরুষ। যাদের অহঙ্কার নেই, স্বার্থবোধ নেই। লবণ

সত্যাগ্রহ একমুঠো লবণের জন্যে নয়। এইসব নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক কর্মীর লবণত্ব পরীক্ষার জন্যে।

কিন্তু মহেশ্বরী বোনের জন্যে সে এখন একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন মর্ত্য পায় কোথায়? কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়? পেটোর দোকানে না সার টমাস মোরের দোকানে? রুশোর দোকানে না মার্কসের দোকানে? টলস্টয়ের দোকানে না গান্ধীর দোকানে? না তাকেই খুলে বসতে হবে আরো এক দোকান? আগাগোড়া নতুন করে ধ্যান করতে হবে? দু' চার শতাব্দী আগ বাড়িয়ে? অর্জন করতে হবে দেশোত্তর ও কালোত্তর এক দৃষ্টি? যে দৃষ্টি ওঁদের ছিল বলেই ওঁদের দোকানে এখনো ক্রেতার ভিড়? ক্রেতারা সব দেশের ও সব জাতির।

এইসব ভাবতে ভাবতে তার দিশাহারা মন ক্রমে সাহিত্যে স্থিতি পায়। তারপর সাহিত্যের সূত্র ধরে দেশে। বিদেশে ফিরে যাওয়ার কথা একটু একটু করে ভুলে যায়। দেশই তার ধ্যানধারণার কেন্দ্র। দেশের জন্যেই কল্পনা করতে হবে একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন মর্ত্য। অবশ্য একদিনে নয়। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই অর্ধেক জীবন অতিবাহিত হবে। রূপায়ণের দিন আসবে তার পরে। দেশকে একটি নতুন স্বপ্ন দাও। তার জন্যে একটি নতুন স্বপ্ন দেখ। প্রবাহন, আজকের দিনে এই হোক তোমার কাজ।

আন্দোলন চলছে বলে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা স্থগিত থাকছে না। সেই উপলক্ষে কলকাতা যায় দুই বন্ধু। রানী বৌদিকে প্রবাহন আগে থেকে জানিয়ে রেখেছে যে এবারে তার হাতে সময় নেই, পরীক্ষা দিয়ে তার পরের ট্রেনেই কর্মস্থলে ফিরতে হবে। জেলার আবহাওয়া থমথমে। কখন কী হয় কে বলতে পারে! রানী বৌদি সেটা বুঝতে পেরেছেন। তাই কলকাতা আসেননি এবার।

প্রবাহনের কলকাতা এবার তেমন ভালো লাগে না। কেমন একটা শূন্যতাবোধ তার অন্তরে। নিশ্চয়ই রানী বৌদির জন্যে নয়। তার কয়েকজন প্রিয়বন্ধুকে ধরে নিয়ে গেছে আইনভঙ্গের অপরাধে। সেটা অবশ্য তাঁদের স্বেচ্ছাকৃত। তা ছাড়া দেশময় নিপীড়নের যে বর্ণনা শোনে তাতে আপনার উপরেই ধিক্কার জন্মে যায়। ইংরেজ সরকারের অঙ্গ বলে।

নিশীথের সঙ্গে এই নিয়ে ভাববিনিময় হয়। সে বলে, 'তোমার আমার পোজিশন খুবই ডেলিকেট। কিন্তু ইস্তফা একটা চরম অস্ত্র। নিতান্ত নাচার না হলে ইস্তফা দেওয়া উচিত নয়। হুট করে একটা কিছু করলে দেশের লোক বাহবা দেবে, কিন্তু সেটা দেশের দিক থেকে ভালো হবে না। ইংরেজ চলে যেতে পারে, কিন্তু তাদের প্রশাসনের স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখবে কে? তাকে আরো উন্নত করবে কে? তোমার আমার মতো লোকের হাতেই সে দায়িত্ব। তাদের শাসনব্যবস্থার কোথায় কী গলদ, কোথায় কী ছিদ্র·

আমরাই সেটা ভিতর থেকে অধ্যয়ন করছি। কোথায় এর গুণ, কোথায় এর শক্তি সেটাও আমাদেরি শিক্ষণীয়। আমরা শিক্ষানবিশ। আমরা যদি আমাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি তবে ইংরেজ চলে যাবার পর দেশ আবার সেই মরাঠা বা মুঘল যুগে পিছু হটবে। আমরাও যদি চলে যাই তবে অরাজকতা। জনপ্রিয় হতে চেয়ো না, প্রবাহন। কাজের লোক হও।'

প্রবাহন তার বন্ধুকে বলে না যে তার এ চাকরি নিজের জন্যে নয়। মীরা যাতে একটি ঘরের পরিবর্তে আরেকটি ঘর পায় সেইজন্যেই এটা নেওয়া। কী পাগল ছিল সে! মীরা আগত তার দেশের কাজ ছেড়ে সরকারী কর্মচারীর বাংলোয় মেমসাহেব হতে ও রহিম মিঞার হাতে হাজরি ও খানা খেতে। সাহেবদের উপর যার উৎকট ঘৃণা ও সরকারী কর্মচারীদের উপর দারুণ বিরাগ। আর মুসলমানদের উপর যার তীব্র বিদ্বেষ। কেন ওরা গোমাতাকে বধ করে ও পরনারী হরণ করে? নাঃ! মীরা এমনতর জীবন-যাত্রার সাথী হতো না।

সেই বা মীরার জেলযাত্রার সাথী হতো কী করে? নাঃ। সেভাবেও তাদের সামঞ্জস্য হতো না। হবার নয়।

ফজলির পর লোকে চায় ফজলিতর। তেমনি লায়লার পরে শ্যামবরণ চান লায়লাতর। প্রবাহন কিন্তু মীরার পর মীরাতর চায়নি ও চায় না। জগতে কত বিচিত্র নারী আছে। তাদের একজন কেন আরেকজনের মতো হবে? প্রত্যেকেই আপনার মতো। প্রত্যেকেই অতুলনীয়। তাদের মধ্যে কে যে কার তৃষ্ণার জল জীবনদেবতাই জানেন। প্রবাহন যে কার, কে যে প্রবাহনের, তা এখনো তার অজানা।

অতীতকে জোর করে মুছে ফেলাও একপ্রকার ভায়োলেন্স। তেমন কাজ সে করবে না। অপর পক্ষে অতীতের পুনরভিনয় জীবনকে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে। যে প্রেমের বিকাশ নেই, বাড় নেই, যে প্রেম দিন দিন ম্লান হয়ে আসে তার প্রতি একনিষ্ঠতা বা তারই মতো আর একটি প্রেমের অন্বেষণ তো অন্ধ পুরানুবৃত্তি বা পুনরাবৃত্তি। হয়তো প্রশংসনীয়, কিন্তু অনুকরণীয় নয়। শ্যামদা যাই ভাবুন।

প্রবাহন তার হৃদয়ের উপর জোর খাটাতে যায় না। কিন্তু জীবনের দুয়ার খোলা রাখে। কে জানে সে কখন আসবে, যে তার তৃষ্ণার জল, সে যার তৃষ্ণার জল। সেদিন যেন সে মুক্ত থাকে। যেন চিনতে পারে। যেন বলতে পারে, 'এই যে তুমি!'

॥ এগারো ॥

রানী বৌদির চিঠি।

এবার দেখা হলো না বলে তিনি ক্ষুণ্ণ। কত কথা জমানো ছিল। বলবার সুযোগ পেলে মনটা হালকা হতো। 'তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার নামাতে পারি যদি মনোভার।' তিনি রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতাটির মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে ক্ষান্ত হননি। আরো, আরো উদ্ধৃত করেছেন।

'সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি
গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর।'

আবো কয়েকটা লাইন উদ্ধার করে তিনি কেটে দিয়েছিলেন। বোঝা যায় কোন্ কোন্ লাইন। 'কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।'

প্রবাহন মনে করে ওটা অন্যমনস্কভাবে একটানা লিখে যাওয়া, পরে অপ্রযোজ্য বলে বাদ দেওয়া। সে ধরে নেয় তিনি চেয়েছিলেন শোকের ভাব লাঘব করতে। যদিও ঠিক 'বর্ষার দিনে' নয়। কবিগুরুও তাঁর কবিতাটি লিখেছিলেন জ্যৈষ্ঠমাসে।

প্রবাহন আবার কবে কলকাতা যাবার অনুমতি পাবে জানে না। পেলে তাঁকে খবর দেবে। ততদিনে হয়তো বর্ষা এসে পড়বে। আকাশ থেকে অনিবার জল ঝরবে। কলকাতা শহর যখন, তখন রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাবে। তার উপর যদি নয়ন থেকেও অনিবার জল ঝরে তবে তো এক কোমর জল হবে।

প্রবাহন লেখে, 'বৌদি, জানেন তো, দেখা হলে আমরা আজেবাজে বকে সময় বইয়ে দিই। গভীর কথা আমার মুখে আসেও না। তার চেয়ে ভালো চিঠি লেখা। লেখনীর মুখে বলা। অমনি করে হয়তো কিছু গভীর কথাও বলা হয়ে যাবে। আপনিও বলবেন, আমিও বলব। মনোভার নামাতে পারি কি না দেখব।'

বৌদি রাজী হন। তাঁর ওই একই চিন্তা। বুলা। আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে বুলা আবার তার মার কোলে ফিরে আসতে পারে? তাঁর কিন্তু আর মা হতে বাসনা নেই। যে ক'টি আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে ও মানুষ করে তুলতে পারলেই তিনি কৃতার্থ। এর পরে যদি একটি হয় তো সে যে বুলা এমন কী নিশ্চয়তা আছে? কে তাঁকে নিশ্চয়তা

দেবে ? প্রবাহন কী বলে ?

প্রবাহন বলে, বুলার পর বুলান্তর হতে পারে, কিন্তু বুলা আর হবে না। তা বলে সে নেই তা নয়। বরং সে আছে বলেই আর হবে না। এই জগতের মতো আরো কত না জগৎ আছে। বুলাকে যেতে হবে এক এক করে সেইসব জগতে নব নব রূপে দর্শন দিতে, নব নব রসের আস্বাদন নিতে। নব নব সম্পর্ক পাতাতে। পুনরাবৃত্তি কি ভালো। প্রবাহন তা মনে করে না। কিন্তু কে জানে বুলা হয়তো তার অসমাপ্ত কাজ সারা করার জন্যে আবার সেইখানটিতে আসবে ও সেই হাতে নেবে। তা যদি হয় তবে সে বুলান্তর নয়, সে বুলা। কিন্তু প্রবাহন এ বিষয়ে অজ্ঞ। সে নীরব থাকতে চায়।

বৌদিও এ প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। মনে হয় তিনি আর মা হতে ইচ্ছুক নন। বুলার খাতিরেও না। কেউ নিশ্চয়তা দিলেও না। ও পর্ব চুকে গেছে। বার বার মা হওয়ার পর্ব। কিন্তু মা হওয়ার বয়স তো এখনো যায়নি। তাঁর ইচ্ছা না থাকলেও প্রকৃতির ইচ্ছা থাকতে পারে। মীরা কি পারন প্রকৃতির সঙ্গে এঁটে উঠতে ? কিন্তু এ প্রসঙ্গে প্রবাহন সম্পূর্ণ মৌন। তার লেখনীর মুখ বন্ধ।

আন্দোলনটার সেই প্রচণ্ড বেগ ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসে। নতুন লোক আর যোগ দেয় না। লাঠি চার্জের ভয়ে পেছিয়ে যায়। একা একা গ্রেপ্তার হতেও তেমন উৎসাহ নেই। সামনে 'গণ' বিশেষণটি না বসালে সত্যাগ্রহীরা অনাগ্রহী। এগোলে দলবলে এগোবে, নয়তো আদৌ এগোবে না। যাদের ব্রত 'একলা চল রে' তারা ইতিমধ্যে জেলে গিয়ে বসে আছে

সুতরাং প্রবাহন একটা ছুটিতে কলকাতা ঘুরে আসার অনুমতি পায়। বৌদিকে জানায়। তিনি খুব খুশি হন ও আগের মতো তাঁর অপর এক আত্মীয়ের ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। সে এবার শ্যামবরণের অতিথি হয়। নইলে তিনি রাগ করতেন।

'নতুন স্বর্গ ও নতুন মর্ত্য।' শ্যামবরণ বলেন, 'আগে তো তুমি আমাকে স্বর্গ আর মর্ত্যের ধারণা দাও, তারপরে আমি তোমাকে নূতনত্বের আইডিয়া দেব।'

প্রবাহন বলে, 'যেখানে প্রেম সেখানে ভগবান। যেখানে ভগবান সেখানে স্বর্গ। তেমনি যেখানে জন্ম সেখানে মৃত্যু। যেখানে মৃত্যু সেখানে মর্ত্য। স্বর্গ আর মর্ত্য একই দেশে ও একই কালে বিরাজ করতে পারে। ইহলোক পরলোক বা ইহকাল পরকালের মতো দুই বিভিন্ন দেশে বা কালে অবস্থিত হতে বাধ্য নয়। আমরা মর্ত্যে বাস করেও স্বর্গে বাস করতে পারি, তবে স্বর্গে বাস করেও মর্ত্যে বাস করতে পারি কি না সে বিষয়ে সন্দিহান।'

'হুঁ। তা হলে শেষপর্যন্ত তুমিও সংশয়বাদী। আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু নিঃসন্দেহ

ছিলেন যে স্বর্গের মেয়াদও মর্ত্যের মেয়াদের মতো সসীম। পুণ্যবল ক্ষয় হলে মর্ত্যধামে নেমে আসতে হয়। অবশ্য সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যাঁরা তাঁদের কথা আলাদা। দেবতারা অমর। মানুষ কোনোদিন অমর হবে না। দেবতা হবে না। তাই স্বর্গের অধিকারী হবে না। এসব হলো পুরোনো যুগের পুরোনো আইডিয়া।' শ্যামবরণ ব্যাখ্যা করেন।

'এখন মহেশ্বরী বোনকে আমি লিখি কী। না আদৌ কিছু না লিখে শুধু শুভকামনা জানাব, যেমন জানিয়েছি মীরাকে?' প্রবাহন পরামর্শ চায়।

'লিখতে পারো, স্বর্গমর্ত্যের সেই পুরাতন ধারণা আর আমাদের তৃপ্তি দেয় না। তাই আমরা নতুন করে ভাবছি। কিন্তু মন থেকে সংশয় যাচ্ছে না। সংশয় না গেলে বিশ্বাস কী করে বলিষ্ঠ হবে? বিশ্বাস এক হাতে যা গড়বে সংশয় আরেক হাতে তা ভাঙবে। ভাঙাগড়ার কাটাকুটির পর কী থাকবে, কতটুকু থাকবে কে বলতে পারে? আমাদের অস্তিত্ব তাই দিন আনা দিন খাওয়া। তবে ভগবান যদি মানতে পারো বিজোড়ের জোড় মেলাতে পারবে। আমি কিন্তু মানতে পারছিনে।' শ্যামবরণ অকপটে স্বীকার করেন।

প্রবাহন শুনতে থাকে, তিনি বলে চলেন, 'নতুন নতুন করছ যে নতুনটা সত্যি কোথায়? সেই জন্ম সেই মৃত্যু। সেই ক্ষুধা সেই তৃষা। পৃথিবী যতদিন থাকবে, পৃথিবীতে প্রাণ যতদিন থাকবে ততদিন জন্ম আর মৃত্যু ক্ষুধা আর তৃষা আজকের মতোই থাকবে। তারপর নিবৃত্তি বল, নির্বাণ বল, জন্মান্তর থেকে মুক্তি বল, পাপতাপ থেকে পরিত্রাণ বল, সব কিছু আপনা আপনি হবে, তার জন্যে কাউকে ভজন পূজন সাধন আরাধনা করতে হবে না। ত্যাগ বা তপস্যা করতে হবে না। সূর্য যেই শীতল হয়ে আসবে আমাদের ভিতরে যে ঘোর অগ্নি জ্বলছে সেও অমনি শীতল হয়ে যাবে। বেঁচে থাকলে আমরা সকলেই তখন নিষ্কাম, সকলেরই প্রেম কামগন্ধহীন। আহা, কী অপার্থিব অপ্রাকৃত প্রেম।'

প্রবাহন হাসবে না কাঁদবে। দাদা বলে যান, 'অবশ্য তার যথেষ্ট দেরি আছে। ইতিমধ্যে মানবজাতি তার নূতনত্বের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারবে না। প্রাচীনত্বের মোহও কি কাটাতে পারে। ইউরোপে পাঁচ বছর থেকে এই শিখে এলুম যে মানুষ নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা না হলে বাঁচবে না, অথচ সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড় থেকে পুরাতনের বৃদ্ধটিও নামবে না। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে বার্লিনের নির্মাতাদের ধ্যান ছিল স্প্রে নদীর তীরে অভিনব অ্যাথেন্স গড়ে তোলা? গড়তে গিয়ে দেখা গেল অভিনব অ্যাথেন্স নয়, অভিনব স্পার্টা। তা হলে আমাদের এদেশের কী আশা। গান্ধীজী কত কষ্ট করে অভিনব রামরাজ্য পত্তন করে যাচ্ছেন। সেই ভিতের উপর গড়ে উঠবে

অভিনব কিষ্কিন্ধ্যা।'

'না। না।' প্রবাহন প্রতিবাদ করে। 'তোমার কী হয়েছে বল তো? এই কি রেনেসাঁসের উদ্দীপনী বাণী? দেশের লোককে এই বাণী শোনাবে?'

আসলে হয়েছিল কী, শ্যামবরণদা একশো রকম জিনিস আর আইডিয়া নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও আঁকড়ে ধরবার মতো কোনো কিছু পাচ্ছিলেন না। ভগবানও না, প্রেমও না। নূতন আর পুরাতন ছাড়া চিরন্তন বলে আর একটি কথা আছে। এটি তিনি মানবেন না। মানবেন কী করে। পৃথিবী থাকলে তো। মানবজাতি থাকলে তো। রেনেসাঁসের মানবিকবাদ যার উপর দাঁড়িয়ে সেই নিশ্চিতি থাকলে তো।

মহেশ্বরী বোনকে প্রবাহন শেষপর্যন্ত যা লেখে তার সারকথা নূতনের জন্যে অত বেশী না ভেবে চিরন্তনের কথা ভাবা যাক। কী কী চিরন্তন। অক্ষয় অব্রণ অজর অমর। সত্য আর সৌন্দর্য, আনন্দ আর প্রেম ন্যায় আর নীতি, মঙ্গল আর মুক্তি যদি জয়ী না হয় তবে নতুন মর্ত্য নিয়ে মানুষ করবেই বা কী? আর নতুন স্বর্গ নিয়ে কোন্‌খানে রাখবে?

॥ বারো ॥

রানী বৌদি এবার তাঁর ননদ মল্লিকার অতিথি। সেখানে প্রবাহনের আপ্যায়ন যেমন সাদর তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। মল্লিকা দেবী বলেন, 'আমার বৌদি যখন আপনার অতিথি তখন আপনি ও আমি ভাইবোন।'

'তা হলে আর 'আপনি' বলে পর করে দেন কেন? আমিই যখন ছোট।' প্রবাহন বলে।

কথায় কথায় বৌদি বলেন, 'আমারও ইচ্ছে করে এই আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে আপনার শক্তির পরিচয় দিতে ও পেতে। কিন্তু তা হলে ওঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি। ফরাসীদের উপর ইংরেজদের চাপ পড়বেই।'

প্রবাহন মনে মনে খুশি হয় যে বৌদির মুখে শোক ভিন্ন আর কোনো কথা আছে। ফুর্তি করে বলে, 'তা আপনি যদি কখনো জেলে যেতে চান এমন জায়গায় সত্যাগ্রহ করবেন যেখানে আমি গিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি।'

'বা রে! আমি কি ছাড়া পাবার জন্যেই সত্যাগ্রহ করতে যাব নাকি? আমি চাই সাজা। বেশ কিছুদিনের জন্যে সাজা। তোমার কোর্টে যদি হয় তো একটা কীর্তি থাকে তোমার। বৌদিকে জেলে পুরে বৌকে শেখাবে।' তিনি সহাস্যে বলেন।

'বৌ থাকলে তো শিখবে ?' প্রবাহন কপট আপসোসের স্বরে বলে।

'কেন ? চেষ্টা চলছে না ?' তিনি কৌতূহলী হন।

'চেষ্টা এদিক থেকে নয়। যাঁরা চেষ্টা করছেন তাঁরা বৃথা চেষ্টা করছেন। তাঁদের চোখে আমি একজন সুপাত্র ছাড়া আর কিছু নই। সুপাত্র কুপাত্র হতে কতক্ষণ যদি সত্যাগ্রহীদের সাজা না দিয়ে সরকারের কোপে পড়ি ? যদি বেকার হই ? বিশ্রী লাগে ভাবতে যে স্ত্রীর ভালোবাসাও আমি মানুষটা পাব না। পাবে সেই সুপাত্র, যতদিন সে সুপাত্র থাকে।'

'না, না। এ কী বলছ তুমি !' প্রতিবাদ করেন বৌদি। 'বিয়ে একবার হয়ে গেলে স্ত্রীর ভালোবাসা সুপাত্র কুপাত্রের বাছবিচার করে না। তখন স্বামীকে ভালোবাসা ঠিক ছেলেকে ভালোবাসার মতোই। খোকা বলেই ভালোবাসি, ভালো বলে নয়।'

'তাই নাকি ? তবে তাতেও আমার আপত্তি।' প্রবাহন হেসে বলে, 'স্বামীও আর একটি ছেলে ! ওটা ভালোবাসা হতে পারে, কিন্তু প্রেম নয়। আমি আমাদের দেশের অসংখ্য স্বামীস্ত্রী দেখেছি। ওঁরাও মনে করেন না, আমিও মনে করিনে যে ওঁরা প্রেমিক-প্রেমিকা।'

বৌদি শরমে আরক্ত হন। বলেন, 'প্রেমকে আমাদের গুরুজন লজ্জার বিষয় বলে পরিবারের বাইরে রাখতে চান। স্বামীস্ত্রীর প্রেমও তাঁদের চোখে নির্লজ্জতা।'

এই মনোভাবের বিরুদ্ধেই প্রবাহন কলম ধরেছে। দপ করে জ্বলে উঠে বলে, 'গুণের তবে কোন্ প্রেম ? ভাগবত প্রেম ? কয়েক জন মরমী সাধক হয়তো সে প্রেমের আস্বাদন পেয়েছেন। তাঁরাও কি পরমাত্মাকে কৃষ্ণ ও জীবাত্মাকে রাধা বলে কল্পনা করেননি ? এঁরাও কি নরনারীরূপে লীলা করেননি ? নরনারীপ্রেমের অভিজ্ঞতা যার হয়নি তাঁর ভাগবত প্রেমের আস্বাদন যেন অন্ধের রামধনু দর্শন।'

বৌদির কর্ণমূল আরক্ত হতে আরম্ভ করেছিল। কে জানে কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না। শুনে কী মনে করছে। প্রবাহনটা এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। তিনি একবার কি দু'বার কাশেন। যাতে ওর হুঁশ হয়। না, ওর যা বলবার ও নিঃশেষে বলবেই।

'প্রাচীনকালে প্রেম বলে স্বতন্ত্র একটি শব্দ ছিল না। কাম বলতে প্রেমও বোঝাত। অতি সুন্দর ওই শব্দটি মধ্যযুগে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়। ওর জায়গা নেয় ওরই মতো সুন্দর আর-একটি শব্দ। প্রেম। কিন্তু এই শব্দটির চারদিকে বেড়া দিয়ে লিখে রাখা হয় : 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে'। মানুষ তো তা বলে বৈকুণ্ঠের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি মৃত্যুসাপেক্ষ। তার চেয়ে কম কষ্টকর বৃন্দাবনপ্রাপ্তি। বৃন্দাবন যে কেবল মথুরার কাছেই তা নয়, বৃন্দাবন আমাদের জেলায় জেলায়। গ্রামে গ্রামে। সমাজ তা দেখে বিষম খায়। প্রেম কথাটাই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাই স্বামী স্ত্রীর প্রেমও দোষের।

আমরা আধুনিকরা এই মনোভাব সহ্য করব না। প্রেম বাদ দিলে সাহিত্যের আর কী থাকে? ভালোবাসা?' প্রবাহন আপন মনে বকে যায়।

বৌদি তার ডান হাতের তর্জনীটি মুখে ছুঁইয়ে ইঙ্গিত করেন, চুপ, চুপ। কিন্তু ও কি থামবার ছেলে। ওর তখন ভাব এসেছে। ও ব্যক্ত না করে ছাড়বে না।

'ভালোবাসাও সুন্দর একটি শব্দ। কিন্তু আরো ফিকে। আরো নির্বিশেষ। আমি তো সব মানুষকেই ভালোবাসি। পশুপাখী গাছপালা সাত সমুদ্র তেরো নদী পাহাড়পর্বত চাঁদ তারা কাকে না ভালোবাসি। ভালোবাসি কবিতা ও ইতিহাস, সাঁতার ও টেনিস। এর চারদিকে তেমন কোনো বেড়া নেই। তাই উল্টো বিপত্তি। যখন শুনি কেউ ধানী লঙ্কা ভালোবাসে, কেউ শুঁটকি মাছ, কেউ উচ্ছের সুক্তো বা তেঁতুলের আচার তখন আমি বলি ভালোবাসা শব্দটার জাত গেছে। এ ভাষায় প্রেম প্রকাশ করা যায় না। ভাবনায় পড়েছি। আমার উপন্যাসের নায়কনায়িকা তা হলে কোন্ ভাষায় প্রেম প্রকাশ করবে।' প্রবাহন নিরীহের মতো তাকায়।

বৌদি তক্ষণে সিঁদুরে আম। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে তিনি অন্য বিষয় পাড়েন। 'আচ্ছা, তোমার বন্ধু নিশীথ শুনেছি অবিবাহিত। তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ আসে না?'

'আসবে না? এটা বাংলাদেশ না?' প্রবাহন ফিক করে হেসে বলে, 'কিন্তু আমি গ্রীন সিগনাল না দিলে ওর বিয়ে হবে না।'

বৌদি চমৎকৃত হয়ে বলেন, 'সে কীরকম।'

প্রবাহন একটু একটু করে সুতো ছাড়ে। 'নিশীথের বাবা কনে দেখার ভার আপনার হাতে নিয়েছেন। নিশীথও হাতে বাজী। ওর এত সময় কোথায় যে কলকাতা শহর চষে বেড়াবে? তা ছাড়া ওর যদি পছন্দ হয় আর ওর বাবা যদি না মঞ্জুর করেন তবে বাবার অমতে বিয়ে করা ওর সাধ্য নয়। তার চেয়ে বাবাই পছন্দ করুন, তারপর ওর যদি অমত হয় ও বিয়ে করবে না। অর্থাৎ বিয়ে করবার স্বাধীনতা ওর নেই, কিন্তু বিয়ে না করবার স্বাধীনতা ওর আছে। ওর বাবা এটা ভালো করেই বোঝেন। তাই তিনি এখন আমার সহায়তা চান।' প্রবাহন মুচকি হাসে।

'তোমার সহায়তা।' বৌদি ধাঁধায় পড়েন।

'হাঁ, আমার সহায়তা। তিনি যাকে শেষপর্যন্ত পছন্দ করবেন আমি যদি তাকে দেখে একমত হই তা হলে তাঁর ছেলে আর 'না' বলতে পারবে না। তাঁর সাবস্ত আমার রুচির উপর নিশীথের অপরিসীম আস্থা। কিন্তু আমি যদি তাঁর সঙ্গে একমত না হই তা হলে কী উপায়? তিনি কি মর্মাহত হবেন না? অথচ সেই ভয়ে আমি আমার প্রকৃত মত চাপা দিয়ে তাঁরই সুরে সুর মেলাব? সেটা কি হবে বন্ধুর প্রতি বন্ধুকৃত্য? ও যদি অসুখী হয় আমাকেই তো তার জন্যে দায়ী করবে? যদি টের পায়।' প্রবাহনকে

অসুখী দেখায়।

'এ এক আজব সমস্যা। তোমার যদি সত্য বলার সাহস না থাকে তবে তুমি পেছিয়ে গেলেই পারো। সকলের সব অনুরোধ কি রাখতে পারা যায়?' বৌদি বলেন।

'চক্ষুলজ্জা। তা ছাড়া তিনি যে কেবল পিতৃতুল্য তাই নয়, তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁর দিক থেকে আমার মতো নগণ্য ছেলেমানুষের সহায়তা চাওয়া আমার পক্ষে কত বড়ো সম্মানের! ভেবে দেখুন, আমি একজন রুচিনিপুণ রূপদক্ষ। বিউটি এক্সপার্ট। আমার কাছে এটা যেন একটা কেস। এই কেসটাতে যদি সফল হতে পারি তবে আমার যে প্রসিদ্ধি হবে সেটা কবিপ্রসিদ্ধির চেয়েও লোভনীয়। সেই সুবাদে কত সুন্দর সুন্দর মুখের দেখা পাব। চিনির বলদ যদিও, তবু তো চিনির শতরূপ চিনব।' প্রবাহন কৌতুকের ভান করে।

বৌদি এর উপর মন্তব্য করেন, 'হুঁ। তোমার সহায়তা দেখছি নিঃস্বার্থ নয়। কনে দেখার শখটি ষোল আনা আছে, যদিও নিজের জন্যে নয়।'

সেদিন বিদায়কালে মল্লিকাদি বলেন, 'তুমি আবার কবে আসছ, প্রবাহন? তুমি কি জানো যে তোমার সঙ্গে খেতে বসলে বৌদির অগ্নিমান্দ্য সেরে যায়, উনি খুশি হয়ে খান? না খেয়ে না খেয়ে ওঁর যা চেহারা হয়েছে! আমরা হাজার সাধলেও উনি পেট ভরে খাবেন না। অথচ তোমার সঙ্গে খেতে বসলেই ওঁর রুচি ফিরে আসে। তুমিই কি ওঁর টনিক? যাতে ক্রনিক অগ্নিমান্দ্য সারে।'

প্রবাহন হো হো করে হেসে ওঠে। 'শুনছেন, বৌদি? আমিই কি আপনার টনিক? আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে আপনি আমার উপর খুশি হয়ে খেয়েছেন না রাগ করে খেয়েছেন।'

'তোমার সঙ্গে আমার একরাশ কথা ছিল, বলতেই দিলে না। খুশি হই কী করে? হাঁ, রাগই করেছি। রাগ পড়বে না, যতদিন না আবার দেখা হয়।' তাঁর চোখে জল।

প্রবাহন মাফ চেয়ে বলে, 'এরপর থেকে আমি নীরব শ্রোতা।'

তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। চোখের জল বাধা মানে না। তখন প্রবাহনকে কথা দিতে হয় যে সে যত শীগগির পারে আসবে। তাতেও কি তাঁর চোখের জল বাগ মানে! মল্লিকা বা আর কেউ সেখানে নেই লক্ষ করে প্রবাহন নিজের রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ মুছিয়ে দেয়।

তখন তিনি ধীরে ধীরে তার হাতটি সরিয়ে দেন, কিন্তু রুমালটি কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁর মুখেও হাসির ঝিলিক।

পুত্রশোককে পুত্রের মত লালন করলে চেহারা দিন দিন খারাপ হবেই। প্রবাহন তার কী করতে পারে? তার ভৃঙ্গারে নেই তৃষ্ণার জল। যে অর্থে তিনি চান। সে মুনি

ঋষি বা সাধু সন্ত নয়। মরমী সাধকও নয় সে। তার উপলব্ধিও তেমন গভীর নয়। কোথায় পাবে সেই বাণী যাতে প্রাণ জুড়োয়? সে যে উপন্যাসে হাত দিয়েছে সেটা প্রেমের মুক্তির জন্যে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। জরাব্যাধিমরণের কবলে প্রাণীমাত্রের দশা তাকে অভিভূত করলেও সে আবহমানকালের ওই সব রহস্যময় প্রশ্নের নবতম উত্তর দিতে লেখনী তুলে নেয়নি।

প্রেমও কি তেমনি এক রহস্যময় প্রশ্ন নয়? তেমনি আবহমানকালের? হাঁ, প্রেমও তেমনি এক প্রশ্ন। কিন্তু এখানে তার হয়তো নতুন কিছু বলবার আছে যা আগে কেউ কোনোদিন বলেননি। নারীকে গুরু করে সে তার গুরুদের কাছে যা শিখেছে তা বোধহয় তাকে বলবার অধিকার দিয়েছে। নয়তো সে সাহিত্যের আসরে নামত না। মনে মনে সে তার গুরুদের প্রত্যেককে প্রণতি জানায়। বিশেষ করে মীরাকে ও বিয়াট্রিসকে।

তার খেদ এইজন্যে নয় যে এঁদের সঙ্গে মিলন একদিন না একদিন হতে পারত, হলো না। খেদ এই কারণে যে একটি নারীকে ত্যাগ না করে আর-একটি নারীকে গ্রহণ করা যায় না। আর প্রেমবতী নারীকে ত্যাগ করা তো প্রেমিকের পক্ষে কাপুরুষতা বা নিষ্ঠুরতা। প্রবাহনের বিশ্বাস প্রেমই এ বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রান্ত শক্তি বা প্রভু। গান্ধীজী যেমন বলেন সত্যই ভগবান সেও তেমনি বলে প্রেমই ভগবান।

এ শিক্ষা বিয়াট্রিসের কাছে। যার নাম ভগবান তারই নাম প্রেম, যার নাম প্রেম তারই নাম ভগবান। কখনো যদি সন্দেহ হয় যে এ ভগবান প্রেম নয় তা হলে বুঝতে হবে এ ভগবান ভগবানই নয়। তেমনি কখনো যদি খটকা বাধে যে এ প্রেম ভগবান নয় তা হলে ধরে নিতে হবে এ প্রেম প্রেমই নয়।

বিয়াট্রিস ফী হপ্তায় চিঠি লেখেন। প্রবাহনের জীবনের সেরা সৌভাগ্য তাঁর মতো মহীয়সী নারীর অহেতুক প্রীতি। তাঁর স্বকীয় শিল্পকর্ম সম্বন্ধে, ইউরোপীয় শিল্প সম্বন্ধে, ইংলণ্ডের নিসর্গদৃশ্য সম্বন্ধে কত কথা থাকে তাঁর চিঠিতে। এক একখানি পত্র যেন এক-একখানি রেখাচিত্র। পড়তে পড়তে প্রবাহনের মন উড়ে যায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে।

সেও তাঁকে নিয়মিত চিঠি লিখে যায়। তার সবচেয়ে প্রিয় কৃত্য। তার যেটা রূপময় সত্তা সেটা তাঁর দৃষ্টির বহুদূরে। তার যেটা ভাবময় সত্তা সেটা তাঁর মনের কাছাকাছি। সে তার সৃষ্টির কথা তার কল্পনার কথা তাঁকে লেখনীযোগে শোনায়। আর তার সাহিত্যিক ধ্যানের কথা। প্রবাহনের বিয়াট্রিস যেন দান্তের বিয়াট্রিস। তার জীবনের নেপথ্যে থেকে তার কল্যাণ বিধান করে চলেছেন। তাঁর চোখে ক্ষুদ্র হতে সে লজ্জিত। তাকে উচ্চে উঠতে হবে, মহৎ হতে হবে। তবেই তো সে তাঁর উপযুক্ত হবে।

কিন্তু মানুষের গঠনে মাটি জল বাতাস আর আকাশ যেমন আছে তেমনি আছে আগুন। আছে প্যাশন। সেটাও একটা এলিমেন্ট। দান্তেকেও তার জ্বালায় জ্বলতে হয়েছিল। বিগড়ে যাচ্ছেন দেখে তিনি বিয়ে করেন। সে বিবাহ প্রেমের অনুরোধে নয়। প্রবাহনের আশঙ্কা তার যৌবনজ্বালা অসহন হলে সেও তেমনি বিগড়ে যাবে, কিংবা সেটা এড়াবার জন্যে সেও তেমনি বিয়ে করবে। সে বিবাহ প্রেমসম্পর্করহিত। তা যদি করে তবে দান্তের বেলা যাই হোক তার বেলা সঙ্কট দেখা দেবে। এক নারীকে ত্যাগ না করে আরেক নারীকে গ্রহণ করতে তার বাধবে। কিন্তু এলিমেণ্টাল একদিন প্রবল হবেই।

প্রবাহন নিষ্ঠুর নয়। যৌবন নিষ্ঠুর। সমুদ্রস্নানের সময় এক-একটা ঢেউ আসে, যেন এক-একটা পাহাড়। সে যদি তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে না বসে তবে ঢেউ তাকে উলটিয়ে-পালটিয়ে ডিগবাজি খাইয়ে আধমরা করে আছাড় মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই যে অভিজ্ঞতা এ শুধু সমুদ্রস্নানের নয়। যৌবনজ্বালা সেও এমনি নিষ্ঠুর। মৃত্যুর মতো সেও এমনি এলিমেণ্টাল।

একটু যেন নিরাশ, তা হলেও বিয়াট্রিস বাস্তববাদীর মতো মেনে নিয়েছেন যে প্রবাহন আর কারো প্রেমে পড়বে, আর কাউকে বিয়ে করবে, আর কারো সঙ্গে নীড় বাঁধবে। প্রেমিক থেকে পতি হবে, পতি থেকে পিতা হবে। বিয়াট্রিস যখন তার সঙ্গে অতদূর যেতে অনিচ্ছুক তখন তাকে মুক্তি দিতে তাঁর দ্বিধা নেই। কিন্তু মুক্ত হতে প্রবাহনেরই দ্বিধা। তার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিয়াট্রিস সম্পূর্ণ পর হয়ে যাবেন একথা সে ভাবতেই পারে না। আর বিয়ের আগে তার হৃদয়কে ওঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবেই বা কী করে? ছাড়াছাড়ি এক জিনিস, ছাড়িয়ে আনা আরেক। ছাড়াছাড়ি চূড়ান্ত নয়, ছাড়িয়ে আনা চূড়ান্ত। সেইজন্যে তার অন্তর দ্বিধাশঙ্ক নয়।

প্রবাহনের উপন্যাস রচনাও সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। সে এক কল্পজগৎ। সেখানে সে ভগবানের মতো স্রষ্টা। তার উপরে কেউ মালিক নয়। কিন্তু যতই এগোয় ততই টের পায় যে অদৃশ্য এক মালিক আছে, সে নিরঙ্কুশ নয়। নিরঙ্কুশ হতে অবশ্য কেউ বাধা দিচ্ছে না, কিন্তু নিরঙ্কুশ হলে তার উপন্যাস অনুত্তীর্ণ হবে। উপন্যাসের কতকগুলো নিজস্ব দাবী আছে, তার উপর আছে আর্টের প্রচ্ছন্ন দাবী। এসব যদি সে না মানে তবে সে আখেরে ব্যর্থ হবে।

তা বলে পাঠকপাঠিকার সংস্কারগুলোর প্রতি তার সহানুভূতি নেই। সে বিদ্রোহী লেখক। কিন্তু হেমন্ত মেসোমশায় যখন কাতরস্বরে লেখেন, 'প্রবাহন, তোমার জন্যে আমার হাতে হাতকড়া পড়বে নাকি?' তখন তাকে দু'বার ভাবতে হয়। শালীনতা বা শ্লীলতার নামে যদি সত্যের কণ্ঠরোধ করা হয় তবে সাহিত্যের থেকে লবণ চলে যায়।

সেই আলুনি তরকারি উপাদেয় হতে পারে, কিন্তু তার স্বাদ নষ্ট হয়। সম্পাদকের দোষ কী? দোষ এদেশের ভিক্টোরিয়ান রুচির। ইংরেজ থাকতে রুচির হেরফের আশা করা যায় না। যারা কোনার্ক গড়েছিল, খাজুরাহো গড়েছিল তাদের সন্ততির আজ কী রসবোধ! লালবাজারের লাল সিগনাল অগ্রাহ্য করে সাহিত্যের রাজপথে মোটর চালনা নিরাপদ নয়। মনে মনে জ্বলতে থাকে প্রবাহন। ডি. এইচ. লরেন্স বা জেমস জয়েসের তুলনায় কী-ই বা লিখেছে সে! অমনি সম্পাদকের আর্তনাদ। ভাবে লেখা বন্ধ করে দেবে, কিন্তু ওটা একটা চরমপন্থা।

সে কি ভুলে গেছে যে লরেন্স ও জয়েস দেশান্তরী না হলে লিখতে পারতেন না? লিখলেও প্যারিস বা ইটালী ছাড়া কোথাও প্রকাশ করতে পারতেন না? বাঙালী লেখক দেশান্তরী হলেও হতে পারে, কিন্তু বাংলা রচনা প্যারিস থেকে বা ইটালী থেকে প্রকাশ করা অসম্ভব। বাঙালী লেখককে রানী ভিক্টোরিয়া তথা রানী বৌদির অনুশাসন মানতে হবে।

॥ তেরো ॥

নিশীথ ও প্রবাহন একবাড়ীতে বাস করলেও দু'বেলা গল্প করলেও কেউ কারো হৃদয়ের রহস্য জানত না, জানাত না। ওই একটা বিষয়ে ওরা দু'জনেই মৌন।

কিন্তু একই কারণে নয়। নিশীথের নীরবতা এইজন্যে যে তার বিবাহের স্বাধীনতা নেই, সুতরাং প্রেমের স্বাধীনতা নেই। কোথায় থামতে হয় সে জানে। দুটি একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুসম্পর্ক তারও হয়েছে, কিন্তু সেটা গভীর বা গাঢ় নয়। বন্ধুতা হলেই যে প্রেম পর্যন্ত গড়াবে তাও নয়। তার আগেই সে যবনিকা টেনে দেবে। তার বাবাকে সে বলতে পারবে না যে সে প্রেমে পড়েছে ও বিয়ে করতে চায়। মাকেও না। তাঁরা যে মানুষ হিসাবে কড়া তাও নয়। তবে তাঁরা জাতকুল ইত্যাদি বিষয়ে গোঁড়া।

প্রবাহনের মা নেই। বাবা তাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে যদি ভালোবেসে বিয়ে করতে চায় তিনি একদিক থেকে খুশিই হবেন যে ছেলে সংসারী হয়েছে, কেননা ছেলে তাঁকে বুঝতে দিয়েছে যে সে সংসারী হবে না। সংসারী না হওয়া মানে তো সন্ন্যাসী হওয়া। তাতে তাঁর দারুণ ভাবনা। সংসারী না হওয়া বলতে যে বোহিমিয়ান হওয়াও বোঝায় এটা তাঁর কল্পনার বাইরে।

'তোমার মনে আছে, নিশীথ, সেবারকার সঙ্কট?' প্রবাহন একদিন নিশীথের কাছে

মন খোলে। সেদিন সে রীতিমতো উদ্বেগ বোধ করছিল। 'সেই যেবার রেলপথ বন্যায় ভেসে যায়। কলকাতায় তোমার সঙ্গে যোগ দিতে না পেরে সরাসরি বম্বে গিয়ে জাহাজ ধরি। যাত্রার মুখে দেখি গুরুতর উদরাময়। বার বার ট্রেন বদল করতে করতে মারা যাব। গ্রীক নাটকের এক সঙ্কটমুহূর্তে উদ্ধারের আর কোনো মানবিক উপায় না থাকলে অকস্মাৎ আসমান থেকে নেমে আসতেন এক দেবতা। তেমনি আমার বেলা। তাঁর কল্যাণহস্ত ও করুণাদৃষ্টি আমাকে দু'দিনের মধ্যে সারিয়ে তোলে। যেন এইজন্যেই তিনি দেখা দেন ও কাজ সারা হলে অদৃশ্য হয়ে যান। বিলেত থেকে ফেরার পর আকস্মিক-ভাবে আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এখন আমার ভয় হচ্ছে যে তাঁর চেহারা দিন দিন যা হচ্ছে সময়মতো সারিয়ে না তুললে কঠিন কোনো অসুখে ধরবে।'

নিশীথ পরিহাস করে বলে, 'এবার তা হলে তুমিই তাঁকে সারিয়ে তুলতে চাও?'

ওর কাছে সহানুভূতি না পেয়ে প্রবাহন চিঠির কাগজ নিয়ে বসে ও লেখে, 'আমার সঙ্কটক্ষণে যে দেবী আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে সারিয়ে তোলেন তাঁর নিজের অসুখ বিসুখ হলে আমার কর্তব্য কি নয় তাঁর শুশ্রূষা করা? কিন্তু তিনি কোথায় আর আমি কোথায়!'

'সেদিন আকাশ হতে যিনি অবতীর্ণ হন তিনি দেবী নন, তিনি দেবদূত।' সারিণীর উত্তর। 'ভেবে দেখ আমার মনের অবস্থা যখন শুনি হাওড়া যাত্রীদের দাক্ষিণাত্য ঘুরে যেতে হবে। তাতে চারদিন চার রাত লাগবে। অনেকেই পুরী ফিরে যান। আমি কিন্তু পিছু হটিনে। আমার নিয়তি যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলে আমার মেজ ছেলের রোগশয্যায়। দক্ষিণের ট্রেনে উঠে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কম্পমান। কখনো ওদিকে যাইনি, ওদের ভাষা বুঝিনে, কে জানে পথে কী বিপদ ঘটে। কলকাতা থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যে আমাকে বা আমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে আপনার লোক ছুটে আসতে পারে না। ভরসা তো সরকারবাবু। তিনি আমার চেয়েও ভীতু। এমন সময় তোমার আবির্ভাব। তুমি কি জানতে আমাকে তুমি কতখানি নির্ভরতা দিলে!'

তিনি আবো লেখেন, 'তুমি আমাকে সারিণী বলে ডেকেছ, কিন্তু তোমার সারিণীর কী হয়েছে যে তুমি তাকে সারাতে যাবে? চেহারা দিন দিন খারাপ হচ্ছে শুনি। সেটা কিন্তু অসুখ থেকে নাও হতে পারে। তুমি কবি। কবিরাজ নও। কবিরাজী করতে যেয়ো না। পারো তো একটুখানি সঙ্গ দিয়ো। যখন তোমার খুশি।'

'একটুখানি সঙ্গ!' হায়, সারিণী। প্রবাহন কি চাইলেই ছুটি পেতে পারে! সে যে রাজকর্মচারী। বন্ধুজনের আতিথ্য কি যখন তখন নেওয়া যায়!

তা ছাড়া ছুটি জমিয়ে রাখলে একদিন সে আবার বিলেত যেতে পারে। সেখানে আছেন বিয়াট্রিস। তিনি এখনো তার পথ চেয়ে বসে আছেন। থাকবেন অনির্দিষ্টকাল।

হয়তো আজীবন। প্রবাহনের প্রেম যেমন চপল তাঁর প্রেম তেমনি অচপল। চলবিদ্যুৎ আর স্থিরবিদ্যুৎ। প্রবাহন মনে মনে তাঁর প্রেমের মহিমা স্বীকার করে। যদিও তাঁর অনুসরণ করতে পারে না। সে চায় তৃষ্ণার জল। তার এই অন্বেষণে বিয়াট্রিস তার সাথী নন।

ওদিকে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও বন্ধুপত্নী সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছেন। জয়ন্তদা ও ইলাদির জন্যে তার মন কেমন করে। এতবার কলকাতা যায়, কোনোবার প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়ে জয়ন্তদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতে পারে না। সে সাহসই তার নেই। পাছে সরকার কিছু মনে করেন। জয়ন্তদার সঙ্গে চিঠিপত্রও তার বিরুদ্ধে যেতে পারে। চাকরির এই দিকটাই বিশ্রী। এই নৈতিক কাপুরুষতা। বন্ধুকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে শঙ্কা। অপরপক্ষে জয়ন্তদাও বিব্রত বোধ করতে পারেন। শত্রুপক্ষের লোক তাঁর কাছে যায় কেন? দেশদ্রোহীর সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ছেঁকে ধরলে তিনি কী জবাবদিহি করবেন? বন্ধুতা? বন্ধুতাই এ সংগ্রামের প্রথম ক্যাজুয়ালটি।

দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এটা নিরেট সত্য। এক শিবিরে জয়ন্তদা, ইলাদি, মীরা প্রভৃতি সত্যাগ্রহী। অপর শিবিরে প্রবাহন, নিশীথ, সুনন্দ প্রভৃতি সরকারী কর্মচারী। হাঁ, সুনন্দও ইতিমধ্যে সরকারী চাকরি নিয়েছে। চাকরি জুটতে না জুটতেই বিয়ে। প্রেমে পড়ে নয়, দেখেশুনে।

ব্যর্থপ্রেমের যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি কে চায়? দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়তে সুনন্দর আগ্রহ ছিল না। মফঃস্বলের ছোট শহরে একক বাস করাও তার কাছে শ্বাসরোধকর। শরীরও তার দাবী জানায় সেবাযত্নের। তথা যৌবনসুখের। না, সুনন্দকে দোষ দেওয়া যায় না। প্রেমের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তার চেহারা হয়েছে সমুদ্রস্নানের সময় তরঙ্গতাড়িতের মতো। বন্ধুর বিয়েতে প্রবাহন সানন্দে যোগ দেয় ও সেইসূত্রে কলকাতা যায়।

'এইবার তোমার পালা।' মন্তব্য করেন শ্যামবরণদা। যাঁর অতিথি সে।

'ক্ষেপেছ!' প্রবাহন বলে, 'সমুদ্রস্নানের সময় আমি কতবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি, তবু সমুদ্র ছেড়ে কলের জলে স্নান করিনি। বার বার প্রেমে পড়ব, বার বার কাঁদাব ও কাঁদব। তবু হার মানব না।'

'ওকথা তুমি বলতে পারতে ওদেশে। কিন্তু এদেশে তোমার সংকল্পের জোর থাকবে না। মেয়ে কোথায় যে তুমি প্রেমে পড়বে? যাদের সঙ্গে বয়সের মিল হতো তাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এখন যারা আছে তাদের বয়স এত কম যে খুকুরানী বললেও চলে। ওই বিধবা কিংবা সধবা পেতে পারো, যার সঙ্গে বিয়ে এদেশের রীতি নয়।' শ্যামদা হাসেন।

'কিন্তু কেউ যদি তোমার প্রেমে পড়ে তবে তুমি ঠেকাবে কী করে? বিধবা কিংবা সধবা বলে কি তার প্রেমের মহিমা কিছু কম? রাধার প্রেম যে সাধ্যশিরোমণি এটা

কোন্ দেশের কথা ?' প্রবাহন চেপে ধরে।

'তা হলেও তুমি স্বীকার করবে যে রাধাকৃষ্ণের বিয়ে সম্ভব ছিল না। এখনো নয়। প্রেম যদি হয় প্রেমের জন্যে তবে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে যদি জুড়ে দিতে চাও তা হলে তোমাকে হয় দেশ ছাড়তে হবে, নয় সমাজ ছাড়তে হবে। ব্রাহ্ম হতে রাজী আছো? যাবে আমার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী? ওঁরাও সুখী হবেন।' দাদা দীর্ঘশ্বাসভাবে বলেন।

প্রবাহন অনেকক্ষণ নীরব থাকে। তারপর বলে, 'ব্রাহ্ম মেয়ের প্রেমও আমি পেয়েছি, শ্যামদা।'

'বুঝেছি। সমাজ ছাড়তে বেধেছে।' তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বলেন।

'দূর! সাড়া দিতে পারিনি। হৃদয় জোড়া ছিল বলে।' প্রবাহন দুঃখিত হয়।

'হুঁ। সম্ভবকে দুই পায়ে ঠেলে অসম্ভবের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছ। সে ধরা দেয়নি। এখন পস্তাও।' তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েন।

এরপরে ওরা সাহিত্যের প্রসঙ্গে যায় ও ফরাসী ঔপন্যাসিক জুল রমাঁর নতুন উপন্যাস নিয়ে মেতে ওঠে। রম্যাঁ নাকি তাঁর উপন্যাস বিশ খণ্ডে সমাপ্ত করবেন। তখনো তিনি ১৯১৪ সালে। মহাযুদ্ধের প্রাককালে। বাঙালী লেখকেরা কেউ কেন বিশ খণ্ডের উপন্যাস লেখেন না? অষ্টাদশ পর্বের না হোক সাতকাণ্ডের?

'লিখতে চাইলে লিখতে দিচ্ছে কে?' শ্যামবরণদা আপসোস করেন। 'লক্ষ করনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তিনপুরুষ' শুরু করে হালে পানী পেলেন না, 'যোগাযোগ' নাম দিয়ে একখণ্ডেই দাঁড়ি টেনে দিলেন? দেশ প্রস্তুত নয়, পাঠক প্রস্তুত নয়। বিশেষত পাঠিকারা প্রস্তুত নন। আর তাঁরাই তো আমাদের দেশের উপন্যাসকারদের পেট্রন।'

এই যেমন বর্ণী বৌদি। প্রবাহন তাঁকে খবর দিয়ে রেখেছিল। যথাকালে গাড়ী এসে দাঁড়ায়। কলকাতায় তাঁর বাড়ীর অভাব হয় না, তেমনি গাড়ীর। এবারেও তিনি মল্লিকার ওখানে। বলতে নেই, এবার তাঁকে একটু যেন ভালো দেখাচ্ছে। তাঁর চেহারার সেই শীর্ণ শুষ্ক ভাবটা আর নেই।

প্রবাহন এবার মনঃস্থির করে এসেছিল যে সে বৌদিকে একটানা বলতে দেবে, যতক্ষণ না তাঁর বলার সাধ মেটে। নিজে বিশেষ কিছু বলবে না।

'কী একরাশ কথা ছিল, বৌদি, তোমার?' সে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'ছিল বইকি। কিন্তু তোমাকে দেখলে আমার সেসব কথা মনে আসতে চায় না। তুমি চুপ করে বসে থাক। আমিও চুপ করে তোমাকে দেখি। দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী। কিন্তু আকাশে একফোঁটা জল নেই। চোখের জলও বুঝি শুকিয়ে গেছে। এত কেঁদেছি যে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কান্না! কান্না! কান্না! প্রায় তিন বছর

হতে চলল। দু'চোখের সব জল গড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। যেন আমাকে নিংড়ে নিয়েছে। চেষ্টা করলেও আর আমি কাঁদতে পারিনে।' বৌদি একখানা পাখা হাতে নিয়ে ঠাকুরপোকে বাতাস করেন। যদিও বনবন করে ফ্যান ঘুরছিল মাথার উপর।

প্রবাহন মৌন শ্রোতা। একদৃষ্টে চেয়ে দেখে তাঁর চোখ যেন বৃষ্টিধোওয়া আকাশ। মুখে একটা বিদ্রোহের আভাসও লক্ষণীয়।

'মানুষের জীবন। আজ আছে, কাল নেই। আমিই বা আর কদ্দিন। কেন তবে কাঁদতে কাঁদতে কাহিল হয়ে যাই? খালি কর্তব্য আর কর্তব্য। আমারও কি সাধ আহ্লাদ নেই? কেন আমি থিয়েটারে সিনেমায় যাব না? চিত্রপ্রদর্শনী দেখব না? আসরে বা জলসায় মার্গসঙ্গীত শুনব না? রেস্টোরান্টে বসে ভালোমন্দ খাব না?'—তিনি বলে যান।

প্রবাহন ততক্ষণে ভোজনরত। কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'ভালো মন্দ নয়, ভালোই খাবে। বল তো তোমাকে চাইনীজে নিয়ে যাই। চীনারা খায় না হেন জীব নেই, কিন্তু খাওয়ায় ভালো।'

বৌদি 'বাঃ! বাঃ!' করে ওঠেন। তারপরে বলেন, 'কারুর যদি কোনো অনিষ্ট না হয় তা হলে একটু আধটু সুখ পাব না কেন, শুনি? ভগবান কি কেবল দুঃখই দেবেন? সুখ দেবেন না? যত হাসি তত কান্না। যত কান্না তত হাসি নয়? এত কান্নার পর আমার মুখে যদি একটু হাসি ফোটে তবে এ জগতের ক্ষতি কার।'

প্রবাহন তাঁর এই পরিবর্তনে মহাখুশি হয়েছিল। কিন্তু কে জানে হয়তো এটা পাকা রং নয়। ধোপে টিকবে না। তাই সন্তর্পণে বলে, 'হুঁ। ক্ষতি কার। তবু কাজ কী সকলের সামনে হেসে! তুমি শুধু আমাকেই একটু হাসির ভাগ দিয়ো।'

তিনি তেমনি গম্ভীরভাবে বলে যান, 'তুমি বুঝলে না, ঠাকুরপো। হাসতে আমাকে কেউ মানা করেনি। ভিতর থেকেই বাধা পাই। যার অমন চাঁদের মতো ছেলে চলে গেল সে কোন্ মুখে হাসবে। তার সারাজীবন কাঁদাই তো ভালো। কিন্তু জীবনের সবটাই যদি কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায় তবে আর কবে হাসব! আর ক'টা দিনই বা আছে।'

'ষাট, ষাট!' প্রবাহন তেড়ে ওঠে। 'তুমি অনেকদিন বাঁচবে। তুমি কি মনে করেছ আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুমি ওপারে গিয়ে একাই স্বর্গসুখ ভোগ করবে। তোমাকে আমরা নজরবন্দী করে রাখব, বৌদি।'

'ওমা, তাই নাকি?' তিনি আতঙ্কের ভান করেন। 'তোমরা আমাকে কী দিয়ে বেঁধে রাখবে? বেড়ী দিয়ে?'

'কতরকম বাঁধন আছে। যা বেড়ীর চেয়েও শক্ত।' প্রবাহন রহস্যময় করে বলে।

'জানি। ওসব মায়ার বাঁধন। কে ওতে ভোলে।' তিনি তাচ্ছিল্য করেন।

'তোমার দেখার অনেক বাকী আছে, বৌদি। সময় থাকতে দেখে নাও। যার জন্যে তোমাকে এ জীবন দেওয়া হয়েছে।' প্রবাহন আবেগের সঙ্গে বলে।

'তা হলে তুমি আমাকে বাঁচতে বল? বাঁচতে ও দেখতে ও সুখ পেতে? তা হলে আমি পরকালের কথা না ভেবে ইহকালের কথাই ভাবব? কারুর কোনো অনিষ্ট হবে না তো? ঠিক জানো?' বৌদি একনিঃশ্বাসে বলে যান।

'ঠিক জানি। একটি পিঁপড়েরও অনিষ্ট হবে না। পরকালের কথা পরকাল ভাববে। যতদিন ইহলোকে আছো ততদিন ইহলোকের মাধুরী ভোগ কর।' প্রবাহন উৎসাহ দেয়।

তাঁর মুখ অপূর্ব আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়। তিনি ওর দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকেন। কী যেন বলতে চান, ব্যক্ত করতে চান। পারেন না। প্রবাহনও তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকায়। নতুন কিছু বলার নেই ওর।

ওটি এমন একটি মুহূর্ত যখন মুখের ভাষার চেয়ে মনের ভাষা মুখর। মনের ভাষায় ভাব বিনিময় হয়ে যায়। সারিণী যেন প্রবাহনকে বলেন, কী যে তৃপ্তি পেলুম। আর প্রবাহন যেন সারিণীকে বলে, এইবার সেরে ওঠ। আর কষ্ট ভুগবে! সারিণী আশ্বাস দেন, না, আর ভুগব না। প্রবাহন অনুরোধ করে, তা হলে একটু হাসি ফুটুক।

সেবার চোখের জলে বিদায়। এবার হাসিমুখে। বৌদি বলেন, 'তোমাকে দেখলেই হাসি পায় কেন বল তো?'

মল্লিকা এর উত্তর দেন. 'ও যেখানেই যায় সেখানেই হাসি বয়ে নিয়ে যায়। হাসির পসারী। সেইজন্যেই তো ওকে এত করে বলি, আবার এসো।'

॥ চোদ্দ ॥

কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে প্রবাহন আইনের কেতাব খুলে বসে। এর পরের পরীক্ষাটা রাজস্ব আইনের। অথচ কিছুই তার মনে থাকে না। এত জটিল যে মাথায় ঢোকে না। অপরের সাহায্য নিতে হয়। নিশীথ সেদিক থেকে নায়েক।

এমনি দশরকম ভাবনা ও কাজ নিয়ে ব্যাপৃত ছিল সে। প্রত্যাশা করেনি সারিণীর চিঠি। চিঠিখানি ছোট্ট। 'তোমাকে এতবার স্বপ্ন দেখছি কেন? ভালো আছো তো? এক লাইন লিখে উদ্বেগ দূর কোরো।'

স্বপ্ন দেখার খবরে সে খুব আমোদ পায়। কিন্তু ভালো থাকা না থাকার সঙ্গে ওর

কী সম্পর্ক ? না, তার কোনো অসুখ বিসুখ করেনি। তার আক্ষেপ শুধু এই যে মুখার্জি তাকে টেনিসে ও বিলিয়ার্ডসে প্রথম কয়েকটা শট ছেড়ে দিয়েও আখেরে হারিয়ে দেন। সে তার দ্বিগুণবয়সীকেও খেলায় জব্দ করতে পারে না। তবে তার যৌবনের জাঁক কিসের ? নিশীথও সেই প্রৌঢ়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

এক একদিন তিনি গল্পের মেজাজে থাকেন। তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। আশ্চর্য আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ভগবান আছেন কি না তিনি জানেন না, কিন্তু একটা কোনো অচেনা অজানা 'পাওয়ার' আছে যার হস্তক্ষেপ তাঁর জীবনরক্ষা করেছে। অথচ তিনি প্রার্থনাও করেননি বা করেন না। অল্পবয়সে স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে তেরো চোদ্দ বছর নিঃসঙ্গ ছিলেন। তার পরে যার আদেশ অমান্য করতে পারেন না, আবার সংসারী হন। কিন্তু নির্লিপ্ত। মৃত্যুভয় তাঁর এতটুকুও নেই। আজ যদি মরণ হয় বিনা-বাক্যে মাথা নত করে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন।

একদিন মুখার্জির কাছে গিয়ে ক্যাজুয়াল লীভ চাইতে হয় দুই বন্ধুকে। নিশীথকে কলকাতা যেতে হবে, তার সঙ্গে প্রবাহনকেও। কারণটা ভেঙে বলতে লজ্জা করে, কিন্তু শুধু দরকার আছে বললেই ক্যাজুয়াল লীভ মেলে না। তাই ঝুলির ভিতর থেকে বেড়াল বেরোয়। নিশীথের বাবা অধ্যাপক পাকড়াশির চিঠি। পাকা দেবার আগে নিশীথের মত জানা আবশ্যক, ততোধিক আবশ্যক প্রবাহনের অভিমত। মুখার্জি একগাল হেসে বলেন, 'ওঃ এই কথা ! আচ্ছা, আপনারা শনিবার আদালতে গিয়ে ডায়েরি সই করে বাকী কাজগুলো মুলতুবি রেখে দুপুরের ট্রেন ধরে কলকাতা চলে যেতে পারেন। আমি অনুমতি দিলুম। ক্যাজুয়াল লীভ অযথা নষ্ট না করাই ভালো। কখন কী গুরুতর প্রয়োজন হয় ! হাঁ, সোমবার সকালের মধ্যে ফিরে আসা চাই। গুড লাক, প্যাকরাশি।'

অধ্যাপক পাকড়াশি প্রবাহনকে পেয়ে বর্তে যান। 'বাঁচালে, প্রবাহন। আমি তো এক রকম পাকা কথা দিয়েই ফেলছিলুম, এত ভালো লাগল মেয়েটিকে দেখে। এই ক'মাসে কিছু না হোক দু'শো মেয়ে দেখেছি। তোমরা কেউ বলতে পারবে না যে আমি বহুদর্শী নই। একটা না একটা খুঁত বেরিয়ে পড়ে আর অমনি এককথায় ডিসমিস করি। রূপে বিদ্যাধরী যদি হয় তো পেটে বিদ্যা নেই। বিদ্যায় সরস্বতী যদি হয় তো রূপে চলনসইও নয়। কেউ বরের চেয়ে মাথায় বড়ো। কেউ তার চেয়ে আধ হাত খাটো। কেউ বেশী রকম অভিজাত ঘরের। কেউ নেহাৎ ভুঁইফোঁড় পরিবারের। বিশ্বাস কর, টাকার দিকটা আমি একবারও ভাবিনি। বড়লোকের প্রলোভনে ভুলিনি। বড়লোকের নন্দিনী কি আমাকে শ্রদ্ধা করবে, না তোমার মাসিমাকে মানবে।'

মাসিমা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেন, 'বিয়েটা কার তাই বুঝতে পারছিনে। ছেলের না ছেলের বাপের। তোমরা দু'জনে গিয়ে আজকেই এ রফা শেষ করে

দিয়ে এসো।'

ও বাড়ীতে যেতেই অভ্যর্থনার ধুম পড়ে যায়। অধ্যাপক ও অধ্যাপকপুত্রের চেয়ে প্রবাহনেরই সমাদর বেশী। যেটা সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটা মেসোমশায় উল্লেখই করেননি। মা বাবা ভাই বোন সবাই মিলে একটি চমৎকার মণ্ডলী। সবাইকে ওর ভালো লেগে যায়। এখন ওর একমাত্র আশঙ্কা নিশীথ যদি কোনো একটা খুঁত খুঁজে পায়।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, মিষ্টুনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই নিশীথ একেবারে জমে যায়। ও মনে মনে চেয়েছিল সঙ্গিনী। যার সঙ্গে কথা বলে ইনটেলেকচুয়াল তৃপ্তি পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে চেয়েছিল মধুর মনোহর স্বভাব। যার সঙ্গে ঝগড়া বাধবে না। নিশীথের মুখ দেখে অনুমান করা যায় ওর পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ওকে পছন্দ হয়েছে কি না কে বলবে।

প্রবাহনকে অন্তরালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মিষ্টুনীর বাবা শচীনবাবু বলেন, 'মিস্টার করগুপ্ত, এখন আপনার একটি 'হাঁ' কি 'না'র উপর এবাড়ীর ভাগ্য নির্ভর করছে।'

নিশীথের সঙ্গে পরামর্শ না করে সে কোন্ অধিকারে সেই একটি কথা বলবে? সে আশ্বাস দেয় যে সে তার যথাসাধ্য করবে। তখন তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। মিষ্টুনীর মা মহামায়া দেবী বলেন, 'আপনি শুধু ওঁদের নন, আপনি আমাদেরও আপনার লোক। আপনার লেখা আমরাও পড়ি। একটু দেখবেন।'

হেমন্ত মেসোমশায়ের কথা মনে পড়ে যায়। বিয়ে করতে হলে কেবল বৌভাগ্য নয়, শালীভাগ্য বিবেচনা করতে হয়। নিশীথের শালীসম্পদ অসাধারণ। আর ভাববার কী আছে? 'হাঁ' বলে দিলেই ধাঁ করে বিয়ে হয়ে যায়।

অধ্যাপক পাকড়াশি প্রবাহনকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে পাশে বসান। সে মোটরে আর কেউ ওঠে না। তিনি জানতে চান তার খোলাখুলি মতামত। সে তো নিশীথের সঙ্গে ভাববিনিময় না করে 'হাঁ' 'না' বলতে পারে না। নিশীথ যদি অপরাধ নেয়। শেষকালে বন্ধুতে বন্ধুতে এই নিয়ে মনোমালিন্য।

প্রবাহন বলে, 'আচ্ছা, জাত না হয় মানলেন, কিন্তু রাঢ়ী শ্রেণীতে খোঁজ করেছেন কি? মনোনয়নের আরো প্রশস্ত পরিসর পেতেন।'

'আরে, তা কি কখনো হয়।' পাকড়াশি চমকে ওঠেন। 'আমাদের কত বড়ো ঐতিহ্য। আমরা রানী ভবানীর স্বজন। আমরা কি আমাদের বারেন্দ্র আইডেনটিটি বিলুপ্ত হতে দিতে পারি! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ! কী যে বল, প্রবাহন!'

এরই নাম ভারতবর্ষ। এই দেশ হবে স্বাধীন। এই দেশ হবে সবল। হবে মহান। দু'চারজন গান্ধী রবীন্দ্রনাথ নিয়েই যেন দেশ। এসব বেড়া ইংরেজের সৃষ্টি নয়। ভাঙতে

হলে আমাদেরই ভাঙতে হবে। কিন্তু কবে? স্বাধীনতার পরে না আগে? প্রবাহনের মতে এর যত দেরি হবে স্বাধীনতারও তত দেরি।

নিশীথের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় আবার যখন দেখা হয় তার উজ্জ্বল মুখভাব বিনি কথায় বলে, হাঁ। তখন প্রবাহন গিয়ে মেসোমশায় ও মাসিমাকে জানায়, হাঁ। মেসোমশায় তখন ছুটে গিয়ে টেলিফোনে জানান, হাঁ।

'প্রবাহনদা, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন।' ছোট বোন ঘুঁই এসে খবর দেয়।

প্রবাহন বুঝতে পারে না কে। রিসিভার তুলে নিতেই খিল খিল হাসির আওয়াজ আসে। নিশীথের শালী বাহিনীর। তাদেরি একজন বলে, 'মিষ্টুনী আপনাকে মিষ্টান্ন খাওয়াতে চায়। কবে আপনার সময় হবে? খোকাবাবুটিকেও সঙ্গে আনতে হবে।'

প্রবাহন দুষ্টুমি করে বলে, 'কই, মিষ্টুনী দেবী তো আমাকে জানাননি যে আমার নাবালক ভাইটিকে ওঁর পছন্দ হয়েছে। ওর ধারণা ওর কেসটা হোপলেস।'

ওরা সবাই মিলে মিষ্টুনীকে ধরে নিয়ে এসে টেলিফোন ধরিয়ে দেয়। কী যে বলতে চান ওই কন্যা তা প্রবাহনের দুর্বোধ্য। নিশীথকে ধরে আনা হয় ইন্টারপ্রেট করার জন্যে। ওরা দু'জনে আবার জমে যায়। প্রবাহন পেছন থেকে নিশীথকে খোঁচায়। মিষ্টুনীকে দিয়ে ও যেন বলিয়ে নেয় যে, হাঁ, ওকে পছন্দ হয়েছে।

প্রবাহন কিন্তু মিষ্টুনীর মিষ্টান্নের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে না। ওদিকে মল্লিকাদির নিমন্ত্রণ ছিল। হাঁ, রবিবার গাড়ী পাঠিয়ে চন্দননগর থেকে বৌদিকে আনিয়ে নেওয়া হবে স্থির হয়েছিল।

দেখা হতেই সারিণী বলেন, 'আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'না তো।' প্রবাহন বলে, 'নতুন কোনো চিঠি পাইনি তো।'

'তা হলে ফিরে গিয়ে পাবে। তোমার কাছে মিনতি, ওটা তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো। ইচ্ছে করলে পুড়িয়ে ফেলতেও পারো।' তিনি চুপি চুপি বলেন।

'কেন, কী হয়েছে?' প্রবাহন অবাক হয়।

'কিছুই হয়নি। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখে তার বৃত্তান্ত তোমাকে লিখেছি। স্বপ্ন তো আর সত্যি নয়। তা হলেও কে জানে কে কী মনে করবে।' তিনি ত্রস্ত হন।

'আর কারো হাতে পড়লে তো? তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি আর কাউকে পড়তে দেব না। যার চিঠি সেই পড়বে।' প্রবাহন আশ্বাস দেয়।

'কিন্তু যার চিঠি সে যদি কিছু মনে করে?' তাঁর নয়নে ত্রাস।

'সে কেন কিছু মনে করবে? স্বপ্ন তো আর সত্যি নয়।' প্রবাহন পুনরুক্তি করে।

'নয়ই তো। তবু ভয় করে। তুমি যদি ভুল বোঝ।' তাঁর মনে শঙ্কা।

'আচ্ছা, তা হলে তোমার চিঠি আমি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেব, আর নয়তো না

খুলেই ফেরৎ পাঠাব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, বৌদি।' প্রবাহন শঙ্কামোচন করে।

তিনি তা শুনে পুলকিত হন না। বলেন, 'তা কি হয়। যে চিঠি একবার ডাকে দেওয়া হয়ে গেছে সে চিঠি আর আমার সম্পত্তি নয়। তোমার সম্পত্তি। তুমি ওটা একবার খুলে দেখবে না তা কি হয়।'

প্রবাহন হাসি চাপতে পারে না। বলে, 'খুলে দেখব, কিন্তু পড়ব না। যখন লেখিকার ইচ্ছে নয় যে পড়ি।'

তিনিও হেসে ফেলেন। 'দেখি কেমন না পড়ে থাকতে পারো।'

নিশীথের পছন্দ হয়েছে শুনে তিনি উল্লসিত হন। 'মেয়েটি দেখতে শুনতে কেমন?'

'দেখতে সুশ্রী। শুনতে মিষ্টি। গ্রাজুয়েট, সুতরাং সঙ্গিনী হিসাবে সুখকর। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা নিশীথ যদি কোনোদিন নভেল লিখতে চায় তো শক্তিশালী নভেলিস্ট হবে। পাঁচখানি নভেলের নায়িকারা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পিরান্দেল্লোর সেই নাটকের মতো ছ'টি নয় পাঁচটি চরিত্র একটি গ্রন্থকারের সন্ধানে।' প্রবাহন গম্ভীর-ভাবে বলে।

'ওঃ। তোমার জিবে জল আসছে বুঝি। তা তুমি ইচ্ছে করলে ওদের একটিকে বিয়ে করলেই পারো। তা হলে হবে দরে সেইসংখ্যক নায়িকাচরিত্র পাবে। পাঁচজনের পাঁচালী লিখবে। আমরাও পড়ে ধন্য হব।' বৌদি কৌতুক করেন।

প্রবাহন ফরাসী ভঙ্গীতে কাঁধ উঁচু করে বলে, 'এদেশে সকলের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক পাতানো যায়, কিন্তু বিয়ের বেলা জাত কুল শ্রেণী এসে মোহভঙ্গ ঘটায়। আমি দুটিমাত্র জাতি মানি। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি। সেইজন্যে আমার এত লাগে। মাঝে মাঝে পাগল করে দেয় এই চিন্তা যে কোনোদিন যদি তার সাক্ষাৎ পাই যে আমার তৃষ্ণার জল ও যার আমি তৃষ্ণার জল তবে জাত কুল শ্রেণী এসে মাঝখানে দাঁড়াবে।'

বৌদির চোখে সমবেদনার মেঘ। মুখ অন্ধকার হয়ে আসে।

কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে প্রবাহন তার জমে থাকা ডাকের মধ্যে বৌদির চিঠি-খানি পায়। খুলবে কি খুলবে না করতে করতে খোলে। পড়বে কি পড়বে না করতে করতে পড়ে। পড়তে পড়তে ওর মাথা ঘোরে। ও বুক চেপে ধরে।

ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা হাজার হাজার বছর পরে চোখ মেলে দেখেন অচেনা অজানা এক রাজপুত্র তাঁর শয্যার পাশে সোনার কাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। দু'জনের কারো চোখে পলক পড়ে না। কারো মুখে কথা জোগায় না। কত যুগ ঐভাবে কেটে যায়। তারপরে রাজকন্যা ইঙ্গিত করেন বসতে। রাজপুত্র শয্যার ধারে বসেন। রাজকন্যা একটি হাত বাড়িয়ে দেন ধরতে। রাজপুত্র একটি হাত দিয়ে ধরেন। সেইভাবে কত যুগ কেটে যায়। তারপরে রাজকন্যা তাঁর গলার হার খুলে রাজপুত্রকে দেন। রাজপুত্র পরেন। রাজপুত্রের

গলার হার তিনি রাজকন্যার গলায় পরিয়ে দেন। তারপরে কখন একসময় দু'জনের অধর দু'জনের অধর অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু তৃষ্ণার জল পান করার আগেই স্বপ্নভঙ্গ হয়। ততক্ষণে রাজকন্যার মনে পড়েছে যে এই রাজপুত্রের সঙ্গে পূর্বে একবার তিনি পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। রাজপুত্র চলে যান সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। আর রাজকন্যা রুপোর কাঠির ছোঁয়া লেগে ঘুমিয়ে পড়েন।

॥ পনেরো ॥

প্রেম, তুমি চাইতে ও না চাইতে বিভিন্ন নামরূপ ধরে এসেছ। প্রেমকে জাগিয়েছ। প্রেমের আস্বাদন দিয়েছ ও নিয়েছ। তারপরে কোথায় মিলিয়ে গেছ। ক্ষমা করো, যদি কখনো তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকি। যদি বলে থাকি, এই পর্যন্ত, আর নয়।

কী করি, আমার এই পানপাত্রে আরো বেশী ধরে না। আরো ভালোবাসতে পারিনে। আরো ভালোবাসা ধারণ করতে পারিনে। পেয়ালা যতক্ষণ না আপনা হতে খালি হয়ে যায় ততক্ষণ আমি অক্ষম। ক্ষমা করো, যদি তাকে খালি করতে না পারি বা না জানি। যদি সে তোমার সুধায় উপচে পড়ে। যদি তোমার সুধা ছাপিয়ে উঠে ছড়িয়ে যায়।

উত্তম সুরার উপচয় ও অপচয় দেখে কার না দুঃখ হয়! ও যে মহামূল্যবান। আহা, ওর উপযোগী আধার যদি থাকত! আমার হৃদয় যদি এত সংকীর্ণ না হতো। আমার মন যদি এমন বদ্ধ না হতো। আমার দেহ যদি মোমবাতির মতো দগ্ধ না হতো।

প্রেম, তোমার দোষ নয়, তোমার পাপ নয়, তোমার গ্লানি নয়, তোমার লজ্জা নয়, তুমি সবকিছুর উর্ধ্বে। তোমাকে তো আমি চিনি। কতবার চেনা হলো এই একটি জীবনে। আমার উপর তোমার কী অকৃপণ কৃপা! আমি কি এর যোগ্য! ঋণ জমতে জমতে পাহাড়। ঋণশোধের কী উপায়? আমি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতার্থ। আমি ধন্য।

ভালো করে ভালোবাসতেও কি আমি জানি! নিঃশেষে দান করতে! আত্মসমর্পণ করতে! যাকে দিই তার কাছ থেকে পরে ফিরিয়ে আনি। তাও পুরোপুরি নয়। খানিকটে তার কাছে রেখে আসি। এই আমার স্বভাব। মানি প্রেমের মার্গে আমি একজন পেছিয়ে পড়া পথিক। প্রত্যেকটি প্রেমবতী নারী আমার থেকে এগিয়ে। তাদের জয় হোক। তারা যেন আমার দিকে ফিরে না তাকায়, আমার জন্যে পেছিয়ে না পড়ে।

কী দিলুম, কী পেলুম, এর চেয়ে বড়ো কথা কী উপলব্ধি করলুম। প্রেম, তোমাকে দিয়ে তোমার কাছ থেকে পেয়ে তোমার হয়ে তোমার সঙ্গে এক হয়ে তুমি হয়ে আমি যা উপলব্ধি করেছি তাই আমার ভাগবত উপলব্ধি। তোমাকে নিয়ে আমি দ্বৈতবাদী, তোমাতে লীন হয়ে আমি অদ্বৈতবাদী।

প্রেম, তুমি ভালোমন্দের অতীত। যেমন ঝড়বৃষ্টি বজ্রবিদ্যুৎ। তোমাকে আমি ভালোর ছাঁচে ঢালাই করতে পারিনি। মন্দের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে পারিনি। তুমিও কি আমাকে ভালোর ছাঁচে ঢালাই করতে মন্দের ছোঁয়াচ থেকে উদ্ধার করতে পারলে? তা সত্ত্বেও তুমি ভালো, তুমি যা করেছ তা ভালো, আমি যা হয়েছি তা ভালো, আমি যা করেছি তা ভালো। মোটের উপর ভালো। বাদসাদ দিয়ে ভালো। কিংবা ভালোমন্দের অতীত। ভগবান আমাকে যেমনটি করে গড়েছেন আমি তেমনটি। তার চেয়ে ভালো হতে গেলে বিকলাঙ্গ হতুম। না, আমি সাধুসন্ত নই। আমি প্রেমিক।

প্রবাহন ভাবে এমনি কত শত কথা। কিন্তু লেখে না। সব কথা লেখাও যায় না। তার অন্তর মথিত হতে থাকলেও সে তার সারিণীকে জানাতে চায় না। জানে নারীকে প্রত্যাখ্যান করা শিভালরি নয়। নারী তাতে ব্যথা পায়। সে-অপমান ভোলে না। ভুলতে পারে না।

আবার বিবাহিতা নারী! আবার সিঁথিতে সিঁদুর! ওই সিঁদুর যেন সিঁদুরে মেঘ। আবার অন্যের সন্তানের জননী! আবার অবশ্যম্ভাবী অসামঞ্জস্য। না, প্রবাহন আর ওর পুনরাবৃত্তি সইতে পারবে না।

আবার অসমবয়সিনী! আবার অশরীরী সম্পর্ক। আবার যৌবনজ্বালার অনির্বাণ দহন! আবার চিরকৌমার্যের পীড়ন! যদিও আত্মার কোনো বয়স নেই। সব নারীই অনন্তযৌবনা। সব পুরুষই অজর। সব প্রেমই বৃন্দাবনলীলা।

না, প্রবাহন ওর পুনরাবৃত্তি বইতে পারবে না। হয়তো প্রেমের পরীক্ষায় তার হার হলো। কোন্ বারই বা তার জিৎ হয়েছে! তবু সেই পরাজয়ই তার বরণীয়। সারিণীকে মিথ্যা আশা দিলে তাঁর ক্ষতি করা হবে।

তা বলে কি অপ্রিয় সত্য বলতে হবে? আদৌ কিছু বলার দরকার আছে কি? বার বার লিখে ও ছিঁড়ে শেষপর্যন্ত যা দাঁড়ায় তা কয়েক লাইনের একটি চিরকুট। তাতে ছিল, 'তোমার লেখা পেয়েছি, পড়েছি ও যা করতে বলেছিলে করেছি। রূপকথাটি যেখানে এসে থেমেছে সেইখানে থামাই ভালো।'

চিঠির উত্তর ও ছাড়া আর কী হতে পারত! তবু পরিতাপ হয় যে প্রবাহন এক-হিসাবে দরজা বন্ধ করে দিল। রানী বৌদি এর পরে আর কখনো মনের কথা প্রাণ খুলে জানাবেন না। মনের কথা মনে চাপা থাকবে। সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। যতরকম

ক্রমবেউীয় উপসর্গ দেখা দেবে। যার চিকিৎসা দেহ চিকিৎসকের অসাধ্য। মীরা সেদিক থেকে বেপরোয়া। তাই স্বাস্থ্যবতী।

ও মেয়ে যেখানে যায় হৈচৈ বাধিয়ে দেয়। জেলে গিয়ে সি-ক্লাস কয়েদিনীদের জন্যে অনশন আরম্ভ করে দিয়েছে। সি-ক্লাসই যদি হয় তবে শুধু ওরা কেন, সকলেই হবে। কর্তারা জবাব দেন, সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদা ভেদে যাকে যে শ্রেণী দেওয়া হয়েছে সেই শ্রেণীই সমাজে তার পাওনা। জেলখানাও সমাজেরই প্রতিফলন। ওটা জগন্নাথের মন্দির বা শ্রীক্ষেত্র নয়। সমাজবিপ্লবের দায়িত্ব ব্রিটিশরাজ নেবে না। যার খুশি সে জেল ছেড়ে চলে যাক। অবশ্য যাবার বেলা মুচলেকা দিতে হবে যে অমন কর্ম আর করবে না। নারীর স্থান গৃহে। গৃহই তার কর্মক্ষেত্র।

শোন কথা! তাই যদি হবে তো আন্দোলন বল পাবে কার কাছ থেকে? সুভদ্রা না হলে অর্জুনের রথ চালাবে কে? মহাভারতের যুদ্ধের পেছনে দ্রৌপদীর প্রেরণা। নারীকে হেঁসেলে পুরে নবযুগের মহাভারত নয়। পর্দা মোগলদের পক্ষে সুবিধের ছিল, ইংরেজদের পক্ষেও তাই। কিন্তু স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভারতের পক্ষে নয়। এই আন্দোলন পর্দার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। জেলখানার প্রাচীর তার কাছে কিছু নয়। মহেশ্বরী ও মীরা জেল থেকে নড়বে না। বরঞ্চ সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই দেহত্যাগ করবে।

এলাহাবাদের বন্ধু অঘোরী শশিশেখরলাল জানিয়েছেন যে পরিস্থিতি দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। মীরার স্বামীকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। মুচলেকা দিতে হবে না, তিনি যদি আশ্বাস দেন যে স্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু তিনি যদি দায়িত্ব অস্বীকার করেন তা হলে কী হবে বলা যায় না। জোর করে খাওয়ানো যদিও সরকারী নীতি তবু নারীদের বেলা সরকার অতিরিক্ত সাবধান। মহিলাদের সংগ্রামে নামিয়ে কী এক চাল চেলেছেন গান্ধী!

মীরার জন্যে মন কেমন করে প্রবাহনের। বেচারি কি তা হলে না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে? না আর সহ্য করতে না পেরে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর দায়িত্বে ঘরের বৌ ঘরে ফিরবে? ছেলের মুখ চেয়ে হয়তো তাই শেষপর্যন্ত করবে সে।

সেরকম কিছু হয় না। ইংরেজের চিরকেলে পলিসি, ভাগ করো আর শাসন করো। মহেশ্বরীকে ওরা ফাঁসীর আসামীদের নির্জন সেলে আবদ্ধ করে রাখে। কারণ তিনি কারো কোনো কথা শুনবেন না। স্বামীকেও অমান্য করবেন। সকলের সামনে বলবেন, আমার স্বামী আমার দেশ। আপনি যান, আর-একটি বিয়ে করুন।

মহেশ্বরীকে অন্যত্র চালান হতে দেখে মীরার মনটা দমে যায়। কে জানে, বাবা, তাকেও যদি ফাঁসীর আসামীদের নির্জন সেলে আটক করা হয়? সে কি পাগল হয়ে যাবে না? মহেশ্বরীর সন্তান নেই, তিনি চাকিতে গম ভাঙেন, অধরদন্ত ঔরৎ। তাঁর

কাছে মীরা। মীরার স্বামীর সঙ্গে ছেলেকেও সরকার ফ্রী পাশ দিয়েছিলেন। ফার্স্ট ক্লাস রেলভ্রমণের। সেই সুযোগে তাঁদের প্রয়াগ কাশী গয়া দর্শন হয়ে যায়। ছেলের অনুনয় মা এড়াবে কী করে। তবে স্বামীর দায়িত্বে ঘরে ফেরার প্রস্তাবও সে নাকচ করে। সি-ক্লাস আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

ওদিকে রানী বৌদি কী ভাবলেন কে জানে। আর তাঁর চিঠিপত্র নেই। প্রবাহনও মনঃস্থির করতে পারে না তাঁর কাছ থেকে কীরকম চিঠি সে প্রত্যাশা করে। যেরকম চিঠি তার হাতে পড়লে তিনি লজ্জিত হন, সেও বিব্রত হয়? না আগেকার মতো জীবনমরণের অর্থ, ভগবান ও নিয়তির লীলা প্রসঙ্গে চিঠি?

ওই একখানি চিঠির থেকে নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায় না যে তিনিও প্রবাহনের মতো দেহে মনে আত্মায় তৃষ্ণার্ত। তিনিও চাতকের মতো চান প্রাণ মন হৃদয় জুড়ানো প্রেমরস। যার অভাবে তিনিও অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছেন। তৃষ্ণার জল বলতে প্রবাহনের যে ধারণা তাঁরও সেই ধারণা। একখানি চিঠির থেকে অতকিছু টেনে বার করা চলে না। তা ছাড়া ওটি তো একটি স্বপ্নের বৃত্তান্ত। স্বপ্ন তো আর সত্যি নয়। মানুষ কত কী স্বপ্ন দেখে। তার জন্যে তার সচেতন মনকে দায়ী করা যায় না। স্বপ্নের রাজকন্যা আর বাস্তবের রানী বৌদি কি একই মানুষ, না কখনো এক হতে পারেন?

প্রবাহন যতই চিন্তা করে ততই নিজের মূঢ়তায় বিস্মিত হয়। একজন একটা স্বপ্ন দেখে সরল মনে তার বৃত্তান্ত লিখেছেন। অমনি সে ধরে নেয় যে ওটা তাঁর হৃদয়ভাবের অভিব্যক্তি। তিনিও সেই অর্থে তৃষ্ণার জলের পিয়াসী। আর প্রবাহনের পানপাত্রে সেই তৃষ্ণার জল। অকারণে সে ওটাকে গায়ে পেতে নিয়েছে। আসলে তাঁর তেমন কোনো তৃষ্ণা নেই। যেটা আছে সেটা ভগবানের জন্যে ও ভগবানের কোলে বুলার জন্যে ব্যাকুলতা। আধ্যাত্মিক মিলনের জন্যে তৃষ্ণা।

কথা হচ্ছে স্বপ্ন কি একেবারে অমূলক না তার কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে? অন্তত কাল্পনিক ভিত্তি? মানুষের মনের অচেতন স্তরে কী নিহিত আছে কে জানে। সচেতন মন তাকে শিউরে উঠে অস্বীকার করতে পারে, তা বলে তা অসত্য হয়ে যায় না। কিন্তু অসত্য না হলেও তা অবাঞ্ছিত হতে পারে। সুতরাং আর ও নিয়ে খোঁচাখুঁচি না করাই শ্রেয়। কার মনের অচেতন স্তরে কী অতৃপ্ত কামনা নিহিত আছে তা নিহিতই থাক। স্বপ্নে যদি তা বেরিয়ে পড়ে তো স্বপ্নেই নিবদ্ধ থাক। চিঠিপত্রে, কথাবার্তায়, সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্কে তাকে অর্গলমুক্ত করে কাজ কী! যখন চরিতার্থতার কোনো সম্ভাবনা নেই। যখন চরিতার্থতা থেকে অন্তহীন জটিলতা ও দুঃখ।

হাঁ, কিন্তু আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক কি অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায়? তার জন্যে দুয়ার খোলা রাখতেই হয়।

॥ ষোল ॥

সারিণীকে ফিরিয়ে দেবার এটাও একটা কারণ যে প্রবাহনের হৃদয় তখনো তার হাতে ফিরে আসেনি। তখনো বিয়াট্রিসের কাছে। অদৃশ্য হলেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। তাঁর অকৃপণ প্রীতি অহেতুকভাবে প্রবাহনের শিরে বর্ষিত হচ্ছিল।

বিয়ের আশা না থাকলেও কি প্রেম হয় না? নিশ্চয় হয়। দেহের আনন্দ না থাকলেও কি প্রেম হয় না? নিশ্চয় হয়। তবে তাকে প্রেম না বলে প্রীতি বলাই সঙ্গত। সেটা ঠিক নারীতে পুরুষে নয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। আত্মাতে আত্মাতে। বিয়াট্রিস ধীরে ধীরে ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, আত্মায় পর্যবসিত হয়েছেন। বা হতে চলেছেন। তেমনি প্রবাহনও। তার প্রেমের সেই প্রগাঢ় অনুভূতি ক্রমে গাঢ়তা হারিয়েছে। নারী যদি নারী না হয়ে ব্যক্তি হয়, পুরুষ যদি পুরুষ না হয়ে ব্যক্তি হয় তা হলে প্রেমও হয় প্রীতি। তার স্বাদ ভিন্ন।

সেও কিছু কম মূল্যবান নয়। সত্যিকার প্রীতি এ জগতে প্রেমের চেয়েও দুর্লভ। আর বিয়াট্রিসের প্রীতির তুলনা নেই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ ওর চেয়ে নিবিড় হতে পারে না। তবু ভয় হয় যে তিনি হয়তো অন্য নারী সহ্য করবেন না। যদিও সেই নারীও ঠিক নারী নন, অপর এক ব্যক্তি, আর একটি আত্মা। প্রবাহনও কি অনুরূপ ক্ষেত্রে সহ্য করতে পারবে? না বোধহয়।

বাণী বৌদির চিঠি আর আসেই না। প্রবাহন সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়াট্রিসের সঙ্গে সহজভাবে পত্র ব্যবহার করে। না, তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। না সারিণী, না স্বারা। নারী হিসাবেও না। যদিও তিনি দূরে তবু তিনিই নিকটে। তিনিই নিকটতম। প্রেম হয়তো অস্তোন্মুখ। সখ্য তখনো দীপ্যমান। সখীরূপে তিনিই আকাশ জুড়ে আছেন। তবে আগুন কবে নিবে গেছে।

অকস্মাৎ আর-একজনের কাছ থেকে আসে আর-একখানি চিঠি। সম্পূর্ণ অপরিচিতা বিদেশিনী মহিলা। একাকিনী ভারত সন্দর্শনে এসেছেন। উঠেছেন কলকাতার এক বিদেশী হোটেলে। কাউকেই চেনেন না। সঙ্গে একটি পরিচয়পত্র বহন করে এনেছেন। প্রবাহনের নামে ওর বন্ধু নবনীতের। লণ্ডন থেকে। ভদ্রমহিলার ধারণা প্রবাহন যেখানে থাকে সেটা কলকাতার থেকে একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টার পথ। নবনীত নাকি তাঁকে সেইরকম বুঝতে দিয়েছে। প্রবাহন কি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় আসতে পারে না? নয়তো তিনিই ওর কর্মস্থলে আসবেন। ওর পরামর্শ নিয়ে ভারতভ্রমণের প্রোগ্রাম করবেন। এক বছরের মতো।

সে পত্রপাঠ শ্যামবরণকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে। তাঁকেও শ্যামবরণের নামে পরিচয়লিপি দেয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল শ্যামবরণের স্বচক্ষে দেখা। প্রবাহনের ততখানি নয়। ছুটি নিয়ে কলকাতায় ছুটে যাওয়া সহজ হলে সে খুশি হয়েই যেত। কিন্তু তার যেতে দেরি হবে। ততদিন যদি অপেক্ষা করতে না পারেন তবে প্রবাহনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নয়, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীনকীর্তি দর্শনের জন্যে তার কর্মস্থলে আসতে পারেন মিস সুইনারটন। হোটেল নেই, সার্কিট হাউসে তাঁর মতো বিশিষ্ট অতিথির জন্যে আর-সব ব্যবস্থা সম্ভবপর, শুধু আহারের বেলা প্রবাহন ও তার বন্ধু নিশীথের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে হবে। এদের সানন্দ নিমন্ত্রণ রইল।

প্রবাহনের প্রত্যয় ছিল না যে তিনি সত্যি সত্যি আসবেন। তাই পুলকিত হলো যখন তিনি ধন্যবাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। নির্দিষ্ট তারিখের সন্ধ্যাবেলা সে স্বয়ং রেলস্টেশনে যায় তাঁকে স্বাগত জানাতে, কিন্তু মিস্টার মুখার্জির মোটর পাওয়া যায় না, ট্যাক্সি তো নেই, ঘোড়ার গাড়ী দেরি করিয়ে দেয়। ট্রেন তখনো দাঁড়িয়ে, কিন্তু ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস খালি। তারই একটা কামরায় ফ্যান শুধু শুধু ঘুরছিল বলে অনুমান হয় কেউ একজন একটু আগেই নেমেছেন। কিন্তু কোথায় তিনি? কেউ বলতে পারে না। স্টেশন অন্ধকার, বোধহয় বাদলের দিন বলে কেরোসিনের বাতিগুলো নিবে গেছে। প্ল্যাটফর্মে তাঁকে পাওয়া যায় না, ওয়েটিং রুমেও না। থার্ড ক্লাস যাত্রীদের জন্যে যে খোলা শেড ছিল সেখানে কলরবমুখর জনতা। সেখানে না খুঁজে ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় গিয়ে প্রত্যেকটিতে উঁকি মারে প্রবাহন। কোনোটিতে তিনি নেই। তা হলে কি তিনি ইতিমধ্যে অন্য একখানা গাড়ীতে উঠে শহরের দিকে রওনা হয়ে গেছেন?

আরো একবার নিশ্চিত হবার জন্যে সে স্টেশনঘরে ঘোরে, শেডের যাত্রীসমাবেশে হারিয়ে যায়। হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছে এমন সময় নারী কণ্ঠের মিষ্টি আওয়াজ কোন্‌খান থেকে আসে। 'মিস্টার গুপ্টা?' এই তো! এই তো! প্রবাহন ভিড় কাটিয়ে শব্দের অভিমুখে ছুটে যায়। অন্ধকারে মুখ দেখতে পায় না। দেখলেই বা চিনত কী করে! তবু আন্দাজে বুঝতে পারে ইনিই তিনি। একপ্রান্তে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে।

'গুড ইভনিং, মিস সুইনারটন। আমি অতিশয় সুখী। সেই সঙ্গে অতিশয় লজ্জিত। আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।' প্রবাহন তাঁর হাত থেকে স্যুটকেসটা কেড়ে নেয়। বেডিং তিনি আনেননি। ওদেশের রীতি নয়।

স্টেশন থেকে শহরের পথ অন্ধকার। মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। তারই আলোয় দুজনে দুজনের মুখ প্রথমবার দেখে। না, বয়স তত বেশী নয়, বিশ একুশ হবে। হাসি হাসি মুখখানি প্রবাহনের ভালো লেগে যায়। দেখনহাসি পাতালে কেমন হতো? কিন্তু তার ইংরেজী প্রতিশব্দ মাথায় আসে না। তা হলে

কি তৃষ্ণার জল ? কথাটা প্রবাহনের কল্পনায় খেলে যায়। একনিমেষের জন্যেই। সেও হাসিমুখে গল্প করে। বিদেশের গল্প। ঠিক একবছর আগে সে আর-একজনের সঙ্গে ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছে। এখনো সে ছবি তার মনের পর্দা থেকে মোছেনি। যদিও তৃষ্ণার জল নন তাহলেও বিয়াট্রিসের সঙ্গে তার হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়নি।

বাংলোর সামনে একমিনিট দাঁড়িয়ে নিশীথকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী চলে সার্কিট হাউসে। সেখানে একখানি ঘরে তাঁর বিছানা পাতা। পাশেই স্নানের ঘর। ড্রেসিং রুম। তাছাড়া আলাদা একখানা বসবার ঘর। ব্যবস্থা দেখে তিনি সুখী হন। কিন্তু খাবার জন্যে তাঁকে আবার সেই গাড়ী করে যেতে হবে বাংলোয়। তা শুনে তিনি বলেন, 'গাড়ী ছেড়ে দিন। আসুন, পায়ে হাঁটা যাক।'

তিনজনে একসঙ্গে বসে আনন্দ করে নৈশ ভোজন সারে। রহিম যা রাঁধে তা অমৃত নয়, কিন্তু কতকাল পরে দুই বন্ধুর ডাইনিং টেবলের অধিষ্ঠাত্রী হলেন একজন নারী। তাতে আহারের ছন্দ মধুর হয়, আস্বাদনে রুচি আসে। সেই নারী যদি বিদেশিনী হন তবে ক্ষণকালের জন্যে বিভ্রম জন্মায় কোথায় আছি। এদেশে না ওদেশে। আর তিনি যদি হন সমবয়সিনী ও মিষ্টালাপিনী তবে সন্ধ্যাটা সুদীর্ঘ হয়, গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজে ও যারা নাচতে জানে না তারাও নাচের তাল ভাঁজে।

অমনি করে রাত হয়ে যায়। চাকরবাকর ছুটি চায়। তখন তিনজনে মিলে আবার পায়ে হেঁটে সার্কিট হাউস যাত্রা। সেখানে রাতের অতিথি বলতে ওই একজন। নারীভৃত্য নেই। উদ্বেগের কথা বইকি। তিনি কিন্তু অকুতোভয়। চৌকিদার নিশীথ-প্রবাহনকে আশ্বাস দেয় যে সে পাহারা দেবে ও পরের দিন তার বিবিকে নিয়ে আসবে। বিবি আর কেউ নয়, রহিমের চাচী। নিশীথ-প্রবাহন তাদের অতিথিকে বলে, 'আপনার সুনিদ্রা হোক।' তিনি উত্তর দেন, 'আপনাদেরও। আমার জন্যে ভাববেন না। গুড নাইট।'

পরের দিন ব্রেকফাস্ট আবার বাংলোয় একসঙ্গে। তেমনি প্রত্যেকটি মীল। মাঝখানের সময়টা কাটে সাইকেলে চড়ে ঘোরাঘুরি করে। তিনজনে নয়, দু'জনায়। নিশীথ ছুটির দিনেও কাজ করে। সেসময় কিসের যেন ছুটি। তার সঙ্গে রবিবার জুড়লে দু'দিন তিনরাত। প্রবাহন তার সমস্তটা সময় অতিথিকে দেয়। ভারতভ্রমণের পরামর্শ জোগায়।

এমনি করে মায়া পড়ে যায়। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। হয়তো আর কোনোদিন নয়। কারণ ইউনিভার্সিটির বন্ধের সময় তিনি অনুমতি নিয়ে আসেননি, অনুমতি না পেলে তাঁকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। পরে আবার আসবেন।

কলকাতাগামী ট্রেনের দেরি হচ্ছিল। ওয়েটিং রুমে বসে প্রবাহন তাই মিস

সুইনারটনকে বাংলা শেখাতে সুরু করে দেয়। বলে, 'আমার লেখা যদি কোনোদিন পড়তে সাধ যায় তা হলে আপনাকে আমার ভাষা শিখতে হবে। তা হলে আজ এখনি নয় কেন?'

'নয় কেন?' তিনি খুশি হয়ে সুধান, 'ওটাকে কী বলে?'

'গাছ। আম গাছ।' প্রবাহন তাঁকে দিয়েও বলিয়ে নেয়।

'আর ওটা কী বসে আছে?' তিনি প্রশ্ন করেন।

'পাখী। নীলকণ্ঠ পাখী।' প্রবাহন উত্তর দেন আর তিনি পুনরুক্তি করেন।

এমনি করে আট দশটি শব্দ শেখা হতে হতে ট্রেন এসে পড়ে। তিনি ট্রেনে উঠে বলেন, 'নোমোস্কার। ডন্‌নোবাড। গুডবাই, মিস্টার গুপ্টা।'

প্রবাহনের মন মেনে নিতে চায় না যে এই দেখাই শেষ দেখা। কিন্তু কন্যাটির কলকাতায় অবস্থান বেশীদিন নয়। পাটনা যাবার কথা আছে। টমাস কুক নাকি ওঁর জন্যে একটা ভ্রমণসূচী তৈরি করে ফেলেছে।

জীবনে কত লোক আসে, কত লোক যায়। দু'দিন পরে মনেও থাকে না যে কেউ কোনোদিন এসেছিল। কলকাতা থেকে মিস সুইনারটন চিঠি লিখে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। প্রবাহন তাঁকে শুভকামনা জানিয়ে ওইখানেই সমাপ্তিরেখা টানে।

তারপরে আর খবর রাখে না কন্যাটি কোথায় আছেন বা কেমন আছেন। কাজ-কর্মের অবসরে পূজার লেখায় মন দেয়। আরো কয়েকটি পত্রিকা থেকে আহ্বান এসে-ছিল। হেমন্ত মেসোমশায়ের আদেশ তো ছিলই।

॥ সতেরো ॥

পুজো এবার অক্টোবরে। আপিস আদালত বন্ধ হয়ে গেলে নিশীথ-প্রবাহন কলকাতা রওনা হয়। ওখানে দিন কাটিয়ে রাতের দার্জিলিং মেল ধরবে প্রবাহন। এবার তার প্রোগ্রাম এমন আঁটসাঁট যে শ্যামবরণ ছাড়া আর কারো বাড়ী যাবার সময় নেই। উঠবে নিশীথদের ওখানে। ওঁরা বিশেষ করে বলেছেন। কী সব কথা আছে।

সকালবেলা শ্যামবরণের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে না ফিরতেই দু'দুটো টেলিফোন মেসেজ। একটা মল্লিকাদির কাছ থেকে। প্রবাহন যেন এইবেলা একবার আসে। এবার সে খবর দেয়নি বলে বৌদি বিশেষ ক্ষুণ্ণ। কিন্তু তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে পুজার বন্ধে সে কলকাতা আসবে। সেইজন্যে আগে থেকেই এসে বসে আছেন। বসে আছেন

ঠিক নয়, শুয়ে আছেন। তাঁর জ্বর হয়েছে।

আর একটা মিস সুইনারটনের কাছ থেকে। প্রবাহন ও নিশীথ দু'জনেই যেন তাঁর সঙ্গে তাঁর হোটেলে এসে চা খায়। তিনি পরম প্রীত হবেন। এখনো তিনি কলকাতায়। একটু মুশকিলে পড়েছেন। পরামর্শ চান। সাড়ে চারটের সময় তিনি প্রত্যাশা করবেন।

আহারের আয়োজন নিশীথদের সঙ্গেই হয়েছিল। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যায়। ওদিকে বৌদি অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত। যদিও প্রবাহন জানিয়ে রেখেছিল যে মধ্যাহ্নভোজন সারা না হলে সে ছাড়া পাবে না। তা বলে বেলা তিনটে! কিন্তু কেমন করে সে বলবে যে, আমার বৌদির অসুখ, আমাকে একটু সকাল সকাল বসিয়ে দিলে হয় না? সেদিন মিষ্টুনীর বাবা ও ভাইরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বিয়ের তারিখ নিয়ে আলোচনা হয়। নিশীথ বলে, এপ্রিলের আগে নয়। তার আগে সে তাঁবুতে থাকবে। বৌকে তো তাঁবুতে রাখা যায় না। ওঁরা প্রবাহনকে সালিশ মানেন।

মল্লিকাদির ওখানে গিয়ে দেখে বৌদি সত্যি শয্যাশায়ী। ওঁর দিকে তাকালে এমন দুঃখ হয়। উনিও চোখের জল রোধ করতে পারেন না।

বসতে ইঙ্গিত করেন। প্রবাহন বসে। টেম্পারেচার চার্টে চোখ বুলিয়ে দেখে একশো তিন পর্যন্ত উঠেছিল। এখন পড়তির মুখে। তা হলেও একশোর নিচে নয়। ম্যালেরিয়া বলেই চিকিৎসা হচ্ছে। পুরোনো ম্যালেরিয়া। ভয়ের কিছু নেই।

বৌদির প্রথম কথা, 'কতক্ষণ থাকা হবে?'

'এবার একঘণ্টার বেশী নয়, বৌদি। সাড়ে চারটের মধ্যে রাসেল স্ট্রীটে হাজির হতে হবে। মিস সুইনারটনের সঙ্গে চা। নিশীথও যাচ্ছে।' প্রবাহন উক্ত কন্যার পরিচয় দেয়। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে দেখায়।

'তা হলে সন্ধ্যাবেলা আবার এসো।' তাঁর বিনতি।

'তা কী করে সম্ভব, বৌদি! আজকেই দার্জিলিং মেল ধরতে হবে যে। আমি তো এযাত্রা কলকাতায় আসিনি, এসেছি কলকাতায় ট্রেন ধরতে। নইলে তোমাকে নিশ্চয়ই খবর দিতুম। যাক, তোমার সঙ্গে দেখা হলো বেশ হলো। তুমি চটপট সেরে ওঠ, লক্ষ্মিটি।'

বৌদি মাথা নেড়ে বলেন, 'তোমার সারিণী এবার বোধহয় সেরে উঠবে না, ঠাকুরপো। কে জানে কী জ্বর! ম্যালেরিয়া যদি না হয়!'

'যতসব মরবিড চিন্তা। টেম্পারেচার নামতে আরম্ভ করছে যখন, তখন সেরে যাবে ঠিক। তোমার কী হয়েছে যে তুমি অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনবে!' প্রবাহন তাঁর শয্যার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ও আস্তে আস্তে তাঁর একখানি হাত ধরে।

হাঁ, জ্বর আছে। তবে খুব বেশী নয়। টেম্পারেচার ইতিমধ্যে আরো নেমেছে।

তিনি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। চোখের জলে চোখ ভরে ওঠে। তখন

প্রবাহন ওর রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে মুছিয়ে দেয়। দরদের সঙ্গে।

'কেমন ফাঁকি দিয়ে তোমার সেবা নিচ্ছি, ঠাকুরপো!' তিনি ম্লান হাসেন।

'ফাঁকি দিয়ে কেন বলছ? তোমার কত কষ্ট হচ্ছে তা কি বুঝিনে?' প্রবাহন সমব্যথীর মতো বলে। আর তাঁর হাতে একটু চাপ দেয়। সেটা সাহেবিয়ানা।

'কত কষ্ট নয়, কত আরাম হচ্ছে আমার। এত সুখ কি আমি সইতে পারব। তুমি আর কতক্ষণ!' তিনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে টাইমপীসের দিকে তাকান।

'তিন কোয়ার্টার।' প্রবাহন উত্তর দেয়।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 'মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এক্ষুণি ফুরিয়ে যাবে।'

এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি ওকে দৃষ্টির আড়াল করেন না। এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর চাউনি ধারামুক্ত হয় না। অবশেষে রুমালে কুলোয় না। আঁচল দিয়ে চোখ মোছাতে হয়। মোছায় কে? ওই প্রবাহন?

খাবার হাতে ঘরে ঢোকেন মল্লিকাদি। প্রবাহনকে সাধেন দুইজনেই। কিন্তু মধ্যাহ্নের গুরুভোজনের পর একটা ঘণ্টাও হয়নি। সে খেতে রাজী হয় না। তবু উপরোধে গিলতে হয়।

'সবটুকু খেতে হবে। বাড়ীতে তৈরি। নইলে দুঃখ পাব।' মিনতি করেন বৌদি।

'আমার মা থাকলে আমাকে জোর করে গেলাতেন। তুমিও দেখছি তেমনি অবুঝ। আচ্ছা, বৌদি, একটা মানুষ কত খেতে পারে! এই তো আবার সাড়ে চারটের সময় চা। ভদ্রতার খাতিরে তাও তো খেতে হবে।' প্রবাহন আবেদন করে। মল্লিকা হেসে বেরিয়ে যান।

'কেন তুমি ও নিমন্ত্রণ নিতে গেলে? নিলে তো পেছিয়ে দিলে না কেন? আমি যদি তোমাকে যেতে না দিই?' তিনি কবিগুরুর 'যেতে নাহি দিব'-র মতন করে বলেন।

'লক্ষ্মিটি, এনগেজমেন্ট করলে রাখতে হয়। না করে উপায় ছিল না। দেরি করাটা দারুণ অভদ্রতা।' প্রবাহন বিলম্বের ভয়ে ভীত হয়ে ঘড়ি দেখে।

সারিণী একবার ওর মুখের দিকে একবার ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকান আর হতাশায় ভেঙে পড়েন। কখন অলক্ষিতে তাঁর একখানি হাত প্রবাহনের একটি হাতকে বুকের কাছে নিয়ে গেছে। হাতটিকে তিনি বুকে চেপে ধরেন। আর চোখের জল ঝরান। অস্ফুট স্বরে বলেন, 'এ হৃদয় গোপীর হৃদয়। কেমন করে বোঝাব! তুমি যেয়ো না। যদি না বাঁচি।'

কেউ কখন এসে পড়ে সে আশঙ্কা না থাকলে প্রবাহন বোধহয় মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেত। আরো একঘণ্টা বসে থাকলে আঁধার হয়ে এলে হঠাৎ একনিমেষের জন্যে হয়তো বা ছোঁয়াত। কিন্তু রূপকথা ওইখানেই থেমে যায়। তাকে টেনে নিয়ে যায় অদৃশ্য একটি তার।

॥ আঠারো ॥

'ও কী! আপনি এখনো কলকাতায়! আপনার না পাটলীপুত্র দেখবার কথা ছিল?' প্রবাহন কুশল বিনিময়ের পর বলে। 'বিদ্যাধরকে আপনার পরিচয় দিয়ে চিঠি লিখেছিলুম।'

'উনিও সব কিছু দেখাবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশ থেকে ডাক আসে। ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যেতে হবে। ওরা যদি বা রাজী ছিল মা বাবা নারাজ। তাঁরা খবর পেয়েছেন যে ভারতবর্ষের সর্বত্র অশান্তি।' কন্যাটির মুখের হাসি নিবে গেছে।

'আপনি তা হলে ভারতের স্বাদ কলকাতায় মেটাবেন। এটা কি ভারতের সত্যিকার প্রতিমা? এই প্রতিমার ধ্যান কি ভারতের ধ্যান?' প্রবাহন তার ক্ষোভ দমন করতে পারে না।

'না, না, তা কি আমি বুঝিনে? এই একমাস আমি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে গিয়ে বিস্তর শিল্পকর্ম দেখেছি, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে বিস্তর বই পড়েছি, ভারতীয় সঙ্গীতের জলসায় গিয়ে রাগ-রাগিণী শুনেছি, একটা সেতার কিনে পাঠ নিয়েছি। ভারতের প্রতিমা বলতে এসবও তো বোঝায়। যদিও জানি যে এই যথেষ্ট নয়। আপনারা দু'জনে আমার বন্ধু হলেন, এই বন্ধুতাও ভারতের প্রতিমা।' তিনি সাদরে চা পরিবেশন করেন ও কেক বাড়িয়ে দেন।

নিশীথ ওটি দুই ছোট ছোট টুকরো তুলে নেয়। প্রবাহন একটিও না। ওকে দয়া করে মাফ করতে হবে। ওর আজ আরেকটা নিমন্ত্রণ ছিল।

'তা বলে আমি বঞ্চিত হই কেন? এ সুযোগ তো দু'বার পাব না।' তিনি নৈরাশ্যের সুরে বলেন।

'কেন পাবেন না? আপনি তো আবার এদেশে আসছেন।' প্রবাহন মনে করিয়ে দেয় তাঁর আরেকদিনের উক্তি।

'ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু ইচ্ছে থাকাই যথেষ্ট নয়। তাই যদি হতো তবে আমি এখনি এদেশ থেকে বিদায় নিতুম না। আরো দেখতুম, আরো শিখতুম। এমন কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যেতুম যা চিরস্মরণীয়।' তিনি তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেন।

নিশীথ ও প্রবাহন উভয়েই আক্ষেপ জানায়। কথাবার্তার মাঝখানে একসময় তিনি বলেন, 'আপনাদের তিনদিনের আতিথেয়তার প্রতিদান অবশ্য একদিনের চা দিয়ে হয় না। শুধু সেইজন্যে আপনাদের আজ কষ্ট দেওয়া নয়। আমি জানতে চাই আমার হাতের কাছে এমন কী আছে যা এই সাতদিনের মধ্যে দেখা যায়, যা দেখা উচিত, যা

না দেখলে নয়। যা দেখলে চিরকাল মনে থাকবে। না দেখলে চিরকাল আপসোস রয়ে যাবে।'

নিশীথ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, 'তাজমহল তো হাতের কাছে নয়। কাশ্মীরও আরো দূর। কোণার্কের পথ অতি দুর্গম। যদিও কাছাকাছি। আমার পরামর্শ হচ্ছে শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ।'

'রবীন্দ্রনাথকে তুমি এখন পাচ্ছ কোথায়? উনি এখন সোভিয়েট সফর সারা করে বার্লিনে বিশ্রাম করছেন। এরপরে যাত্রা করবেন আমেরিকায়। আর শান্তিনিকেতনেও তো এখন শারদীয় অবকাশ।' প্রবাহন ইংরেজীতে বলে।

'সরি! আমার অত জানা ছিল না।' নিশীথ মাফ চায়।

'তারচেয়ে আপনি এক কাজ করুন, মিস হুইনারটন।' প্রবাহন পরামর্শ দেয়। 'আমি আজ রাতের মেলে দার্জিলিং গিয়ে কাল আপনাকে তার করে জানাব ওখানে জায়গা মিলবে কি না। এদিকে আপনিও টমাস কুককে বলে একটা বার্থ রিজার্ভ করে রাখুন। তা হলে আপনার দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও টাইগারহিল থেকে এভারেস্ট দর্শন হবে। সেই হবে সত্যিকার ভারতদর্শন। আর ওই হবে চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।'

তিনি চিন্তা করে বলেন, 'সব নির্ভর করছে হোটেলের উপরে। আমি তো শুনেছি অনেকদিন আগে থেকে চেষ্টা করতে হয়। অত সময় আমার হাতে কোথায়?'

'সে দায়িত্ব আমার।' প্রবাহন নিশ্চিত আশ্বাস দেয়। 'ওখানে যাঁর অতিথি হব তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমার বহুকালের বন্ধু। আর কোথাও জায়গা না হলে ওঁদের ওখানেই হবে। আপনি ও ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে রেলের রিজার্ভেশনের জন্যেই বরং চেষ্টা করুন। নিশীথ, তোমার ভাবী শ্বশুর তো রেলওয়ে অফিসার। তুমি কি তাঁকে একবার বলে দেখবে? না আমিই তাঁকে রিং করব?' মনের ভুলে বাংলায় বলে প্রবাহন।

'আমার চেয়ে,' নিশীথ হেসে বলে, 'তোমারি বেশী খাতির। বিয়েটা যদি কোনো কারণে ফস্কে যায় তা হলে আমি কে? আর তুমি হলে ওঁদের আপন জন। তোমার লেখা ওঁদের ভালো লাগে।' নিশীথও বলে বাংলায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে তর্জমা করে।

'বাংলা আমি বুঝিনে মনে করেন?' কন্যাটিও হাসিতে যোগ দেন। 'আমি সব বুঝি। গাচ। পাকী। নোমোস্কার। ভন্‌নোবাড।'

'বাঃ! আপনি তো বেশ বাঙালী বনে গেছেন দেখছি।' নিশীথ তারিফ করে।

'তা হলে সেই কথাই রইল।' প্রবাহন বলে, 'আমি কালকেই তার করছি। আপনি কাল যদি বার্থ না পান পরশু পাবেন আশা করি। নিশীথ, তুমিই ভাই দয়া করে নাও

না এ ভার। কেন বেচারিকে ভারাক্রান্ত করা!'

সেদিন দার্জিলিং মেলে উঠে প্রবাহন যখন বিছানায় গা মেলে দেয় তখন তার নিজের মনটাই ভারাক্রান্ত। থেকে থেকে মনে পড়ে যায় সারিণীর বেদনাভরা মুখ আর রোদনভরা চাহনি। সবটাই কি অসুখের জন্যে? না তৃষ্ণার জন্যেও? আহা, ওঁকে আজকের সন্ধ্যাটা দিলে কার কি এমন ক্ষতি হতো! মিস সুইনারটন কি তাঁর চেয়েও আত্মীয়? সারিণী যদি না বাঁচেন?

সঙ্গে সঙ্গে মন বলে ওঠে, না। ও তৃষ্ণা ওইটুকুতেই মিটত না। ওইখানেই থামত না। কতবার গোপনে দেখা করতে হতো, কতবার মুখমধু সেবন করতে ও করাতে হতো, কতবার মান অভিমানের খেলা খেলতে হতো। অবশেষে একদিন বুকভাঙা বিদায় দিতে ও নিতে হতো। ও ছাড়া আর কোনো পরিণতি সম্ভবপর নয়। হলে ওর চেয়ে ট্র্যাজিক হবে। প্রবাহনের তৃষ্ণার জল সারিণী নন। সারিণীর তৃষ্ণার জল প্রবাহন হতে পারে, কিন্তু ও জল চোখের জলে লোনা।

থেকে থেকে মনে পড়ে যায় আর-একখানি মুখ। হাসি-হাসি মুখ। আজ কিন্তু বিদায়ের বিষাদঢাকা। ইলেন বলে ওই যে কন্যাটি ওঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওঁর জাহাজ আর দশ দিন বাদে বম্বে থেকে ছাড়বে। কলকাতায় ওঁর অবস্থান আর সাত দিন। এরই মধ্যে যদি দার্জিলিং ঘোরা হয়ে যায় তো সাক্ষাতের আশা আছে। নয়তো নেই। কে জানে আবার কবে এদেশে ফিরবেন! নাও ফিরতে পারেন। ইচ্ছা থাকাটাই যথেষ্ট নয়। ধরো, যদি ওঁর বিয়ে হয়ে যায় তবে কি ওঁর স্বামী ওঁকে আসতে দেবেন? স্বামীও সঙ্গে আসবেন হয়তো। তা হলে আর সুখ কী? প্রবাহন চোখ বুজে হাসে। না, স্বামী থাকলে আর গাইড হয়ে সুখ নেই।

সেদিন সে মনে মনে একটা লেকচার মুসাবিদা করে নিয়ে গেছল। সেটা দেওয়া হয়নি। ইলেন যদি ওঁর পরিকল্পনা অনুসারে একবছর এদেশে থাকতেন তা হলে ওঁকে বলা যেত, মিস সুইনারটন, ভারতের যা শ্রেষ্ঠ তাই আপনি দেখবেন, যা নিকৃষ্ট তা নয়। ভারতের যা সুন্দর তাই আপনি দেখবেন, যা অসুন্দর তা নয়। ভারতের যা শাশ্বত তাই আপনি দেখবেন, যা সাময়িক তা নয়। ভারতের যা স্বরূপ তাই আপনি দেখবেন, যা বিকার তা নয়। এরই নাম ভারতদর্শন। আর এ কেবল দেশ দেখা নয়, দেশের মানুষকেও দেখা। মানুষের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, যা সুন্দর, যা স্বভাবসঙ্গত। পাপতাপ ভুল-ভ্রান্তি কোন্ দেশের মানুষের নেই? হয়তো এদেশে কিছু বেশীই আছে, কিন্তু তাই দেখবার জন্য কেউ সাত সমুদ্র পার হয়ে আসে?

লেকচারটা মাঠে মারা যায়। দশ দিন বাদে যিনি চলে যাচ্ছেন তাঁকে ওসব বলা মিছে। কন্যাটি যদি সত্যি সত্যি দার্জিলিং আসেন—না আসার সম্ভাবনাই ষোল আনা

—তা হলে আর লেকচার নয়। তখন তাঁকে সৌন্দর্যের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দিতে হবে। সৌন্দর্য আপনার কথা আপনি বলবে। চোখাচোখি করিয়ে দিতে হবে। সৌন্দর্য আপনার রূপ আপনি দেখাবে। প্রবাহনের কাজ শিল্পীর মতো আপনাকে সরিয়ে নেওয়া। কন্যাটি তো প্রবাহনের জন্যে আসছেন না। আসছেন এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্যে।

ইলেনের জন্যে সে একপ্রকার স্নিগ্ধভাব অনুভব করে। যাকে বলে টেণ্ডারনেস। আর সারিণীর জন্যে? তাঁর জন্যেও তেমনি এক টেণ্ডারনেস। ট্রেনে ওর ভালো ঘুম হয় না। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যায় আর অমনি দুটি মুখ পর পর ফুটে ওঠে। দুটিতেই বিদায়ের ব্যথা। সে ব্যথা যেন প্রবাহনের ব্যথারই প্রতিফলন। তাঁদের মুখ যেন মুকুর। ইলেনের সঙ্গে আর বোধহয় দেখা হবে না এদেশে বা ওদেশে। সারিণীর অসুখ যদি ম্যালেরিয়া না হয়ে আর-কিছু হয়ে থাকে তবে তিনিও কি প্রবাহনের পথ চেয়ে বেঁচে থাকবেন? একটি মানুষকে একটু সুখ দিতে কলকাতায় থেকে গেলেই পারত প্রবাহন। তা হলে ইলেনের সঙ্গেও আবার দেখা হতো। দার্জিলিং যাত্রা কি অনিবার্য ছিল?

॥ উনিশ ॥

পরের দিন দার্জিলিং পৌঁছে দু'চোখ জুড়িয়ে যায় আর হৃদয় নেচে ওঠে। না, দার্জিলিং যাত্রা বাদ দিলে এত আনন্দ হতো না। পূজার বন্ধের পুরো দশদিন প্রবাহন রূপোপভোগ করবে। ওর বন্ধু সমর ও বন্ধুজায়া টুকটুক ওকে তার আগে ছাড়বেও না। ইতিমধ্যে ওরা কালিম্পং ও গ্যাংটক পরিক্রমার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। কতকাল পরে পুনর্দর্শন! ওদের বিয়েতে সাক্ষী হয়ে প্রবাহন সেই যে বিদেশে চলে যায় তারপর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

'ভালো কথা, টুকটুক আর সমর, তোমাদের এখানে কি আরো একখানা ঘর মেলা সম্ভব? অবশ্য তোমাদের কষ্ট দিয়ে নয়। আমার পরিচিতা এক বিদেশিনীর জন্য। ওঁকে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেস্ট দেখাব, যাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে আবার এদেশে আসতে আগ্রহী হন।' প্রবাহন বাড়ীতে পা দিয়েই বলে।

'আর কাউকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নয়?' টুকটুকের কৌতুক প্রশ্ন।

'না, টুকটুক, সেটা কল্পনার বাইরে। সবে সেদিন আলাপ।' প্রবাহনের উত্তর।

'আচ্ছা, আমরা রাজী। তোমার শোবার ঘরটা ওঁকে ছেড়ে দিয়ে বসবার ঘরে

শোবে। কেমন ? ডাইভানে শুতে আপত্তি আছে ?' টুকটুকের প্রস্তাব।

'কিছুমাত্র না।' প্রবাহন সানন্দে সম্মত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইলেনকে টেলিগ্রাম করে।

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দেবার পর প্রবাহনের খেয়াল হয় যে কন্যাটিকে সে বলেছিল আর কোথাও যদি জায়গা না হয় তার বন্ধুর বাড়ীতে হবে। সত্যের খাতিরে তার উচিত ছিল আগে আর কোথাও চেষ্টা করা। তার সঙ্গে কন্যাটির এমন কী সুবাদ যে এত জায়গা থাকতে তার বন্ধুর ওখানেই উঠবেন।

সমরকে ওকথা বলতেই সে যেন একটু নিরাশ হয়। 'বুঝেছি। আমরা কালা আদমি কিনা। আমাদের এখানে উঠলে ওঁর জাত যাবে।'

যাই হোক সে কয়েকটা হোটেলে রিং করে তাদের উত্তর প্রবাহনকে স্বকর্ণে শোনায়। তিলধারণের স্থান নেই। লোকে লোকারণ্য। প্রবাহন ম্যালে গিয়েই টের পায় যে তামাম কলকাতা শহরের ইউরোপীয় ও ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায় দার্জিলিং-এ সমবেত।

তা হলে সে যা করেছে ঠিকই করেছে। এখন কন্যাটি আসতে চাইলে বা আসতে পারলে হয়। এই মরসুমে বার্থ পাওয়া বোধহয় হোটেলে জায়গা পাওয়ার চেয়েও কঠিন। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। তার উপরে যা বৃষ্টি আর যা কুয়াশা! দার্জিলিং দর্শন না হয় হলো, কিন্তু হিমালয় দর্শন হচ্ছে কোথায়!

কন্যাটির সঙ্গে আর দেখা হবে না, যদি তিনি না আসেন। ভালো করে বিদায় নেওয়াও হয়নি। হলেন তার বন্ধু নন, কেউ নন। ওঁর সঙ্গে তেমন কোনো সম্পর্কও পাতানো হয়নি যেমন সাবিত্রীর সঙ্গে। তা সত্ত্বেও কী জানি কেন ইলেনের কথাই বার বার মনে উদয় হয়। ইলেন। কী মধুর নাম। আর কী মিষ্টি সুরে কথা বলেন। ওঁর মধ্যে বর্ণচেতনার নামগন্ধ নেই। কে ভারতীয়, কে ইউরোপীয় এ গণনারও তিনি ঊর্ধ্বে। বরঞ্চ ভারতেরই প্রতি তাঁর একটা অহেতুক টান। ভারতের সৌন্দর্যময় সত্তার প্রতি।

আর প্রবাহনের প্রতি? তার প্রতিও কি লেশমাত্র টান নেই? দেখা যাক। এইবার প্রমাণ হবে তাঁর টেলিগ্রাম এলে। কিন্তু কোথায় তাঁর টেলিগ্রাম! সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তাঁর সাড়া মেলে না। একটা ট্রাঙ্ক কল করলে কেমন হয়? এই অনিশ্চয়তা যে চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেবে, যদি তার আগে দূর না হয়।

টুকটুক প্রবাহনের ভাবভঙ্গী সারাদিন ধরে দেখছে। সে সমব্যথীর মতো বলে, 'দাদা, তোমার ব্যথা আমি বুঝি। তোমাদের উচিত ছিল ওদেশে থাকতেই বিয়ে করা।'

প্রবাহন রাঙা হয়ে ওঠে। 'ও কী যা তা বকছ তুমি, বোন। পাঁচ সপ্তাহ পূর্বেও আমরা কেউ কাউকে চক্ষে দেখিনি। কাল কলকাতায় দেখা না হলে আর কখনো দেখাও হতো না আমাদের। যাবার আগে একটা চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা চান। তাই হিমালয় দর্শনের কথা ওঠে। নইলে আমার কী! আমার কিসের মাথাব্যথা!'

এর থেকে ওঠে প্রবাহনের বিয়ের প্রসঙ্গ। বিয়ে কি সে কোনোকালে করবেই না? কই, তার লক্ষণ কোথায়? এই দার্জিলিং শহরেই বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব নেই। কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম। টুকটুক ও সমর প্রবাহনের জন্যে পার্টি দিতে রাজী আছে, অন্যের পার্টিতে ওকে নিয়ে যেতেও রাজী। হিমালয় দর্শনের চেয়ে আরো জরুরি কন্যাকুমারী দর্শন।

'ওই চৌরাস্তাটাই একটা পার্টি। যে পার্টি দিনভর ও অর্ধেক রাতভর চলে। চাও তো ওইখানেই ডেরা পাতা যাবে।' সমর বলে দুষ্টু হেসে। 'আমিও থাকব তোমার সঙ্গে তোমার পরিচয় দিতে। তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু আমার কানে কানে বলবে, ওই কন্যাটিকে আমার পছন্দ। ব্যস্, বাকীটুকু আমার হাতে।'

'কিন্তু ওর যদি আমাকে পছন্দ না হয়?' প্রবাহনও দুষ্টুমি করে।

'আলবৎ হবে। তোমাকে না হোক তোমার চাকরিকে।' সমর আশ্বাস দেয়।

'ঠিক ওইখানেই আমার আপত্তি। চাকরি যদি আমি ছেড়ে দিই?' প্রবাহন হাসে।

'আর যাই কর ওই কাজটি কোরো না। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। অমন করলে কেউ কোনোদিন তোমাকে বিয়ে করবে না।' টুকটুক দরদের সঙ্গে বলে।

'দেখা যাক এমন কোনো মেয়ে আছে কি না যে আমার জন্যেই আমাকে চায়। এই বয়সেই পরাজয়বাদী হব কেন? বিয়ে আমার এক সমাজে না হয় আরেক সমাজে হবে। আমার সেই চাষানী বিয়ে করার আইডিয়া আমি ছেড়ে দিইনি। ওটাই আমার হাতের পাঁচ। দেখি না আমার জীবন আমাকে কোন্ ঘাটে নিয়ে যায়।' প্রবাহনের প্রবাহিণী দু'পাঁচ বছরে শুকিয়ে যাবার নয়। সে অনন্তকাল অপেক্ষা করবে।

প্রতীক্ষিত টেলিগ্রাম পরের দিন পৌঁছয়। 'বন্ধু ও বন্ধুজায়ার নিমন্ত্রণের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঁচ তারিখ অক্টোবর দেখা হবে। ইলেন।'

টুকটুক তা শুনে মুচকি হাসে। 'পাঁচ সপ্তাহের আলাপেই এত! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। স্টেশনে তোমরা কেউ যাবে না, আমিই ওঁকে অভ্যর্থনা করব। তারপর মিসেস সাটক্লিফের বোর্ডিং হাউসে নিয়ে তুলব। আমার অতিথিকে যদি আমি আরো ভালো জায়গায় রাখি কেন তিনি কিছু মনে করবেন? আমি থাকতে আর কোনো গাইডের দরকার কী? আমিই তাঁকে নিয়ে ঘুরব। সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।'

এই বলে সে টেলিগ্রামখানাকে রসিয়ে রসিয়ে পড়ে। 'পাঁচ তারিখ অক্টোবর তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ইতি। তোমার ইলেন।'

প্রবাহনের মুখ শুকিয়ে যায়। আশ্চর্যের কথা, সমরেরও। সে তার বন্ধুর পক্ষ নিয়ে ওকালতী করে। 'আসলে উনি প্রবাহনেরই অতিথি। প্রবাহনই ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছে। প্রবাহনের অতিথি বলেই উনি আমাদের অতিথি। নইলে কি আমাদের অতিথি হতেন?'

টুকটুক রঙ্গ করে বলে, 'আচ্ছা, দাদা, তুমিই স্টেশনে যেয়ো। তোমার ইলেনকে তুমিই প্রথম স্বাগত জানাবে। আমরা কেন রসভঙ্গ করি ?'

এখন প্রবাহনের একমাত্র ভাবনা বৃষ্টি কি তার আগে ধরবে ? কুয়াশা কি তার আগে সরবে ? সে ফুর্তি করে প্রার্থনা জানায়, 'হে বৃষ্টি ধরে যা। হে কুয়াশা সরে যা।'

তা শুনে চুমকি পাদপূরণ করে, 'লেবুর পাতা করমচা।'

আর টুকটুক তাল দিয়ে বলে, 'কে খাবে গো গরম চা।'

ভারতীয় পরিবারে ইউরোপীয় অতিথি। নতুন কথা বইকি। টুকটুক ও সমর উত্তেজিত হয়ে প্রবাহনকে জেরা করে। কেমন দেখতে ? কত বয়স ? কী খেতে ভালোবাসেন ? বাঙালীর মতো শাকভাত ? না সাহেবদের মতো অ্যাংলো মোগলাই খানা ? হোটেল থেকে হ্যাম্পার আনিয়ে নিলে চলবে কি ? না সবাই মিলে হোটেলে গিয়ে খাওয়া যাবে ? মিসেস সাটক্লিফকে বললে আরো সুবিধাদরে হবে।

তিনজনে গিয়ে মার্কেট থেকে তরিতরকারি ফলমূল মাছ-মাংস কেনা হয়। তখন প্রবাহনের মনে পড়ে কন্যাটি নিরামিষ পছন্দ করেন। কিন্তু ঝাল বাদ দিয়ে। মশলা কম দিয়ে। টুকটুক তো রন্ধনে দ্রৌপদী। যা রাঁধবে তাই অমৃত।

সমর আবেগের সঙ্গে বলে, 'এ কি কম সৌভাগ্যের কথা ! একজন বিদেশিনী মহিলা আমাদের ঘরে অতিথি ! দেখো যেন তাঁর লেশমাত্র কষ্ট না হয়। হলে তাঁকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব। কিংবা হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নেব।'

টুকটুক রান্নাঘরের ভার নিজের হাতে নেয়। সে যেতে পারে না। পূজার বন্ধেও সমর আপিসে যায়। সেও অপারগ। তাদের প্রতিনিধি হয় চুমকি। চুমকিকে নিয়ে প্রবাহন স্টেশনে হাজিরা দেয়। দার্জিলিং মেলও দেখতে দেখতে হাজির। ট্রেনে দিব্যি ভিড়।

ইলেনকে ভিড়ের মধ্যে নজর করে প্রবাহন পুলকে হাত তুলে স্বাগত জানায়। ইলেনও সাহ্লাদে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখা দেন। কামরা থেকে নেমে করমর্দন করেন চুমকির সঙ্গেই প্রথম। প্রবাহন ওঁর ব্যাগেজের ও উনি চুমকির দায়িত্ব নেন।

বাড়ীতে পদার্পণ করতেই কী সাদর অভ্যর্থনা করে টুকটুক ! আর আপিস থেকে লাঞ্চের সময় এসে কী বিপুল উল্লাস সমরের ! চুমকি একমুহূর্তের জন্যেও তার আন্টিকে ছাড়বে না। তাঁর ঝুলি থেকে একে একে খেলনা ও চকোলেট বেরোয়। সে অবাক হয়ে দেখে।

॥ বিশ ॥

ইলেন খুব আলাপী মেয়ে আর তাঁর বর্ণচেতনা একেবারেই নেই। দুধের সঙ্গে চিনির মতো মিশে যেতে জানেন। ওই যে গুটিকয়েক বাংলা শব্দ ওরই সাহায্যে তিনি শিশু চুমকিকেও আপনার করে নেন। বিকেলে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া হয়। ম্যাল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন করে তাঁর কী আবেশ! ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অস্তরবির আভায় মুগ্ধ হন।

প্রবাহন আশা করেছিল যে ইলেনের সঙ্গে একদণ্ড নিভৃত আলাপের সুযোগ পাবে। কিন্তু চুমকিকে নিয়ে টুকটুক বাড়ী ফিরে গেলেও সমরের ফেরবার লক্ষণ নেই। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল, কিন্তু বাতাসে শীত ছিল না। অপূর্ব সন্ধ্যা। প্রবাহন কবিত্ব করে বলতে যাচ্ছিল সে যেন স্বপ্নচালিত হয়ে এই মায়ারাজ্যে উপনীত হয়েছে। সে যেন একজন স্লীপওয়াকার। এভাবটা কলকাতায় বা তার কর্মস্থলে হয়নি, ইউরোপ থেকে ফেরার পর এই প্রথম হচ্ছে দার্জিলিং-এর চন্দ্রালোকে তুষারশিখরমালা অবলোকন করে।

কিন্তু তাকে বলতে দিচ্ছে কে? সমর যেন মূর্তিমান রসভঙ্গ। ইলেনকে তার শিকার বৃত্তান্ত শোনানো চাই। ভালো শিকারী বলে লাটসাহেবের পার্টিতে তার ডাক পড়ে। সেবার বাঘের মুখ থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়ে টুকটুকের হুকুমে সে এখন শিকার বন্ধ রেখেছে। নইলে ইলেনকেও মাচানে নিয়ে যেত ও বন্দুক ধরিয়ে দিত। নির্ঘাত একটা কিছু ব্যাগে ভরা যেত। সেই ট্রোফি নিয়ে ইলেন স্বদেশে ফিরতেন। হায়, তা তো হবার নয়! টুকটুক কি তাকে যেতে দেবে। এক যদি ইলেন ওকে ভজান।

ইলেন প্রবাহনের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকান যেন তিনি স্বাধীনা নন, পরাধীনা। প্রবাহন গম্ভীর ভাবে বলে, 'মিস হুইনারটনের যদি ভালোমন্দ হয় সে দায়িত্ব কার? সে দায়িত্ব আমার। আমি ওঁকে অমন কোনো ঝুঁকি নিতে দেব না।'

তার মানে প্রবাহনকে ভজাতে হবে। সমর হাল ছেড়ে দেয়। শিকারের হাল। কিন্তু বনভোজনের হাল ছাড়ে না। কোথায় কোথায় বনভোজন করা যায় তা নিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। তাতে ইলেনেরও আগ্রহ। প্রবাহন কিন্তু উৎসাহ বোধ করে না। বনভোজনে তো সে ইলেনকে কাছে পাবে না। সে চায় একদণ্ড নিভৃত আলাপ।

যাঁর প্রতি এত টেণ্ডারনেস সেই কন্যাটি দু'তিনদিন পরে কলকাতা ফিরে যাবেন ও সেখান থেকে বম্বে হয়ে স্বদেশ। এই দু'তিনটি দিন কি পরম মূল্যবান নয়? একে যদি সে কৃপণের মতো ব্যয় করে তবে কি সেটা তার স্বার্থপরতা? আর কারো কি লাভ নেই তাতে? ইলেনের মুখের দিকে তাকালে তার মনে হয় তিনিও সময়ের ফেলাছড়া চান

না। এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে এসেছেন। তাই দেখবেন। সেই হবে তাঁর ট্রোফি।

চাঁদিনী রাতে তিনজনে মিলে ম্যালের একপ্রান্ত হতে অপরপ্রান্ত অবধি পায়ে হেঁটে বেড়ায়। সমরের ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর প্রস্তাবটাও বাতিল করে প্রবাহন। তখন একখানা বেঞ্চিতে তিনজনে মিলে বিশ্রাম করে। সমর যে একজন গাইয়ে প্রবাহনের জানা ছিল না। হঠাৎ সে তার বেসুরো গলায় তার ছেলেবেলার গান 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' শুরু করে দেয়। ওটা শেষ হলে আরো একটা। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

হেলেন শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রবাহন কিন্তু ক্রমে ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সমর যেন প্রতিজ্ঞা করেছে যে হেলেনকে ওর সঙ্গে একা থাকতে দেবে না। ওঃ ওদের মুরুব্বি। মানুষের কি নির্জনে দুটো কথা বলার অধিকার নেই? কী গেরো।

অবশেষে প্রবাহন মনে করিয়ে দেয় যে ডিনারের সময় পার হয়ে গেছে। মিসেস বাসু কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন? হেলেন তা শুনে লাফ দিয়ে ওঠেন। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখন মিসেস বাসু আমাকে মাফ করলে হয়।

সমর বাংলায় বলে, 'আমাকে আজ বাড়ী ফিরে মিথ্যা বলতে হবে, প্রবাহন। তুমি যদি দয়া করে আমায় সমর্থন কর তা হলেও মুখ রক্ষা।'

প্রবাহন 'হাঁ' কি 'না' বলে না। তার বিসদৃশ লাগে।

বাড়ী ফিরে সমর একটা গালগল্প ফাঁদে। টুকটুক অত কাঁচা মেয়ে নয়। বোঝে সব। কিন্তু কথা বাড়ায় না। তখন সমরকে ওর মানভঞ্জনের জন্যে অধ্যবসায় করতে হয়। সেই সুযোগে প্রবাহন ও হেলেন পরস্পরকে কাছে পায়। বিলম্বিত বলেই তাদের সে আলাপ এত উচ্ছ্বসিত হয়। প্রবাহন আবিষ্কার করে যে হেলেনও এই সুযোগটুকুর জন্যে মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছিলেন।

ডিনারের পর কর্তাগৃহিণীর অনুপস্থিতিতে কতক্ষণ ড্রয়িংরুমে বসে থাকা যায়। হেলেনকে হাই তুলতে দেখে প্রবাহনের খেয়াল হয় যে শুতে যাবার সময় হয়েছে। শুভ-রাত্রি জানিয়ে যে যার ঘরে শুতে যায়। আপাতত ড্রয়িংরুমটাই প্রবাহনের শোবার ঘর।

কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারে কে একজন ঢোকে ও কার্পেটের উপর ঢালা বিছানা পেতে গা মেলে দেয়। তার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস শুনে প্রবাহন দরদীর মতো সুধায়, 'কী হয়েছে, ভাই? বৌ রাগ করেছে।'

সমর জানে দেয়ালেরও কান আছে। তাই চুপ করে থাকে। কয়েক মিনিট পরেই ওর নাক ডাকতে শুরু করে। নাক না শাঁখ। ও যে ঘুমিয়ে পড়েছে এ তথ্য ও সশব্দে ঘোষণা করলেও টুকটুকের বিশ্বাস হয় না। সে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে চুপি চুপি ঘরে ঢোকে ও একফোঁটা মোম ওর কপালে ফেলে ওর নিদ্রার সত্যতা পরীক্ষা করে।

ঘুমন্ত মানুষ হলে তৎক্ষণাৎ জেগে উঠত। সমর কিন্তু নির্বিকার।

টুকটুক খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'এ যে দেখছি সার্কাসের খেলোয়াড়!'

প্রবাহন মনে মনে বলে, 'দাম্পত্যধর্মের মার্টার।'

টুকটুক মোমবাতি নিয়ে চলে যায়। সমর কিন্তু সমানে শাঁখ বাজিয়ে চলে। তখন প্রবাহনকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, 'ভাই সমর, ও ঘরে ইলেন বেচারির ঘুম ভেঙে যাবে। ঘুম ওঁর বিশেষ দরকার। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি।'

এর ফলে সমরের নাসিকাগর্জন ক্ষীণ হয়ে আসে। তবে থামে না। যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে গৃহিণী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারপরে সে তার শয্যায় ফিরে গিয়ে আরাম করে শোয় ও প্রবাহনকে বাকী রাতটা চোখ বুজতে দেয়।

কথা ছিল ইলেন বা প্রবাহন যার ঘুম আগে ভাঙবে সে অপরজনকে ডেকে তুলবে ও দুজনে মিলে হিমালয়ে সূর্যোদয় দর্শন করতে বেরিয়ে পড়বে। সমরদের জন্যে অপেক্ষা করবে না।

ভোরের প্রথম আলো ঘরে আসতেই প্রবাহন চোখ মেলে। তক্ষুণি তার মনে পড়ে যায় যে ইলেনকে জাগাতে হবে। সে ওঁর ঘরের দরজায় টোকা মারে। ভিতর থেকে সাড়া পায়, আসুন। দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে ইলেন তখনো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন।

ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার মতো তাঁর মুখখানি পদ্মফুলের মতো ফুটে আছে। তার উপর ভোরের আলো পড়ে কী মোহন লাবণ্য সৃষ্টি করেছে।

প্রবাহন স্বপ্নচালিতের মতো এগিয়ে যায়, তাঁর শিয়রে দাঁড়ায়। সোনার কাঠির মতো একখানি হাত তাঁর কুন্তলে ছোঁয়ায়। তিনি চোখ মেলে ইশারা করেন বসতে। সে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। দুজনে দুজনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হাতে হাত মেলায়। ইলেনের ঘুম তখনো ভালো করে ভাঙেনি। ভাঙবে কী করে প্রবাহন যদি না ভাঙায়? সে ওঁর অধরের কাছে অধর নিয়ে গিয়ে নিমেষের জন্যে ঠেকায়।

ইলেনের অধর চুম্বক হয়ে একনিমেষকে অনিমেষ করে।

॥ একুশ ॥

যে স্বপ্ন সারিণীর বেলা ফলতে ফলতে ফলে না সেই স্বপ্ন ইলেনের বেলা ফলে যায়। সেই যে না দেওয়া চুম্বন সেটি সেদিন সারিণীকে দিলে তার চারদিন পরে ইলেনকে

দেওয়া যেত না। ইলেনকে দেবার জন্তেই যেন সেটি তুলে রেখেছিল প্রবাহন।

সারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মল্লিকাদির বাড়ী থেকে পা তোলার ও ইলেনের হোটেল অভিমুখে পা ফেলার সেই যে ক্ষণটি সেটি যেন প্রবাহনের জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হতে দিলে ইলেন ওর জন্যে অপেক্ষা করতেন না, তাঁর দার্জিলিং আসার কথা উঠত না, আর কখনো দেখা হতো কি না সন্দেহ।

কিন্তু সারিণী? তিনি কি এই ক'দিনে সেরে উঠেছেন? না তাঁর অসুখ আরো বেড়েছে? কে জানে কী জর? যদি সেই দেখাই শেষ দেখা হয়ে থাকে? প্রবাহন মনে মনে প্রার্থনা করে, তিনি যেন নিরাময় হন। যেন চোখের জল না ফেলেন। বেঁচে থাকেন যেন।

ওর পানপাত্রে একটি প্রেমের জন্তেই অপূর্ণতা ছিল, দুটি প্রেমের জন্তে নয়। ইলেন যদি ঘটনাচক্রে কোন্ সুদূর থেকে এসে উদয় না হতেন সারিণীর সঙ্গে সম্পর্কটা গাঢ়তর হয়ে দু'জনকে কাঁদাত। তৃষ্ণার জল সারিণী প্রবাহনকে দিতে পারতেন না। আর প্রবাহনও কি দিতে পারত তাঁকে? দিতে গেলে আপনাকেই বঞ্চিত ও জড়িত করত। পুনর্বার দগ্ধ হতো। আবার ছাড়িয়ে নিত। তিনি মর্মে আঘাত পেতেন।

একটি চুম্বন দুটি মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। চারদিন আগে সারিণীকে দিলে একভাবে ঘুরিয়ে দিত। চারদিন বাদে ইলেনকে দেওয়ায় অন্যভাবে ঘুরিয়ে দেয়। সারিণীকে দিলে তৃষ্ণার জল হতো চক্ষের জল, যার স্বাদ লোণা। ইলেনকে দেওয়ায় তৃষ্ণার জল হয় ঝরণার জল। কী মধুর এর স্বাদ। কী প্রাণপ্রদ! কেমন পরিপূর্ণতার আকর! এ জল এক চুমুকে ফুরোবার নয়।

কিন্তু কেবল এক চুমুক কেন? আরো। আরো। এ যে তৃষ্ণার জল। শুধু একজনের নয়। দু'জনারই। ইলেনও বেঁচে ওঠেন। সেই ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যার মতো। মোহময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। যেন তাঁর রাজপুত্রকে চিনতে পেরে মুগ্ধ।

সূর্যোদয়দর্শনের দেরি হয়ে যায়। তা হোক। এও তো সূর্যোদয়দর্শন। নির্বাক হয়ে প্রেমের দেবতার দর্শন লাভ করে প্রবাহন।

আলোয় ভরে যায় ঘর। কাচের জানালা দিয়ে। চোখে পলক পড়ে না দু'জনের। শুভদৃষ্টির মতো।

এই কি সেই চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা? এর পরে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় কী হবে? এভারেস্টে সূর্যোদয় কী হবে?

সেদিন ওরা বার্চ হিলের পথে যায়। জনবিরল বনবীথি। সমরও সঙ্গে ছিল। সেই তো পথপ্রদর্শক। সে ফুর্তিসে নিজের খুশিমতো গান ধরে নেতার মতো কদম কদম এগিয়ে যায়। শ্রোতারা বনস্পতির আড়ালে আবডালে গা ঢাকা দিয়ে পরস্পরের

মাধুর্যের আস্বাদন নেয়। গান তাদের অন্তরে। সে গানের দুটিমাত্র কলি। 'ভালো-বাসো?' 'ভালোবাসি।' কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোয় না।

আনন তাদের আনন্দে উদ্ভাসিত। যেন তৃষ্ণার জলের একটা নির্ঝর আবিষ্কার করেছে ওরা দু'জনে। সেখানে তৃতীয়জনের পদক্ষেপ মানা। সমরকে ওরা যতদূর ইচ্ছা এগিয়ে যেতে দেয়। সে পেছন ফিরে ওদের দেখতে পায় না।

'প্রবাহন! মিস হুইনারটন! তোমরা কোথায়?' সমর ডাক দেয়!

'তুমি এগিয়ে যাও। আমরা আসছি।' উত্তর দেয় প্রবাহন। ইলেনও তার স্বরের সঙ্গে স্বরসঙ্গতি করেন। 'আমরা আসছি।' কত মিষ্টি লাগে তাঁর সেই 'আমরা'। অজান্তেই ওরা 'আমি' ছাড়িয়ে 'আমরায়' পৌঁছেছে।

তরুণতরুণীর ভালোবাসাবাসির মতো আর কী আছে জগতে! ওদের দেখে দেবতাদেরও সাধ যায় তরুণতরুণী হতে। স্বর্গ থেকে নেমে আসতে। ওদেরি মতো প্রেমে পড়তে। দ্যুলোক ভূলোক বনস্থলী পর্বতমালা ওদের চারদিকে ঘোরে। ওরাই যেন কেন্দ্র। আর ওদের কেন্দ্র ওদের প্রেম। যে প্রেম ভগবান আপনি আপনার অঙ্গ দিয়ে আস্বাদন করেন ও করান।

দুপুরে সমর চলে যায় আপিসে। টুকটুক চুমকিকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে। তখন প্রবাহন ও ইলেন আবার দু'জনে দু'জনার সঙ্গ পায়। ততক্ষণে ওরা হৃদয়ঙ্গম করেছে যে ওটা ক্ষণিকের উত্তেজনা বা সাময়িক উন্মাদনা নয়। বেশ কিছুদিন জ্বলবে ও জ্বালাবে। আবেগে ওদের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। এ কী নিয়তি ওদের যে ইলেনের প্রস্থানমুহূর্তে কোন্‌খান থেকে কেমন করে এল এই প্রেম! একদিন আগেও যার আভাস পায়নি ওরা। এখন কী করে পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারবে!

'ইলেন, সুইটহার্ট!' প্রবাহন আকুল স্বরে বলে, 'পরশু যখন তুমি অদর্শন হবে তখন আমার সব আনন্দ নিয়ে যাবে।'

'আমারও!' ইলেনও তেমনি আকুল।

দু'জনের হাতে হাত জড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বসে থাকে দু'জনে। কী বলবে ভাবতে থাকে। পরশু কি না গেলেই নয়? কিন্তু আরো কয়েক দিন পেছিয়ে দিলেও তো একই বেদনা। বরং বেশী। যত হাসি তত কান্না।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে সহজে কেউ ফিরে আসতে পারে না। তা হলে কি প্রবাহনকেই আবার দেশান্তরী হতে হবে? প্রেমের জন্যে? অত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত কি চট করে নেওয়া যায়? প্রস্তুতি চাই। প্রস্তুতির জন্যে সময় চাই। কথা দেবার আগে কথা রাখতে পারবে কি না বিবেচনা করা চাই। বড়ো জোর এইপর্যন্ত বলা যায় যে, আমার এ প্রেম সত্য। একে আমি প্রাণপণে রক্ষা করব। অদর্শনে কোনো ব্যতিক্রম

হবে না, ইলেন।

কিন্তু এও তো একরকম কথা দেওয়া। কথা দিলে কথা রাখতে হয়। ক' মাস! ক' বছর! যৌবন বিদ্রোহী হবে না? সারিণী স্বপ্ন দেখবেন না? মীরা জেল থেকে ফিরবে না? নিবন্ত আগুন জ্বলে উঠবে না? আর বিয়াট্রিসের অচপল ভালোবাসা? তার কি কোনো তুলনা আছে?

'ইলেন, সুইট ইলেন!' প্রবাহন অবশেষে বলে, 'আমার সাধ্য থাকলে তোমাকে আমি ধরে রাখতুম। যেতে দিতুম না। কিন্তু সাধ্য এখানে আমার নয়, প্রেমের। প্রেম কেবল আমার নয়, আমাদের। তুমি আর আমি এখন আমরা।'

'হাঁ। আমরা।' ইলেন উৎসাহের সঙ্গে বলেন।

কথাবার্তা প্রবাহনই একতরফা চালিয়ে যায়। ইলেন শুধু 'হুঁ' আর 'হাঁ' বলে সায় দিয়ে যান। আর সানুরাগ দৃষ্টিতে তাকান। আর মাঝে মাঝে বলেন, 'আমরা'। তিনি যে কী ভাবছেন তা বাক্য দিয়ে বোঝাতে যান না। ওই কয়েকটি শব্দ থেকেই অনুমান করে নিতে হয়।

একদা প্রবাহনের বিশ্বাস ছিল যে প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তিনটি বছর মীরাকে ভালোবেসে তার সে বিশ্বাসে দোলা লাগে। বিয়াট্রিসকে ভালোবেসেও তার সে বিশ্বাস অটল হয়নি। তাই সে ইলেনের বেলা বিশ্বাস করতে পারছে না যে প্রেম থেকে পরিণয় ও পরিণয় থেকে মিলন ও মিলন থেকে সন্তানসুখ এক এক করে সম্ভব হবে। হবে তো ওই অশরীরী প্রেম। অন্তহীন অপেক্ষা। ইলেন কি সত্যি ফিরবেন? যাওয়া বন্ধ করা তো দূরের কথা। না, প্রেম সর্বশক্তিমান নয়। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে না।

তাই বা কেমন করে বলবে? একদিন আগেও যা অসম্ভব ছিল আজ কি তা সম্ভব হয়নি? প্রেমকে সুযোগ দিয়ে দেখতে হয় কতদূর তার দ্বারা সম্ভব। প্রেম নিজেই একটা সুযোগ। নিজের সুযোগ। এ সুযোগ একবার যদি কেউ পায় তবে সুযোগের পর সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে। আগুন একবার যদি লাগে একটু একটু করে ছড়িয়ে যায়। যদি না আপনা হতে নেবে। কিংবা আর কেউ এসে জোর করে নিবিয়ে দেয়। প্রেমের চেয়ে বলবান আর কে আছে? সমাজও নয়। সংসারও নয়। তবে মৃত্যুর কথা বলা যায় না। সেটা অপরীক্ষিত।

'ইলেন, সুইটহার্ট!' প্রবাহন আবেগের সঙ্গে বলে, 'তোমার কি মনে হয় এ প্রেম আপনা হতে নিবে যাবে?'

'না, ডারলিং। আমার তা মনে হয় না।' ইলেন স্নিগ্ধ স্বরে বলেন।

'কিন্তু এ যদি সত্যিকার প্রেম না হয়ে থাকে, যদি খেলা হয়ে থাকে? এইটুকু পরিচয়

থেকে কী করে তুমি জানলে যে আমার এ প্রেম খেলা নয় ?' প্রবাহন সুধায়।

'তোমার কাছে খেলা হতে পারে, আমার কাছে তা নয়। আর তোমার কাছেও তা নয়। এ অনুভূতি আমাদের চেয়েও বলবান। এই আমাদের প্রভু।' ইলেন কাতর স্বরে উত্তর দেন।

'প্রেম মানে তো বেদনা। কিন্তু এত আনন্দ আমার জীবনে আর কোনোদিন পাইনি। ভাবছি এ সৌভাগ্য কি বেশীদিন স্থায়ী হবে ? ইলেন, ডারলিং, এলে যদি তো দু'দিনের জন্যে কেন এলে ?' প্রবাহন আদর করতে করতে অনুযোগ করে।

'তোমার জন্যে না হলে দু'দিনের জন্যেই বা কেন আসতুম ? হিমালয়ের জন্যে ? তোমার জন্যেই আবার একবছর বাদে আসব। তোমার মন যদি তখনো এইরকম থাকে তবে তুমি যা বলবে তাই হবে।' ওর চেয়ে স্পষ্ট করেন না ইলেন।

কত বড়ো একটা আশ্বাস। যা বলবে তাই হবে। তাতেও প্রবাহন ভোলে না। বলে, 'কিন্তু তোমার মন কি তখনো এইরকম থাকবে ? একটা বছর বড়ো কম সময় নয়, ডিয়ার। জানো তো দেবতারা হিংসুটে। আমাদের সুখ ওঁদের সইবে না। দময়ন্তীকে ছিনিয়ে নিতে দেবতারা মানুষ সেজে এসেছিলেন। আমি কি তাঁদের সঙ্গে পারব !' প্রবাহন সে উপাখ্যান শোনায়।

'চমৎকার দৃষ্টান্ত। দেবতারাও দময়ন্তীকে ভোলাতে পারলেন না। পারবেন কী করে ? প্রেম ছিল না অন্তরে বা নয়নে। নলের যেমন ছিল। আমিও দময়ন্তীর মতো অভ্রান্তভাবে চিনেছি ও চিনতে পারব।' ইলেন অভয় দেন।

এর পরেও যা বলবার থাকে তা প্রবাহনেরই আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব। সে এখনো আরেক জনকে ভালোবাসে। বিয়াট্রিসকে। তিনিও তাকে ভালোবাসেন। অশরীরী বলে সে ভালোবাসা কম সত্য নয়। হৃদয়কে দুই নারীর মাঝখানে ভাগ করে দেওয়া যায় না। অথবা একজনকে হৃদয় ও অপরজনকে দেহ দেওয়া যায় না, গেহ দেওয়া যায় না। ইলেনকে বিয়ে করলে বিয়াট্রিসকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে হবে। আর-কোনোদিন তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া চলবে না। আরো একবছর সময় পেলে স্বাভাবিক নিয়মে প্রেম পর্যবসিত হবে বন্ধুতায়। ইতিমধ্যে কতক পরিমাণে হয়েছে। ততখানি টান আর নেই। ছেড়ে থাকতে পারবে না ভেবেছিল। ছেড়ে থাকতে পেরেছে।

তা হলে সেই কথাই রইল। একবছর বাদে ইলেন ফিরবেন। তখন প্রবাহন যা বলবে তাই হবে। অর্থাৎ বিয়ে। ওর চেয়ে আরো বিশদ করেন না ইলেন। করে না প্রবাহন। দু'জনেই ধরে নেয় যে একবছর পরে পূর্ণ মিলন। এখন নয়।

আরো একটি কথা ছিল। সেটি তখন না বললেও চলত। কিন্তু প্রবাহনের মনে হয় এখন থেকে পরিষ্কার করে নেওয়াই ভালো। মীরার সঙ্গে মন দেওয়ানেওয়ার পর তিনটি

বছর লেগেছিল বুঝতে যে বিবাহের বাধা দূর হলে মীরা একদিন প্রবাহনের বধূ হলেও হতে পারে, কিন্তু তার সন্তানের জননী কোনোদিন হবে না। অকালে ও অনিচ্ছায় তার স্বামীর বংশরক্ষার পর সে আর মা হতে চায় না। তার কাছে মুক্তির অন্যতম অর্থ মাতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি। নইলে সে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে না। আর তাই যদি না পারল তবে স্বামীত্যাগ করে বিবাহভঙ্গ করে শিশুপুত্রের প্রতি কর্তব্য না করে প্রবাহনের সঙ্গে নীড় রচনা করবে কেন ?

বিয়াট্রিস তো খোলাখুলি বলে দেন যে তাঁর বয়সে মাতৃত্বের দায় তিনি বহন করতে অক্ষম। বিবাহও তাঁর পরিকল্পনার বাইরে। একসঙ্গে থাকতে তাঁর আপত্তি নেই, প্রবাহন যদি তাঁর দেশে থাকে আর সম্বন্ধটা যদি হয় অশরীরী। প্রবাহনেরই তাতে আপত্তি। তার যৌবন বিদ্রোহী হয়। প্রেমের সঙ্গে যৌবনের সেই দ্বন্দ্ব কোনোদিন কি মিটত ? যৌবনকেই হার মানতে হতো। প্রবাহন তাই বিয়াট্রিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছে। হয়তো তাঁর কাছেই আবার ফিরে যাবে ও তাঁরই শর্তে রাজী হবে, যদি আর কোনো নারী তাকে ভালো না বাসেন, যদি ভালোবেসে তার বধূ না হন, যদি তার সন্তানের জননী হতে তাঁর আন্তরিক অনিচ্ছা থাকে। চাইলেই যে মা হওয়া যায় তা নয়। কিন্তু চাওয়া যেন দুই পক্ষের চাওয়া হয়।

প্রবাহনও মুক্ত পুরুষ হতে চায়। তার দিক থেকে বিবাহ একটা বন্ধন, সে-বন্ধন সেও প্রাণ থেকে স্বীকার করত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার প্রতীতি হয় যে প্রেমকে পূর্ণতা দেয় সন্তান আর সন্তানের জন্যে চাই নীড়রচনা। নীড়রচনার উদ্যোগপর্বই বিবাহ। সে-বন্ধন বহন করতে তার অনাগ্রহ একটু একটু করে চলে যায়। কিন্তু প্রেমহীন বন্ধনে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বন্ধনহীন প্রেম তার চেয়ে ভালো।

দিবাস্বপ্ন যদিও, তবু অমন একটি স্বপ্ন তার আছে। ইলেনেরও কি আছে ? সেই স্বপ্নের সার্থকতার জন্যে ওরা দু'জনে কি দু'জনাকে চায় ? কিন্তু কথাটা এত ডেলিকেট যে মুখ ফুটে বলবার মতো নয়।

হাঁ, একটা বহু পুরাতন ক্ষত ছিল প্রবাহনের মনে। মীরা যাকে কামনা করেছিল সে শুধু প্রেমিক নয়, সে পুরুষোত্তম। একমাত্র তারই সন্তান সে ধারণ করবে, নয়তো নয়। প্রবাহন কি পুরুষোত্তম ? মীরার সঙ্গে কোনোদিন এ নিয়ে আলাপ হয়নি। কিন্তু কী জানি কেন তার ধারণা—ভুল ধারণাও হতে পারে—সে পুরুষোত্তম নয় বলেই মীরার মাতৃত্বে অনিচ্ছা। সেইজন্যে সে ইলেনকে বাজিয়ে দেখতে চায়। এখন থেকেই।

'ইলেন, মধুর ইলেন, তুমি আমাকে যা দিয়েছ ও দেবে তা অমৃত।' সে গৌরচন্দ্রিকা করে। 'কিন্তু আমার তৃষ্ণা তার চেয়েও নিগূঢ়। আমি চাই অমরত্ব।'

ইলেন অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। কী ওর মানে।

'মানুষকে অমরত্ব দেয় তার সন্তান।' বলতে গিয়ে প্রবাহন আরক্ত হয়।

'ওঃ এই কথা!' ইলেন স্মিত হেসে বলেন, 'আমারও তো সেই সাধ। তুমি যদি অপেক্ষা কর যা চাইবে সব পাবে।' এর পরে তিনি প্রবাহনের মাথাটি তাঁর কোলে টেনে নিয়ে মায়ের মতো আদর করেন।

মোহিতলালের ভাষায় 'রাধা ও মাডোনা একাকার'। প্রবাহন তন্ময় হয়ে আরাধনা করে। নারীর কাছে তার চাইবার মতো বর ছিল দুটি। ইলেন বরদা হয়ে দুটি বরই দান করেছেন। বর ফলবে, যখন সময় হবে।

॥ বাইশ ॥

প্রবাহনের চোখে আনন্দের লহর। প্রেমের দেবতার কাছেও তার প্রার্থনা বলতে ওই দুটি। যে নারী ওকে প্রেমিকরূপে বরণ করবে, শুধু পতিরূপে নয়। যে নারী ওকে তার সন্তানের পিতারূপে মনোনয়ন করবে, শুধু প্রেমিকরূপে নয়। ইলেনের মধ্যেই দুই নারী একনারী হয়েছে। প্রেমের দেবতা ওর দুই প্রার্থনা একযোগে মঞ্জুর করেছেন। সে কৃতার্থ। সে ধন্য।

তবু খাঁড়ার মতো মাথার উপর ঝুলতে থাকে ইলেনের আসন্ন প্রস্থান। একবার সাত সমুদ্র পারে গেলে ফিরে আসা সহজ হবে কি? মা বাবা কি আসতে দেবেন, যদি জানতে পান? পুনর্দর্শন এত সুলভ নয় যে চাইলেই মেলে। সে তার জীবনের সব চেয়ে আনন্দের দিনেই সব চেয়ে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়।

'ও কী। অত বিমর্ষ কেন।' জানতে চান ইলেন। 'যা কিছু চাও সবই তো পাবে। শুধু দুটো দিন সবুর করতে হবে এই যা। আমি কি সত্যি একবছর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব নাকি? চেষ্টা করব আরো আগে চলে আসতে। ভারতশিল্পের উপর আমার কাজ পড়ে থাকতে পারে না, এই কথাটা বুঝিয়ে বললেই ফিরে আসার পথঘাট খুলে যাবে। ক'টাই বা মাস! দেখতে দেখতে কেটে যাবে। প্রস্তুত হতেও তো কিছু সময় লাগবে তোমার।'

লাগবে, সেকথা ঠিক। বিয়াট্রিসকে এখন কী লিখবে প্রবাহন! তার চিঠি পেয়ে কী ভাববেন তিনি। এসব ভাবনা তো আছেই। আরো আছে মীরাকে নিয়ে ভাবনা। ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে ওকে কথা দিয়েছিল যে ওর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ

যদিও রইল না তবু ওর মুক্তির জন্যে যদি সাহায্যের দরকার হয় ওর ভাই সুবাদে প্রবাহন যথাসাধ্য করবে।

তার পর সারিণীর শরীরের ওই অবস্থায় খবরটা যখন তাঁর কানে পৌঁছবে তখন তাঁর মনের অবস্থা কী হবে? আর মনের অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় শরীরের অবস্থা কী হবে? তাঁর দিক থেকে বিবেচনা করলে ইলেনের কথাই ঠিক। প্রবাহনের প্রস্তুতি বলতে এ সমস্তও বোঝায়। কিন্তু প্রকাশ করতে বাধে। সময় পেলে এসব জট একে একে খোলা যাবে।

এ যেমন একদিকের ভাবনা তেমনি আরেকদিকের ভাবনা হলো ঘটনাচক্রে মীরা এখন জেলে। যতই সময় যাবে ততই সময় হবে ওর ছাড়া পাবার। ছাড়া পেলে ও কি ছিন্ন সম্পর্ক জোড়া দিতে চাইবে না? প্রবাহন বিদেশে যতদিন ছিল ওর নাগালের বাইরে ছিল। এখন সারা দেশটাই স্বাধীনতা কর্মীদের এলাকা। কোথায় যে ওদের মিটিং না হয়। চক্রান্ত না হয়। কে জানে ও কোনদিন এসে পুরাতন প্রেম নতুন করে জাগিয়ে তুলবে। প্রবাহনকে তো অন্তর থেকে ভাই বলে স্বীকার করেনি। ভাইটিও কিছু কম দুর্বল নয়। প্রহরী না থাকলেও রক্ষা করবে কে? ইলেনই তার সেই প্রহরী। যদি স্ত্রী হন ও কাছে থাকেন।

আপিস থেকে ফিরে সমর হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। রাত পোহাবার আগেই টাইগার হিল পৌঁছতে হবে। তার মানে রাত দুটোর সময় রওনা হতে হবে। মোটর এসে নিয়ে যাবে। এই সেই চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা যার জন্যে বিদেশিনী কন্যাটি অতদূর এসেছেন। সেই যে একটা কথা আছে, নেপলস দেখ আর মরো। তেমনি এভারেস্ট দেখ আর মরো।

'সেইজন্যেই তো নেপলস দেখতে যাইনি।' প্রবাহন হেসে বলে। 'এখন এভারেস্ট দেখে মরব? না, বাপু, আমি মরতে চাইনে। আর ইলেন আমার বন্ধু। ওঁকেও আমি মরতে দেব না। ইলেন, তুমি কি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেই সন্তুষ্ট নও? এভারেস্ট দেখা তোমার চাইই চাই?'

'তুমিই তো আমাকে দেখতে বলেছিলে, প্রবাহন। না দেখলেও যদি চলে তবে ওটা বাদ দেওয়া যাক। কিন্তু মরণভয়ে নয়।' ইলেন হেসে জবাব দেন।

টুকটুক বলে, 'থাক, ও বেচারির সামনে তিন রাত রেলযাত্রা। কেন ওর আরেকটা রাত নষ্ট হয়? আপনি তো আবার এদেশে আসবেন, মিস স্টুইনারটন; তখন এভারেস্ট দেখবেন। আমরা কেউ এখন পর্যন্ত মরিনি। আপনিও বেঁচে থাকবেন।'

সেই কথাই রইল। এরপর সমর প্রস্তাব করে, 'তা হলে চল আমরা পায়ে হেঁটে ঘুম অবধি বেড়িয়ে আসি। ক্লান্ত হলে মাঝপথ থেকে ফিরব।'

চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে ওরা একখানা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বিশ্রাম করে। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝলমল। দূর থেকে তুষারশিখরও দৃষ্টিগোচর। আশেপাশে জনমানব নেই। প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। কিন্তু সমর যেন প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছে ইলেনকে প্রবাহনের হাতে একা ছেড়ে দেবে না। কেউ লক্ষ করেনি যে তার পকেটে একটা বাঁশি ছিল। সেটা মুখে তুলে নিয়ে সে কেষ্ট ঠাকুরের মতো দুই হাতে আড়ভাবে ধরে বাজাতে শুরু করে দেয়। 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।'

প্রবাহনের হঠাৎ কেমন যেন মনে হয় ওই কেষ্ট ঠাকুরটি বাঁশি দিয়ে যাঁর মনোহরণ করতে চান তিনি তার ইলেন। অমনি তার মুখ দিয়ে বাহির হয়, কে যেন তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নেয়, ভেবেচিন্তে নয়, হিসেব করে নয়, স্বপনের ঘোরে, 'সমর, শোন। ইলেন আর আমি বিয়ে করছি। তুমি সাক্ষী।'

সমর থমকে থেমে যায়। 'সত্যি?' তার প্রত্যয় হয় না।

ইলেনও চমকে ওঠেন। প্রবাহন তো বিয়ের প্রস্তাব করেনি। ওঁর সম্মতিও পায়নি। ঘোষণা করার সময়ও হয়নি। তিনি ওকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। এ কী! তিনি বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন। প্রবাহনের মুখের দিকে।

বরকনের চেয়ে সাক্ষীরই আগ্রহ অধিক। সমর জানতে চায় বিয়েটা কবে আর কোথায়। এদেশে না ওদেশে। এ বছর না আর বছর।

প্রবাহন ইলেনের মুখের দিকে তাকায়। সে বদনে বিস্ময় ধীরে ধীরে আনন্দে রূপান্তরিত হচ্ছে। তিরস্কার ক্রমে ক্রমে প্রশংসায়।

'বোধহয় একবছর বাদে। কলকাতায় বা আমার কর্মস্থানে। কোনো এক মহকুমা শহরে। ততদিনে আমি মহকুমা পেয়ে থাকব।' প্রবাহন উত্তর দেয়।

ইলেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলেন, 'দার্জিলিংএ হলে কেমন হয়?'

এর উত্তরে প্রবাহন কী বলতে যাচ্ছিল, সমর তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'দার্জিলিংএ হলে চমৎকার হয়। কিন্তু তোমার মহকুমা পাবার আগে আমি বদলি হয়ে যেতে পারি। তিন বছর তো পুরো হতে চলল এখানে। যদিও দু'বছরের স্টেশন। বদলি হয়ে গেলে দার্জিলিংএ আসব কী করে? সাক্ষী হব কী করে? তোমরা যদি আমার উপর ছেড়ে দাও তো আমি আসছে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই তোমাদের বিয়ে দিই। ঠিক একমাস পরে।'

'কিন্তু ইলেনের জাহাজ যে এইমাসের বারো তারিখে। এখন তার দেশে ফিরে না গেলেই নয়।' প্রবাহন ধাঁধায় পড়ে।

ইলেন প্রবাহনের হৃদয় জয় করে নেন একটি কথায়। 'ইলেনকে তার ঘর যেতে

দিলে তো সে যাবে ? সেই বা তার বরকে ছেড়ে যাবে কী করে ?'

তখন প্রবাহন ওঁকে কাছে টেনে নেয় ও দু'জনে দু'জনের হাতে হাত বেঁধে প্রেমের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করে। যেন ওদের মিলনের উপর তিনি পুষ্পবর্ষণ করেন।

সমর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'বোন ইলেন ও ভাই প্রবাহন, তোমরা চিরসুখী হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমরা কি জানো তোমরা আমাকে আজ কত আনন্দ দিলে! বন্ধু-বান্ধবের বিয়ে দিতে আমার এমনিতেই বড়ো ভালো লাগে। কত জনের দিয়েছি। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধু প্রবাহন একটা বদ্ধ পাগল।'

তা শুনে শিউরে ওঠেন ইলেন। প্রবাহনও আঁৎকে ওঠে। কী বিপদ!

'বলে কি না চাকরি করবে না। স্বাধীনভাবে লিখে সংসার চালাবে। কোন্ নির্বোধের স্বর্গে বাস করছে! গোলমালের মাঝখানে হয়তো দুম করে ইস্তফা দিয়ে বসবে, সে-সময় ওর হাত চেপে ধরবে কে? সেইজন্যেই আমি ওর বিয়ে তাড়াতাড়ি দিতে চেয়েছিলুম। যাঁকে ওর পছন্দ তাঁর সঙ্গে। তিনিই ওর হাত চেপে ধরতেন। বিয়ের পর ওর পাগলামি সেরে যাবে আশা করি।' সমর টিপে টিপে হাসে।

'আমি কিন্তু ওঁর হাত চেপে ধরব না।' ইলেন শশব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন। 'ওঁর যাতে অভিরুচি তাই করতে দেব।'

'এটি দেখছি আরেকটি পাগলী।' সমর স্নেহের স্বরে বলে।

এর পরে সে আপনা হতে কবুল করে যে প্রবাহনকে সে দার্জিলিংএ নিমন্ত্রণ করেছিল কনে দেখার জন্যে। চৌরাস্তার রূপের হাটে বা ঘরোয়া পার্টিতে। নিজের বাড়ীতেও পার্টি দেবে ভেবে রেখেছিল।

আবার সে বাঁশিতে তান ধরে। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।'

দুপুরে যা ছিল দিবাস্বপ্ন সন্ধ্যায় তাই হয় জাগ্রত স্বপ্ন। সেই মধুময় স্বপ্নলোকে একমাত্র নারী ইলেন আর একমাত্র পুরুষ প্রবাহন। চিরন্তনী নারী আর চিরন্তন নর। তাদের নিত্য লীলাই ভগবানের লীলা। তাদের পারস্পরিক প্রেমই ভগবানের প্রেম। তাদের মিলিত আনন্দেই ভগবানের আনন্দ।

স্বপ্নচালিতের মতো হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে দু'জনে। সমর বাঁশি মুখে এগিয়ে যায়। সুখবরটা টুকটুকের সঙ্গে ভাগ করার জন্যে তার আর তর সয় না।

॥ তেইশ ॥

আহা, সারা জীবনটাই যদি এমনি মধুময় এক সুখস্বপ্ন হতো! হাত ধরাধরি করে দু'জনে মিলে চলা। একজনের কাঁধে আরেকজনের মাথা। প্রেমিক আর প্রেমিকা। পুরুষ আর প্রকৃতি।

ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নায় পাহাড়ী পথ বেয়ে চলতে চলতে অঙ্গের সৌরভ নেওয়া, অলকের পরশ পাওয়া। চলতে চলতে একশো বার থামা। চোখে চোখ রাখা। ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে ঝট করে ফিরিয়ে নেওয়া। পথচারী দেখলে ভালোমানুষ সাজা।

ওদের ওই নীরবতা সব চেয়ে বাঙ্‌ময়। কী হবে বাগ্‌বিনিময় করে? বলবার যা তা ওই চাউনিতে ও চুম্বনে ব্যক্ত হয়। সেই তো সত্যিকার বাগ্‌বিনিময়। মুখের ভাষায় কীই বা প্রকাশ করতে পারা যায়!

'এবার আমি আমার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি, ডিয়ার। প্রেম অসম্ভবকেও সম্ভব করে। অন্তত একটি দিনের জন্যে। আজ সেই অবিস্মরণীয় দিন।' প্রবাহন ধীরে ধীরে বলে।

'অবিশ্বাস্য দিন।' হেলেন মিষ্টি স্বরে যোগ দেন।

'এর বিস্ময় যেন ফুরোতেই চায় না। অনাবৃষ্টির পর অতিবৃষ্টির মতো। কোথায় ছিলে তুমি এতকাল! আরো আগে দেখা দিলে না কেন!' প্রবাহন অনুযোগ করে।

'আমি কি জানতুম তুমি কোথায় আছো? খুঁজতে খুঁজতে এসেছি। আমার অন্বেষণ আজ শেষ হলো, ডারলিং। সব ভালো যার শেষ ভালো।' হেলেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

'আমার আর-জন্মের প্রিয়া।' প্রবাহন আবেগের সঙ্গে বলে।

'আমার স্বপ্ন, আমার আনন্দ।' হেলেন অস্ফুট স্বরে বলেন।

চৌরাস্তায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ওরা কাঞ্চনজঙ্ঘার নৈশ রূপ নিরীক্ষণ করে। শাশ্বত সেই সৌন্দর্য কোনোদিনই ম্লান হবার নয়। মানুষ থাক আর নাই থাক। তেমনি শাশ্বত নরনারীর সর্বময় প্রেম। মানুষ থাক আর নাই থাক। প্রবাহন ও হেলেন প্রতি যুগলের মধ্যে লীলা করে এসেছে, লীলা করতে থাকবে। মানুষ থাক আর নাই থাক। এ-অপূর্ব উপলব্ধি যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। সব কিছু বাসি হয়ে গেলেও সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও যা থাকে তা সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। যুগল লীলা।

'অভিনন্দন!' টুকটুক এক গাল হেসে বলে, 'আমি কিন্তু একটুও বিস্মিত হইনি, প্রবাহনদা। যা মনে করেছিলুম অবিকল তাই। তোমরা ওদেশ থেকেই এনগেজড।'

'আরো ঠিক হতো যদি বলতে পূর্বজন্ম থেকেই।' প্রবাহন হেসে পালটা দেয়।

সবাই মিলে আরো একবার টহল দিতে বেরিয়ে পড়ে। রাতের খাওয়া আজ বাইরে। খাওয়াচ্ছে সমর। ফুর্তিটা ওরই সবার থেকে বেশী। বিয়েটা তো ওই দিচ্ছে।

'অবশেষে প্রবাহনেরও বিয়ের ফুল ফুটল। আমরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম।' সমর খেতে খেতে মুখর হয়। 'বড়ো ভাবনা ছিল কী করে ও আমাদের সকলের মতো ঘরসংসার করবে, সংসারী হবে। বলে কি না, বোহিমিয়ান হব। ওসব গল্পে উপন্যাসে শোভা পায়। জীবনে নয়। বোন হেলেন, তুমি আমার এই অসংসারী ভাইটির সংসারের ভার নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। আমি কৃতজ্ঞ। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

বলতে বলতে সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়া সমরের স্বভাব। ওর চোখে আনন্দের অশ্রু।

সমর ও টুকটুক দু'জনেই জানত প্রবাহন কাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কেন ওদের বিয়ে হলো না। মীরা টুকটুকের সই। সমরকেও দাদা বলে ডাকে। চোখের ইশারায় টুকটুক সমরকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে ওসব কথা আজকের দিনে যেন না ওঠে। সমরও সেই ভাষায় তাকে আশ্বস্ত করে। হেলেন বা প্রবাহন লক্ষ করে না।

'শুনবে, হেলেন, আমাদের বিয়েতে সাক্ষী হবার জন্যে প্রবাহন কেমন প্রখর শীতে হাজারিবাগে হাজির হয়?' সমর অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। 'আরো এক সাক্ষী ছিল। ওর আর আমার প্রিয় বন্ধু শামসুর রহমান। ওরা দু'জনে দু'জনাকে বলত, দুশমন। কারণ ইংরেজী সাহিত্যে শামসুর রহমানের বিদ্যা ও রসবোধ প্রবাহনকেও হার মানাত। দু'জনের দেখা হলেই একজন বলে, শয়তান, তো আরেকজন বলে, ডেভিল। এ বলে, লুসিফার, তো ও বলে, বীলজেবাব। তোমার মনে পড়ে, প্রবাহন?'

'বিলক্ষণ। ওকে আমি বিলেতেও পেয়েছিলুম, জানো? কিন্তু এক ইংরেজ ললনা ওর বুকের পাঁজর ভেঙে দেন। বিবাহিতা মহিলা। জীবনে ও আর নারীর মুখ দর্শন করবে না।' প্রবাহন সমবেদনার সঙ্গে বলে।

সমর বলতে যাচ্ছিল, বেশ হয়েছে, স্বদেশী মেয়ের কি দুর্ভিক্ষ যে বিদেশী মেয়ে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু হেলেনের দিকে চেয়ে কথাটা ঘুরিয়ে দেয়। 'ওঃ তাই নাকি! তবে তো খুব ভাবনার কথা ছেলেটা কি তা হলে জীবনভোর একলা থাকবে? কিন্তু যা বলছিলুম। বিয়ের পরে বিয়ের সাক্ষী দুটিকে আমাদের ওখানেই রাত কাটাতে হয়। দুই বন্ধুর জন্যে দুটো খাটিয়া পাই কোথায়? দুই দুশমনকেই এক তক্তপোষে শুতে বলি। একখানামাত্র রেজাই। তাই নিয়ে দু'জনাতে সারা রাত টাগ অব ওয়ার চলে। এ বলে, হি হি! আমার বাঁ পাশটা ঢাকা পড়ছে না। শীতে জমে যাচ্ছে। ও বলে, হি হি। আমার ডান পাশটা ঢাকা পড়ছে না। শীতে জমে যাচ্ছে। কেউ কাউকে চোখ বুজতে দেয় না। শেক্সপীয়ার মিলটন আউড়িয়ে কবিতার টুর্নামেণ্ট করে রাত কাবার করে দেয়।' সমর অভিনয় করে দেখায়।

হাসির ধুম পড়ে যায়। ইলেনও কৌতুক বোধ করেন। কেবল টুকটুক গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি তখন কনে বৌ। গৃহস্থালীর কোথায় কী আছে জানতুম না। আমাকে উনি যদি একবার জানাতেন আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করতুম।'

কবেকার কথা! প্রবাহন এতদিনে ভুলে গেছে। সমর যতটা বাড়িয়ে বলেছে ততটাও নয়। সঙ্গে শাল ছিল, জামিয়ার ছিল। ঘুম এসেছিল ঠিকই। তবে দেরিতে।

কী দুষ্টুমি যে মনে মনে এঁটেছিল টুকটুক আর সমর তা মালুম হয় বাড়ী ফিরে যে যার শয্যায় শুতে গিয়ে। মুখে কাপড় গুঁজে পালায় টুকটুক। আর সমর শয়তানের মতো মিট মিট করে হাসে। ওরা তাড়াতাড়ি ওদের ঘরে ঢুকে খিল দেয়।

প্রবাহনের ডাইভান সেই আরব্য উপন্যাসের রাজপুত্রের পালঙ্কের মতো পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। নিয়ে গিয়ে ভিন্ দেশের রাজকন্যার পালঙ্কের পাশে পেতেছে। দু'জনের একটাই বিছানা। একখানা মাত্র রেজাই।

'এ কী!' চমকে ওঠে প্রবাহন। ইলেনের দিকে তাকায়। তিনিও তেমনি চমৎকৃত।

ডাইভানটাকে যথাস্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে দু'জনের হাত লাগে, কিন্তু ইলেনকে দেখে মনে হয় দ্বিধান্বিত। এত রাতে এত শক্তিও নেই তাঁর। ঘোরাঘুরি তো বড়ো কম হয়নি।

'থাক, আমি ক্লান্ত।' তাঁর চোখের পাতা বুজে আসে।

অক্লান্ত কে? প্রবাহন। না, সেও হাই তুলতে থাকে।

একটু পরে আলো নিবে যায়। সমরের দুষ্টুমি। মেন সুইচ তারই শোবার ঘরে। সঙ্গে মোমবাতিও নেই। প্রবাহন নিরুপায় হয়ে বসে থাকে।

'আর জেগে থাকতে পারছিনে,' বলে ইলেন শয্যার আশ্রয় নেন।

'সুনিদ্রা হোক,' বলে প্রবাহন ঠায় বসে থাকে।

কিছুক্ষণ অসাড় থাকার পর ইলেন ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, 'জেগে আছো?'

প্রবাহন ঢুলছিল। বলে, 'ও কী! তুমি এখনো ঘুমোওনি!'

'তুমি জেগে থাকলে আমার ঘুম আসবে না।' তিনি সলাজভাবে বলেন।

'কী করি বল! একটি তো বিছানা।' প্রবাহন সঙ্কোচের সঙ্গে বলে।

'কিন্তু যথেষ্ট চওড়া।' ইলেন আর একটু সরে শোন।

'কিন্তু রেজাই যে মাত্র একখানা।' প্রবাহন ইতস্তত করে।

'ওটা তুমি একাই ভোগ করো। আমার কালকেও লাগেনি, আজকেও লাগবে না।' রেজাইটা তিনি প্রবাহনের দিকে ঠেলে দেন।

এর পরে আর ওজর আপত্তি খাটে না। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। প্রবাহন আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় উঠে একধার ঘেঁষে জড়সড়ভাবে শোয়। মাঝখানে প্রচুর

ব্যবধান। রেজাই দিয়ে সে সর্বাঙ্গ মোড়ে। রাতটা সত্যি বেশ ঠাণ্ডা। ইলেন শীতের দেশের মেয়ে, তাই তাঁর শীতবোধ কম। নইলে এ রেজাই কি তিনি অত সহজে ছেড়ে দিতেন ?

তন্দ্রার ঘোরে প্রবাহন শুনতে পায় কে যেন বলছে, 'হি হি! শীতে জমে যাচ্ছি!' আবার সেই শামসুর রহমান! রেজাই আমি বেহাত করছিনে, মিএল।

'আজ কেন এত শীত করছে ?' ইলেন কাঁপতে কাঁপতে বলেন।

'শীত করছে ? কার ? তোমার ? তুমি ইলেন ?' প্রবাহনের তন্দ্রা ভেঙে যায়।

'মিলটন শেক্সপীয়ার কোনো কাজেই লাগছে না। ওঘর থেকে তোমার কম্বলটা নিয়ে এস। হি হি! শীতে জমে যাচ্ছি।' ইলেন বোধহয় ভদ্রতার খাতিরে রেজাইটা ছেড়ে দিয়েছেন ও সেই অবধি শীতে কষ্ট পাচ্ছেন।

প্রবাহন তৎক্ষণাৎ রেজাইখানা তাঁর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে অন্ধকারে পা টিপে টিপে বসবার ঘরে যায় ও কম্বলের তল্লাস করে। ডাইভান যেখানে ছিল। বৃথা অন্বেষণ। টুকটুক সেটা আগেই বগলদাবা করেছে।

'কম্বলটা খুঁজে পাচ্ছিনে, ডারলিং। সমরকে জাগাতেও সাহস হয় না। তুমি আরাম করে শোও। আমি ওভারকোট গায়ে দিচ্ছি।' প্রবাহন ওটা হাতে করে এনেছে।

'ডারলিং, এ শীত আমি সইতে পারছিনে, তুমি পারবে! চলে এস আরো কাছে। মিলে মিশে গায়ে দিলে দু'জনেরই কুলোবে।' ইলেন অভয় দেন।

'যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় দু জন।' পাশাপাশি মাথা রেখে ওরা তালে তালে নিঃশ্বাস ফেলে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ? সেও তাল রাখে।

অবিশ্রান্ত, অবিস্মরণীয় নিশি। নিদ্রার পর জাগরণ। জাগরণের পর নিদ্রা। নিদ্রাতেও ওরা এক। একই স্বপ্নের শরিক। জাগরণে তো ওরা একই।

'তোমার শীত লাগছে না তো ? লাগলে আরো কাছে সরে এস।' একজন বলে আরেকজনকে। শেষে সরে আসবার মতো ঠাঁই থাকে না। তবু ওই একই কথা বলে যায়।

কত দেশ, কত যুগ পার হয়ে এসেছে ওরা। নিত্যলীলার নায়কনায়িকা। দেখেছে ও দেখবামাত্র চিনেছে। চিনেছে ও চিনতে পেরে ভালোবেসেছে। ওরা একমনে প্রার্থনা করে, একদেহেও, ওদের ভালোবাসা যেন ভগবানকে ভালোবাসা ও ভগবানের ভালো-বাসা হয়। আর সে ভালোবাসা যেন ক্ষণকালের জন্যেও বিরতি না মানে। লেশমাত্র ব্যবধান স্বীকার না করে। দূর যেন ওদের আরো নিকট করে। নিকট যেন ওদের একাত্ম করে।

'তোমার কাছে আমি কিছুই চাইনে। শুধু তোমাকেই চাই।' প্রবাহন গাঢ়স্বরে বলে।

'তা হলে তো সব কিছুই চাওয়া হয়ে যায়। তোমার প্রথম বাক্য আমাকে এমন চমকে দিল!' ইলেন সে চমক তখনো অনুভব করছিলেন।

'বৈষ্ণবরা যেমন ভগবানের কাছে কিছুই চায় না। শুধু ভগবানকেই চায়।' প্রবাহন ভাবাবেগে বলে। 'প্রেমের সাধনা ওই একই সাধনা। দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। আমার ভাষায় নয়, কবির ভাষায়।'

॥ চব্বিশ ॥

'ও কী! তুমি কাঁদছ কেন!' ইলেন আশ্চর্য হয়ে সুধান।

'অতি সুখে।' প্রবাহন ধরা গলায় বলে। 'অতি দুঃখেও বলতে পারো।'

'দুঃখ। কিসের দুঃখ তোমার।' ইলেন সহানুভূতির সঙ্গে শুনতে চান।

'সেসব অনেক কথা। আজকের দিনে অতীতের ইতিহাস মনে আনতে নেই। তবু আপনা হতে আসছে। আমি রোধ করতে পারছিনে। আমি অসহায়।' প্রবাহন নেতিয়ে পড়ে।

'বললে পরে হয়তো তোমার বুক হালকা হবে। যদি বলতে বাধা না থাকে। আমি কিছু মনে করব না, ডিয়ার। আমি যে তোমার সুখদুঃখের সঙ্গিনী।' ইলেন তার চোখ মুছিয়ে দেন ও চোখে চুমো খান।

প্রবাহন উপলব্ধি করে যে, সে যদি সুখী হতে চায় এই তার সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সে যদি সুখী করতে চায় তো একমাত্র ইলেনকেই সুখী করতে পাবে। আর কোনো নারীকে নয়। অন্যের প্রতি উদাসীন হতে হবে। মৃত্যুকালেও শয্যাপার্শ্বে যেতে পারবে না। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে পারবে না। জীবিতকালেও দূরত্ব রক্ষা করতে হবে। বন্ধুতা? বন্ধুতাও অশান্তি ডেকে আনতে পারে। ইলেনের অনুমতি নিয়ে ওঁরাই বা বন্ধু হতে রাজী হবেন কেন? সারিণী হয়তো বাঁচবেন না। বিয়াট্রিস হয়তো মর্মে আঘাত পাবেন। মীরা হয়তো মুক্তধারায় গা ভাসিয়ে দেবে।

'বলছ না যে? আমি কি বিশ্বাসের অযোগ্য?' ইলেন অভিমান করেন।

'তা নয়, ডারলিং। অতীতের জন্যে ভবিষ্যৎ হারাতে আমার ভয় করে। অথচ অতীতকে আমি এক কথায় নাকচ করতেও পারিনে। সেটাও একপ্রকার ভায়োলেন্স। নিজের উপর ভায়োলেন্স।' প্রবাহন যেন কিছুতেই বোঝাতে পারে না। বেগ পায়।

ইলেন তার উপর চাপ দেন না। বলেন, 'তবে থাক।'

'আমি ঋণী। প্রেমের ঋণে প্রীতির ঋণে ঋণী।' প্রবাহন ভাবের ঘোরে বলে যায়। 'সব ঋণ একসঙ্গে শোধ করাও চলে না, এক খোঁচায় খারিজ করাও চলে না। আমার মতো মানুষের বিয়ে করা কি উচিত? অথচ বিয়ে না করলে প্রেমের পরিপূর্ণতা হয় না। পরিপূর্ণ প্রেমের সুযোগই মেলে না। তুমি আমাকে যে সুযোগ দিয়েছ সে সুযোগ পূর্ণতম প্রেমের সুযোগ। আর কেউ তা দেয়নি, দিতে পারবেও না। ইলেন, তুমি আমাকে বাঁচালে। অন্তরের এত ভালোবাসা কেমন করে আমি বাইরে আনতুম? কেবল চিঠি লিখে আর কথা বলে?'

ঘুম কারো চোখে ছিল না। প্রবাহন বার বার ইংস্তত করে অবশেষে বলে যায় তার পুরাতন প্রেমের কাহিনী। এলোমেলো ভাবে। সংক্ষেপে।

'তুমি কী মনে করবে, জানিনে। কিন্তু আমারও কিছু বলবার ছিল। আমার পূর্বকথা। তা শুনে তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য নও। ডারলিং, আমি এদেশে বিয়ে করতে আসিনি। তার জন্যে প্রস্তুতও নই। ওদেশে আমার কাজ পড়ে আছে। কাজ না সেরে কেন যে এদেশে এসেছিলুম তার সত্যি কোনো অনিবার্য কারণ নেই পরে আবার আসব। তখন তোমার বন্ধু হব তুমি যেমন স্বাধীন ছিলে তেমনি স্বাধীন থাকবে। আমি যদি তুমি হতুম মীরাকেই বিয়ে করতুম। তোমার পক্ষে উচিত ছিল মীরার জন্যেই অপেক্ষা করা। বলতে বলতে ইলেনের সান্নিধ্য তার উষ্ণতা হারায়।

'তা হয় না' ডিয়ার। প্রবাহন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে 'তোমার যদি বিয়ে করতে ইচ্ছা না থাকে তোমাকে আমি ধরে রাখব না। আমি যেমন স্বাধীন ছিলুম তেমনি স্বাধীন থাকব। কিন্তু মীরার জন্যে অপেক্ষা করব না। তার সঙ্গে আমার সামঞ্জস্য হবার নয়। মীরার মাতৃত্ব আমার পিতৃত্ব নয়। পিতৃত্ব যার তার সঙ্গেই ওর সামঞ্জস্য হবে। ও যদি মুক্তি চায় আমি ওর ভাই সুবাদে ওকে সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছি। কিন্তু যদি প্রেম আশা করে তবে আমি পলাতক। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু মীরার সঙ্গেও হবে না।'

ইলেন প্রতিবাদ করে বলেন, একটি মেয়ে একজনের সন্তানের মা হয়েছে বলে আরেকজনের সঙ্গে তার প্রেম বা পরিণয় বা সামঞ্জস্য হবে না, তোমার এ তত্ত্ব কোনো আধুনিক নারী মানবে না। হয়তো আর কোনো কারণ আছে, সেটা বোধহয় তুমি খুলে বলতে ভরসা পাচ্ছ না।' তিনি ঘুমের উদ্যোগ করেন। প্রবাহনকেও বলেন আর জেগে না থাকতে।

'ডারলিং, ওটা হয়তো নিছক অনুমান। অনুমান হয়তো অমূলক। সেইজন্যে এতক্ষণ বলিনি। প্রথম দর্শনের দিনই আমার কেমন যেন উপলব্ধি হয় যে ও আমার পৌরুষকে

প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি ওর কল্পনার পুরুষোত্তম নই। ওর নারীত্ব যার কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে। বিয়ে করত কি না বোঝা যেত আরো কয়েক বছর সবুর করলে। কিন্তু সে হতো না আমার সন্তানের। সেইটেই তো প্রেমের চরম পরীক্ষা।' প্রবাহন যা বলবার নিঃশেষে বলে।

'তোমার মনের কোন্‌খানে কাঁটা ফুটে রয়েছে তা আমি বুঝেছি।' ইলেন ওকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আপনি ঘুমিয়ে পড়েন।

পরের দিন প্রাতরাশের সময় টুকটুক গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করে, 'কী দাদা ঘুম কেমন হলো তোমার? আর বোন ইলেন, তোমার সুনিদ্রা হয়েছে তো?'

'কবিতার টুর্নামেন্ট ছাড়া আর কী হতে পারে!' সমর শয়তানী হাসি হাসে।

প্রবাহন পাশ কাটিয়ে যায়। বলে, 'শোন, আমরা একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজকেই আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। সেখানে বিয়ের জন্যে কেনাকাটা করে কর্মস্থলে যাব ও ছুটির দরখাস্ত করব। ইলেন এখানে থাকছেন বিয়ের নোটিশ দিতে। ততদিন তোমরা কি দয়া করে ওঁকে তোমাদের সঙ্গে রাখবে?'

'কী যে বল, দাদা!' টুকটুক রাগ করে। 'আমরা কি ওঁর কেউ নই, তুমিই সব? দয়া করে নয়, আদর করে। পরম সমাদরে রাখব।'

'প্রবাহনটা একটা গাধা। কী করে ওকে আমি বোঝাই যে এ বিয়ে আমরাই দিচ্ছি? ওরা শুধু মেহেরবানী করে মন্তরটা পড়বে। শাস্ত্রীয় মন্ত্র নয়, সিভিল মন্ত্র। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে আমি আজকেই ডেকে পাঠাচ্ছি। পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হবে। ডেপুটি কমিশনারের দক্ষিণ হস্ত হবার ওই এক মস্ত সুবিধে।' সমর গোঁফে তা দেয়।

ইলেনকে নিয়ে সেদিন সকালবেলা প্রবাহন তার পরম হিতৈষী সাহিত্যিক প্রধান বীরেশ্বর চক্রবর্তী ও তাঁর পত্নীর আশীর্বাদ চাইতে যায়। জলাপাহাড়ে তাঁরা অবকাশ যাপন করছেন। 'আমার ফিয়াঁসী মিস ইলেন সুইনারটন।' এই বলে পরিচয় দেয়।

'Elaine the fair, Elaine the lovable,

Elaine, the lily maid of Astolat'

ইত্যাদি পদ আবৃত্তি করতে করতে অভ্যর্থনা করেন চক্রবর্তী সাহেব। ইলেন ও প্রবাহনের প্রণাম গ্রহণ করেন তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন।

মিসেস চক্রবর্তী ইলেনকে ভিতরে নিয়ে যান। প্রবাহন চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্প করে।

'টেনিসনের ওইসব কবিতা পড়ে কী যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি তোমাদের বয়সে! নারীত্বের একটা আদর্শ, পৌরুষের একটা আদর্শ ওর মধ্যে ছিল। শিভালরির দিন বিগত হতে পারে, আমরা কেউ হয়তো নাইট বা লেডী নই। তবু আদর্শটা এ যুগেও অম্লান।'

চক্রবর্তী পানপাত্রে চুমুক দিয়ে বলেন, 'কিন্তু ইংলণ্ডের কী হয়েছে, বল তো? মহাযুদ্ধে কি সব কিছুই বিপর্যস্ত? টেনিসন আজ কেউ পড়তে চায় না কেন?'

প্রবাহন সহসা কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। বলে, 'কবিতাই বা ক'জন আজকাল পড়ে? যত নাম হয় তত আয় হয় না।'

'মোট কথা আদর্শবাদ জিনিসটাই লোকের শ্রদ্ধা হারিয়েছে। ওরা চায় বাস্তববাদ। বেশ, ওরা যা চায় তা ওরা পাবে। কিন্তু আমাদের হাত দিয়ে কেন? আমরা আমাদের কলম লোকের কাছে বন্ধক রাখিনি। ভাগ্য ভালো যে আমার অন্য একটা পেশা আছে, আমাকে লেখার আয়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। তুমিও পেশাদার নও। তোমার চাকরিই তোমাকে বাঁচাবে।' চক্রবর্তী আশাদের বাণী শোনান।

'আপাতত পাঁচ বছর তো আমি বাঁচি। পরে বাঁচব কি না ভগবান জানেন।' প্রবাহন বলে একাধিক অর্থে। উপন্যাস শেষ করতে পাঁচ বছর লাগবে। তার আগে জীবিকার পরিবর্তন কাম্য নয়।

'উঁহু, ওটা কোনো কাজের কথা নয়। তোমাকে আরো অনেক বছর বাঁচতে হবে। অন্তত ইলেনের খাতিরে। বিয়ে যারা করে তাদের দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। তুমি বিয়ে করছ শুনে খুব খুশি হয়েছি আমি। আমার আশঙ্কা ছিল যে তুমিও ল্যান্সলটের মতো চিরকুমার হবে। ইলেনের প্রেমের মর্যাদা রাখবে না। ল্যান্সলটের তবু একটা অজুহাত ছিল। তোমার তেমন কোনো অজুহাত নেই। তুমি তো আর্থারের রানী গুইনে-ভিয়ারকে সারাজীবন উৎসর্গ করে দাওনি। কী বল প্রবাহন!' তিনি মুচকি হাসেন।

প্রবাহন মাথা চুলকায়। 'না সার। সারাজীবন নয়।'

'ল্যান্সলট যখন গুরুতর আহত তখন ওই ইলেনই তাঁর শুশ্রূষা করে তাঁকে প্রাণ ফিরিয়ে দেন। তোমার হৃদয়ের ক্ষতটিও তো কম গভীর নয়। তোমার ইলেনও তোমাকে নিরাময় করবেন। অধিকন্তু তোমার চিরসঙ্গিনী হবেন। আশীর্বাদ চাইতে তোমরা যে আমাদের কাছেই সর্বপ্রথম এসেছ একথা ভেবে আমরা পরম আনন্দিত। আমরা যেমন পরস্পরের চিরসাথী তোমরাও তেমনি হও। এর চেয়ে বড়ো আশীর্বাদ আর কী হতে পারে।' তিনি প্রবাহনের হাতে ঝাঁকানি দেন।

ফেরবার পথে ইলেন ক্ষুণ্ণস্বরে বলেন, 'জানো, মিসেস চক্রবর্তী তেমন খুশি হননি। খাতির করলেন খুব, কিন্তু শুনিয়ে দিলেন যে, তোমরা বিদেশিনী কন্যারা যদি আমাদের ছেলেদের বিয়ে কর তবে আমাদের মেয়েদের বিয়ে করবে কে?'

প্রবাহন দুঃখিত হয়। 'আসলে ওটা ওঁর প্রশ্ন নয়, ওটা ওঁর প্রত্যুত্তর। একবছর আগে আমাকে ডেকে নিয়ে উনি একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান জানতে চেয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষিতা কুমারীদের যে সুপাত্র জুটছে না তার প্রতিকার কী হতে পারে।

আমি উত্তর দিয়েছিলুম, সব রকম গণ্ডী ভেঙে দিতে হবে। জাত ধর্ম ভাষা শ্রেণী ও দেশ। দিন ওদের সমুদ্রপারে পাঠিয়ে। হোক বিদেশীদের সঙ্গে বিয়ে। ভদ্রমহিলা তো হাঁ।'

'তুমি তো বেশ!' ইলেনের মুখে হাসি ফোটে।

'ওঁর স্বামী কিন্তু খুব খুশি। আমার অনুমান ভদ্রলোক বোধহয় আমার বয়সে আমারি মতো প্রেমে পড়েছিলেন তোমারি মতো কোনো বিদেশিনী কন্যার। বিয়ে হয়নি। খেদ ছিল। সেই থেকে স্ত্রীর মনেও একটা কম্‌প্লেক্স বাসা বেঁধে থাকতে পারে: নইলে এমনিতেই উনি অতি স্নেহশীল ও পরোপকারী। দেখবে আমাদের বিয়েতে আসবেন।'

॥ পঁচিশ ॥

সমর প্রবাহনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। নিভৃত বৈঠকে মিলিত হয় দুই বন্ধু।

'সবচেয়ে দরকারী কথাটা সবচেয়ে দেরিতে মাথায় আসে। প্রেমে পড়লে মানুষের হুঁশ থাকে না যে বিয়ে করতে চাইলে গুরুজনদের মত নিতে হয়। তোমার বাবা উদারমনা ব্যক্তি। আমাকে তিনি একবার বলেছিলেন যে প্রবাহন তার পছন্দমতো বিয়ে করতে পারে, আমি তাকে সংসারী দেখতে চাই, সন্ন্যাসী নয়। কিন্তু তখন কি তিনি জানতেন যে তুমি বিদেশে যাবে ও ফিরে এসে বিদেশিনী বিয়ে করবে? তাঁকে সব কথা জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করা চাই। তোমাকেই এ ভার নিতে হবে। সোজা গিয়ে দেখা করাই ভালো। আরো ভালো হতো যদি ইলেনকেও নিয়ে যেতে। কিন্তু তোমাদের একজন এখানে না থাকলে বিয়ের নোটিশ দেবে কে? ফিরে আসতে আসতে দেরি হয়ে যাবে যে! যেতে আসতে বারো শো মাইল। খরচটাও সামান্য নয়। কী উপায় প্রবাহন?' সমর ধাঁধায় পড়েছে।

'তাঁকে সব কথা জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু গুরুজনের অন্তর জয় করার জন্যে জয়ন্তদা আর তুমি যেমন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছিলে আমি তেমন পারব না। দেরি দেখলে ইলেন দেশে ফিরে যাবে। পরে আবার আসবে কি না অনিশ্চিত। বাবার সঙ্গে দেখা করতে বল তো আমি একাই যাব, ভাই। ওকে নিয়ে গেলে কোন্ সুবাদে নিয়ে যাব? ফিয়াঁসী বলে পরিচয় দিলে বাবা কি সেটা মেনে নিতে পারবেন? তা হলে তো বিয়েটাও মেনে নেওয়া হয়। একেবারে বিয়ের পরে নিয়ে গেলে ক্ষতি কী!' প্রবাহন ইলেনকে অপদস্থ হতে দেবে না।

এদিকে ইলেনেরও সেই একই সমস্যা। মা বাবার সঙ্গে দেখা না করে, ওঁদের মত না নিয়ে বিয়ে করলে ওঁরা কি মেনে নেবেন? একমাত্র কন্যা যে! কিন্তু দেখা করতে গেলে যদি ওঁরা ফিরে আসার পথ রোধ করেন? আরো পড়াশুনার জন্যে তো নয়। বিয়ের জন্যে। বিয়েতে মত না থাকলে দেশ ছাড়ার অনুমতি মিলবে কি। মনে তো হয় না।

টেলিগ্রাম করে ইলেন তাঁর স্বদেশযাত্রা রহিত করেন। আর বিমানডাকে চিঠি লেখেন তাঁর গুরুজনদের।

'তুমি কি আজ সত্যি যাচ্ছ, দাদা? ইলেনের মুখখানা যদি দেখতে! শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে।' টুকটুক প্রবাহনের রওনা হবার সময় বলে।

'ওটা বোধহয় বাপ মার ভয়ে। বেচারি মেয়ে জানত না যে ভারতভ্রমণে এসে মোগলদের হাতে পড়বে! পড়েছে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' প্রবাহন বলে। আর শক্ত হাতে ইলেনের হাত ধরে।

'না, না, ওটা বিরহের দুঃখ। তা হলে তুমি ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও। আমরা কি ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারব?' টুকটুক সমব্যথীর মতো বলে।

'কিন্তু তা হলে বিয়ের নোটিশ কলকাতায় গিয়ে দিতে হয়। ইলেন যে চায় দার্জিলিং-এ বিয়ে করতে। হরপার্বতীর বিয়ে তো পর্বতেই হয়েছিল।' প্রবাহন ইলেনের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকায়।

'বেশীদিন দেরি কোরো না। আমি তোমার জন্যে ভাবব।' ইলেন ম্লান মুখে হাসির আভা ফোটান। প্রবাহনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে সুস্মিতা।

সেবার দার্জিলিং মেলে ইলেনকে স্বাগত জানাতে প্রবাহন গেছল। এবার প্রবাহনকে তুলে দিতে যান ইলেন। মাঝখানে ছুটিমাত্র দিন। ওই দুটি দিনের মধ্যেই ওরা বন্ধু বন্ধুনীর থেকে প্রণয়ী প্রণয়িনী হয়েছে, প্রণয়ী প্রণয়িনীর থেকে বর বধূ হয়েছে।

ট্রেন যখন ছেড়ে দেয় ঘন ঘন রুমাল নাড়তে থাকে দু'জনে। ট্রেন যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন ইলেনের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে, তিনি চোখে রুমাল দেন।

আগে বাগ্‌দানের আংটি কিনবে, না সরাসরি বিয়ের আংটি কিনবে প্রবাহন? কলকাতা গিয়ে এই তার প্রথম কৃত্য। এ জন্যে সে অধীর হয়ে ছুটেছিল। এ যাত্রা সে যার অতিথি সেই শ্যামবরণদা বলেন, 'আর বাগ্‌দানের আংটি কেন? ওই বিয়ের আংটিই যথেষ্ট। আপাতত একখানা ঢাকাই শাড়ী কিনে পাঠিয়ে দাও দেখি। এখন থেকে এদেশের মেয়ে হতে হবে।'

শ্যামদা এত খুশি হয়েছিলেন যে বিয়েটা যেন তাঁরই। নিজের বেলা যা যা করতেন প্রবাহনকেও তাই করতে পরামর্শ দেন।

'এবার তোমার পালা।' প্রবাহন সঙ্কেত করে।

'কোথায় মেয়ে! কাকে বিয়ে করব! বিয়ে তো একা একা হয় না।' তিনি উদাস কণ্ঠে বলেন। 'জল। জল। চতুর্দিকে জল। কিন্তু একটি ফোঁটাও পান করবার মতো নয়।'

প্রবাহন তার আপন আনন্দ ভুলে গিয়ে বন্ধুর বিষাদে বিধুর হয়। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় সুযোগ শ্যামদা যত বেশী পেয়েছেন প্রবাহন তার সিকিভাগও নয়। তবু করুণা ওদের তাঁর ভাগ্যেই কম। কেন এমন হয়।

এই সুন্দর ধরণীতে কেন কেউ প্রেমহীন আনন্দহীন হবে! নারীর জন্যে পুরুষ পুরুষের জন্যে নারী কি যথেষ্ট সংখ্যায় নেই? প্রবাহনের ইচ্ছা করে সবাইকে তারই মতো সৌভাগ্যের অধিকারী দেখতে।

খানিকটে তোমার সাহস, বাকীটা তাঁর করুণা। একটিবার সাহস করে বলতে হয় যে, আমি তোমায় ভালোবাসি। মুখের ভাষায় বলতে না পারলে চোখের ভাষায় বল। পরশও পরশমণি হতে পারে। কিন্তু সম্ভব অসম্ভবের গণনা ত্যাগ না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। শ্যামবরণদা গণনা করতে করতেই মাহেন্দ্রক্ষণটি হারান। সুপ্ত সিংহের বিবরে কোন্ মৃগ এসে প্রবেশ করবে। যে আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বেলা গড়িয়ে যায়।

মাহেন্দ্রক্ষণ? হ্যাঁ, বিশেষ একটি মুহূর্ত আছে, সেটিতে যা করতে চাইবে তাই হবে। সে মুহূর্তটিকে বয়ে যেতে দিলে আর তা হবে না। প্রবাহনের জীবনে সেই মুহূর্তটি বার বার এসেছে, কিন্তু আংশিক করুণা নিয়ে। এইবার এল পূর্ণ করুণা নিয়ে। এখন যদি সে বিয়ে না করে তবে আর কখনো কি তার বিয়ে হবে? তার বাবা যাই মনে করুন ইলেনকে সে এই শুভলগ্নেই বিয়ে করবে।

'বাবাকে কী লেখা যায়, বল তো?' সে শ্যামদার পরামর্শ চায়।

'কী লেখা যায়?' শ্যামদা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলেন, 'সটান চলে গিয়ে দেখা করো। শতং বদ মা লিখ। ওই প্রেম ক্রেম বাদ দিয়ো। গুরুজনকে ওভাবে বলা যায় না। বলতে পারো তোমার বন্ধুরা সকলে একমত যে অমন মেয়ে লাখে একটি দেখা যায়। দৈবাৎ কপালে মেলে। তোমাকে আমি জ্যোতিষীর অভিমত সংগ্রহ করে দেব। বিবাহের পক্ষে যে কোনো দিনই শুভদিন। শুভস্য শীঘ্রম্। তবে এটাও তোমরা ভেবে দেখবে হিন্দুমতে একটা অনুষ্ঠান যোগ করলে কেমন হয়।'

না, শ্যামদা। ইলেনকে আমি হিন্দু হতে দেব না। ইলেন স্বয়ং যদি চায় তা হলেও না। প্রেমের জন্যে ধর্মান্তর প্রেমের মহত্ব খর্ব করে। আর পরিণয়ের জন্যে ধর্মান্তর একপক্ষের না একপক্ষের উপর অবিচার ছাড়া কিছু নয়। আমার বাবা যদি এটা না

বোঝেন তো ইলেনের মা বাবাও কি বুঝবেন ? ভুলে যেয়ো না যে গুরুজনকে বোঝানোর দায় ইলেনেরও আছে।' প্রবাহন মনে করিয়ে দেয়।

কলকাতায় তার আরো একটি কৃত্য ছিল। রানী বৌদির খোঁজ-খবর নেওয়া। সে শুধু এইটুকুই জানতে চায় যে তিনি বেঁচে আছেন ও ভালো আছেন। দর্শনের অভিপ্রায় তার নেই। মল্লিকাদিকে টেলিফোন করতেই তিনি সংবাদ দেন যে বৌদির জ্বর ছেড়ে গেছে ও তিনি চন্দননগর ফিরে গেছেন। প্রবাহন যে এত সত্বর দার্জিলিং থেকে নামবে তা তো তিনি ভাবতে পারেননি। নইলে আরো কয়েকদিন থেকে যেতে পারতেন। প্রবাহন হঠাৎ নেমে এল কেন, এর উত্তর দিতে ইতস্তত করে। শুনলে রানী বৌদি কী মনে করবেন কে জানে! হয়তো আবার অসুস্থ হবেন। বলে, একটা জরুরি কাজে এসেছি।

কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে সে প্রথমেই করে ছুটির জন্যে দরখাস্ত। তারপরে বাবাকে চিঠি লিখে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

ছেলের ষোল বছর বয়স হলে তার সঙ্গে মিত্রের মতো আচরণ করতে হয় চাণক্য পণ্ডিতের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলেও ছেলেকে তিনি নিজের ইচ্ছা-মতো বাঁচার সীমাহীন স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বিবাহের স্বাধীনতাও তার অঙ্গ। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা প্রত্যাশাও ছিল। সে যেন অসংসারী না হয়, সন্ন্যাসী না হয়। কিংবা সংসার করতে গিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়। অসবর্ণে তাঁর আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে কোনো শ্রেণী নয়। একটা না একটা শক তাঁকে দিতে হতোই। মীরার সঙ্গে বা বিয়াট্রিসের সঙ্গে বিয়ে হলে কি তিনি কম আঘাত পেতেন ? বিয়ে না করে অনুরাগ-বৈরাগী হওয়া যে তাঁর গৃহী বৈষ্ণব চিত্তে পুলক সঞ্চার করত তাও নয়। আর পাশ্চাত্য শিল্পীদের সঙ্গে জুটে তাঁদের অনেকের মতো বোহিমিয়ান হওয়া তো তাঁর কল্পনার বাইরে। প্রবাহনের বিয়ের সম্বন্ধ তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আসত। তিনি বলতেন প্রবাহন যা ভালো বোঝে করবে। ওকে তিনি বাধ্য করবেন না।

ইলেন সম্বন্ধে সব কথা সংক্ষেপে লিখে প্রবাহন তার বাবাকে তার বিয়ের সিদ্ধান্ত জানায়। মানুষের জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ অপ্রত্যাশিতভাবেই আসে। সেই মুহূর্তটিকে বয়ে যেতে দিলে সেটি হয়তো দ্বিতীয়বার আসবে না। পরে যেটা হবে সেটা হয়তো আর পাঁচজনের মতো গতানুগতিক ধারায় বিবাহ। প্রবাহনের আত্মার পরাজয়। আর নয়তো শেষপর্যন্ত সে অপরাজিত রয়ে যাবে। তার মানে অপরিণীত।

'আপনি যদি আমাকে সংসারী দেখতে চান, বাবা, তবে আশীর্বাদ করুন, ইলেনের ও আমার মিলিত জীবন যেন আমাদের পরিপূর্ণতা দেয়।'

আশীর্বাদ। অনুমোদন নয়। অনুমোদন চাইতে তার ভরসা হয় না। অনুমোদন

যদি না পায় তা হলে কি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করবে ? না, কোনো সম্মানসম্পন্ন পুরুষ তেমন কাজ করতে পারে না। অনুমোদন না মিললেও বিয়ে যথাকালে হবে।

ওদিকে ইলেন তাঁর গুরুজনের আশীর্বাদ তথা অনুমোদন চেয়েছেন, না কেবল আশীর্বাদ, প্রবাহন ঠিক জানে না। যদি অনুমোদন না পান তা হলে কি তিনি বিয়ে করবেন, না আরো সময় চাইবেন ও দেশে ফিরে গিয়ে গুরুজনের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন ? এমন অনিশ্চিত অবস্থায় সবাইকে বিয়ের বার্তা জানানো যায় না। ছুটির দরখাস্তে বিয়ের উল্লেখ করে, কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে সেটা অনুক্ত রাখে প্রবাহন। তার অনুরোধে মিস্টার মুখার্জি সেটা কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্টান্টের হাতে দেন।

'কার গুপ্টা', মুখার্জি মনের দুঃখে হাসেন, 'আমিও ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছি, জানেন। স্কট ফিরে এলে আমার কি আর সিনিয়র ডেপুটি পদে ফিরে যাওয়া মানায় ? সিমুলতলায় বাগানবাড়ী কিনেছি, সেইখানেই চার মাস কাটবে। বিয়ের পরে বৌ নিয়ে যখন আসবেন তখন আমাকে আপনারা পাবেন না, কিন্তু আমার অভিনন্দন পাবেন।'

'কী আফসোস।' প্রবাহন সত্যি দুঃখিত হয়। এই ক'মাসে সে তাঁর পক্ষপাতী হয়েছে। ইলেনকে সার্কিট হাউসে থাকার অনুমতি দিয়ে তিনি তাদের বিশেষ উপকার করেছেন। নয়তো ইলেনের আসাই হতো না।

নিশীথকে জানায় কার সঙ্গে বিয়ে। সে তা শুনে হো হো করে হাসে। 'তোমাদের ধারণা আমার চশমার কাচ পুরু বলে আমি কিছুই দেখতে পাইনি। দিনের পর দিন দু'জনে দু'খানা বাই-সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছ, তার একখানা তো আমার। জানতুম তোমরা প্রেমে পড়েছ, আমার সঙ্গ চাও না। তাই চুপচাপ বাসায় বসে কাজকর্মে ডুব দিয়েছি। তোমাদের বিয়েতে আমারও কিছু অবদান আছে, প্রবাহন।'

কথাটা ঠিক। একটি বিয়েতে বহুজনের হাত থাকে। একটি প্রেমেও।

কিন্তু আমার তো সে সময় জানা ছিল না যে প্রেমে পড়েছি। একমাস পরে কলকাতায় যখন দেখা হয় তখনো না।' প্রবাহন স্বীকার করে না।

'প্রেমে যারা পড়ে তাদের কি হুঁশ থাকে ?' নিশীথ অট্টহাস্য করে।

'তবে তুমি আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলে না কেন ?' প্রবাহন হাসিতে যোগ দেয়।

'নাঃ। আমিও কল্পনা করতে পারিনি যে ইলেন থাকতে এসেছেন। যাক, তোমরা বিয়ে করো ও সুখী হও। আমার অভিনন্দন।' নিশীথ ডান হাত বাড়িয়ে দেয়।

॥ ছাব্বিশ ॥

নারীর প্রেম বহুভাগ্যে মেলে। ইলেনের মতো নারীর প্রেম তো আশাতীত সৌভাগ্য। প্রবাহন মনঃস্থির করে ফেলেছে। একবার মনঃস্থির করলে সে আর দোলায়মান হয় না। শেষকালে এই নিয়ে বাবার সঙ্গে, ভাইবোনদের সঙ্গে, আপন জনদের সঙ্গে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ ঘটে যাবে না তো? ঘটে যদি সে নাচার।

'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

হাঁ, তার জন্যেও সে প্রস্তুত। বিয়ের পরে ইলেনের আর তার সাধনা হবে তাঁদের অন্তর জয় করা। কিন্তু বিয়ের আগে নয়। বিয়ে যেন একটা ট্রেন। কারো জন্যে দাঁড়াবে না। দেরি হলে ধরতে পারা যাবে না। এর পরে আর কোনো ট্রেন নেই। 'নাউ অর নেভার'।

'আশীর্বাদ চাইলেও পাবে, না চাইলেও পাবে।' বাবা'র উত্তর। 'কিন্তু একটিবার ভেবে দেখবে তোমাদের ছেলেমেয়ে হলে কোন্ সমাজে তাদের বিয়ে হবে। আমি যখন এ সমস্যার কূল খুঁজে পাইনে তখন অনুমতি দিই কী করে?' আরো লিখেছেন, 'আর আমার অনুমতি চায়ই বা কে? সেকালে বাল্যবিবাহ ছিল, তাই বরকর্তা বলে একজন থাকতেন। একালে তিনি বাহুল্য। তা ছাড়া কন্যাকর্তা না থাকলে বরকর্তা বা থাকেন কী করে।'

বোঝা গেল তিনি যোগ দেবেন না। কিন্তু বাধাও দেবেন না। প্রবাহনের জীবনের সব চেয়ে আনন্দের দিনে তিনি নেই, কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে আনন্দ করতে চাইলে যত খুশি করা যায়। প্রবাহনের মনে ব্যথা লাগে। আরো ব্যথা লাগবে ইলেনের মনে। কী উপায়। যাবে নাকি একবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে?

হয়তো যেত. কিন্তু হঠাৎ সমরের টেলিগ্রাম 'বিয়ের তারিখ এগিয়ে দিতে হয়েছে। চলে এস জলদি।'

বিয়ে পেছিয়ে যাবার সম্ভাবনাই এতদিন ছিল। এগিয়ে আসার কল্পনা কেউ করেনি। কেন, বুঝতে পারে না প্রবাহন। ইলেনের চিঠিতেও আভাস নেই। মিস্টার মুখার্জির শরণ নেয়। ক্যাজুয়াল লীভ যদি দয়া করে মঞ্জুর করেন।

'যত পাওনা তার চেয়ে দু'দিন বেশী দিচ্ছি, ইয়ংম্যান। বলিনি সেবার ক্যাজুয়াল লীভ অকারণে নষ্ট না করতে? কখন কী কাজে লেগে যায়, কে বলতে পারে?' রক্ষণশীল হলেও তিনি এ বিবাহের বিরোধী নন। শুভকামনা জানান।

প্রবাহন সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং রওনা হয়ে যায়। সেবার যেমন সে ইলেনকে স্টেশন

থেকে নিতে এসেছিল এবার তেমনি ইলেন আসেন তাকে নিতে। ওঁর চোখে মুখে আনন্দের জোয়ার। কিন্তু প্রবাহনের অনিশ্চয় দূর করেন না। বলেন, 'দাদার কাছে শুনবে।' সমর ইতিমধ্যে ওঁর দাদা হয়ে বসেছে।

কর্তা তখন আপিসে। টুকটুক বলে, 'কী ভালো বৌ যে তুমি পেয়েছ, প্রবাহনদা, তুমি তা জানো না। কী ভালোবাসাই না বাসে তোমাকে! কিন্তু 'পেয়েছ' কেমন করে বলি? অপেক্ষা করলে হারাবে।'

যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নোটিশ দেবার কথা তিনি পূজার সঙ্গে মিলিয়ে লম্বা ছুটি নিয়েছেন, কালীপূজার পরে ফিরবেন। এখন একমাত্র উপায় অন্য একটা আইনে বিয়ে করা। যদি গুরুজনের অমতে বিয়ে করতে ইলেনের অনিচ্ছা না থাকে। সে আইনে নোটিশের মেয়াদ স্বল্প।

প্রবাহন এসবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ভাবনায় পড়ে। ইলেনকে সুধায় তাঁর পিতার অমতে তিনি বিয়ে করবেন কি না। তিনি বলেন, 'তুমি যা বলবে তাই হবে।'

এমনি করে ইলেন প্রবাহনের উপরে ছেড়ে দেন। ও যদি রাতারাতি বিয়ে করতে তৈরি থাকে তবে ইলেন ওর। যদি গড়িমসি করে তবে হয়তো ওর নন। কোনো একটা বিষয়ে ভালো করে ভেবেচিন্তে মনঃস্থির করতে ওর একযুগ লাগে। কিন্তু বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওর নিয়তি ওকে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছোটায়। ইলেনের মতো মেয়ে হয়তো পাওয়া যাবে একদিন, কিন্তু ইলেনের মতো ভালোবাসা আর কেউ কোনোদিন ওকে ভালোবাসেনি ও বাসবে না। সেও কি আর কাউকে অতখানি ভালোবাসবে?

প্রবাহন বলে 'প্রেমিকপ্রেমিকা পরস্পরকে যে চোখে দেখে একজনের গুরুজন কি অপরজনকে সেই চোখে দেখেন? তবে সুযোগ পেলে তাঁদেরও অন্তর জয় করা যায়। সেই সুযোগটা আমাদের বেলা অনুপস্থিত। আমি ওদেশে যেতে পারছিনে। তুমি এদেশে থাকতে পারছ না। যদি না অবিলম্বে বিয়ে কর।'

'তুমি যা বলবে তাই করব।' ওই এক কথা ইলেনের।

'আমি বলব যে গুরুজনের অন্তর জয়ের সুযোগ জীবনে আবার আমরা পাব, কিন্তু পরিণয়ের সুযোগ একবার হাতছাড়া হলে আর কোনোদিন আমাদের হাতে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। তোমার বা আমার মনে যদি দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে তবে চল আমরা এগিয়ে যাই।' প্রবাহন স্বপ্নচালিতের মতো বলে।

'চল আমরা এগিয়ে যাই।' স্বপ্নচালিতের মতো ইলেন যেন মন্ত্রপাঠ করেন।

বিয়ের দিন সমর বহু বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চক্রবর্তী দম্পতী। ইলেন তখন শাড়ী সিঁদুর শাঁখা ও লোয়া পরে পুরোদস্তুর বঙ্গবধূ।

প্রবাহনও জোড় পাঞ্জাবী পরে রীতিমতো বাঙালী বর।

ও যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। যাকে চেয়েছিল তাকে পেয়েছে। তবু ওর মনটা বিরস। সব সম্প্রদায়ের ত্রিশ চল্লিশ জন শুভার্থীর সমাগম যেন আরো বেশী করে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আত্মীয়রা কেউ যোগদান করেননি। করবেন কী করে, বিয়ের খবর পাবার আগেই বিয়ে। নিশীথ আসতে পারেনি ব্যক্তিগত কারণে। শ্যামবরণও না।

সেইসঙ্গে আরো একটা চিন্তা ওকে বিকল করে। ওর মুক্তির প্রহর ফুরিয়ে গেল। ওর মুক্তি চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। এখন থেকে ও বিবাহিত পুরুষ। শত সুখের হলেও বিবাহ একটা বন্ধন। যারা গুরুজনের নির্বন্ধে বাঁধা পড়ে তারা ভিতরে ভিতরে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়লে তেমন কোনো ফস্কা গেরো নেই। এর পরে যার সঙ্গে যে সম্পর্ক সব অন্তরূপ হবে। যেমনটি ছিল তেমনটি নয়। হায় বিয়াট্রিস!

নিরানন্দ ইলেনেরও অন্তরে। গুরুজন কি ক্ষমা করবেন! কিন্তু নিরানন্দকে ছাপিয়ে ওঠে আনন্দ। বিয়ের পর মেয়েদের চেহারা বদলে যায়। ইলেনের রূপান্তর প্রবাহনকেও বিস্মিত করে। ও মেয়ে যেন চিরদিনই বৌ ছিল। বৌ হয়েই জন্মেছে, বৌ হতেই জন্মেছে। পরিণয় যে মতেই হোক না কেন ওটা যেন একপ্রকার ম্যাজিক।

'মিসেস করগুপ্ত' এই ডাকটি প্রথমবার শুনে তিনি উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। একে একে সবাই এসে ওই নামে ডেকে অভিনন্দন জানিয়ে জান। শেষে প্রবাহনও বলতে আরম্ভ করে, 'কেমন আছেন, মিসেস করগুপ্ত?'

মিস থেকে মিসেস, হুইনারটন থেকে করগুপ্ত ওই যে পরিবর্তন ওটা একপ্রকার ম্যাজিক। ওতেও রূপান্তর ঘটায়। সেইজন্যে মেয়েদের জীবনে বিবাহ একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। ইলেন তন্ময় হয়ে সেই ঘটনার মধ্যমণি হন।

ভোজনপর্বের পর সবাই একে একে বিদায় নিলে প্রবাহন ইলেনকে একান্তে পেয়ে বলে, 'আজকের ইতিহাসের নায়িকা তুমি, নায়ক আমি। ইতিহাস এই যে সুযোগটি আজ দিল এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

'আমরা কৃতজ্ঞ।' ইলেন পুনরুক্তি করেন।

রাত হয়েছিল। সমর ও টুকটুকের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে ওরা শুতে যায়। ততক্ষণে ওরা সমাজ সংসার ভুলে গেছে। জগতে ওরা ভিন্ন আর কেউ নেই। প্রেমিক আর প্রেমিকা। বর আর বধূ। নর আর নারী। পুরুষ আর প্রকৃতি। চিরন্তন যুগল।

দুইই বা থাকবে কেন? থাকবে এক। দুয়ে মিলে এক। লেশমাত্র দ্বৈত থাকবে না। বিন্দুমাত্র ব্যবধান থাকবে না। এক হতেই ওদের জন্ম। ওরা এক।

হে প্রভু, তোমার প্রীতি হোক। হে প্রভু, তোমার প্রীতি হোক। ওরা প্রার্থনা করে। আর প্রীতি দেয়। যা দেয় প্রিয়কে তাই দেয় দেবতাকে।

যে আনন্দ নিখিল বিশ্বের শিরায় শিরায় প্রবাহিত সে আনন্দ ওদের দু'জনের সমস্ত সত্তা জুড়ে সঞ্চারিত। বিশ্বব্যাপী সেই রাসলীলায় ওদেরও অংশ আছে। ওদের অংশ ওরা নেয়।

রাতের মাঝখানে ঘুম ভেঙে যায়। ইলেন বলেন, 'স্বপ্ন দেখছি না তো?'

প্রবাহন ওঁকে আদর করে বলে, 'স্বপ্ন নয় তো কী!'

'তুমি আমার এ কি স্বপ্ন?' ইলেন নিবিষ্ট হয়ে সুধান!

'না, এ সত্য। আমি তোমার। তুমি আমার। আমি তুমি। তুমি আমি।' প্রবাহন ওর প্রিয়তমাকে পরম নির্ভরতার বাণী শোনায়।

॥ সাতাশ ॥

পরের দিনই কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছ থেকে বিদায়। সমর উপদেশ দেয়, 'এমনভাবে বাঁচবে যেন সারাজীবনটাই হয় একটানা একটা হানিমুন। এখন তোমাদের হানিমুনে গিয়ে কী হবে?' নহিলে খরচ বাড়ে।

বলতে নেই, ভাঁড়ে মা ভবানী। ইলেন হাত খালি করে না দিলে বিয়েতে লোকজন খাওয়ানো হতো ধার করে। তাই মধুমাসটা ওরা কর্মস্থলেই কাটাবে বলে স্থির হয়। এবার ওরা সেখানে ফিরে যায় জোড়ে। ট্রেন থেকে নামেন মিস্টার ও মিসেস করগুপ্ত।

এর পরে দুটিতে মিলে শুরু হয় য'র নীড় বাঁধা। ওরা আপনাতে আপনি মগ্ন থাকে। ওদিকে নিশীথ বলে আরো একজন যে আছে তার দিকে দৃষ্টি পড়ে না। সে বেচারা প্রাতরাশের জন্যে অন্তহীন পদচারণ করে ক্ষুধায় কাতর ও ক্ষিপ্ত।

শেষকালে সেও স্থির করে যে তার বিয়ের তারিখটা এগিয়ে আনবে। এমনি করে দুই বন্ধুই বছর না ঘুরতে সংসারী হয়।

প্রবাহন যে সংসারী হতে সহজে রাজী হবে তার বাবা এতটা ভাবেননি। তিনি তো আশঙ্কা করছিলেন যে তাঁর ছেলে স্বদেশীওয়ালাদের মতো চিরকুমার হবে। দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করা অবশ্য গৌরবের বিষয়। তা বলে সন্ন্যাসী হওয়া তো সুখের কথা নয়। তিনি তো জানতেন না যে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেও মীরাকে বিয়ে করার জন্যে প্রবাহন বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল ও মীরাকে না পেয়ে যা হতে চেয়েছিল তাকে বলে বোহিমিয়ান। সন্ন্যাসীও নয়, সংসারীও নয়।

যাক, ও ছেলে সত্যি সত্যি সংসারী হয়েছে শুনে তাঁর একটা দুর্ভাবনা দূর হয়। যে

মেয়েটির জন্তে এই অঘটন সম্ভব হলো। সে যেই হোক না কেন সে তাঁর পরম উপকার করেছে। কত দূর দেশ থেকে সে এসেছে তার মা বাপকে ছেড়ে। তাঁর ছেলের জন্তে। একটু একটু করে তাঁর মন বদলে যায়। তিনি চিঠি লিখে বলেন যে বিয়েতে তাঁর ঠিক অমত ছিল না। তিনি কেবল ভবিষ্যতের কথা ভেবেই পেছিয়ে যান। তাঁর ছেলের বৌকে তিনি পর ভাবতে পারছেন না। ওকে দেখতে চান।

প্রবাহন ও ইলেন নিশীথের বিয়েতে যোগ দিতে যাবার জন্তে দিন গুনছে এমন সময় তারবার্তা আসে, ইলেনের পিতার গুরুতর অসুখ। মেয়েকে দেখতে চান। ইলেন তাঁর বাবাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। বাবার গুরুতর পীড়ার সংবাদে মুষড়ে পড়েন। পিতামাতার একমাত্র কন্যা। অশেষ আদরের দুলালী। বাপ যেমন মেয়েকে দেখতে চান মেয়েও তেমনি বাপকে। প্রবাহন কী করে মাঝখানে দাঁড়াবে? বরং সেই তাঁকে প্রবর্তনা দেয়।

কিন্তু এদিকে স্বামীকে ছেড়ে যেতেও তার বিন্দুমাত্র প্রেরণা ছিল না। এমন সঙ্কটেও কেউ পড়ে। অবশেষে তিনি মনঃস্থির করেন। বলেন, 'তুমি যদি আমাকে কথা দাও যে তুমি ভালো থাকবে, শরীরের অবহেলা করে অসুখ বিসুখ বাধাবে না, তা হলেই আমি যাব। যাব আর আসব।'

প্রবাহন কথা দেয়। 'তোমাকেও ভালো থাকতে হবে। নিজের যত্ন নিয়ো।'

প্রেমের মধুমাস ফুরোতে না ফুরোতেই নীড় থেকে একটি পাখীর সুদূরযাত্রা। মনটা উদাস হয়ে যায়। তবু ভালো যে বিচ্ছেদ নয়, বিরহ।

বম্বে থেকে সমুদ্রযাত্রার আগে ইলেনকে তাঁর শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর শ্বশুর তাঁকে ঘরে তুলে বলেন, 'বৌমা, এই পুরোনো গয়নাগুলি তোমার জন্তে রেখে গেছেন তোমার শাশুড়ী। কত সাধ ছিল বৌ আনবেন। দেখে যেতে পারলেন না। তুমি হয়তো ব্যবহার করবে না। তবু যত্ন করে রেখে দিয়ো। পরে যারা আসবে তাদের দিয়ো। পুরোনো হলেও তোমার শাশুড়ীর স্নেহের দান।'

ইলেন মাথা পেতে নেন। প্রবাহন মার কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়। বেচারি মা! যাবার সময় ছেলেকেও দেখে যেতে পারেননি। সে তখন বাইরে।

ইলেনকে জাহাজে তুলে দেবার জন্তে প্রবাহনও বম্বে যায়। সারাপথ ওরা বিরহকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে। ইলেন তো স্বীকারই করতে চান না যে সত্যি যাচ্ছেন। প্রবাহন কিন্তু জানে যে মিলনটাই মায়া, বিরহটাই সত্য। কিন্তু চোখ বুজে থাকে।

শেষের রাতটি কাটে ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের রিটায়ারিং রুমে। লোকে বলে দুঃখের নিশি পোহাতে চায় না। কিন্তু দুঃখটা যদি হয় আসন্ন বিরহের দুঃখ তা হলে কিন্তু সে রাত চায় সকাল সকাল পোহাতে। সমস্তক্ষণ ওরা দেয়ালঘড়ির কাঁটার দিকে

চেয়ে থাকে। একটার পর দুটো। দুটোর পর তিনটে। কোথায় নিদ্রা! চোখে চোখ রেখে মুখে মুখ জুড়ে প্রতি অঙ্গে প্রতি অঙ্গ জড়িয়ে গেঁথে ওরা ভাবে কেউ ওদের ছাড়াছাড়ি ঘটাতে পারবে না।

সাতসমুদ্র এর কাছে কিছু নয়। এমন ভালোবাসা কেউ কখনো দেখেনি। সেই-জন্যেই তো প্রত্যয় হয় যে রাধাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। রাধা তার প্রেমিকের কাছে ফিরবেই। প্রবাহন তো কেবল স্বামী নয়, তার চেয়েও বড়ো কথা ইলেনের সে প্রেমিক।

'তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব না।' ইলেন কথা দেন তাঁর স্বামীকে। যে স্বামী তাঁর প্রণয়ী।

'তোমাকে ছেড়ে আমিও থাকব না। প্রবাহন কথা দেয় তার স্ত্রীকে। যে স্ত্রী তার প্রণয়িনী।

পরের দিন স্বপ্ন হয়ে যান ইলেন। প্রথমে অদৃশ্য হয় তাঁর দেহ। তারপরে তাঁর জাহাজ। জাহাজঘাটে পাগলের মতো রুমাল নাড়তে থাকে বিরহী যক্ষ। আর সবাই যখন তাদের প্রিয়জনদের বিদায় জানিয়ে চলে গেছে তখনো সে একা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে পশ্চিম দিগন্তে। আরব সাগর যেখানে আকাশকে ছুঁয়েছে।

॥ আটাশ ॥

কলকাতা ফিরে এসে প্রবাহন মল্লিকাদিকে রিং করে। বৌদিকে অনেকদিন দেখেনি, তাঁর চিঠি পায়নি। কেমন আছেন তিনি? সেই অসুখটা কি সেরেছে? এতদিন সে সংবাদ নিতে পারেনি বলে দুঃখিত। হঠাৎ তার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়।

'আর কত মিথ্যে বলবে তুমি, ভাই! কে না জানে যে তোমরা ওদেশ থেকেই অঙ্গীকারবদ্ধ। শ্যামবরণবাবুর কাছে সব খবর পেয়েছি। সমস্ত ব্যাপারটিই মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরিকল্পিত। তাঁকে পর্যন্ত তোমরা বোকা বানিয়েছ। কিন্তু বৌদিকে ধোঁকা দিতে পারোনি। তিনি অনুমান করেছিলেন, তাই একটুও আশ্চর্য হননি। আমরা যদিও নিমন্ত্রণ পাইনি তবু মনে মনে অভিনন্দন ও শুভকামনা করেছি।'

বৌদি চন্দননগর থেকে এসে গাড়ী পাঠিয়ে দেন। দেখে মনে হয় সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক।

'যা খুশি হয়েছি, ঠাকুরপো। আমার আশঙ্কা ছিল সেই অধিকবয়সী মহিলাটি

ভারতে এসেছেন ও তুমি তাঁকেই বিয়ে করেছ। পরে শুনলুম যাঁর সঙ্গে বিয়ে তাঁর কাঁচা বয়স। বয়সের ধূম্রজাল রচনা করে তুমি আমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে ওটা একটা বানানো গল্প। যা গুল দিতে পারো তুমি, ঠাকুরপো। তুমি একটি গুলবাজ। যেমন তোমার দাদা একজন গোলন্দাজ। তুমি কিন্তু কোনোদিন শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হবে না। তোমার শুনছি একটিও শালী নেই।' তিনি একনিঃশ্বাসে বলে যান।

প্রবাহন হাল ছেড়ে দেয়। 'আচ্ছা, বৌদি, আমি যদি কম বয়সের একটি মেয়েকেই ভালোবেসে থাকি তবে তাকে বেশী বয়সের বলে চালাতে যাব কেন? আর বেশী বয়সের হলেই বা কী হয়েছে? প্রেম কি বয়সের বাছবিচার করে। প্রেম অন্ধ।'

তিনি যেন এক নিমেষেই বদলে যান। তাঁর বয়সের ভার নেমে যায়। প্রথম যৌবনের রূপলাবণ্য ও ব্রীড়ার ভাব ফিরে আসে। তিনি ওর দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকেন। বলেন, 'সেই রাজপুত্র কি ভালোবেসেছিল ওই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যাকে? স্বপ্ন যদি সত্য হয়?'

প্রবাহন ইতস্তত করে বলে, 'হাঁ, কিন্তু জানত না যে রাজকন্যাও ভালোবাসতেন ওকে।'

'রাজকন্যার ভালোবাসা ছিল অহেতুক ও নিষ্কাম। তার নাম গোপীপ্রেম। যার ঘরে স্বামী আছে পুত্র আছে, তাঁদের প্রতি কর্তব্য আছে, সে অত কিছু হাতে রেখে কীই বা দিতে পারে তার গোপালকে? ওই ক্ষীর সর নবনী ও নাড়ু? পুরুষ মানুষে কি ওইটুকুতেই তৃপ্ত হয়? আর গোপাল কি চিরদিনই বালগোপাল? তাই তো ওইসব স্বপ্ন দেখা। যতসব অসম্ভব স্বপ্ন। আজগুবি ও অলীক। আশা করি ও চিঠি পড়ে তুমি বিশ্বাস করনি, প্রবাহন।' বলতে বলতে তিনি শরমে অরুণ হন।

'আরে না, না। আমি কি এতই নির্বোধ! স্বপ্ন কখনো সত্য হয়!' প্রবাহন হেসে উড়িয়ে দেয়।

'তোমাদের প্রণয় কত নিবিড়! শ্রীমতী সাতসমুদ্র পার হয়ে এলেন তোমার হাত ধরতে, তোমার ঘর করতে। শ্রেষ্ঠতর প্রেম জয়ী হয়েছে, এতে আমিও সুখী হয়েছি, প্রবাহন। একটুও খেদ নেই আমার। আর থাকবেই বা কেন? গোপীরা শ্রীমতীকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। জানতেন যে রাধার প্রেমের মতো আর কারো প্রেম নয়। আর ওই যে স্বপ্নবৃত্তান্ত ওটা তুমি ভুলে যেয়ো, লক্ষ্মীটি। স্বপ্ন কখনো সত্য হয়!' এই বলে সুদেষ্ণা যবনিকা টেনে দেন।

প্রবাহন বলতে পারত, বলে না যে স্বপ্নই মানুষকে মুক্তি দেয়। স্বপ্নেই মানুষ স্বাধীন। সে যা স্বপ্ন দেখে তা সমাজের চোখে নয়, সংসারের চোখে নয়, তা আপনার

চোখে, তার তৃতীয় নয়নে। তার আর-সব স্বাধীনতা হাতছাড়া হতে পারে, কিন্তু এই স্বাধীনতা সব সময় তার হাতে। তাই তো আমরা রোজ রোজ স্বপ্ন দেখি। যা খুশি। যখন খুশি।

—

রাজ অতিথি

একটা শীতকাল ওঁরা আমাদের রাজ্যের রাজধানীতে ছিলেন। মাতাজী, দিদিজী ও দাদাজী। যেখানে ছিলেন সেটা ছোট একটা শাদা একতলা বাড়ী। নাম রোজ ভিলা। লোকে বলত গোলাপ বাগ। তার পেছনেই রাজার বাগিচা। আমরা বলতুম মালী বাগিচা। তারপরেই আমাদের বাড়ী।

ওঁরা কারা, কোন্‌খান থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন এসব জানবার মতো বয়স আমাদের নয়। জানতেন আমার বাবা। তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্যের উপরে একটি বাড়তি কর্তব্য ছিল ওঁদের মতো রাজ অতিথিদের তত্ত্ব নেওয়া। ওঁদের যখন যা দরকার রাজ-সরকার থেকেই সরবরাহ করা হতো। তদারক করতেন বাবা। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কেবল কর্তব্যের সম্পর্ক ছিল না। বাবা সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে তত্ত্বালাপ করতে ভালোবাসতেন। তত্ত্বশ্রবণ করবার জন্যে যেতেন, তত্ত্বালোচনা করবার জন্যে থাকতেন, যেদিন বক্তৃতা সেদিন তো কথাই নেই, বাড়ি ফিরতে রাত হতো।

মাতাজী দিতেন রাজবাড়ীর রংমহলে বেদ উপনিষদের উপর বক্তৃতা। পাশে বসে পুঁথিপত্র জুগিয়ে দিতেন দিদিজী। আর মঞ্চের একটেরে বসে অদৃশ্য কলম দিয়ে নোট লিখে নিতেন দাদাজী। মাতাজীর পরিধানে গৈরিক শাড়ী ও জামার উপরে কখনো আলখাল্লা কখনো শাল। মাথায় সাধুদের মতো কান ঢাকা টুপি। কাঁচা পাকা কেশ কাঁধ অবধি খাটো। দিদিজী যেন শ্বেতবসনা সরস্বতী। মাথায় আধ-ঘোমটা। গলায় সুতোর মতো সরু সোনার হার। দু' হাতে দু' গাছা সোনা বাঁধানো শাঁখা। কপালে সিঁদুরের টিপ। আর দাদাজীর পরনে পাশ্চাত্য পোশাক। ওঁরা যেমন ফরসা ইনি তেমনি কালো। ওঁরা বেনারসের বাঙালী, ইনি বাঙ্গালোরের দক্ষিণী।

একদিন হেডমাস্টার মশায় আমাকে বলেন, 'ওহে নিরঞ্জন, রাজবাড়ীতে বক্তৃতা হচ্ছে, জানো? অমন চমৎকার ইংরেজী আমি কতকাল শুনিনি। ইন দি ওলডেন গোলডেন ডেজ্‌ অব ইণ্ডিয়া। যেয়ো।'

'সার, ও তো বেদ উপনিষদের উপর বক্তৃতা। আমি ওর কী বুঝব? আর রাজ-বাড়ীতে যেতে হলে বাবার সঙ্গে যেতে হয়। বাবা নেবেন কেন?' আমি তর্ক করি।

'আমার সঙ্গে দেখা হলে আমি ওঁকে বলব। বেদ উপনিষদ্‌ বুঝতে পারবে না সেটা

আমি জানি। কিন্তু ভাষারও তো একটা মহিমা আছে। উচ্চমানের ইংরেজী তো শুনবে। এমন সুবর্ণ সুযোগ তুমি পাচ্ছ কোথায়? এ যেন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত।' তিনি গদগদ স্বরে বলেন।

বেদ উপনিষদের নয়, উত্তম ইংরেজীর আকর্ষণে একদিন আমি বাবার হাত ধরে রাজবাড়ীর রংমহলে অনধিকার প্রবেশ করি। রাজাসাহেব আমাকে চিনতেন। স্মিত হাসেন। দেওয়ান সাহেবও আমাকে জানতেন। তিনি ভুরু কোঁচকান। আমি বাবার সঙ্গ ছাড়তে কুণ্ঠিত। যদি কেউ কিছু বলে। তিনি আমাকে সবচেয়ে সামনের সারিতে বসিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে সবচেয়ে পেছনের সারিতে বসেন। আরো পেছনে রাজাসাহেব ও দেওয়ানসাহেবের উচ্চাসন। বাবা বসেন তাঁদের কাছাকাছি, কিন্তু ফরাসের উপর। আর-সকলেও তাই। মঞ্চের উপর মাতাজী, দিদিজী ও দাদাজী।

বক্তৃতা শেষ হলে রাজাসাহেব ও দেওয়ানসাহেব গাত্রোত্থান করেন। আর সকলে উঠে দাঁড়ান। বেশীর ভাগই পলায়নের পথ খোঁজেন। নেহাৎ রাজাসাহেবের নজরে পড়ার জন্যেই আসা। কিন্তু বাবার মতো আমলাদের একটি অন্তরঙ্গ মণ্ডলী ছিল। রাজবাড়ীতে থিয়েটার বা বক্তৃতা উপলক্ষে গেলে এঁরা রাজবাড়ীর অতিথি হয়ে জলযোগ না করে ফিরতেন না। থিয়েটার হলে এঁরা ছেলেদেরও নিয়ে যেতেন, অভিনয়ে অংশ নিতেন ও সবাই মিলে জলযোগ করতেন। বক্তৃতার সময় কিন্তু ছেলেদের নিতেন না, জলযোগটা হতো বড়োদেরই ব্যাপার।

বাবা যান মাতাজীকে সদলবলে গাড়ীতে তুলে দিতে। আমিও তাঁর সঙ্গ নিই। মাতাজী আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। কথা বলেন না। তাঁর কথাবার্তা শুধু বাবার সঙ্গেই।

দিদিজী আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলেন, 'বেদ উপনিষদ্ ভালোবাসে এমন সোনার চাঁদ ছেলে আমি এই প্রথম দেখছি। তোমার মতো ছেলেরাই তো বৈদিক যুগে ঋষিদের তপোবনে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যার বিদ্যার্থী হতো। তাদের জিজ্ঞাসা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। তোমার নাম কী, খোকা?'

'নিরঞ্জন।' আমি পদবীটাও বলি।

'বা! বেশ সুন্দর নাম তো! বাড়ীতে কি ওই নামে ডাকে?' দিদিজী সুধান।

'না, বাবলু বলে ডাকে।' আমি জবাব দিই।

'আমি কিন্তু তোমাকে ও নামে ডাকতে পারব না। বাবলু আর বাবুয়া যে একই রকম শোনায়!' তিনি চমকে উঠে বলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে।

আমি এই রহস্য ভেদ করতে পারিনে। মনে মনে ছটফট করতে থাকি বলতে যে আমি ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে আসিনি, এসেছি ভাষাজ্ঞানের জন্যে।

'তোমাকে আমি জয় বলে ডাকব। ইউ আর এ জয় টু মি।' তিনি বলেন। 'আর তুমি আমাকে ডাকবে পিসি বলে। সুশীলবাবুকে আমি দাদা বলি।'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিই। বাবা আমাকে উদ্ধার করেন। 'তুমি যা ভেবেছ তা নয়, বোন আত্রেয়ী। ও এসেছে ওর হেডমাস্টার মশায়ের মুখে মহামান্য মাতাজীর উচ্চাঙ্গের ইংরেজীর সুখ্যাতি শুনে। বেদ উপনিষদ্ বুঝতে না পারুক উচুদরের ইংরেজী তো শুনতে পাবে। এমন সুযোগ কি সহজে মেলে আমাদের এ অঞ্চলে? রেল লাইন নেই। মহানদী পার হয়ে আসতে হয়। পথের দু'ধারে জঙ্গল। বাঘ হানা দেয়। আমরা ধন্য যে বেদ উপনিষদ্ ও ইংরেজী সব একসঙ্গে শিখতে পাচ্ছি।'

মাস্টারমশায়ও এসেছিলেন। তিনি ব্যস্ত ছিলেন দেওয়ানসাহেবকে বিদায় দিতে। পরে আমাদের দেখা হয় জলযোগের ঘরে। জলযোগের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'লাস্ট, বাট নট লীস্ট। কী বল হে, নিরঞ্জন? এই রাজকীয় ভোজনটি কি কারো চেয়ে কম? বেদ উপনিষদের চেয়ে? উন্নত ইংরেজীর চেয়ে?'

বক্তৃতা হয় সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু রোজ নয়। সপ্তাহে দু'দিন। অন্যান্য দিন মাতাজীর ওখানে ঘরোয়া বৈঠক বসে। ভক্তালাপ হয়। বাবা প্রায়ই যান। কিন্তু সেখানে তো ইংরেজী নেই। কথাবার্তা চলে বাংলায় আর হিন্দীতে। কেবল দাদাজীই বলেন ইংরেজীতে। তবে তিনি হিন্দী বেশ বোঝেন। বাংলাও কিছু কিছু। গোটা দুই জাতীয় সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠস্থ। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা।' আর 'বন্দে মাতরম্।' ছাত্রদের তিনি নতুন পদ্ধতির ব্যায়াম শেখান আর ব্যায়ামের পর জাতীয় সঙ্গীত। আমার আগ্রহ ছিল না।

আবার যেদিন রাজবাড়ীতে বক্তৃতা শুনতে যাই দিদিজী আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকেন। তাঁর পাশে বসান। আমি তো লজ্জায় জড়সড়। বলেন, 'তোমার আসল উদ্দেশ্য তো ইংরেজীজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান নয়। তা হলে তুমি অত কষ্ট করে বক্তৃতা শোন কেন? ও তো শুধু কানেই যায়, অন্তরে প্রবেশ করে না। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না? তুমি কাল থেকে রোজ আমার কাছেই এসো, আমি তোমাকে অনেকরকম ইংরেজী বই পড়ে শোনাব। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়। কিন্তু আমাকে পিসি বলে ডাকতে ভুলো না। আমরা কোথায় থাকি জানো তো?'

'গোলাপ বাগে।' আমি অস্ফুট স্বরে উত্তর দিই।

'আমি তো জানতুম ওর নাম রোজ ভিলা। গোলাপ বাগ বলে নাকি লোকে? বেশ তো, তুমি আমাকে গোলাপ পিসি বলেই ডেকো।' তিনি আমার হাতে চাপ দেন।

এর পর থেকে আমি রাজবাড়ীতে গিয়ে মাতাজীর বক্তৃতা শোনায় ক্ষান্তি দিই। বেদ উপনিষদ্ মাথায় থাকুক। বড়ো হয়ে ওসব পড়ব। আপাতত ইংরেজীটা না শিখলে নয়। আর শিখতে হলে ভালো করেই শিখতে হয়। ক্লাসে যেটুকু ইংরেজী শেখায় তার

চেয়ে আমি কিছু বেশী জানতুম বলে আমার উপর হেডমাস্টার মশায়ের সুনজর ছিল। আমার হাতেই তিনি স্কুলের ম্যাগাজিন রুমের চাবী সঁপে দিয়েছিলেন। যখন খুশি খুলতুম, যেটা খুশি পড়তুম। লাইব্রেরীতেও আমার অবাধ গতি ছিল। এমন সব বই আমি বেছে নিতুম যা আর কেউ পড়ত না। আমিও যে সব কথা বুঝতে পারতুম তা নয়। ভাবগ্রহণ করতুম। প্রতিবেশীদের কারো কারো বাড়ীতে ইংরেজী পত্রিকা আসত। আমাদের বাড়ীতেও ইংরেজী সাপ্তাহিক। বিলিতী ম্যাগাজিন নিতেন এক কলকাতা-নিবাসী অফিসার। পুরোনো হলে বিলিয়ে দিতেন। আমার হাতে পড়ত। আমি গোগ্রাসে গিলতুম।

আর কেউ কি জানত যে ফরাসীবিপ্লবের সময় প্যারিসের একটি গুপ্ত ক্লাবে 'হান্ট দ্য টাইগার' খেলা হতো? খেলত যাদের জীবনে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, অথচ আত্মহত্যা করতে অনিচ্ছা। যারা খেলতে যেত তাদের পকেটে পিস্তল, মুখে মুখোশ। খেলায় জিতলে 'বাঘ' শিকার, হারলে 'বাঘে'র মতো মৃত্যু। কিন্তু একবার হলো কী, একটি 'বাঘে'র মুখোশ খসে পড়ল। অপূর্ব সুন্দরী। তখন সে যা হলো তা আরেকরকম শিকার। প্রেমে পড়ে গেলেন এক অভিজাত পুরুষ। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ। ওঁরা বিয়ে করলেন ও সুখে বাস করলেন। রূপকথায় যেমনটি লেখে। ষাট বছর পরেও আমার মনে আছে। গোলাপ পিসি জানবেন কী করে যে তাঁর ভাইপোটি বারো তেরো বছর বয়সেই অতদূর এগিয়েছে? সে প্রেমও বোঝে। তবে ও প্রেম মিলনাও প্রেম। যার থেকে বিবাহ ও চির সুখ।

তিনি থাকতেন একপাশের একটি কুঠরিতে। সেইখানেই তাঁর পড়ার টেবিল ও বইয়ের আলমারি। কোথায় যেন একজোড়া ডামবেলও ছিল। পিসি ডামবেল ভাজতেন দুর্বল দেহকে সবল করতে।

গোলাপ পিসি আমাকে নিয়ে তাঁর নিজের ঘরে বসান। প্রথমেই করেন আপ্যায়নের ব্যবস্থা। চায়ের সঙ্গে কাশীর পেড়া।

'শোন, অন্নু। তুমি কিন্তু আমাকে সত্যি নিরাশ করলে। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে তুমি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্যে ব্যাকুল। ঠিক সেকালের আর্য বালকদের মতো। কিন্তু যে বালক উচ্চাঙ্গের ইংরেজীর জন্যে উৎকর্ণ হয়ে নীরস বেদ উপনিষদের বক্তৃতা শোনে তার জ্ঞানস্পৃহাও আর্য বালকদেরই মতো। তাছাড়া ওরাও কি আর্য নয়? ওই ইংরেজরা? ওদের ভাষাও তো আর্যভাষা। তুমি আর্যদের আর এক শাখার সভ্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু। ভাষা আর সাহিত্যই তো তার সোপান। আমিও ইংরেজী সাহিত্যেরই ছাত্রী ছিলুম। অ্যানী বেসান্টের নাম শুনেছ?' তিনি প্রশ্ন করেন।

'হাঁ, গোলাপ পিসি। আমাদের বাড়ীতে তাঁর শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা আছে। বাবা

পড়ে শোনান মূল সংস্কৃত ও ইংরেজী।' আমি উত্তর দিই।

'সেই যে মিসেস বেসান্ট তিনি থাকেন আডায়ারে। সেখানেই থিয়সফিস্টদের কেন্দ্র। থিয়সফির নাম শুনেছ?' তিনি আবার প্রশ্ন করেন।

'শুনেছি, গোলাপ পিসি। হেড মাস্টার মশায় একজন থিয়সফিস্ট। মাঝে মাঝে থিয়সফির উপর বক্তৃতা দেন।' আমি আবার উত্তর দিই।

'তা হলে শোন। মিসেস বেসান্টের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বেনারসে এলে আমাদের ওখানে উঠতেন। আর আমরাও আডায়ারে গেলে ওঁর ওখানে। ওঁর যেমন সংস্কৃতে অনুরাগ আমাদেরও তেমনি ইংরেজীতে। পূর্ব আর পশ্চিমের মিলন যদি কাম্য হয় তবে এই দুই ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। গীতা যেমন অবশ্য পঠনীয় বাইবেলও তেমনি। আমরা সবাই গীতা আর বাইবেল একসঙ্গে পড়তুম। আর বাইবেলের যে ইংরেজী অনুবাদটিকে চার্চে ব্যবহার করা হয় তার ভাষাই হলো ইংরেজী গদ্যের আদর্শ। পড়তে পড়তে মনে হবে কবিতা পড়ছি। কী বল, জয়? নিউ টেস্টামেন্ট দিয়েই আরম্ভ করা যাক?' তিনি সেটি আলমারি থেকে বার করেন।

'কাকা ও-বই পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমিও একটু আধটু পড়েছি। খুব সহজ ইংরেজী. কিন্তু মনে হয় ভাষা যত সহজ ভাব তত সহজ নয়।' আমি বলি।

'আচ্ছা, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব। উপদেশ ও বচনগুলি পরে হবে। উপাখ্যান দিয়েই পাঠ শুরু হোক।' তিনি পরিষ্কার সুরেলা কণ্ঠে পাঠ করেন।

আমিও তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করি। অনেকগুলি প্যারাবল শোনা হয়।

বাবা তা শুনে বলেন, 'বাইবেল পড়ছ. খুব ভালো কথা। কিন্তু সেইসঙ্গে উপনিষদ্‌ও চলুক। তার জন্যে ওঁদের চেয়ে উপযুক্ত শিক্ষক পাচ্ছ কোথায়? আত্রেয়ীকে আমি বলব তোমাকে বাইবেলের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদ্‌ও একটু আধটু পড়াতে। তোমাকে আর মাতাজীর বক্তৃতা শুনতে যেতে হবে না।'

কী করি! রাজবাড়ীর জলযোগটা আমার কপালে নেই। কিন্তু গোলাপ বাগেও চা যোগের বাঁধা নিমন্ত্রণ ছিল। ওঁরা কঠোর নিরামিষাশী হলেও ইউরোপীয় স্টাইলে থাকতেন ও খেতেন। আমারও তাতে অরুচি নেই শুনে আমাকেও দিতেন কেক বা পুডিং। আমিষবর্জিত। রাজ ভাণ্ডার থেকে সিধা আসত, রাঁধতেন গোলাপ পিসিই। সাহায্য করত রোজ ভিলার খানসামা।

উপনিষদ্ পড়ানোর প্রস্তাবে গোলাপ পিসি তো মহা খুশি। যেন অপেক্ষা করছিলেন নচিকেতার উপাখ্যান শোনাতে। বলেন, 'নচিকেতার ছিল এক শাশ্বত জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসা আজকেও সমান সত্য। তেমন কোনো জিজ্ঞাসা কি তোমার আছে? যদি

থাকে তোমার জীবনও সার্থক হবে।'

আমি তো ভেবেই পাইনে এমন কী জিজ্ঞাসা আমার আছে যা শাশ্বত। কতরকম প্রশ্নই মনে ওঠে। এই যেমন, পরীরা কি সত্যি আছে? ডাকলে দেখা দেয়? ওই যে গোলে বকাউলী কাহিনীর পরী ওকে আমার ভালো লেগেছিল, যখন ঠাকুমার মুখে শুনেছিলুম ওর গল্প।

'মনে রেখো কোন্ দেশে তোমার জন্ম। এ দেশ কি আবার উঠবে না? জাগবে না? জগৎকে দেবে না নতুন কোনো মহাভারত? নতুন কোনো রামায়ণ? নতুন কোনো দর্শন? নতুন কোনো সাধনা? জয়, তোমার মতো ছেলেরাই ভরসা। আমরা তো ফুরিয়েই গেছি।' তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। বিষাদের প্রতিমা।

'কেন? ফুরিয়ে যাবেন কেন? এমন কী বয়স হয়েছে আপনার? আমি তো শুনেছি আমার মার সমবয়সী।' আমি আশ্বাস দিই।

'দ্যাখ, জয়, একদিন না একদিন পরাধীনরা স্বাধীন হবে, পতিতরা উন্নত হবে, দীনরা ধনী হবে, দুর্বলরা সবল হবে, অজ্ঞরা জ্ঞানী হবে, মন্দরা ভালো হবে, পাপীরা পুণ্যবান হবে, কুৎসিতরা সুন্দর হবে, আদিমরা সভ্য হবে, কিন্তু যারা একবার চলে গেছে তারা কি আর ফিরে আসবে? তাদের সঙ্গে মিলন তা হলে হবে কোথায় ও কবে? এটা একটা শাশ্বত জিজ্ঞাসা। তোমার কী উত্তর?' তিনি ব্যাকুলভাবে শুধান।

আমি নিরুত্তর। এই তো সেদিন পৃথিবীতে এলুম। এ জগতের কতটুকুই বা জানি। আমার দৃষ্টি পড়ে একটি ছোট ছেলের ফোটোর উপরে। ফোটোটিও ছোট্ট। পিসির টেবিলের মাঝখানে হেলানো।

'ও কে, গোলাপ পিসি?' আমি কৌতূহল প্রকাশ করি।

'বাবুয়া। আমার ছেলে। ভালো নাম সত্যবান।' তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'ওঃ। বাবুয়া এখন কোথায় আছে, গোলাপ পিসি?' আমি জানতে চাই।

'কোথায় আছে তাই যদি জানতুম তো সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়তুম কেন? ওকে খুঁজতেই আমি পথে বেরিয়েছি। এ পথ আমাকে নিয়ে যাবে ওর সন্ধানে। এ জীবনে আমার আরো কাজ ছিল, জয়। সেসব দেখছি করা হলো না। তোমরাই করবে। তোমাদেরই আমি সে ভার দিয়ে যেতে চাই। তোমাদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব।' বলতে বলতে তাঁর চোখে জল আসে।

চোখে জল আসে আমারও। চুপচাপ থাকি।

'দেখবে?' তিনি উঠে গিয়ে বাক্স থেকে একটা বাঁধানো বই বার করে আনেন। মলাটের উপর সোনার জলে লেখা ইংরেজীতে 'ইন মেমোরিয়াম'। না, ইংরেজীতে নয়, লাটিনে।

হাতে নিয়ে পাতা ওলটাই। ইংরেজী বাংলা রচনার ফাঁকে ফাঁকে আর্ট পেপারে ছাপা ছবি। যেন একখানি আলবাম। বেশীর ভাগ রচনাই আত্রেয়ী দেবীর। তিনি করেছেন কবিতায় তাঁর পুত্রের স্মৃতিতর্পণ। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার থেকে ইংরেজীতে তর্জমাও করেছেন। অরবিন্দ গুপ্তও লিখেছেন। ইংরেজীতে স্মৃতিচারণ। আরো একজনের ইংরেজী প্রবন্ধ ছিল। তাঁর নাম শ্রীচিদানন্দ ভারতী।

গোলাপ পিসি বলেন, 'টেনিসনের পদাঙ্ক অনুসরণ আর কী। জানি আমি কবি নই, কবিযশঃপ্রার্থী হলে আমারও কপালে আছে উপহাস্যতা। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না যে বিয়ের আগে আমিও মাসিকপত্রে লিখতুম। টেনিসনই ছিলেন আমার আদর্শ। আজকাল আমি আর টেনিসন পড়িনে। আমার রুচি বদলে গেছে। এখন পড়ি দেশবিদেশের মিষ্টিক কবিদের কবিতা, মিষ্টিক নাট্যকারদের নাটক, মিষ্টিক প্রবন্ধকারদের প্রবন্ধ। আইরিশ কবি জর্জ রাসেলের নাম শুনেছ? যাঁর ছদ্মনাম এ-ই।'

'প্রবাসী'তে পড়েছিলুম তাঁর সম্বন্ধে লেখা—অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা। গোলাপ পিসি তা শুনে বলেন, 'তা হলে তো তুমি খানিকটে এগিয়েই রয়েছ। তোমাকে আমি তাঁর ও ইয়েটসের কবিতা পড়ে শোনাব। আর মেটারলিঙ্কের নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' পড়েছ? না, বাংলা নয়, ইংরেজী।'

'না, গোলাপ পিসি, ইংরেজীটা আমাদের লাইব্রেরীতে নেই। ওরা বলে, কী দরকার? বাংলাটাই তো রয়েছে।' আমি উত্তর দিই।

'দুটো একই নামের, কিন্তু একই জিনিস নয়। তোমাকে পড়ে শোনালে তুমিও অনুভব করবে ইংরেজীটা আরো সুন্দর। কবি যেন নিজেকেই নিজে ছাড়িয়ে গেছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধিও পরিণতি পেয়েছে।' গোলাপ পিসি বলেন।

এবার আমি বাবুয়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। 'ওর জন্ম সাল লেখা আছে ১৯০৪। ও কি তবে আমার সমবয়সী ছিল?'

'ঠিক বলছ কেন, জয়। ছিল বললে আমার মনে লাগে। নেই বললে তো আমি প্রাণে আঘাত পাই। আছে, আছে, আছে। 'হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে, আছে, আছে।' এ হলো মহাকবির বাণী। কোথাও না কোথাও আছে। দৃশ্যমানের অন্তরালে আছে। তুমি যেমন আছো সেও তেমনি আছে।' তিনি ঝোঁক দিয়ে বলেন।

আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি। 'এই যে শ্রীচিদানন্দ ভারতী ইনি কে, গোলাপ পিসি? পারিবারিক স্মারকগ্রন্থে এঁর লেখা কেন?'

'ওঃ। তুমি জানো না বুঝি। উনি আমার মা।' তিনি উত্তর দেন।

'ওঁকে তো আমরা মাতাজী বলেই জানি। কিন্তু—'

'কিন্তু কী! মাতাজীর নাম কেন স্বামীজীর মতো? এই তো? এর কারণ, সন্ন্যাস নিলে স্ত্রী আর স্ত্রী থাকে না, পুরুষ আর পুরুষ থাকে না। থাকবে কী করে? নিজেকেই নিজের শ্রাদ্ধ করতে হয় যে। ব্রহ্ম যেমন ক্লীবলিঙ্গ আত্মনও তেমনি। সন্ন্যাসীদের নামের আগে শ্রীমৎ লেখা হয়। শ্রীযুত লিখতে নেই। তবে সাধারণ মানুষ তো অত বোঝে না। ওরা বলে বাবাজী, মাতাজী। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মা আর আমার মা নন। পারিবারিক স্মারকগ্রন্থে ওঁকে টেনে আনা উচিত হয়নি। কিন্তু উনিও জানেন, আমিও জানি, সন্ন্যাস নিলেও উনি আমার মা, আমি ওঁর মেয়ে, বাবুয়া ওঁর নাতি। কোনো মতেই এ পরিচয় মুছে ফেলা যাবে না।' গোলাপ পিসি চোখ মোছেন।

সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করা নিষেধ। আমার একথা জানা ছিল। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই তো তাঁদের পায়ের ধুলো পড়ত। তত্ত্বালাপের জন্যেই আসা, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিও প্রখর। মঠবাড়ী, নিষ্কর জমি, মাসোহারা প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাঁরা বাবার পরামর্শ বা সহায়তা চাইতেন। বাবারও লাভ হতো অধ্যাত্মবিদ্যা।

মাতাজীর পূর্বাশ্রমের পরিচয় আমি যেটুকু পাই সেটুকু বাবার কাছে নয়, হেডমাস্টার মশায়ের মুখে। তিনিও একজন থিয়সফিস্ট। সেই সুবাদে মাতাজীর ও তাঁর স্বামীর প্রাক্তন থিয়সফিস্ট জীবনের সংবাদ রাখতেন। ওঁরা ছিলেন বেনারসের একটি বনেদী পরিবার। ওঁদের ভূসম্পত্তি নানান জেলায় ছড়ানো। মিউটিনির সময় থেকেই পশ্চিমে অবস্থান। বেনারসের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলেও ওঁদের পরিবারের দাক্ষিণ্য। ওই কলেজের এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে আত্রেয়ীর বিবাহ হয়। সে বিবাহ সুখেরই হয়েছিল, কিন্তু সন্তানকে কেন্দ্র করে অশান্তি দেখা দেয়। ওদিকে মিসেস বেসান্টকে সভাপতি করায় থিয়সফিস্ট মণ্ডলীতে অশান্তি। আত্রেয়ীর মা বাবা দু'জনেই থিয়সফি ছেড়ে দিয়ে বেদান্ত ধরেন ও হিমালয়ে গিয়ে আশ্রমবাসী হন। স্বামীর মৃত্যুর পরে আশ্রমের পরিচালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্তানের মৃত্যুর পরে আত্রেয়ীও মাতাজীর আশ্রমে আশ্রয় নেন। তাঁর জন্যে বহুদিন অপেক্ষা করার পর তাঁর স্বামীও দ্বিতীয়বার সংসারী হন। এর ফলে আত্রেয়ী আরো ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু এখনো তিনি থিয়সফিস্ট। বৈদান্তিক নন। সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি, তবে আশ্রমের নিয়ম মেনে চলেন।

আর ওই দাদাজী? না, দাদাজীও সন্ন্যাসী নন। বিবাহিত পুরুষ। স্ত্রী থাকেন দক্ষিণ ভারতে। মিসেস বেসান্টের সান্নিধ্যে। ইনি থাকেন উত্তর ভারতে। মাতাজীর সান্নিধ্যে। বেদান্তের দিকেই ঝোঁক। হিমালয়ের উপরেও আকর্ষণ। মাতাজীকে মা বলে ডাকেন। পরম মাতৃভক্ত। মাতাজীও তেমনি পরম পুত্রবৎসল। আশ্রমটিও ক্রমে জমে উঠছে। থিয়সফিকাল সোসাইটি ছেড়ে আরো কয়েকজনও মাতাজীর আশ্রমে যোগ

দিয়েছেন, যদিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। সেটা আবশ্যিকও নয়। আবশ্যিক শুধু ব্রহ্মচর্য। মাতাজী এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন প্রব্রজ্যা। বছরে অন্তত চার মাস পরিব্রাজক হতে হবে। তা নইলে কেউ দেশকে চিনবে না। দেশের মানুষকে চিনবে না। আশ্রমের জন্যে কিছু চাঁদা সংগ্রহের প্রশ্নও আছে। যাকে বলে মাধুকরী। পূর্বাশ্রমে ফিরে যাবার পথ সকলের জন্যেই খোলা। একমাত্র মাতাজী বাদে। কিন্তু আত্রেয়ীর বেলা কার্যত রুদ্ধ। তিনি আর স্বামীর সংসারে ফিরে যাবেন না। সেখানে সপত্নীর রানীত্ব।

আমার বাবার সঙ্গে মাতাজী মাতাপুত্র সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি তাঁর পাতানো বোন সম্বন্ধেও দু'চার কথা শুনেছিলেন। মাতাজীর অন্তরের ইচ্ছা ছিল আত্রেয়ী আবার স্বামীর কাছে ফিরে যান। কিন্তু এখন তো আর সেকথা ওঠে না। একালের মেয়ে। সে কি কখনো সতীন সহ্য করবে? তা হলে ওর গতি কী হবে? মাতাজী তো চিরদিন বাঁচবেন না। আশ্রম যে পরে কার হাতে পড়বে কে বলতে পারে? আত্রেয়ীর ব্যক্তিত্ব এমন নয় যে তিনি আশ্রমের হাল ধরতে পারবেন। কেউ ওঁকে মানবেও না।

তা ছাড়া ওটা পুরুষমানুষেরই কর্ম। মাতাজী হলেন ব্যতিক্রম। যেমন পুরুষালী চেহারা তেমনি জাঁদরেল ব্যক্তিত্ব। রাজা মহারাজাদেরও মাথা নত হয়। সপ্তাহে একদিন কি দু দিন তিনি রাজ অন্তঃপুরে গিয়ে রানীসাহেবাকে বেদ উপনিষদের সারকথা শোনান। দিদিজীও থাকেন। আরো সহজ করে বুঝিয়ে দেন। মাতাজী বলেন হিন্দীতে, দিদিজী বলেন বাংলায়। সেখানে দাদাজীর প্রবেশ নিষেধ।

একদিন মা বলেন বাবাকে, 'ভগবান দিয়েছিলেন, ভগবান নিয়ে গেলেন। তা বলে কি স্বামীর ঘর ছাড়তে আছে? তোমার বোন কি আর কখনো মা হতে চায় না? বুড়ো বয়সে কে ওকে দেখবে? ওকে যেমন করে পারো ওর স্বামীর কাছে ফেরৎ পাঠাও। শ্বশুরবাড়ীই মেয়েদের আশ্রম।'

বাবা চমকে ওঠেন। 'সে কী! বি-এ পাশ করা বৌ সতীনের সঙ্গে ঘর করবে! আত্রেয়ী দেবী বঙ্কিমের দেবী চৌধুরানী নন।'

মা বিরক্ত হন। 'স্বামী ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো গতি আছে নাকি? মা হতে চাইলে এম-এ পাশ করা বৌকেও স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে হবে। সতীনের কাছে মাথা হেঁট করতেও হবে। সতীন আছে বলে কি স্বামী পর হয়ে গেল? আপনার তবে কে? বিয়ের পরে মা বাপও আর আপনার নয়। দাদা তো দাদা!'

গোলাপ পিসির সঙ্গে মার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। উচ্চশিক্ষিতা নন বলে মার মনে হীনমন্যতা ছিল। তা ছাড়া ওঁরা হলেন রাজ অতিথি। ওঁরা কি আমাদের মতো সামান্য রাজকর্মচারী! বাবার না হয় ডিউটি, হাজিরা না দিলে তাঁর চাকরি থাকবে না।

কারও কি ওটা একটা ডিউটি ! ওদিকে গোলাপ পিসিরও তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। রাজবাড়ীতেই তাঁর ডিউটি। সেখানে না গেলে নয়। অন্যত্র তিনি অদৃশ্য। তাঁর এত সময়ই বা কোথায় ! ইউরোপীয় ধরনের লাঞ্চ ও ডিনার খেলেও খানসামাকে উনি রাঁধতে দিতেন না। তেল ঝাল মশলার ভয়ে।

ওদিকে দাদাজীর মন্ত্র ছিল নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। স্কুলের ছাত্র দেখলেই তিনি পাকড়াও করতেন ও ছুটির পর ব্যায়াম শেখাতেন। তাঁর একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। কতকটা যৌগিক কতকটা পাশ্চাত্য। আমাকেও একদিন তিনি পিসির ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আঙিনায় আর সব ছেলের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেন। ডলাই মলাই টেপাটেপি করে বলেন, 'ইউ আর পিজন-ব্রেস্টেড।' আমার বুক নাকি পায়রার বুকের মতো। আমি অপমানে লাল হয়ে যাই। আর ওমুখো হইনে।

গোলাপ পিসিকে বলি, 'দাদাজী আমাকে পিজন-ব্রেস্টেড বলেছেন। ছি ছি ! কী অপমান।'

গোলাপ পিসি বলেন, 'পিজন-ব্রেস্টেড বলেছেন। চিকেন-হার্টেড তো বলেননি। বুক সুগঠিত না হোক, তাতে সাহস যদি থাকে তো তুমি বীরপুরুষ হবে। নচিকেতার উপাখ্যান তো শুনেছ। তোমার মতো একটি ছেলের কী অসম সাহস যে সে যমকেও ডরায় না।'

শুধু নচিকেতার উপাখ্যানই নয়, আরো কয়েকটি বৈদিক আর ঔপনিষদিক উপাখ্যান তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল উর্বশী ও পুরূরবার উপাখ্যান। অবশ্য রেখে ঢেকে।

অভিভূত হয়ে আমি বলে উঠি, 'ইটারনাল ফেমিনিন।'

গোলাপ পিসি তা শুনে চোখ কপালে তোলেন, 'ইটারনাল ফেমিনিন ! ওটা তুমি পেলে কোথায় ?'

'প্রমথ চৌধুরীর লেখা 'চার ইয়ারী কথা'য়।' আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

'আমাকে দেখতে দেবে ? বাংলা বই আমি কতকাল পড়িনি।' তিনি আগ্রহ দেখান। তাঁর কাছে যে ক'খানা বাংলা বই ছিল সে ক'খানা পুরোনো।

'বই তো নয়। ম্যাগাজিন। 'সবুজপত্র'। এনে দেব। দেখবেন ওতে ধারাবাহিক-ভাবে বেরিয়েছে।' আমি কথা দিই।

ওতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি গল্প উপন্যাসও ছিল। কোনোটাই মিষ্টিকভাবাপন্ন নয়। 'বলাকা'র কবিতাও ছিল। তা পড়ে গোলাপ পিসি বলেন, 'এ যে দেখছি আরেক রবিবাবু। মিষ্টিক নন, দার্শনিক।'

আমি অত বুঝিনে। উনি বুঝিয়ে দেন।

পত্রিকাগুলি গোলাপ পিসি যথাকালে ফেরৎ দেন। দেবার সময় বলেন, 'কই, তোমার ইটারনাল ফেমিনিনকে তো দেখতে পেলুম না? দেখলুম যেটা সেটা সেই ইটারনাল ট্রায়াঙ্গল। চিরন্তন ত্রিভুজ। সেকালের বাল্মীকি আর হোমার থেকে আরম্ভ করে একালের বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেরই উপজীব্য দেখছি দুই পুরুষ ও এক নারী। রাম রাবণ সীতা। মেনেলাউস প্যারিস হেলেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনী। নিখিলেশ সন্দীপ বিমলা। ভাবতে অবাক লাগে, জয়।'

'কেন, দুই নারী ও এক পুরুষ কি হয় না?' আমি তর্ক করি।

'হয় না আবার! মেয়েরাই বা কিসে কম। সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্র। ভ্রমর রোহিণী গোবিন্দলাল। পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দেয়। রবি ঠাকুরের নভেল আমি এর আগে পড়িনি। তুমি যদি পড়ে থাক তুমিই বলতে পারবে দুই নারী ও এক পুরুষ তাঁর নভেলেও হয় কি হয় না।' তিনি আমাকে পালটা প্রশ্ন করেন।

'হয় বইকি। 'চোখের বালি'র আশা বিনোদিনী মহীন্দ্র। 'নৌকাডুবি'র কমলা হেমনলিনী রমেশ।' আমি সকরার মতো ফরফর করি।

'তা হলে দেখছ তো। সব দেশের সব কালের প্রিয় বিষয় হলো ইটারনাল ট্রায়াঙ্গল। পরিণাম কি ট্র্যাজিক না হয়ে পারে! মানুষের জীবনে এমনিতেই যথেষ্ট দুঃখশোক। তার উপর এই সমস্ত প্রণয়ঘটিত বিয়োগান্ত কাহিনী। এমনটি ঘটে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। রোহিণীকে গুলী করে মারা, কুন্দনন্দিনীকে বিষ খেয়ে মরতে দেওয়া এসব কি সত্যের অনুরোধে না নীতির অনুরোধে না বদ্ধমূল সংস্কারের অনুরোধে না জনপ্রিয়তার অনুরোধে?' তিনি বঙ্কিমের বদলে আমাকেই জবাবদিহির দায়ে দায়ী করেন।

আমি একটু ভেবে নিয়ে বলি, 'ও ছাড়া আর কোনো সমাধান সম্ভব নয় বোধ হয়। যেমন আমাদের সমাজ!'

'কথাটা তুমি বলেছ ভালো। তবু আমার মন মানে না। এসব মনগড়া সমস্যার মনগড়া সমাধান দিয়ে চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। সৃষ্টি চিরায়ত যদি হয়ে থাকে তবে তার পেছনে আছে বিরাট এক রহস্য। ডেস্টিনি বা নিয়তি। কী করে আমি বিশ্বাস করব যে 'চতুরঙ্গে'র দামিনীর ওই ডেস্টিনি। রবিবাবু যেখানে মিস্টিক সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেখান থেকে সরে এলে আর শ্রেষ্ঠ থাকেন না। আমি দুঃখিত।' গোলাপ পিসি বলতে বলতে অন্যমনস্ক হন।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের সমালোচকের অভাব ছিল না। নোবেল প্রাইজ তো তাঁর আগেও এদেশে কেউ পাননি, তাঁর পরেও কেউ না। বিজ্ঞানের কথা আলাদা। এমন বিশ্ববরেণ্য পুরুষের জন্যে স্বভাবতই আমার গর্বের সীমা ছিল না অথচ আমার

হেডমাস্টার মশায়ই একদিন অযাচিতভাবে আমাকে বলেন, 'তোমরা যাই বল না কেন, বাংলাসাহিত্যে রবিবাবুর চেয়ে বড়ো কবি আরো আছেন। বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস থাকতে রবি ঠাকুর। বৈষ্ণব পদাবলী থাকতে 'গীতাঞ্জলি'। তবে, হ্যাঁ, গদ্যে উনিই সকলের চেয়ে বড়ো। অমন গদ্য আর কেউ লিখতে পারেন না। 'গোরা' ইজ গ্রেট। হাই ওয়াটার মার্ক অভ বেঙ্গলী প্রোজ।'

'গোরা' আমার পড়া হয়নি। পড়লেও বারো তেরো বছর বয়সে ওর কতটুকুই বা বুঝতে পারতুম আমি। বিচার করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তবে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস আমার পড়া ছিল। আমাদের বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় আরতির সময় বিগ্রহের সম্মুখে জয়দেব গান করতেন আমার মা আর বিদ্যাপতি আবৃত্তি করতেন আমার বাবা। মাঝে মাঝে চণ্ডিদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের পদাবলী কীর্তন করতে আসত পাড়ার কীর্তনীয়া দল। শেষে হরির লুট হতো। কীর্তনে যোগ দিই না দিই লুটের ভাগ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তুম। হাতে উঠত দুটো কি একটা বাতাসা কি গজা।

'সার,' আমি নিবেদন করি মাস্টার মশায়ের কাছে, 'তাই যদি হয় তবে উনি নোবেল পুরস্কার জয় করে বিশ্বকবি হলেন কী করে? 'গীতাঞ্জলি' কি গদ্যরচনা?'

'ওর ইংরেজী ভাষান্তর তো তুমি পড়নি। ওটা গদ্যরচনা ছাড়া আর কী! কী মধুর রসাত্মক!' তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

আমি সভয়ে গোপন করি যে ইংরেজী ভাষান্তরও আমি পড়েছি। কোথায়, কার কাছে জানতে চাইলে গোলাপ পিসির নাম করতে হতো। তাতে হয়তো তাঁর অভিমানে বাধত। যাক, উনি তো রবীন্দ্রনাথকে খাটো করতে চাননি। শুধু বলতে চেয়েছেন যে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস আরো বড়ো। সেটা শুধু তাঁর নয়, তার বয়সের অধিকাংশের মত। তখনকার দিনে বিদ্যাপতিকেও বাঙালী কবি বলে গণ্য করা হতো।

আরো একদল ছিলেন যাঁদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়ো কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। কী করে যে অমন অঘটন ঘটল, দ্বিজেন্দ্রলাল না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল পুরস্কার, এর পেছনে নাকি একটা রহস্য ছিল। রহস্যটা ফাঁস করে দেন আমার বন্ধু নরেনের মামা। ওটা নাকি অ্যাণ্ডরুজ সাহেবের ইংরেজী। বলম বুলিয়েছেন কবি ইয়েটস।

এসব কথা আমি গোলাপ পিসির কানে তুলি।

'একজনকে খাটো করলে আরেকজনকে বড়ো করা যায় না, জয়। ইউরোপের বিদগ্ধ মণ্ডলীকে আকৃষ্ট করেছে ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী। মরমিয়াবাদ। মিস্টিসিজম। তা ছাড়া ইউরোপেরও নিজের একটা মিস্টিক ঐতিহ্য আছে। যার একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা মেটারলিঙ্ক। তাঁকেও তো কয়েক বছর আগে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। তোমাকে

আমি মেটারলিঙ্কও পড়াব।' তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

আমি তাঁকে আরো কয়েকপ্রস্থ মাসিকপত্র পড়তে দিই। পড়া হয়ে গেলে তিনি ফেরৎ দেন। তখন আবার আরো কয়েক তাড়া।

'তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব, জয়! বাংলা মাসিকপত্র আমি কতকাল পড়বার সুযোগ পাইনি। তোমার সৌজন্যে আমার বাংলা সাহিত্যজ্ঞান ঝালিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো লাগছে আমার। কিন্তু একটা কথা মাথায় ঘুরছে। সংসারে লেখবার মতো বিষয়বস্তুর কি অভাব আছে? বিষয়বস্তুই কেঁদে বেড়াচ্ছে লেখকের জন্যে। আমাদের লেখকরা কি সে কাঁদন শুনতে পান না? পান, পান, নিশ্চয়ই পান। কিন্তু লেখেন না। কেন, বল দেখি? আমার তো মনে হয় সংস্কার এসে তাঁদের হাত চেপে ধরে। কিংবা লোকে কী বলবে এই ভয়। ওদিকে বিষয়বস্তুরা কাঁদছে। চরিত্রেরাও কাঁদছে। বলছে, 'লেখো, লেখো। লিখে আমাদের অমর করে দাও।' গোলাপ পিসি বলেন।

'তা হলে আপনাকেই লিখতে হয়, গোলাপ পিসি। আপনি যে লিখতেন তার সাক্ষী আছে। 'ইন মেমোরিয়াম'। বাংলাও আপনার হাতে সমান সুন্দর। যেটা করণীয় সেটা ওঁরা না করলে আপনিই করবেন।' আমি চাপ দিই।

'রক্ষে কর, জয়। সকলের সামনে হাজির হবার মতো না আছে আমার বিদ্যা না আছে আমার সাহস। প্রকাশ করা মানে তো সকলের সামনে হাজির হওয়া। তুমি কি লক্ষ করনি যে আমাদের 'ইন মেমোরিয়াম' বিক্রীর জন্যে নয়? ওর ভিতরে লেখা আছে —ফর প্রাইভেট সাবস্ক্রিপশন ওনলী।' তিনি মনে করিয়ে দেন।

আমার তো বিশ্বাস গোলাপ পিসি ইচ্ছা করলে টেনিসনের মতো কবিতা লিখতে পারতেন। যার নমুনা আমি দেখেছি। কিন্তু টেনিসন কি কেবল ওই একটি বিষয়েই লিখেছেন? বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেছেন। অপর পক্ষে গোলাপ পিসি যেন ওই একটি বিষয়েই আটকে রয়েছেন। পুত্রবিয়োগ। সে কান্না তাঁর এখনো থামেনি, যদিও চলে গেছে সাতটি বছর। পুত্রশোককে পুত্রের মতো তিনি সযত্নে লালন করছেন।

'গোলাপ পিসি,' আমি একদিন সলজ্জভাবে বলি, 'আমারও ইচ্ছা করে একটু আধটু লিখতে। মাসিকপত্রে নিজের নামটা দেখতে। তা বলে কি আমি খুঁজে বেড়াব নাকি কোথায় কোন্ বিষয়বস্তু আমার লেখনীর জন্যে কাঁদছে? আর চরিত্রের ক্রন্দনই বা কোথায় এত শুনব? ক্ষতিটা কী যদি আমি নিজের কথাই নিজের খুশিতে লিখি।'

'ক্ষতিটা কী?' তিনি প্রতিধ্বনি করেন। 'না, তেমন কোনো নিষেধ নেই যে তুমি তোমার নিজের কথা নিজের খুশিতে লিখতে পারবে না। কিন্তু দু'দিন বাদে দেখবে তুমি তোমার লেখায় বৈচিত্র্য আনতে পারছ না। তুমি ফুরিয়ে গেছ। যেমন ফুরিয়ে গেছি আমি।'

'আর যদি বলি যে আমি অনেকদিন ধরে লিখতে চাই, অনেক কথা বলতে চাই, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই, তা হলে ?' আমি লজ্জায় আনত হই।

'তা হলে তোমাকে নচিকেতার মতো জিজ্ঞাসু হতে হবে। ওরই মতো একটা মহান অন্বেষণ নিয়ে জীবন আরম্ভ করতে হবে। যতদিন না তার খোঁজ পাও ততদিন লেগে থাকতে হবে। কেউ যদি উৎসাহ না দেয় তা হলেও তুমি অদম্য। তোমাকে তোমার লক্ষ্য ভেদ করতেই হবে। না করতে পারলেও তোমার একাগ্রতার মূল্য আছে, জয়। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। তদ্ বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।' তিনি আমার কানে মন্ত্র দেন।

আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ থাকলে তো ? লেখা জিনিসটা আমার কাছে নিছক ছেলেমানুষী। এর ওর তার অনুকরণে দু'চার পাতা লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। কাউকে দেখতে দিইনে। আমার প্রাণের বন্ধুদেরও না। বাবা দেখতে পেলে আস্ত রাখবেন না। পড়াশুনা ফেলে এইসব হচ্ছে ! বিষয়বস্তু আমি মাথা খুঁড়েও পাইনে। আর চরিত্র বলতে আমি বুঝি নিপট ভালো লোক বা নির্জলা মন্দ লোক বা ভারী মজাব লোক বা বদ্ধ পাগল। আমার নাটকে 'ধরো অস্ত্র করো যুদ্ধ' এ দুটি কথা থাকবেই। তবে আমি কাউকেই মরতে দিইনে। যে মরে সেও বেঁচে উঠে আবেকবার লড়ে। আমার কাহিনীও মিলনান্ত। যেমন করেই হোক আমি সবাইকে সুখী করবই। কবিতায় কিন্তু আমি নিজেই কাঁদি। কেউ আমাকে ভালোবাসে না। আমার সমবয়সিনী বা মানসী কন্যারা। হ্যাঁ, সেই বয়সেই ভালোবাসার জন্যে আমার প্রাণে একটা আকুতি জেগেছিল।

পিসিকে এসব গোপন তথ্য জানতে দিইনে। জানতে দিলে যদি তিনি দেখতে চান। তা হলেই হয়েছে ! কী মনে করবেন কে জানে ! আর যদি বাবার নজরে আনেন ! কিন্তু পিসি আমাকে ভাবিয়ে দেন। কোন্ বিষয়বস্তু, কোন্ চরিত্র আমার লেখনীর জন্যে কাঁদছে ? আমি যদি কখনো লেখক হই তো যা খুশি লিখব, যেমন খুশি লিখব, ফাই ফরমাস বা নিয়ম কানুন আমার জন্যে নয়। কিন্তু এমন লেখকের লেখা কেই বা পড়তে রাজী হবে ?

'আমি কি সত্যি একজন লেখক হতে চাই নাকি ? তেমন উচ্চাভিলাষ আমার নেই, গোলাপ পিসি। লেখক হবে আমার বন্ধু বিনোদ। সভাসমিতিতে একঘর মানুষকে ও যেমন হাসাতে পারে তেমনি কাঁদাতে পারে। ওকেই তো সকলে ডাকে। আমাকে কি কেউ পোঁছে।' আমি আক্ষেপ করি।

'বিনোদ ওই পর্যন্ত যাবে। ওর চেয়ে বেশীদূর নয়। ওর কাজ বিনোদন।' গোলাপ পিসি বলেন। 'আর তুমি ? তুমি যাবে আরো অনেকদূর, যদি তোমার হাতে থাকে

রাজা আর্থারের অসি এক্সক্যালিবার।'

'কখনো শুনিনি ওর গল্প। কোন্ বইতে আছে, গোলাপ পিসি?' আমি আর্থারের নাম শুনেছিলুম, কিন্তু তাঁর অসির মহিমা শুনিনি।

'রাজা আর্থার আর তাঁর নাইটদের কাহিনী আমি তোমাকে শোনাব। পরে টেনিসনের কাব্যে পড়বে।' গোলাপ পিসি কৌতূহল জাগিয়ে দেন। 'আর্থার ছিলেন রাজপুত্র, কিন্তু ভাগ্যদোষে পিতৃহারা ও রাজ্যহারা। কেউ তাঁকে চিনতেন না। বালকটিকে দেখে এক নাইট তাঁর পেজ করে রাখেন। একবার হয়েছে কি, টুর্নামেণ্ট লড়তে লড়তে নাইটের তরোয়ালটা গেছে ভেঙে। তক্ষুনি তাঁর চাই আরেকটা তরোয়াল। আর্থারকে হুকুম দেন, যা, ছুটে যা, আমার বাড়ী থেকে এক্ষুনি ছুটে নিয়ে আয় আরেকটা তরোয়াল।'

'তারপর?' আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনি।

'তারপর আর্থার তো যান ছুটে। পথের মাঝখানে দেখতে পান এক গির্জার পাশে একটা পাথরে বেঁধানো রয়েছে একটা প্রাচীন তরবারি। এক টান মারতেই সেটা তাঁর হাতে উঠে আসে। তখন তিনি ছুটে গিয়ে সেটাকেই দেন তাঁর প্রভুর হাতে। প্রভুর তো চক্ষুঃস্থির। কোনো বীর আজ পর্যন্ত যা পারেনি এই বালক আজ তা পেরেছে। কিন্তু আর সবাইকে তিনি বলেন কীর্তিটা তাঁর নিজেরই। অন্যান্য নাইটরা তা বিশ্বাস করেন না। তখন সকলে মিলে হাজির হন সেই গির্জার পাশে। তরবারিটাকে আবার বেঁধানো হয় সেই পাথরে। নাইট বার বার টান মারেন। তরবারি তাঁর হাতে উঠে আসে না। শেষে আর্থার এগিয়ে যান। ওঁর এক টানেই তরবারি উঠে আসে ওঁর হাতে। নাইটরা সকলে বুঝতে পারেন যে ইনিই সেই রাজপুত্র যিনি পাথর থেকে টান মেরে বার করবেন এক্সক্যালিবার নামক প্রাচীন তরবারি যা অপরের হাতে যাবে না।' এই বলে গোলাপ পিসি আমার দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকান। যেন আমিই সেই বালক ভৃত্য। পরে রাজপুত্র আর্থার।

আমি অপ্রতিভ হয়ে বলি, 'আমার তেমন ক্ষমতা নেই, গোলাপ পিসি। এক্স-ক্যালিবার আমার হাতে আসবে না। রাজা হবার যোগ্যতাও নেই।'

'তোমার বেলা ওটা অসি নয়, লেখনী।' গোলাপ পিসি বলেন, 'কিন্তু তোমাকেও ওটা পাথর থেকে টেনে বার করতে হবে।'

এই কথাটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে লেখাটা একটা শখ নয়, একটা সাধনা। আমি গুরুত্ব দিইনি। পরে সেকথা মনে পড়েছে। বহুকাল পরে।

দুনিয়ায় কত কী হবার আছে! কত কী করবার আছে! সেসব ছেড়ে হতে হবে কিনা লেখক আর করতে হবে কিনা লেখার কাজ! কাব্য উপন্যাস নাটক আমার ভালো লাগত। কিন্তু তার চেয়ে কম ভালো লাগত না ইতিহাস ভূগোল ভ্রমণকাহিনী।

আমার উচ্চাভিলাষ দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো।

অ্যাটলাস আমার নখদর্পণে। প্রত্যেকটি শহরের নাম আমার নামতার মতো মুখস্থ। কোন্‌টা কোন্‌ দেশে তা আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি। আমার এই উচ্চাভিলাষের কথা আমি কাউকে জানাইনে। জানালে যদি আমাকে নজরবন্দী করা হয়। মা আমাকে ছেড়ে দেবেন না। এমনিতেই তো মার আশঙ্কা আমি মাতাজীর দলে যোগ দিয়ে হিমালয়ে চলে যেতে পারি। এতখানি দহরম মহরম তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর সন্দেহ গোলাপ পিসির যখন ছেলে নেই তখন উনি আমাকেই ছেলে করে নেবেন। বাবুয়ার জায়গায় বাবলু। তা নইলে এত আদিখ্যেতা কিসের! রোজ একটা না একটা কিছু রেঁধে খাওয়ানো!

গোলাপ পিসি একদিন সত্যি সত্যি বলেন, 'আমি সন্ন্যাস না নিলেও প্রব্রজ্যা নিয়েছি। তোমার মতো একটি চেলা পেলে এ জীবনে যা কিছু শিখেছি সব শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারি। নইলে সব মুছে যাবে।'

'দিয়ে যেতে পারি বলছেন কেন, গোলাপ পিসি? কোথায় যেতে চান? বিদেশে?' আমি বিদেশের নাম শুনলে নেচে উঠি।

'কোথায় যেতে চাই?' তিনি একটু থেমে ধরা গলায় বলেন, 'যেখানে গেছে আমার বাবুয়া। ওকে ছেড়ে বেশীদিন আমি বাঁচতে চাইনে, জয়।'

আমার কতই বা বয়স! ওঁকে আমি কী বা সান্ত্বনা দিতে পারি।

এর পর আমি যখনি যাই কিছু ফুল হাতে করে যাই। বাবুয়ার ফোটোর সামনে রাখি। গোলাপ পিসির মুখ আলো হয়ে ওঠে। উনি চোখ বুজে কিছুক্ষণ মনে মনে প্রার্থনা করেন। আমিও ওঁর সঙ্গে নীরবে যোগ দিই।

বাবার মুখে শুনেছি মাতাজী ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক ও অভিন্ন। মাঝখানে কোনো ব্যবধান নেই। সেটা মায়া। যারা ব্যবধান মানে তারাই মায়াবাদী, তারাই প্রার্থনা করে, উপাসনা করে, পূজা অর্চনা করে। তিনি কিন্তু ওসব করেন না। তার বদলে করেন ধ্যান। ওঁর ধ্যানের সময় ভোরবেলা। সে সময় দাদাজী ও গোলাপ পিসিও ওঁর ধ্যানের সাথী হন। কিন্তু এঁরা কেউ ওঁর মতো অদ্বৈতবাদী নন। এঁরা যে যার ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। ধ্যানটাই সকলের একসঙ্গে করণীয়। আর সব একসঙ্গে করলেও চলে, না করলেও চলে।

বাবারও ধ্যানে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় করে উঠতে পারতেন না। হেডমাস্টার মশায় প্রায়ই যেতেন। ওঁর কোয়ার্টার্স গোলাপ বাগের থেকে অতদূর নয়। আর ওঁর তো বিগ্রহসেবার দায় ছিল না। ওঁকে আমি কখনো পূজা অর্চনা করতে দেখিনি। তবে লক্ষ করেছি ওঁর বদনে একটা আভা। সে আভা নিশ্চয়ই ওঁর ধর্মজীবন

থেকে উদ্ভূত। বাবাকে উনি বলেছিলেন যে ধ্যান বাড়ীতে বসেও একক্তাবে করা যায়। তার জন্যে দশ পনেরো মিনিটই যথেষ্ট। যে কোনো সময়ই তার সময়। যাঁর যখন অবসর। পরে আমি বাবাকেও ধ্যানে বসতে দেখেছি। বেশীক্ষণের জন্যে নয়। কেউ না কেউ তাঁকে বিরক্ত করত। গৃহের কর্তা তিনি। কী করে ব্যাঘাত এড়াবেন?

গোলাপ পিসি বলেন, 'আমাদের আশ্রমে আমরা ভজন কীর্তনও করতে দিই। যার যাতে রুচি। আশে পাশে যারা থাকে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হলে যাতে ওরা আনন্দ পায় তাই মেনে নিতে হয়। বিগ্রহও আছে কারো কারো। কিন্তু মার নয়। আমারও নয়।'

তারপর কী ভেবে বলেন, 'এই যে ফোটো এই আমার বিগ্রহ। আমার ছেলেই আমার গোপাল। আমি গোপালের ধ্যান করি।'

আমি অবাক হয়ে শুনি, উনি বলে যান, 'গোপালকে আমি সব ছেলের মধ্যে দেখি। সকলের মধ্যে এক। একের মধ্যে সকলে।'

ওদিকে কিন্তু আমার মার মুখে শোনা যেত অন্য কথা। বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর থেকে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহকে নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকতেন। বলতেন 'এই মায়ার সংসারে কেউ কারো আপনার নয়। আপনার হচ্ছে ওই যাকে দেখছিস, ওই গোপাল। ওই আমার ছেলে।'

মনে লাগত বই কি। গোপালের উপর ঈর্ষাও যে না হতো তা নয়। কিন্তু সব অভিমান জল হয়ে যেত যখন গোপালের প্রসাদ মা আমাদের মুখে গুঁজে দিতেন। আমরাই তো ভোক্তা। 'ভোগ' যদিও গোপালের নামে উৎসর্গ। মালিনী এসে দিয়ে যেত মালা। সে মালা পরিয়ে দেওয়া হতো গোপালকে। তার উপর আমাদের লোভ থাকলেও সে মালা কিন্তু আমাদের গলায় ঘুরে আসত না। কবে, কেমন করে, কার হাত থেকে আমার গলায় মালা আসবে এটাও ছিল আমার বাল্যকালের অন্যতম জিজ্ঞাসা।

সেইজন্যেই কি আমাকে আকর্ষণ করেছিল 'চার ইয়ারী কথা'র ইটারনাল ফেমিনিন!

একদিন আবার কথায় কথায় গোলাপ পিসিকে বলি, 'কেউ যদি ইটারনাল ফেমিনিনের সন্ধানে বার হয় তা হলে কি সে তাকে পাবে না?'

তিনি বোধহয় এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। ভেবে উত্তর দেন, 'রূপকথার জগতে রাজপুত্ররা যাত্রা করে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, যেখানে আছে পরম রূপবতী রাজকন্যা। পথের মাঝখানে পাথর হয়ে যায় বা মরে পড়ে থাকে তাদের নয়শো নিরানব্বই জন। রাজকন্যার সন্ধান পায় মাত্র একজন। সেই একজন যে তুমিই হবে এমন কী কথা আছে? যদি পাথর হয়ে যাও। যদি—'

বাকীটুকু ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না। আমি বুঝি। কিন্তু মানিনে। গোলাপ পিসিকে

বলি বলি করে এতদিন যা বলিনি তাই বলে ফেলি। 'আমার উচ্চাভিলাষ কী, জানেন? দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো। আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী। ইউরোপ আমেরিকা চীন জাপান না দেখে আমার তৃপ্তি নেই। ভ্রমণকাহিনী কত যে আমি পড়েছি। পথঘাট সমস্তই আমার জানা। যেখানেই যাব সেখানেই আমার চেনা মানুষ। ভাবনা শুধু এই যে ওরা আমাকে দেখে চিনবে না।'

এর সঙ্গে জুড়ে দিতে পারতুম অদর্শনা রাজকন্যার কথা। যে আমার ইটারনাল ফেমিনিন। কিন্তু পিসি-মাসির কাছে ওসব গোপন রাখাই ভালো। বয়সটা যদি আরো কম হতো তা হলে বলতে পারতুম ঠাকুমাকে। ইতিমধ্যে তিনিও চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে—না, পরপারে নয়—বড়কাকা ও কাকিমার সঙ্গে অন্য প্রদেশে। আরো ছোট ছোট নাতি নাতনিদের টানে।

যার জন্যে গোলাপ পিসির কাছে যাওয়া সেই ইংরেজী জ্ঞানলাভের বিরাম ছিল না। ওটার একটা ব্যবহারিক দিকও ছিল। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াব কী করে, যদি দেশ-বিদেশের ভাষা না বুঝি। সেকালের রাজপুত্ররা কেমন করে চালাতেন কে জানে, কিন্তু আমি তো জানি যাঁরা দেশ বিদেশ বেড়িয়ে এসেছেন তাঁরা চালিয়েছেন ইংরেজী দিয়ে।

গোলাপ পিসি আর আমি কখনো ইংরেজীতে কখনো বাংলায় কথাবার্তা বলতুম। একটানা ইংরেজীতে কথা বলতে আমার কষ্ট হতো। মন্দ প্রগতি হচ্ছিল না। মুশকিল হয়েছিল এই যে, আমাদের দুজনেরই হৃদয় ছিল অন্যত্র ন্যস্ত। তাঁর ওই একই ভাবনা, একই ধ্যান। বাপ্যোকে তিনি কোথায় পাবেন, কবে পাবেন। কেমন করে ওকে ছেড়ে থাকবেন। আর আমি তো মনে মনে বাস করি আজ লণ্ডনে, কাল প্যারিসে, পরশু রোমে, তরশু সেণ্ট পিটার্সবার্গে। সেইসব রমণীয় নগরের রমণীরা আমার পথ চেয়ে বসে আছে। এক একটি ইটারনাল ফেমিনিন।

'জানেন, গোলাপ পিসি,' আমি ওঁকে চমক দিই, 'সেণ্ট পিটার্সবার্গ আপনি আর খুঁজে পাবেন না। সে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।'

'ওমা, তাই নাকি! কেমন করে, বল তো? পম্পিয়াইর মতো আগ্নেয়গিরির লাভা-বর্ষণে!' তিনি আমার দিকে সবিস্ময়ে তাকান।

'আপনি তো খবরের কাগজ পড়েন না। নইলে খবর রাখতেন যে রাশিয়ানরা এখন জার্মান নামগুলো বদলে দিয়ে স্বদেশী নাম রাখছে। তাই শহরটা আছে ঠিকই কিন্তু নাম হয়েছে ওর পেট্রোগ্রাড,' আমি জ্ঞান বিতরণ করি।

এর পরে শহরটার নাম আবার বদলায়। ততদিনে গোলাপ পিসিরা বিদায় নিয়েছেন। নইলে আমি ওঁকে ছুটে গিয়ে জানাতুম, 'গোলাপ পিসি! গোলাপ পিসি! আগ্নেয়গিরির লাভাবর্ষণের কথাটা সত্যি ফলে গেছে। রুশদেশে বিপ্লব ঘটে গেছে।

সেও একপ্রকার ভূমিকম্প। এবারকার নাম লেনিনগ্রাড।'

বিপ্লবের পর আমার সেদেশে যাবার উৎসাহ দপ করে নিবে যায়। কোথায় সেইসব প্রিন্সেস আর গ্র্যাণ্ড ডাচেস আর কাউন্টেস! সবাই যে নিহত অথবা নির্বাসিত। দুর্ভাগ্যটা আমারি। 'অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।'

যখনকার কথা বলছিলুম তখনকার কথা বলি। সাধারণত আমাদের প্রিয় পাঠ্য ছিল মিষ্টিক কবিদের কবিতা। ইয়েটস পড়তে পড়তে একদিন আবিষ্কার করি—

'ইটারনাল বিউটি ওয়াণ্ডারিং অন হার ওয়ে।'

আমার উপনযন গায়ত্রীমন্ত্রে নয়। আমার উপনয়নের মন্ত্র 'ইটারনাল বিউটি ওয়াণ্ডারিং অন হার ওয়ে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দিনরাত আবিষ্ট থাকি। আর কোনো কথা মনে আসে না। অমন যে ইটারনাল ফেমিনিন সেও নিষ্প্রভ হয় ইটারনাল বিউটির কাছে। ওই যে বলেছে 'হার ওয়ে'। তার থেকে ধরে নিতে পারি যে ইটারনাল বিউটিও ফেমিনিন। চিরন্তন সৌন্দর্য না বলে বলা উচিত চিরন্তনী সুন্দরী। চলেছে সে আপন মনে আপন পথে, বিশেষ কোনো লক্ষ্য অভিমুখে নয়, বিশেষ কোনো ব্যক্তি অভিমুখে নয়, বিশেষ কোনো সময়ের সীমানা মেনে নয়। অনাদি ও অনন্ত তার যাত্রা। সে অজর, সে অমর। ইটারনাল ফেমিনিনও তাই। উর্বশীর বয়সের হিসাব কে রাখে।

গোলাপ পিসি আমাকে আনমনা দেখে বলেন, 'দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্নে মশগুল রয়েছ বুঝি? এখনো তো হিমালয় দেখনি। যাবে আমাদের সঙ্গে?'

'এক্ষুনি। কিন্তু যেতে দিলে তো? মা আমাকে এখন থেকেই চোখে চোখে রেখেছেন। তাঁর মনে ভয় আমি একদিন সত্যি সত্যি আকাশে উড়ে যাব। নীড় আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।' গোলাপ পিসিকে বলি।

'না, না। এত কম বয়সে নয়। আগে তোমার স্কুলের পড়া সারা হোক। আমিও তো মা। মায়ের দুঃখ আমিও অনুভব করি। দেশভ্রমণের সময় পালিয়ে যাচ্ছে না। দেশও পালিয়ে যাবে না, জয়।' তিনি আশ্বাস দেন।

মার মনে শঙ্কা ছিল যে গোলাপ পিসি আমাকে ভুলিয়ে ভজিয়ে তাঁদের আশ্রমে নিয়ে যাবেন ও সেখানে গেলে মাতাজী আমাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেবেন।

শচীমাতা নাকি বলেছিলেন—

'কেশব ভারতী আসি কিবা মন্ত্র দিল
সেই হতে নিমাই আমার সন্ন্যাসী হইল।'

আমার মা বলতেন, 'ইনিও তো তেমনি এক ভারতী। কে জানে কার মনে কী আছে! ভাবসাব দেখে আমার তো সন্দেহ হয়।'

আগেই বলেছি আমাদের বাড়ীতে সাধুসন্ন্যাসীদের পায়ের ধুলো পড়ত বারো মাস। বাবার সঙ্গে তত্ত্বালাপ করতেই আসা। কিন্তু সেটা সাঙ্গ হলেই উঠত বৈষয়িক প্রসঙ্গ। বাবা ছিলেন দেবোত্তর বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত। সাধুদেরও বিষয়বুদ্ধি প্রখর।

একবার এক বাবাজীর আবির্ভাব হয়, তাঁর পদ্ধতিটা অন্যরূপ। তিনি বাবার কাছে না গিয়ে আমাদের ক'ভাইকে পাকড়ান। বলেন, 'তোমাদের আমি খোল বাজাতে শিখিয়ে দেব। পরে প্রত্যেককে একটা করে খোল কিনে দেব। কিন্তু তোমাদের, ভাই, একটি কাজ করতে হবে। রোজ সকালে উঠে বাবাকে আর মাকে প্রণাম করবে। ওঁরাই তো সাক্ষাৎ দেবতা। ওঁদের কথা শুনবে। ওঁদের আদেশ মানবে।'

আমরা তো আনন্দের সঙ্গে রাজী। পরের দিন রাত পোহাতে না পোহাতে আমরা গিয়ে বাবার ঘরে হাজির। প্রণামের ধুম দেখে তিনি তো বিমূঢ়। হঠাৎ এত ভক্তি কেন? কার শিক্ষা এটা? গোকুলদাস বাবাজীর। গোকুলদাস যে বৃন্দাবন থেকে এসেছেন এ খবরটা বাবার কানে পৌঁছেছিল। আর তিনি যে খোল বাজাতে ওস্তাদ এটাও তাঁর অজানা ছিল না। এ ছাড়া তিনি একজন সুকণ্ঠ কীর্তনগায়ক। বাবা তো খুব খুশি। বাবাজীর প্রস্তাব তিনি মঞ্জুর করেন। আমরা বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে খোল বাজাতে শিখি। আমার হয় না। আমার ভাইদের হয়।

এবার খোল কিনে দেবার পালা। বাবা বলেন, 'গোকুলদাস আমাকে ধরেছে খোল কিনে দিতে। ও বৈরাগী মানুষ, পয়সা পাবে কোথায়?' খোল কেনা হলো। খোল বাজাতে বাজাতে বাবাজীর সঙ্গে নগর সংকীর্তনও হলো। 'নাচ দেখি ভাই বাহু তুলে হরি হরি হরি বলে।' বাবাজী অগ্রদূত। আমিও তাঁর পাশে পাশে। নগর সংকীর্তনের শেষে প্রসাদ সেবনেরও পালা ছিল। বাবাজী ভিক্ষা করে আনতেন। দেবোত্তর বিভাগেরও দাক্ষিণ্য ছিল।

অবশেষে সেই দিনটি আসে যেদিন বাবাজী এসে বাবাকে বলেন, 'বাবুজীর কাছে এ অধমের একটা প্রার্থনা আছে। বাবুজীই তো রাজা সাহেবের ডান হাত। বাবুজীর যদি কৃপা হয় তো বাবুজী কাঙালকে মোহন্ত বানিয়ে দিতে পারেন। শুনছি নন্দগোপাল মঠের মোহন্তের গদী খালি আছে।'

বাবা বলেন, 'সে কি আপনি পারবেন? বিষয়সম্পত্তি ম্যানেজ করতে হবে যে। মোহন্ত আয়ব্যয়ের হিসাব না দিয়ে সরে পড়েছে।'

সাধু যদি অসাধু হয় তাকে সাজা দেওয়া যায় না। পুলিশও তার গায়ে হাত দিতে ডরায়। আর হাকিমই বা তাকে শ্রীঘরে পাঠান কোন্ সাহসে?

'মুই অতি অভাজন মূঢ়মতি দুর্জন। তবু শ্রীহরির দয়া হলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে।' বাবাজী যেন বৈষ্ণব বিনয়ের অবতার। তৃণের মতো সুনীচ। এমন মানুষকে

কে না বিশ্বাস করে?

'প্রভু, দাসের কি পুত্র আছে না কলত্র আছে? কার জন্যে দাস চুরি করবে? মোহন্ত ঠাওরেছে পালিয়ে রক্ষা পাবে। আরে বাবা, পালাইতে পথ নাহি যম আছে পিছে। যমদূত এসে নরকে ধরে নিয়ে যাবে। বিষ্ণুদূত ওকে ছোঁবে না।' বাবাজী বলেন।

শূন্য গদীটা দিতে হতো একজন না একজন বাবাজীকে। প্রার্থীর অভাব ছিল না, কিন্তু গোকুলদাসের মতো জনপ্রিয় আর কেউ নয়। ওঁর নিযুক্তিতে সবাই সুখী। মোহন্ত হয়েও উনি আমাদের ভোলেন না। মহোৎসবের সময় ডাকেন।

কিন্তু বছর খানেক বাদে দেখা গেল কাজকর্মের ধান্দায় তিনি আর কীর্তন পরিচালনার অবসর পান না। নগর সংকীর্তনের পাঠ উঠে গেছে। বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলে শুধু বিষয়সম্পত্তির প্রসঙ্গে মগ্ন থাকেন। ইতিমধ্যেই তিনি আয়ব্যয়ের সমতা স্থাপন করেছেন। তাঁর খাতাপত্রও পরিষ্কার।

এর পর শোনা গেল তিনি মাসোহারা হিসাবে যা পান তা তেজারতিতে খাটান। সুদে আসলে যা আদায় হয় সেটা তাঁর ব্যক্তিগত আয়। কিন্তু কাঞ্চন তাঁকে এমনভাবে আবিষ্ট করে যে তিনি সেবাপূজায় অবহেলা করেন। লোকে নালিশ জানাতে আসে। বাবা তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি একটা না একটা অজুহাতে গরহাজির হন। আর তেমন বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়ও তাঁর আচরণে প্রকাশ পায় না। সর্বদা একটা বিরক্তির ভাব।

কাঞ্চনের পরের অধ্যায় কামিনী। যেই শোনে সেই ছি ছি করে। বাবা দুঃখিত হয়ে বলেন, 'এই যদি মনে ছিল তো কণ্ঠিবদল করে গৃহী বৈষ্ণব হলেন না কেন? নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তো অনুমতি দিয়ে গেছেন।'

কিন্তু কণ্ঠিবদল করলে আর মোহন্ত মহারাজ থাকা চলে না। কাঞ্চনের মায়া কাটাতে হয়। গোকুলদাস মহাজনের কাছে কাঞ্চনই হচ্ছে আসল, কামিনী হচ্ছে সুদ। তিনি পদাবলীকার বৈষ্ণব মহাজন নন, সাধারণ এক সুদখোর মহাজন। তবু ওঁকে বিদায় করা যায় না। প্রয়োজনের সময় আমলারাও ওঁর কাছে হাত পাতেন। শোধ করতে গড়িমসি করেন।

'লোকটা মঠের সম্পত্তি তো তছনছ করছে না। আগের মোহন্ত যেমন করত। তা হলে ওকে তাড়িয়ে কার কী লাভ! আর, যার সঙ্গে যাই করুক প্রকাশ্যে তো করছে না। অমন গুপ্ত পিরীত কোন মঠেই বা নেই? ওর জায়গায় যাকে বসাবে সেই বা কোন্ শুকদেব গোস্বামী!' আমলারা বলেন।

এসব দেখে শুনে আমার সন্ন্যাসে অভিরুচি ছিল না। তাই মা যখন সন্দেহ করতেন যে আমি মাতাজীর দলে ভিড়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হতে পারি তখন আমি মনে মনে আওড়াতুম, 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' আমার রয়েছে ইন্টারনাল

ফেমিনিন। আমার রয়েছে ইটারনাল বিউটি। এখনো বেছে নেবার বয়স আসেনি। কোন্‌টিকে ছেড়ে কোন্‌টিকে বেছে নেব সে ভাবনা পরবর্তী বয়সের। কেন, ছাড়তেই বা হবে কেন? একসঙ্গে দুইজনকে কি ভালোবাসা যায় না?

'তোমাকে তো আজকাল বেশ আনমনা দেখি। কী ভাবছ, শুনতে পাবি কি?' একদিন জিজ্ঞাসা করেন গোলাপ পিসি।

'ভাবছি ইটারনাল ফেমিনিন আর ইটারনাল বিউটি কি এক না দুই? যদি এক না হয়ে দুই হয়ে থাকে তা হলে কি দু'জনের থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে? আমি কিন্তু একজনের জন্যে আরেকজনকে ছাড়তে পারব না, গোলাপ পিসি।' আমি সলজ্জ-ভাবে বলি। আর মুখ নিচু করে থাকি।

'তার মানে আবার সেই ইটারনাল ট্রায়াঙ্গ্‌ল।' গোলাপ পিসি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 'অমনি করে তুমিও একদিন ট্র্যাজেডী ডেকে আনবে। তুমিই ভুগবে।'

শুনে আমি ভীত হই। তবে আমি আশা করি যে ওরা দুই নয়, এক। আমার চোখে নারীমাত্রেই সুন্দরী আর সৌন্দর্য মাত্রেই ফেমিনিন।

ইতিমধ্যে আমি আর্ট কথাটাও আবিষ্কার করেছি। কী যে ওর অর্থ তা বুঝিনে। তবু কেমন যেন মনে হয় আমার জীবনে ওরও স্থান আছে। আর সৌন্দর্যের সঙ্গে আছে ওর সম্পর্ক। তা বলে আমি সারাজীবন আর্ট নিয়ে থাকতে পারব না। আমার আছে কত-রকম বিষয়ে আগ্রহ। হয়তো একদিন রাজপুত্র আর্থারের মতো আমিও এক্সক্যালিবার হাতে পাব। যুদ্ধবিগ্রহে নেমে বীরত্বের পরিচয় দেব। আমি কেন লিখতে যাব আর কারো কাহিনী? আমাকে নিয়েই লেখা হবে রোমান্স। লিখবেন কোনো এক ম্যালরি। কাব্যে রূপান্তরিত করবেন কোনো এক টেনিসন।

না, আমি মনঃস্থির করতে পারছিনে বীর হব না কবি হব, অসি নেব না মসী নেব। এটাও এক ভাবনা। এতেও আমাকে আনমনা করে রাখে।

'আরো এক ইটারনাল ট্রায়াঙ্গ্‌ল।' গোলাপ পিসি মন্তব্য করেন শুনে। 'তোমার ভাগ্যে দেখছি সুখ নেই, ছেলে।'

এই প্রথম তিনি আমাকে ছেলে বলে আপনার করে নেন। আমিও তাঁর কোলে মাথা রেখে ভাবি। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়।

'তোর মতো পাগল ছেলে আমি দেখিনি।' গোলাপ পিসি এই প্রথম আমাকে তুই বলেন। কী মিষ্টিই যে লাগে শুনতে!

'আচ্ছা, গোলাপ পিসি, একটা কথা তোমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করছি। বাবার কানে তুলো না। কারো কানে না।' আমিও এই প্রথম ওঁকে তুমি বলি।

'কী কথা?' তিনিও খুশি হয়ে বলেন।

'কথাটা খুবই গোপনীয়। ভূগোলে, ভ্রমণকাহিনীতে কোথাও কেউ খুলে বলছেন না। তুমি তো অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছ। তুমি বলতে পারবে। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আমি ফাঁস করে দেব না।' কথাটা একটু একটু করে পাড়ি।

'এমন কী গোপনীয় কথা, জয়?' তিনি ফিসফিস করে বলেন।

তখন আমিও ফিসফিস করে বলি, 'গোলাপ পিসি! গোলাপ পিসি! কোন্ দেশে গেলে পরীদের দেখা পাওয়া যায়? পারস্য দেশে?'

তিনি হেসে ফেলেন। এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি লক্ষ করি।

'কী করে বলব? আমি তো পারস্য দেশে যাইনি। কিন্তু তোর কি ধারণা কাহিনীতে যা থাকে জীবনেও তাই থাকে?' তিনি আমাকে পালটা প্রশ্ন করেন।

'তাই তো আমার বিশ্বাস। জীবনে না থাকলে কাহিনীতে থাকবে কী করে? কাহিনী কি নিরালম্ব?' আমিও করি পালটা প্রশ্নের পালটা প্রশ্ন।

গোলাপ পিসি ভাবনায় পড়েন। আমি আবার আমার আদি প্রশ্নে ফিরে যাই। 'পরীদের দেখা পেতে হলে কোন্ দেশে যেতে হয়?'

'তুই আমাকে হাসালি।' তিনি হেসে বলেন, 'পাগল ছেলে, পরী বলে কেউ থাকলে তো তুই তার দেখা পাবি। তবে, হ্যাঁ, ডানা কাটা পরী যদি দেখতে চাস্ তো অত ঘোরাঘুরি করতে হবে না। তোর নিজের বোনেরাই তো এক একটি ডানা কাটা পরী।'

তা ওরা নেহাৎ মন্দ ছিল না দেখতে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাই সেটা কি অমন করে হেসে উড়িয়ে দেবার মতো! এই বিশাল বিশ্বে কি একটাও দেশ নেই যেদেশে গেলে পরীদের দেখা পাওয়া বিচিত্র নয়। কেউ কোথাও না কোথাও দেখেছে। তা না হলে কাহিনীতে এল কী করে? ইংরেজীতে বলে ফেয়'রী টেলস। পড়তে পড়তে মনে হয় সব সত্যি। তবে পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়ার সৌভাগ্য ইংরেজী ফেয়ারী টেলস পড়ে হয় না। তার জন্যে পড়তে হয় পারস্য উপন্যাস।

গালিভারস ট্রাভেলস, রবিনসন ক্রুসো এসব বইও আমার কাছে সত্য ছিল। যা পড়তুম তাই বিশ্বাস করতুম। মাত্র বারো তেরো বছর হলো আমি পৃথিবীতে এসেছি। কেমন করে জানব সত্য কোন্খানে শেষ হয়েছে, কল্পনা কোন্খানে আরম্ভ হয়েছে? সেইজন্যেই তো আমি বেরিয়ে পড়তে চাই, নিজের চোখে দেখতে চাই কোন্টা বাস্তব কোন্টা অবাস্তব। কতখানি বাস্তব কতখানি অবাস্তব।

দাদাজী আমাকে মাঝে মাঝে তাড়া দিতেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। ইউ আর এ উইকলিং।' আর যা বলতেন তার মানে হলো তিনি আমাকে ছ'মাসের মধ্যেই বলিষ্ঠ ও সুগঠিত করতে পারেন, যদি আমি প্রতিদিন তাঁর পদ্ধতিতে ব্যায়াম করি।

পথ্যও তিনি বেঁধে দেবেন।

আমার লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না। যাদের ছিল তারাও একে একে কেটে পড়ে। শীতকালেও আমাদের স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলত। খেলার মধ্যে ওইটেই সব চেয়ে সস্তা। তবে ক্রিকেটের দলও ছিল। কে জানে কোন্‌খান থেকে ওরা ব্যাট বল উইকেট জোগাড় করত। একটু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে যারা তাদের ছিল টেনিসের দল। খেলাধুলার আকর্ষণ ভুলে কেনই বা কেউ দাদাজীর পদ্ধতিতে ব্যায়াম করতে আসবে?

তবু আসত, কারণ হেডমাস্টার মশায় তাদের বোঝাতেন যে, এই গরিব দেশে ওসব ব্যয়সাধ্য বিদেশী খেলা হচ্ছে একপ্রকার বিলাসিতা। যারা পেট ভরে খেতে পায় না তাদের পক্ষে ওসব শ্রমসাধ্য খেলা তো মারাত্মক। ওসব খেলে কারা? বিলিতী গোরা। যাদের নিত্য ভক্ষ্য ষাঁড়ের ডালনা। যেমন কষে খায় তেমনি কষে খেলে। ওদের মতো খেতে না পারলে ওদের মতো খেলতে পারা যায় না। পরে একদিন অসুখে ভুগতে হবে। ক্ষয়রোগ কিংবা গেঁটে বাত আছে কপালে। তার চেয়ে ঢের ভালো দাদাজীর ব্যায়াম। একটি পয়সাও লাগে না। খাবারের খরচ তো আরো কম। ভিজে ছোলা, ফ্যানসুদ্ধ ভাত, কাঁচা তরকারি, ডাল রুটি ইত্যাদি। ওর কোনো কুফল নেই। বরং অসুখ থাকলে সেরে যায়।

হেডমাস্টার মশায় একদা স্বদেশী আন্দোলনে নেমেছিলেন। ফুটবল ছেড়ে হা-ডুডু খেলায় মেতেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তিনি তাগড়া জোয়ান হননি। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। মনে হয় না যে গায়ে জোর আছে। তবে নীরোগ ও কর্মঠ। তিনি বলতেন, 'খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়, বাঁচার জন্যে খাওয়া।' সব কিছুই খেতেন, কিন্তু কম কম।

খেলায় আগ্রহ আমারও ছিল। ফুটবল বা হা-ডুডু, টেনিস বা ক্রিকেট কোনোটাই বাদ দিইনি। সব ক'টাই খেলেছি। কিন্তু কম কম। ঘরে খাবার কম ছিল বলে নয়। তবে এমন কিছু বেশীও ছিল না। মাছ মাংস তো বারণ। খেতে হলে গাছতলায় গিয়ে আলাদা রেঁধে খেতে হয়। আসল কারণ হলো আমার মন থাকত কাহিনীর বা কাব্যের জগতে। আর দেহ থাকত মাটির পৃথিবীতে। গোলাপ পিসি শুনলে বলতেন সেটাও একটা চিরন্তন ত্রিভুজ। আমি, আমার মন, আমার দেহ। কাকে ছেড়ে কাকে বেছে নিই? দেহকে না মনকে? প্রবণতাটা মনেরই দিকে। তা বলে খেলাধুলায় আমি পেছপাও ছিলুম না। বল তো আমিই কতবার গোলের দিকে ক্যারি করে নিয়ে গেছি। হাঁ, গোলও করেছি। তবে সেটা আমার গুণে না গোলকীপারের দোষে তা বলা শক্ত। সেন্টার ফরওয়ার্ড হতে সাধ ছিল, কিন্তু দলের চাঁই যারা তাদের বিচার অন্যরূপ। তাদের ইচ্ছায় আমি রাইট আউট।

গোলাপ পিসির কাছে পড়তে যেতে হয় বলে আমি খেলার মাঠে থেকে ছুটি নিই।

ফুটবলের জন্যে পা নিসপিস করত। হাত নিসপিস করত ক্রিকেটের জন্যে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতুম দাদাজীর ব্যায়ামের ক্লাস আমাকে বাদ দিয়ে চলেছে। একখানা ব্যাটন হাতে নিয়ে ওঁর ছাত্রদের আদেশ বা নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা যেন একদল সৈন্য আর তিনি যেন তাদের সেনাপতি। মিলিটারি ডিসিপ্লিন। ওই দুটি শব্দ আমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। স্কুলের ডিসিপ্লিনও আমি ভালোবাসতুম না। সুযোগ পেলেই পালাতুম। কখনো চলে যেতুম আমবাগানে ও পুকুরপাড়ে। কখনো লাইব্রেরীতে বা ম্যাগাজিন রুমে। মাঝে মাঝে শাস্তিও পেতে হয়েছে। একবার তো আমাকেই বলা হলো বেত কেটে নিয়ে আসতে। বেত আমারই পিঠে পড়বে। সব চেয়ে কচি সব চেয়ে নরম দেখে একখানা বেত বেছে নিয়ে ক্লাসে ফিরে আসি যখন, তখন ঘণ্টা পড়ে গেছে। স্যার তখন অন্য ক্লাসে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। বেতটা ওঁর হাতে দিয়ে বলি, 'আপনার হুকুম আমি তামিল করেছি স্যার।' হাসির রোল ওঠে। সেটা বেতের চেহারা দেখে না শিক্ষকের দশা দেখে তা কে বলবে ? আমি কিন্তু হাসিনে।

মাতাজী ওঁর নিজের ঘরে বসে সেই সময়টা চিঠিপত্র লিখতেন। মাঝে মাঝে ডাকতেন, 'মুন্নি ! মুন্নি !' গোলাপ পিসি বলতেন, 'যাই, মা।' মাতাজীর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে আমার সাহস হতো না। তিনিই আমার খোঁজ নিতেন, যখন গানের জন্যে সবাই তার ঘরে জড়ো হতো। তিনিও গাইতেন ধনধান্যে পুষ্পে ভরা।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে গান করা হতো, নেতৃত্ব করতেন দাদাজী। যাঁর মাতৃভাষা তেলুগু। মাতাজীকে মা বলে ডাকার সময় থেকে বাংলাও ওঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা। তবে সাধারণত তিনি ইংরেজীতেই কথা বলতেন।

আমাদের শুধু গাইলেই হতো না, দুই হাতে তালি দিয়ে দুলে দুলে পায়চারি করতেও হতো। মাতাজীকে ঘিরেই আমরা পরিক্রমা করতুম। তারপর ওঁকে প্রণাম করে ছত্রভঙ্গ হতুম আমরা, মানে দাদাজীর ছাত্ররা আর দিদিজীর ছাত্র আমি। আমাদের প্রত্যেককেই মাতাজী আশীর্বাদ করতেন। বলতেন, 'আবার এসো।' আর গোলাপ পিসি ধরিয়ে দিতেন একটি দুটি পেড়া বা লাড্ডু। আমার পক্ষে ওটা ফাউ। কারণ এর আগেই আমার পেটে গেছে কেক বা পুডিং বা হান্টলি পামারের বিস্কুট। যেদিন যেটা জোটে। কাউকেই জানতে দিইনে। দিলে কি রক্ষা আছে ? না, বাড়ীতেও না। সেখানে যেটুকু বলি সেটুকু ওই পেড়া কিংবা লাড্ডু অবধি।

আগে তো 'বন্দে মাতরম্'ও গাওয়া হতো। কিন্তু পরে বন্ধ হয়ে যায়। এর পেছনে ছিল এক রহস্য। সেটা আমরা সেসময় ভেদ করতে পারিনি। বছর খানেক বাদে জানাজানি হয়ে যায়। মাতাজীরা ততদিনে অন্যত্র। আসলে হয়েছিল কী, দেওয়ান-সাহেবের কুঠি ছিল গোলাপ বাগের থেকে একটা পাথর ছোঁড়ার দূরত্বে। একটা গান

ছুঁড়লে তো তাঁর কানে বাজবেই। তিনি চমকে উঠে ডেকে পাঠান দাদাজীকে। বলেন, 'বেদ উপনিষদ্ শিক্ষা দেবার জন্যেই আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বন্দে মাতরম্ কোন্ বেদে বা কোন্ উপনিষদে আছে জানতে পারি কি?' দাদাজী বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে।' দেওয়ানসাহেব বলেন, 'আনন্দমঠের বিষয়টা হলো সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। বন্দেমাতরম্ হলো বিদ্রোহীদের রণহুঙ্কার। ওরা যাদের বিদ্রোহের শিক্ষা দিত তারা সন্তানদল। ওদের হাতে ছিল অস্ত্র। ওদের নেতা ছিলেন সত্যানন্দ না ভবানন্দ কে একজন আনন্দ। এখন আপনি মিলিয়ে দেখুন, মিলে যাচ্ছে কি না। নেতার নাম চিদানন্দ। তিনি একজন সন্ন্যাসী। তাঁর মঠে ক্যাঠি নিয়ে কুচকাওয়াজ করতে শিক্ষা পাচ্ছে একদল সন্তান। তাদের কণ্ঠে রণহুঙ্কার বন্দে মাতরম্। বড়ো হয়ে এরা রাজদ্রোহী হবে। ব্রিটিশ সরকার যদি আজ এখনি এর গন্ধ পান কাল আসবে আমার বরখাস্তের হুকুম। রাজার রাজত্ব কেড়ে নেওয়া চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু দেওয়ানের দেওয়ানি ঘুচিয়ে দিতে কতক্ষণ। মাননীয় অতিথিদের আমরা অসময়ে বিদায় দিতে চাইনে, বেদ উপনিষদ্ শিক্ষা দিয়ে আমাদের তাঁরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, আমরা কি অকৃতজ্ঞ হতে পারি। কিন্তু বন্দেমাতরম্ তো বেদ উপনিষদ্ নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এর সঙ্গে বোমা রিভলভারের সম্পর্ক ছিল, দাদাজী। জন বুলের কাছে বন্দে মাতরম্ যেন ষাঁড়ের কাছে লাল ন্যাকড়া। আপনারা দেশকে ভালোবাসেন। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'ই আপনাদের পক্ষে ঢের। ওতে বিদ্রোহের অনুষঙ্গ নেই। যে দেশকে সকল দেশের সেরা বলা হয়েছে সে দেশটির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। ও গান আপত্তিকর নয়। সাহেবরা আপত্তি করলে আমি ওঁদের বোঝাতে পারব। কিন্তু বন্দেমাতরম নৈব নৈব চ।'

দাদাজী এসব কথা মাতাজীর কাছে বিবৃত করেন। তা শুনে তিনি এমন রাগ করেন যে তাঁর দলের লোকজনকে হুকুম দেন, তল্পিতল্পা বাঁধো। এমন রাজ্যে আর একটা দিনও নয়। খবরটা কেমন করে রানীসাহেবার কানে যায়। তিনি বলেন রাজাসাহেবকে। হিজ হাইনেস পড়েন উভয়সঙ্কটে। সাহেবরা যদি ক্ষেপে যায় তো বিপদ। আর মাতাজী যদি চটে যান তো রাজ্যের উপর অভিশাপ। বাবাকে ডাক পড়ে। রাজবাড়ীতে বাবার একটা মর্যাদার স্থান ছিল। সেটা পদমর্যাদার তুলনায় অত্যধিক। গোলমেলে বিষয়ে হিজ হাইনেস তাঁর পরামর্শ চাইতেন।

'দেওয়ানসাহেবের হৃদয়ে যে দেশভক্তি নেই, তা নয়, ইওর হাইনেস। কিন্তু এতরকম এতগুলো যোগাযোগ সত্যি বিরল। চিদানন্দ, সন্তানদল, ব্যায়ামশিক্ষা, বন্দে মাতরম্। এসব কথা আমারও মাথায় আসেনি। তা হলে তো আমিই দেওয়ানপদের যোগ্য হতুম। অথচ মাতাজীরও অপদস্থ হবার মতো যথেষ্ট কারণ নেই কি? বন্দে

মাতরম্ আজকাল কে না গায়! স্বদেশীর যুগ কবে গত হয়েছে! মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য চেয়ে আবেদন করছেন রাজপ্রতিনিধিরা। প্রজারাও দাবী করছে হোম রুল বা আত্মনিয়ন্ত্রণ। সন্তানদল তো এখন পলটন তৈরি করে রাইফেল কামান নিয়ে লড়তে নেমেছে। মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে ওরা কি গড সেভ দ্য কিং বলে জান দেবে? না 'বন্দেমাতরম্' বলে? আমরা সবাই এখন ইংরেজদের পক্ষে, জার্মানদের বিপক্ষে। মাতাজীও তাই। দাদাজীও তাই। ইংরেজরা কি তাদের মিত্রদেরও শত্রু বলে সন্দেহ করবে? যেহেতু তারা দেশভক্ত? হিওর হাইনেস মহামান্য অতিথিকে ও দেওয়ান-সাহেবকে দুইজনকেই অডিয়েন্স দিন। দেওয়ানসাহেবের হুকুম নয়, রাজাসাহেবের নিষ্পত্তিই এক্ষেত্রে কাজ দেবে। যেমন বিক্রমাদিত্যের নিষ্পত্তি। নিষ্পত্তিটা ইওর হাইনেসকেই ভেবে বার করতে হবে। আমরা কে যে মাতব্বরি করব! কেউ যেন টের না পায় যে আমি পরামর্শ দিয়েছি।' এই গৌরচন্দ্রিকার পর বাবার অভিমত হলো অতিথির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে অনুরোধ করা হোক যে জাতীয় সঙ্গীত যেন একটিই হয়, একাধিক না হয়। যেটি তাঁর পছন্দ। মাতাজী যদি বলেন বন্দে মাতরম্ তা হলে বন্দে মাতরম্। সেক্ষেত্রে বাবা গিয়ে হেডমাস্টারমশায়কে পরামর্শ দেবেন গোলাপ বাগে তাঁর স্কুলের ছাত্রদের না পাঠাতে।

ইতিমধ্যে মাতাজীও ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছিলেন যে, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যেটা ব্রিটিশ ভারতে অবাধে চলছে সেটা দেশীয় রাজ্যে অচল হতেও পারে। এরা তো আরো পরাধীন। প্রাইভেট সেক্রেটারি অনুরোধ করতেই তিনি বন্দেমাতরম্ ছেড়ে জনগণকে পছন্দ করেন। দেওয়ানসাহেবেরও মান বজায় থাকে। মহামান্য অতিথিরও সম্মান রক্ষা হয়। তাঁরা কেউ টের পান না যে নেপথ্যে রয়েছেন বাবা। বাবাও মুখ খোলেন না যতদিন সময় অনুকূল হয়।

'মহামান্য মাতাজী' কথাটাও তাঁরই উদ্ভাবন। সাধুদের সব জায়গায় মহারাজ বলে সম্বোধন বা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। স্ত্রীলিঙ্গে মহারানী। আমাদের রাজ অতিথিদের বেলাও প্রশ্ন ওঠে, এঁরা কি মহারাজ না মহারানী? দিদিজী সাফ বলে দেন যে তিনি সন্ন্যাসিনী নন, পরিব্রাজিকা। অতএব মহারানী নন। দাদাজীও সোজাসুজি বলেন যে তিনিও সন্ন্যাসী নন, গৃহী শিষ্য। অতএব মহারাজ নন। বাকী রইলেন মাতাজী। তাঁর নাম থেকে বোঝবার উপায় নেই যে তিনি সন্ন্যাসী নন, সন্ন্যাসিনী। অথচ তিনি মাতাজী বলেই সুবিদিত। রাজাসাহেব বলেন, 'দেওয়ানসাহেব, এঁকে আমরা কী বলে সম্বোধন করব, মহারাজ না মহারানী?' দেওয়ানসাহেব বলেন, 'বাবাজী মহারাজ বুঝি। স্বামীজী মহারাজও বুঝি। কিন্তু মাতাজী মহারাজ তো বুঝিনে। আবার শ্রীমৎ চিদানন্দ ভারতীকে মহারানী বলে সম্বোধন করলে তিনি যদি কৈফিয়ৎ তলব করেন সন্ন্যাসীতে সন্ন্যাসীতে

এই অহেতুক ভেদবুদ্ধি কেন? একই তো দীক্ষা।' রাজাসাহেব তাঁর একান্তসচিবকে আদেশ দেন, 'সুশীলবাবুকে ডেকে পাঠান।' বাবা সব শুনে বলেন, 'ইওর হাইনেস, এর কোনো নজীর জানা নেই। মহারানী বা মহারাজ কোনোটাই এখানে খাটে না। নিষ্পত্তিটা ইওর হাইনেসকেই করতে হবে। আমরা শুধু পরামর্শ দিতে পারি। ইওর হাইনেস সেটা গ্রহণ করতেও পারেন, বর্জন করতেও পারেন। আমি তো ইতিমধ্যেই ডাকতে শুরু করেছি মহামান্য মাতাজী বলে।' সেইভাবেই নিষ্পত্তি হয়।

মাতাজীর বক্তৃতা শুনতে প্রথম প্রথম বেশ ভিড় হতো। কে এই সন্ন্যাসিনী যাঁর মুখে ইংরেজীর খই ফুটছে? বেদ উপনিষদ্ যাঁর কণ্ঠস্থ। আর কী রানীর মতো চেহারা! কিন্তু যতই দিন যায় ভিড় ততই পাতলা হয়ে আসে। মাতাজী সেটা লক্ষ করেন ও মনে ব্যথা পান। মুখ ফুটে একদিন বলেই ফেলেন কথাটা। আমার সাক্ষাতে। বাবাকে।

'শোন, সুশীল, আমার জীবনে একটা মিশন আছে। আমিও একজন মিশনারী। আমি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে, সমগ্র সত্তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে আমি আর্য। আমার ভাষা আর্য ভাষা। আমার দেশ আর্যাবর্ত। আমার উত্তরাধিকার আর্য উত্তরাধিকার। আর আমার উত্তরাধিকারের মূলভিত্তি হলো বেদ উপনিষদ্। বেদ উপনিষদ্ যদি বহুল প্রচারিত হতো এদেশ কোনোদিন পরাধীন হতো না। যে ভুলটা আমাদের পূর্বপুরুষরা করে গেছেন তার মাশুল গুনতে হচ্ছে আমাদের। তা হলে আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো সেই ভুলটার সংশোধন। বেদ উপনিষদের বহুল প্রচার। এই বিরাট দেশে মূল সংস্কৃতভাষা বুঝবে ক'জন? বুঝলে কি আমি সংস্কৃতভাষায় বক্তৃতা দিতুম না? সংস্কৃততেও আমি বক্তৃতা দিতে পারি। কিন্তু ইংরেজীকেই আমি বেছে নিয়েছি। ওটাও আর্য ভাষা। ইংরেজরাও আর্য। ম্যাক্স মুলারকে কি কেউ যবন বা ম্লেচ্ছ ভাবে? যারা ভাবে তারা লঘুচেতা।' বলতে বলতে মাতাজী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'মহামান্য মাতাজী যা বলেছেন তা অস্বীকার করছে কে?' বাবা সসঙ্কোচে নিবেদন করেন। 'কিন্তু এসব অঞ্চলে যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হয়নি। যারা স্কুলের চৌহদ্দি পার হয়নি তারা কী করে বুঝবে অমন উচ্চাঙ্গের ইংরেজী? যেন বীণার ঝঙ্কার। বেদ উপনিষদের বাণী কে না শুনতে চায়? কিন্তু শুনে বুঝতে পারলে তো!'

মাতাজী স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করেন। 'কিন্তু তা বলে আমি বাজারের ইংরেজী বলতে রাজী হব না। বেদ উপনিষদেরও একটা মহিমা আছে।'

ভেবে চিন্তে মাতাজী একদিন বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় বক্তৃতা দেন। বেশ জনসমাগম হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা উঠে যান। মাতাজী একে নারী, তায় অব্রাহ্মণ। তাঁর পূর্বাশ্রমের পরিচয় তাঁরা কাশীতে চিঠি লিখে জেনে রেখেছেন। বেদ উপনিষদের চর্চাটাই তাঁর পক্ষে অনধিকারচর্চা। সেটা আজকাল যবনরাও করছে বলে তাঁরা মাতাজীর সে

অনধিকার চর্চা সহ্য করেছেন। কিন্তু ততদিন, যতদিন সেটা যবনভাষায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। তা বলে দেবভাষায় অনধিকারিণীর মুখে বেদ উপনিষদের অনধিকারচর্চা!

এসব কথা যখন মাতাজীর কানে যায় তিনি মর্মাহত হয়ে মন্তব্য করেন, 'ওহে সুশীল, এদেশ আরো একহাজার বছর পরাধীন থাকবে। আর্যাবর্তের পুনরুত্থান এঁরা কেউ চান না। কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা কী ছিলেন? নারী না পুরুষ? অত্রির দুহিতা অপালা কী ছিলেন? নারী না পুরুষ? অত্রিবংশীয়া বিশ্ববারা কী ছিলেন? নারী না পুরুষ? অথচ এঁরাও ছিলেন ঋষি বলে গণ্য। আরো চারজনের নাম শোন। লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী, সূর্যা, বাক্। সবাই এঁরা নারী। এক একটি সূক্তের ঋষি। আর ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের কথা যদি বল বিশ্বামিত্র ঋষি কী ছিলেন? জনক ঋষি কী ছিলেন? ব্রাহ্মণ না অব্রাহ্মণ?'

রাজাসাহেবের মাথা কাটা যায়। রাজ অতিথির অসম্মান। তিনি যদি রাগ করে চলে যান। তা হলে রাজ্যের অকল্যাণ। অপর পক্ষে ব্রাহ্মণদেরও তিনি চটাতে চান না। তারাই গুরু তারাই পুরোহিত, দেওয়ানসাহেবও তো ব্রাহ্মণ। পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজাসাহেব নিষ্পত্তি করেন যে, যেখানে শ্রোতার অভাব সেখানে বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের উপর তো তিনি জোর জুলুম করতে পারেন না। শুধু বক্তাকেই অনুরোধ করতে পারেন যে, আপনি শ্রোতাদের সুগম ভাষায় বক্তৃতা দিন।

মাতাজী বলেন, 'রাজার অনুরোধ মানে রাজাজ্ঞা। তা হলে আমি হিন্দীতে বক্তৃতা দেব। ওটাই তো ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের সাধারণ ভাষা।'

সেই অনুসারে কাজ হয়। হিন্দীতে বক্তৃতা হবে শুনে সকলের উৎসাহ। টুটিফুটি হিন্দী কে না বোঝে, কে না বলে? কিন্তু মাতাজীর হিন্দী বাজারের হিন্দী নয়। সংস্কৃতঘেঁষা ওই হিন্দী বুঝতে সংস্কৃত অভিধানের দরকার হয়। এবার ব্রাহ্মণরা আপত্তি করতে পারেন না। তবু আপত্তি ওঠে।

'ম্যায় কহতা হুঁ।' 'ম্যায় চাহতা হুঁ।' ম্যায় দেখতা হুঁ।' এসব উক্তি যিনি করছেন তিনি কি পুরুষ? তা নয় তো এসব অশুদ্ধ প্রয়োগ। বলা উচিত ছিল কহতী, চাহতী, দেখতী। হিন্দী ভাষার পদে পদে লিঙ্গভেদ। মাতাজী সে নিয়ম উপেক্ষা করেন। মাতাজী তো নন, চিদানন্দ ভারতী। কারা সব উঠে যান। মনে হয় হিন্দীভাষী শেঠ। বাইরে গিয়ে তাঁরা হাসাহাসি করেন। উনি কি মাতাজী না বাবাজী।

মাতাজী তা শুনে ক্ষেপে যান। বলেন, 'এমন অপমান আমাকে কেউ কোনোদিন করেনি। আমার হিন্দী অশুদ্ধ নয়। ওদেরি মন অপবিত্র। আমাকে দেখে যাদের মনে স্ত্রীভাব আসে তারা কি আর্য। না, তারা অনার্য। জানো, সুশীল, হিন্দী ক্রিয়াপদের ওই যে লিঙ্গভেদ ওটা সংস্কৃত থেকে আসেনি। এসেছে আরবী থেকে। আরবী হচ্ছে

সেমিটিক ভাষা।'

এর পর রাজাসাহেব বিনীতভাবে অনুরোধ করেন বাংলায় বক্তৃতা দিতে। রাজবাড়ীতে বাংলার আদর ছিল। অবাঙালী আমলাও বাংলা বইকাগজ পড়তেন। ভাগবতরত্ন যতবার এসেছেন বাংলায় ভাগবতের উপর বক্তৃতা দিয়েছেন। লোকে লোকারণ্য হয়েছে। কীর্তন তো বাংলাতেই হয়। দলে দলে যোগ দেয়।

মাতাজীর রাগ জল হয়ে যায়। বলেন, 'তবু ভালো যে আমাকে স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা দিতে আদেশ দেওয়া হয়নি। প্রত্যেকটি জায়গায় যদি জেদ ধরে যে স্থানীয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে হবে তা হলে আমাকে চোদ্দ পনেরোটা ভাষা শিখতে হয়। তা হলে তো ভাষা শিক্ষাই প্রধান হয়ে ওঠে, বিদ্যা শিক্ষা অপ্রধান। তামিল আমি একটু আধটু জানি। তেলুগুও একটু আধটু বুঝি। মারাঠী গুজরাটীও একটু আধটু বলি। কিন্তু বক্তৃতা দেবার মতো জ্ঞান আমার নেই। আচ্ছা, তবে এখন থেকে বাংলায় বক্তৃতা হবে। এর পরেও যদি কেউ উঠে যায় তো আমিও তাদের সঙ্গ নেব।'

মাতাজীর বাংলাভাষায় বক্তৃতা ভাগবতরত্নের মতো অত জনপ্রিয় না হলেও দিব্যি জমত। আমিও মাঝে মাঝে যেতুম। গোলাপ পিসির পাশে বসতুম। বক্তৃতার পরে যখন জলযোগের পালা আসত তখন বসতুম গিয়ে বাবার পাশে। তাঁর অন্তরঙ্গমণ্ডলীর মাঝখানে।

আমাদের বাড়ীতে শুধু যে সাধুসন্ন্যাসীদের সমাবেশ হতো তা নয়। পীর ফকির দরবেশও আসতেন। খ্রীস্টান শিখ ও ব্রাহ্মদেরও দেখেছি। সব ধর্মের উপরে বাবার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রত্যেকের মত শুনতে চাইতেন। কারো সঙ্গে তর্ক করতেন না। কারো মনে আঘাত দিতেন না। কিন্তু নিজের মতে অটল থাকতেন। সে মত অভ্রান্ত বলে নয়। তাতেই তাঁর স্থিতি। সেটাই তাঁর পায়ের তলার মাটি। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

আমাকে কিন্তু তিনি ভজাতে পারেননি। ভজাতে চানওনি। ধর্মগ্রন্থ যখন যেটা হাতে পড়েছে তখন সেটা পড়েছি। ভালো না লাগলে পড়িনি। ধর্মোপদেশ সম্বন্ধেও সেই কথা। ধর্মানুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছি। অনিচ্ছা হলে কেউ আমাকে বাধ্য করেনি। তবে সাধুসঙ্গের একটা সুফল আছে। সেটা অতি মূল্যবান।

বাবাকে আর মাকে যিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁকেও আমি দেখেছি। তাঁর নামকীর্তন শুনেছি। নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার, সর্ববাসনাশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, করুণাময় পুরুষ। অনবরত নাম বিতরণ করে চলেছেন। জীবে দয়া ও নামে রুচি এ ছাড়া আর কোনো বক্তব্য নেই। বক্তৃতার ধার ধারেন না। উপদেশ চাইলে পালান। যখন কীর্তন করেন না তখন মৌন থাকেন। আহারাদি যতদূর সামান্য হলে চলে। কারো কাছ থেকে কিছু

নেন না। প্রণাম করলে নীরবে আশীর্বাদ করেন। ডান হাত সব সময় মালায়ুলিতে মালা গড়ানোয় রত। হ্যাঁ, ইনিও একজন সংসারত্যাগী সাধু। কিন্তু কাউকে ইনি সংসারত্যাগ করতে বলেন না। বরং বলেন সংসারে থেকে প্রত্যেকটি কর্তব্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে।

গোলাপ পিসির কাছে রোজ বিকেলে স্কুলের ছুটির পর যাই। ইতিমধ্যে তিনি আমাকে শেক্সপীয়ারের নাটকগুলি গল্পের মতো করে শোনাতে শুরু করেছেন। শেক্সপীয়ার আমাদের বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। স্কট ডিকেন্সের বালকপাঠ্য সংস্করণ আমি স্কুল থেকে নিয়ে পড়তুম। কিন্তু শেক্সপীয়ারের তেমন কোনো সংস্করণ দেখিনি। না, ল্যাম্বস টেলস ফ্রম শেক্সপীয়ারও না। গোলাপ পিসির মুখে শুনি আর শুনে মুগ্ধ হই। তবে, হ্যাঁ, শেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার তথা মার্চ্যান্ট অব ভেনিস থেকে নেওয়া দুটি দৃশ্যের অভিনয় আমি আমাদের স্কুলে দেখেছি। শুনেছি ব্রুটাস আর মার্ক অ্যান্টনির ওজস্বী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা। আর পোর্শিয়ার সুচতুর সওয়াল। শাইলকের ছুরিকার আস্ফালন এখনো আমার মনে পড়ে আর ছোটকাকার জন্যে শিউরে উঠি। তিনিই সেজেছিলেন অ্যান্টোনিও।

'ইংরেজী সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যে শেক্সপীয়ারের তুলনা নেই, জয়।' গোলাপ পিসি বলতেন। 'কিন্তু নাটকের রস তার অভিনয়ে। যদি কখনো ইংলণ্ডে যাও তা হলেই সে রসের আস্বাদন পাবে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও অতুলনীয়।'

'যেতে তো চাই, কিন্তু যাই কী করে? বাড়ীর যা হাল, বিলেত তো বিলেত, কলকাতাই যাওয়া হয়ে উঠবে না।' বলতে লজ্জা করে।

'যখন সময় হবে তখন সম্ভব হবে। তুমি ভাগ্য মানো? আমি কিন্তু মানি।' গোলাপ পিসি প্রত্যুত্তরে বলেন। 'কিন্তু তার আগে চাই প্রস্তুতি। জীবনের জন্যে প্রস্তুতি এই বয়সেই আরম্ভ করে দিতে হয়। ফেলে রাখতে নেই। তোমাকে আমি যে তালিম দিচ্ছি তা আজকের জন্যে নয়, আগামীকালের জন্যে। সেটা হয়তো আরো আট দশ বছর পরবর্তী কাল।'

দাদাজীর ব্যায়ামশিক্ষার ক্লাসে আমি যাইনে। তা বলে তিনি আমাকে রেহাই দেবার পাত্র নন। একবার আমাকে সামনে পেয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন, 'মি পেরু এমি?'

আমি তো হতভম্ব। পালাবার পথ খুঁজি।

তিনি আমাকে ঝাঁকানি দেন। 'বল, মা পেরু নিরঞ্জন তালুকদার।'

আমি পুনরুক্তি করি, 'মা পেরু নিরঞ্জন তালুকদার।'

'ভেরি গুড। বল, মি পেরু এমি?' তিনি পাখী পড়ান।

'মি পেরু এমি?' আমি পুনরুক্তি করি।

'মা পেরু মদনপল্লী কুমারস্বামী চিনাপ্পা।' তিনি উত্তর দেন।

এমনি করে আমার তেলুগু শিক্ষার হাতে খড়ি। প্রতিদিন তিনি আমাকে একটা করে তেলুগু বাক্য শেখান। আমি তার গোটাকতক এখনো মনে রেখেছি। যেমন, 'মি এচেটে পউচুনারু।' 'করচুণ্ডমু।'

'তুমি ভাবছ এসব শিখে তোমার কী লাভ হবে।' দাদাজী বলেন।

'যদি কখনো দক্ষিণে যাই কাজে লাগবে।' আমি চটপট জবাব দিই।

'রাইট ইউ আর। এ জগতে কার কোথায় ঠাঁই হবে কে বলতে পারে? আমি কি জানতুম যে আমাকে থাকতে হবে আলমোড়ায়? আমার বাল্যকাল কেটেছে বাঙ্গালোরে। যৌবন মাদ্রাজে, আডায়ারে। আমি ছিলুম ইংরেজীর ছাত্র, পরে অধ্যাপক। কিন্তু আমার নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে যায় থিয়সফিতে, পরে বেদান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ফিজিকাল কালচারে। স্যাণ্ডোর মতো, মুএলারের মতো আমার সীস্টেমও একদিন নাম করবে। কিন্তু একে আমি চিনাপ্পা সীস্টেম বলতে চাইনে। বলব মহাবীর সীস্টেম। মহাবীর কে, জানো তো? বীর হনুমান।' দাদাজী ইংরেজীতে বলেন। বাংলাটা আমার।

দাদাজী আমাকে তাঁর মাসল দেখান। যেমন শক্ত তেমনি তুলতুলে। ইচ্ছামতো শক্ত ও তুলতুলে করতে পারেন। শরীরযন্ত্রের উপর অদ্ভুত কন্ট্রোল।

'তোমার পিজন-ব্রেস্ট আমি সারিয়ে দিতে পারতুম। তুমি তো ধরাই দিলে না। পরে পস্তাবে। কী করে তুমি জানলে যে তোমার বরাতে মাথার কাজ জুটবে? না জুটলে তখন তুমি খাবে কী? যদি শরীরকে তৈরি কর তবে তুমি গতর খাটিয়ে খাবে। তা বলে লেখাপড়া শিখতে মানা করছিনে। সেটাও দরকারী। আমি চাই মস্তিষ্কের সঙ্গে বাহুর সামঞ্জস্য।' তিনি আমাকে বোঝান।

দাদাজীকে আমি কেমন করে বোঝাব আমার ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে যে, এসব হিতকথা আমার জীবনে এই প্রথম নয়। কিন্তু আমার স্বভাব আমার চালক। পরমেশ্বর বলে এক পশ্চিমা দারোয়ান ছিল, সে আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিল কুস্তির প্যাঁচ। বারকয়েক একে ওকে তাকে কাৎ করে সাধ মিটে যায়। ছেড়ে দিই। বাবা আমাদের ডন বৈঠক শিখিয়েছিলেন। ক্রমেই সেটা রীতিরক্ষায় পরিণত হয়। তারপর ছেড়ে দিই। কাকা আমাদের ডামবেল ভাঁজতে শিখিয়েছিলেন। উৎসাহ ধীরে ধীরে হিম হয়ে যায়। কেন এমন হয়? কারণ স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। যেটা মেলে সেটা শুধু বল দেয় না, আনন্দ দেয়। সাঁতারে নামলে উঠে আসতে ইচ্ছে করে না। টেনে তুলতে হয়। গাছে চড়লে শেষ আমটি না শেষ জামটি মুখে না পুরে নামতে চাইনে। ডাকাডাকি করে নামাতে হয়। সাইকেল চালানোও কি কায়িক শ্রম নয়? একবার শুরু করলে বিরতি কোথায়?

না, কায়িক শ্রমে আমার অনীহা ছিল না। যেটাতে ছিল সেটার নাম সংসারের কাজ। রান্নার কাজে আমি হাত লাগাইনে, কিন্তু খাওয়ার বেলা আমি সিদ্ধহস্ত। খাব আমি, আমার এঁটো তুলবে, বাসন মাজবে আরেকজন। নাইব আমি, আমার কাপড় কাচবে, তাতে সাবান দেবে আরেকজন। ছিঁড়ে গেলে রিফু করবে আরেকজন। শোব আমি, ঘর ঝাঁট দেবে আরেকজন, মেজে মুছবে আরেকজন। কেন, বাড়ীর মেয়েরা কি মানুষ নয়? ঝি চাকর কি মানুষ নয়? আমার কাজ আর সকলে করে দেবে। আমি আর কারো কাজ করে দেব না। এটা হলো বাবুবংশের ঐতিহ্য। জন্মসূত্রে আমি একজন বাবু। যদিও আপাতত নির্ভূম তালুকদার। বাবা আমাকে সংসারের কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি জানেন যে আমরা যদি খেটে খুটে না খাই তো পরে খেতেই পাব না। তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে কিছু পাননি। তাঁর পুত্রদের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারবেন না। মহাযুদ্ধের দিনে দুর্মূল্যের বাজারে আমরা আধপেটা খেয়ে থাকি। আমার ভাইদের কাছে তিনি সাড়া পান কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি বলি, 'আমি সংসারী হব না।' মা ভয় পান। ভাবেন আমি সন্ন্যাসী হব।

না, সন্ন্যাসী হতেও আমার রুচি নেই। কেমন করে সন্ন্যাসী হব, যখন আমার অভিষ্ট হলো ইটারনাল ফেমিনিন বা ইটারনাল বিউটি। জীবনধারণের কি কোন অর্থ হয়, যদি জীবনে তার দেখা না পাই? কিংবা দেখা পেলেও চিনতে না পারি? সে হয়তো ছদ্মবেশে দেখা দেবে। ভেদ করতে হবে তার ছদ্মবেশ। অর্জন করতে হবে দিব্য দৃষ্টি। মিষ্টিক কবিদের দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক, এ-ই, ইয়েটসের দৃষ্টি। কী ভাগ্যে পেয়েছি গোলাপ পিসির কাছে দীক্ষা। কোথায় তার সঙ্গে বিকেলটা কাটাব, তা নয় দাদাজীর সঙ্গে কাঠি হাতে কসরৎ করব। তাতে হয়তো শরীরটা মজবুত হতো, সেটাও একটা লাভ। কিন্তু আমার স্বভাব আমার চালক। আমার স্বভাব আমাকে বলে, দাদাজীর মতো একজনকে পরে হয়তো একদিন পাবে, কিন্তু গোলাপ পিসির মতো একজনকে তুমি বহুভাগ্যে পেয়েছ। এমন ভাগ্য কি দ্বিতীয়বার হবে?

'বার্ষিক পরীক্ষার ফল তো কখনো এত খারাপ হয়নি তোমার। এ কী করেছ, নিরঞ্জন?' হেডমাস্টার মশায় আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান। তাঁর মুখ গম্ভীর।

'স্যর, আপনিই তো আমাকে মাতাজীর বক্তৃতা শুনতে বলেছিলেন।' আমি বিরস মুখে বলি। ছি ছি! এত খারাপ ফল! এমন কি, ইংরেজীতেও!

'কই, বক্তৃতায়ও তো তুমি দু'একবারের বেশী যাওনি। মানে, ইংরেজী বক্তৃতায়। বাংলা বক্তৃতায়ও তো তুমি সব দিন যাওনি। কী তোমার কৈফিয়ৎ?' তিনি যেমন কোমল তেমনি কঠোর।

'স্যর, আমি রোজ দিদিজীর কাছে যাই ইংরেজী পড়াশুনা করতে। যেসব বই স্কুলে

পড়ানো হয় না, লাইব্রেরীতেও রাখে না, সেসব বই তাঁর কাছে আছে। বা তাঁর পড়া আছে। এই যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'। উনি আমাকে তার থেকে পড়ে শোনান। কী চমৎকার ইংরেজী!' আমি কৈফিয়ৎ দিই।

'হা হা। 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে তুমি পাঠ্যপুস্তকে জলাঞ্জলি দিলে। বিশেষ করে গ্রামারে। অঙ্কে তো তুমি বরাবরই কাঁচা।' তিনি মুচকি হাসেন।

'প্রমোশন পাব তো, স্যর?' আমি ভয়ে ভয়ে শুধাই।

'প্রমোশন তোমার বাঁধা। কিন্তু পোজিশন তো বাঁধা রইল না। তুমি কত নিচে নেমে গেলে। ফোর্থ থেকে সেভেন্‌। কী দুঃখের কথা। আমি তো ভেবেছিলুম তুমি এবার সেকেণ্ড কি থার্ড হবে। অবশ্য ফার্স্ট হতে হলে অঙ্কে ভালো করতে হয়। সেটা আমি প্রত্যাশা করিনি, নিরঞ্জন।' তিনি আমাকে বিদায় দেন।

মনটা বিষাদ হয়ে যায়। পোজিশন নেমে যাওয়া কি সুখের কথা? যারা নিচের পোজিশনে বসত তারা উপরের পোজিশনে বসবে। তাদের নাম ডাকা হবে আগে। একটা বছর এক হীনতা বহন করতে হবে আমাকে। তারপরে আমি আবার আমার পোজিশন ফিরে পাব। বাবা কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি বলতেন যে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাই সব নয়। জীবনের পরীক্ষাই আসল।

আমার মনের অবস্থা আরো বিরস হয় যখন শুনি যে লাবণ্য বলে একটি সমবয়সিনী মেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের পাশের বাড়ীকে আমরা বলতুম 'ভদের বাড়ী'। সেখানেই আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের আড্ডা। লাবণ্য সেখানে আসত আরেক পাড়া থেকে ওর মার সঙ্গে কাজ করতে। ও যে কেবল আরেক পাড়ার তাই নয়, আরেক শ্রেণীর। ওর সঙ্গে আমার নামমাত্র আলাপ। তবু ওর জন্যে আমার মন বিরস। লাবণ্য, হায়, আর আসবে না। ওকে ওর গুরুজন আর আসতে দেবে না।

'কী হয়েছে রে, চিনু। লাবণ্যকে ওরা আসতে দেবে না কেন?' আমি আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুধাই।

'জানিসনে?' চিনু আমার কানে কানে বলে, 'ওর কাপড়ে রক্ত দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মা ওকে বাড়ী নিয়ে গেছে।'

'আহা! হাত কি পা কেটে গেছে বুঝি! কেমন করে কেটে গেল?' আমি ধরে নিই যে মেয়েটি কাজ করতে করতে জখম হয়েছে।

'দূর বোকা!' চিনু আমার ভুল শুধরে দেয়। 'ও ঋতুমতী হয়েছে।'

তার মানে যে কী সেটাও আমার জানা ছিল না। একটু একটু করে জানা গেল। ইটারনাল ফেমিনিন তো অশরীরী নয়। তার জীবন আছে। ওটা সেই জীবনের তথ্য। একথা পুরাণে রূপকথায় বেদ উপনিষদে লেখে না। কান থেকে কানে কানাকানি হয়।

কানাকানি থেকে জানাজানি।

লাবণ্য যে কেবল অদৃশ্য হলো তাই নয়, লাবণ্য কিছুদিনের জন্যে অস্পৃশ্য হলো। এরকম ঘটনা ঘটে গেল এক এক করে আমাদের অন্যান্য সমবয়সিনীদেরও জীবনে। ওরাও হলো অন্তরীণ। তারপর যেমন করে হোক, যার সঙ্গেই হোক, ওদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে নয়। পাত্ররা কেউ বুড়ো, কেউ আধবুড়ো। কেউ দোজবর কেউ তেজবর। দেখে হাসিও পায়, কান্নাও পায়। ওরা কিন্তু তাতেই খুশি, যদিও যাবার সময় কেঁদে নেয় একচোট।

অমনি করে আমি বারো তেরো বছর বয়সে নির্বান্ধবী হই। সমবয়সিনীরা সকলেই বিবাহিতা নারী। তাদের আর বালিকা বলে গণ্য করা হয় না। যদিও আমরা যারা তাদের সমবয়সী তারা সকলেই বালক। মিশতে হলে কেবল বালকদের সঙ্গেই মিশতে হয়। অসমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কে চায়।

গোলাপ পিসিরা তখনো ছিলেন কি না ঠিক মনে পড়ছে না, একদিন আমাদের স্কুল লাইব্রেরীতে আমি একসেট ইংরেজী বই আবিষ্কার করি। তার প্রথমখানির নাম 'হোয়াট এভরি বয় অট টু নো।' যা প্রত্যেক বালকেরই জানা উচিত। আমিও একটি বালক। তা হলে আমারও জানা উচিত। কিন্তু লাইব্রেরীতে থাকলেও কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। আমিই বোধহয় প্রথম দর্শক। লাইব্রেরিয়ান বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন। বইখানা আমি বাড়ী নিয়ে যাই। পড়তে পড়তে আমার দৃষ্টি খুলে যায়। কিন্তু দিব্য দৃষ্টি নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।

বাবা তাঁর বন্ধু দেবীবাবুর সঙ্গে বসে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। এঁর একটি মেয়ে ছিল। আমারই সমবয়সিনী। সৃষ্টি তার নাম। আমার সঙ্গে আলাপই ছিল না চোখে দেখেছি এইপর্যন্ত। মেয়ের সেই বয়সে বিয়ে দিয়ে ইনি এখন ঝাড়া হাত পা। হ্যাঁ, বিপত্নীক। কিছুদিন পরে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন এঁর নাম বদলে গিয়ে হয় বংশীদাস। বাবার সঙ্গে বসে ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করতেন।

দুই বন্ধুর সামনে আমি গিয়ে হঠাৎ হাজির হই। কলম্বস যেন আমেরিকা আবিষ্কার করেছে, এমনি মনোভাব। বলি, 'বাবা, এ বইতে লিখেছে কিনা স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে শোওয়া উচিত নয়। তাতে নাকি স্বাস্থ্যহানি হয়।'

'হা হা হা হা।' 'হো হো হো হো।' দুই প্রৌঢ়ের মুখে অট্টহাস্য। আমি তো দারুণ অপ্রস্তুত। বইখানা ওঁদের দিকে বাড়িয়ে দিই। ওঁরা নাড়াচাড়া করে ফেরত দেন। পড়তে বারণ করেন না।

বাবা বলেন, 'তা হলে সৃষ্টি চলবে কী করে।'

দেবীবাবুও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, 'তা না হলে সৃষ্টি লোপ হবে যে! আর

কেউ জন্মাবে না।'

জন্মের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক তা তো আমার জানা ছিল না। বই ক'টি পড়তে পড়তে জানলুম। সব ক'টিই আমি একে একে পড়ি। তখনকার দিনে এটা ছিল নিষিদ্ধ রাজ্য। বই ক'টি আমার হাতে না পড়লে আমি ভাবজগতেই বিচরণ করতুম। বস্তুজগতের অর্থ বুঝতে পারতুম না।

সৃষ্টির স্রোতকে বহতা রাখতে হবে। প্রকৃতিই দেয় তার প্রবর্তনা। জীবমাত্রকেই। এর মধ্যে পাপ কোথায় যে অনুতাপ করতে হবে? পাপ যেটাকে বলে সেটা প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ নয় সমাজের নিয়মভঙ্গ। কিন্তু তখনো আমি তফাৎটা বুঝতে পারিনি। পরে একটু একটু করে বুঝি যে প্রকৃতির উপর সমাজের খোদকারি মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের সূচনা থেকেই চলে আসছে। খোদকারির ফল ভালোও হয়েছে, মন্দও হয়েছে। খোদকারি উঠে গেলে একদিক থেকে যদি লাভ হয় তো আরেকদিক থেকে লোকসান। তাই মানুষ সমাজের হাতেই কন্ট্রোল রেখে দিতে চায়। তা বলে প্রকৃতিই বা তাতে সায় দেবে কেন? সে বিদ্রোহী হয়।

বাবা আমাকে ইচ্ছামতো পড়বার, ইচ্ছামতো ভাববার, ইচ্ছামতো তর্ক করবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেও মাঝে মাঝে আমি তর্ক করেছি। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গেও। এ স্বাধীনতা আমার বয়সের আর কোনো ছেলের ছিল না। আমি ভাগ্যবান। আমার স্বাধীনতা যে পরিমাণ ছিল আমার উপর নিয়ন্ত্রণ সে পরিমাণ ছিল না। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার পরিণাম শুভও হয়েছে, অশুভও হয়েছে। অশুভ থেকে আমাকে নিবৃত্ত করবার শক্তি আমার নিজের ছিল না। কী করে যে বেঁচে যাই সে এক রহস্য। যদি কেউ বলে ভগবান বাঁচিয়ে দেন তা হলে আমি বলব আমার উপর তিনি অতিরিক্ত সদয়।

মাকে আমি এসব কথা বলিনে। ঠাকুমার কোলে মানুষ হওয়ার ফলে মা'র সঙ্গে আমার একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। সেটা হয়তো দূর হতো, কিন্তু তার আগেই এসে উপস্থিত হয় কোন্‌খান থেকে এক অষ্টধাতুর বিগ্রহ। কী সুন্দর দেখতে। ওই হলো মার সব শেষের সন্তান। আর সব চেয়ে ভালোবাসার ধন। তাঁর বেশীর ভাগ সময় কেটে যেত সেবা পূজায়। সংসারের জন্যেও তাঁর যথেষ্ট সময় ছিল না। আমাদের দিকে তাকাবেন কখন! আর আমরাও তো বেশীর ভাগ সময় বাইরে। নিজেদের বাড়ীর চেয়ে 'ওদের বাড়ী'ই ছিল আমার কাছে আরো আকর্ষণীয়। সেখানে যেন সব সময় একটা না একটা কিছু ঘটছে। কতরকম লোক যে আসত সে বাড়ীতে। গ্রামের লোক শহরে এলে সেইখানেই জলটল খেত। দিয়ে যেত কলাটা মূলোটা, একটু গাওয়া ঘি, একপোয়া সরষের তেল। মিষ্টি কথায় 'ওদের বাড়ী'র মহিলাদের জুড়ি ছিল না। পরকে

তাঁরা আপন করতে জানতেন। কিন্তু কই, ঠাকুর দেবতা বা সাধুসন্ন্যাসী দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কিংবা বই কাগজ পড়া।

আমার সমবয়সিনীদের সঙ্গে মেলামেশার ক্লাব ছিল 'ওদের বাড়ী'। একে একে ওরা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন আর ও বাড়ীতে গিয়ে কোন্ আনন্দ! বিয়ের পরে যখন ওরা আবার ফিরে আসে তখন ওদের অন্য চেহারা, অন্য সাজ। ওরা নারী, আমরা বালক। মিষ্টভাষিণীরাই তখন তিক্তভাষিণী হয়ে ওঠেন। আকারে ইঙ্গিতে বলেন, 'দূর হ'।'

একদিন যেতে পারিনি। আমাকে দেখে গোলাপ পিসি কাতর স্বরে শুধান, 'কী হয়েছিল তোর? কাল আসিসনি কেন?'

'মন ভালো ছিল না, গোলাপ পিসি।' আমি উত্তর দিই।

'আমি ভেবে মরছি কী জানি কী হলো। যা ঠাণ্ডা পড়েছে। হয়তো সর্দি কি কাশি।' তিনি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

'না, গোলাপ পিসি, তেমন কিছু নয়। এটা অন্য জিনিস। এমনটা যে হতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।' আমি বলতে সঙ্কোচ বোধ করি।

'তা হলে ওটা মনের ব্যাপার, দেহের নয়। তা মনও তো মানুষকে কম কষ্ট দেয় না। কম কষ্ট পায় না। আমি দুঃখিত।' তাঁর চোখে দুঃখের ছাপ।

'তোমাকে বলব কি বলব না, ঠিক বুঝতে পারছিনে, পিসি। কী জানি তুমি কী মনে করবে!' আমি ভরসা পাইনে।

'আচ্ছা, আমি তোকে অভয় দিচ্ছি। যা বলতে মন যায় তা নির্ভয়ে বল।' তিনি আমার অস্বস্তি দূর করেন।

'আমি তো পরীদের স্বপ্নে বিভোর ছিলুম। তারা থাকে কোন্ সুদূর দেশে। সেদেশে যাবার জন্যে আমার পক্ষিরাজ ঘোড়ার কল্পনায় আমি মশগুল। আমার সমবয়সিনীদের ছেড়ে যেতে হবে বলে একটুও মায়া বোধ করিনি। ওরা তো পরী নয়। না, ডানাকাটা পরীও নয়। খুবই সাধারণ চেহারা। কিন্তু এখন দেখছি ওরাই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে একে একে। বরের সঙ্গে চলে যাচ্ছে পরের বাড়ী। সেখান থেকে যখন বাপের বাড়ী আসছে তখন ওদের দেখে চেনা যায় না। ওরা নারী। আর আমি বালক। কেন এমন হয়, গোলাপ পিসি?' আমি বলতে বলতে আত্মহারা হই।

'এটা যে বাল্যবিবাহের দেশ। নইলে ওরাও বালিকা থেকে যেত। আমি তো ওদের বালিকাই মনে করি।' গোলাপ পিসি বলেন।

'সেই ভুলটা করতে গিয়েই আমি নাকাল। ওদের মা-কাকিমারা আমাকে কত ভালোবাসতেন। এখন কিন্তু তাঁদের মুখে অন্য স্বর। না, মুখ ফুটে বলেন না। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চান যে আমি দূর হলেই তাঁরা বাঁচেন। কেন এমন হয়,

গোলাপ পিসি ?' আমি মনের বোঝা হালকা করি।

'ওরা যে এখন পরের ঘরের বৌ।' তিনি এককথায় অনেক কথা বলেন।

কে জানে কবে আমি বড়ো হব, বড়ো হয়ে ইটারনাল ফেমিনিনের অন্বেষণে পক্ষিরাজ ছুটিয়ে দেব, ততদিন কি আমি আমার সমবয়সিনীদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না ? এ শূন্যতা পূর্ণ হবে কী করে ? বালক আমি, আমার জীবনে বালিকা কোথায় ? বালিকার অভাব এতদিন অনুভব করিনি। তাদের বরঞ্চ অবহেলাই করেছি। এখন মনে হচ্ছে বালিকা না হলে বালকের জীবনের অঙ্গহানি হয়। তা তুমি যতই পরীর স্বপ্ন দেখ আর রূপকথার রাজপুত্রের মতো সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে যাবার কল্পনা কর।

কথাবার্তা যে বিষয়েই শুরু হোক না কেন সেটাকে আমি যেমন করেই হোক টেনে নিয়ে আসি ইটারনাল ফেমিনিনে। এটা আমার প্রতিদিনের দস্তুর। তেমনি গোলাপ পিসির রেওয়াজ সেটাকে যেমন করেই হোক টেনে নিয়ে যাওয়া ইটারনাল ট্রায়াঙ্গ্‌লে। এটাও প্রাত্যহিক।

'পরের ঘরের বৌ বলে কি ওরা আমার প্রতিবেশিনী নয় ?' আমি প্রতিবাদের স্বরে বলি। 'আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে ?'

'তা নয়। তবে তোর মনে রাখা উচিত যে দু'জনের মাঝখানে এখন তৃতীয় একজন এসেছে। মেয়েটির বর। তিনজনকে নিয়ে একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি হতে কতক্ষণ! ইটারনাল ট্রায়াঙ্গ্‌ল।' তিনি কৌতুকের সঙ্গে বলেন।

'দুর ছাই! আমরা কেউ কাউকে ভালোবাসলে তো ? আমাদের সম্পর্কটা নিছক স্নেহের সম্পর্ক।' আমি বিরক্ত হয়ে বলি।

'জানি। আমি একটু মজা করছিলুম। কিন্তু, জয়, এমনও দেখা গেছে যে এক বয়সে যা নিছক স্নেহ আরেক বয়সে তাই গভীর প্রীতি। তার আগে বিয়ে হয়ে থাকলে তিনজনে মিলে ত্রিভুজ সৃষ্টি। সব সম্পর্ক চুকে যায় না বলেই তো গুরুজন অত সাবধান। আর তুইও অত মনমরা।' তিনি আবার সেইখানে ফিরে যান।

'না না, মনমরা কিসের ? আই ডোণ্ট কেয়ার। আমি শুধু এই কথাই বোঝাতে চেয়েছি যে বালিকা জগতের সঙ্গে বালক জগতের এই যে বিচ্ছেদ এতে বালকদের জীবনের একটা অঙ্গ বাদ পড়ে। যেমন একটা হাত কেটে নিলে সে জায়গাটা খালি থাকে। মনমরা আমি হইনি। তবে একটার পর একটা ধাক্কা পেয়েছি। কাল যাকে দেখেছি বালিকা আজ তাকে দেখছি নারী। শুনছি কী যেন একটা রহস্য আছে এর পেছনে! কী যেন একটা কথা আছে! 'ঘুগিন্যমন্তু' না 'ভাগ্যিমন্তু'!' হঠাৎ বেরিয়ে যায় আমার মুখ দিয়ে। আমি জিব কাটি।

গোলাপ পিসি তো হাঁ! তাঁর দিকে তাকাতে ভয় করে। আড়চোখে চেয়ে দেখি

তাঁর মুখ আরক্ত। তারপর বিবর্ণ। তারপর ভাবিত। তিনি যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু কী বলবেন ভেবে স্থির করতে পারছেন না।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে দিই। 'ভালো কথা, গোলাপ পিসি, অরবিন্দ ঘোষ নাকি এখন জার্মানীতে? সেখান থেকে নাকি অস্ত্রভরা জাহাজ নিয়ে ফিরবেন? আমার বন্ধু সারদা কলকাতা থেকে শুনে এসেছে।'

'অরবিন্দ ঘোষ! জার্মানীতে। অস্ত্রভরা জাহাজ!' গোলাপ পিসি গালে হাত দিয়ে বলেন। 'ওমা, সে কী! এই তো সেদিনও আমরা পণ্ডিচেরী থেকে ওঁর পত্রিকা পেয়েছি। 'আর্য' দেখেছ?'

দেখিনি। গোলাপ পিসির কাছে একখানা ছিল। দেখতে দেন। পড়ে বুঝতে পারিনে। অরবিন্দ ঘোষ তা হলে পণ্ডিচেরীতে! কী করছেন সেখানে বসে?

'অরবিন্দ ঘোষ এখন যোগসাধনায় নিমগ্ন। পণ্ডিচেরীতে তাঁর আশ্রম। কিন্তু এখনো লোকের বিশ্বাস তিনি গোপনে গোপনে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের তোড়জোড় করে চলেছেন। তা বলে জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ? না, না, সেরকম কাজ তাঁর দ্বারা হবে না। ফরাসীরাও হতে দেবে না।' গোলাপ পিসি মাথা নাড়েন।

'কিন্তু সংগ্রাম যদি হয় সশস্ত্র সংগ্রাম তা হলে জার্মানী ভিন্ন অস্ত্র আসবে আর কোন্ দেশ থেকে? আর কোন্ দেশই বা ইংরেজকে চটাতে সাহস পাবে?' এসব অবশ্য আমার শোনা উক্তি।

'না না, যুদ্ধের মাঝখানে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা একজনও ভাবছেন না। সিপাই মিউটিনিতে আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি। আমরা তো সেই সময় থেকেই পশ্চিমের অধিবাসী।' গোলাপ পিসিকে সন্ত্রস্ত দেখায়।

তখনকার দিনের জনমত ছিল ইংরেজদের পক্ষে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যাটা শেখ, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিদ্যার পরীক্ষা দাও, তারপরে যদি ওরা আপনা হতে হোম রুল না দেয় তা হলে তখন ওদের শেখানো বিদ্যাটা ওদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করার প্রশ্ন উঠবে। এই চিন্তা থেকে বাঙালী পলটনের উদ্‌ভব। একদিন শুনি অমরদা যুদ্ধে যাচ্ছেন তুর্কদের সঙ্গে লড়তে। মেসোপোটেমিয়ায়। আমাদেরি পাড়ায় থাকেন তাঁর মামা। আর অমরদা কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে আসেন মামার সঙ্গে ছুটি কাটাতে। অসাধারণ লম্বা। আমরা তো তাঁর জন্যে গর্বিত। কিন্তু তাঁর মামার মনে শঙ্কা। বাঁচলে হয়!

'তবু যদি জানতুম যে ছেলেটা নিজের দেশের জন্যে প্রাণ দিতে চলেছে। তা তো নয়। প্রাণটা যাবে পরের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। যদি ব্রহ্মকৃপায় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে তা হলে দেখবে যেমন গোলাম ছিল তেমনি গোলাম। ইংরেজ কি অমনি হোমরুল দিচ্ছে?' আক্ষেপ করেন আমাদের ব্রাহ্ম প্রতিবেশী।

মাতাজীও ব্রহ্মবাদিনী। মহিমবাবুও ব্রহ্মবাদী। অথচ তাঁদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের বনিবনা ছিল না। ইনি ওঁর বক্তৃতায় যেতেন না। উনিও এঁর উপাসনায় আসতেন না। আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করি এর কারণ কী।

'মাতাজী হলেন অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ। কে কার উপাসনা করবে! কেনই বা করবে! বাপ আব ছেলে যদি একই সত্তা হয় তা হলে ছেলে বাপেব কাছে কীইবা প্রার্থনা করতে পারে! আর মহিমবাবু হলেন দ্বৈতবাদী। ব্রহ্মকে পিতৃভাবে উপাসনা করেন। একদিন নিয়ে যাব শুনবি। তিনিও উপনিষদ্‌ থেকে মন্ত্র সংগ্রহ করেছেন।' বাবা তার দু'একটা উদাহরণ দেন।

রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের ভাষণগুলি ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে ছাপা হয়ে বেরোলে আমাদের হেডমাস্টার মশায় লাইব্রেরীর জন্যে আনিয়ে নিতেন। আমিও উলটিয়ে দেখতুম। বাবাব কথার মর্ম বুঝি।

সেদিন গোলাপ পিসির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে একটা চমক দেন। 'তুই আমাকে অকুতোভয়ে যা তোর মনে আসে বলবি। সত্যকথা অপ্রিয় হলেও খুলে বলাই শ্রেয়। আমি কিন্তু মনঃস্থিব কবতে পারছিনে রহস্যটাকে রহস্য রেখে দেওয়া উচিত না তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। তোকে গাইড করাও বোধহয় কর্তব্য, কিন্তু তোর মা বাবা যখন জানতে চাইবেন এসব শিক্ষা তুই কার কাছে পেলি তখন তোকে সত্যকথাই বলতে হবে। তা শুনে তাঁবা যদি আমাকেই দোষ দেন তা হলে আমি যে বিষম মুশকিলে পড়ব।'

আমি নীরব থাকি। লক্ষ করি যে তাঁর চোখে জল টলটল করছে।

'ভেবে দেখলুম বাবুয়া যদি তোব বয়সে ধাক্কা খেয়ে আমার কাছে ওই জিজ্ঞাসা নিয়ে হাজির হতো আমি ওর বেলাও দশবার ইতস্তত করতুম। ব্যাপারটা নারীঘটিত কিনা। ছেলেকে বলতে লজ্জা করে। মেয়েকে বলতে লজ্জা করে না, বরঞ্চ বলাটাই প্রয়োজন। তুই যদি মেয়ে হতিস্‌ ভাবনা কী ছিল? যাক, আর একটু বড়ো হলে বইটই পড়ে বুঝবি। আমি দুঃখিত।' বলে তিনি সেদিন বিদায় দেন।

বইটই আমাদের স্কুলের লাইব্রেরীতেই ছিল। 'হোয়াট এভরি ইয়ংম্যান অট টু নো।' আমি ছাড়া কেই বা ও বই পড়ছে? কেনার পর থেকে যেমনকে তেমন রয়েছে। পাতাপর্যন্ত কাটা হয়নি। আমিই প্রথম পাতা কাটি। লাইব্রেরিয়ান যিনি কেরানীও তিনি। আবার তিনিই দরকার হলে ক্লাস নেন। বইখানা বাড়ী নিয়ে যেতে বাধা পাইনে। পড়া হয়ে গেলে ফেরৎ দিই।

মোটামুটি বুঝতে পারি কেন অমন হয়। এবার আর বাবার কাছে ছুটে যাইনে। জানি উনি কী বলবেন। মার পড়াশুনা কম। তাঁকে আমি বিব্রত করিনে। তিনি হয়তো

বকুনি দেবেন। 'ওসব বাজে বই পড়া হচ্ছে কেন? পাঠ্য বই পড়।'

আমার স্বভাবই হলো পাঠ্য বই না পড়ে অপাঠ্য বই কাগজ পড়া। বার সামনে ভাণ করতে হয় যে অপাঠ্য বইও পাঠ্য বই। ইংরেজী হলে তফাৎটা তিনি ধরতে পারেন না। বাংলা হলে ধরেন। 'এ যে দেখছি নভেল। এইটুকু ছেলের কাণ্ড দ্যাখ! ফের যদি দেখি তুই নভেল পড়ছিস্ তা হলে তোর বাপকে বলে দেব।' বলতে ভুলে যান, বললেও বাবা তেমন আপত্তি করেন না। শুনে জানতে চান কী নাম ওটার। কার লেখা।

পরের বাড়ীতে গিয়ে নাটক নভেল পড়াটাই ছিল আমার পক্ষে সুবিধের। একবার একটা মওকা জুটে যায় আমাদের ব্রাহ্ম প্রতিবেশী যখন চিকিৎসার জন্যে কলকাতা যান ও ফিরতে দেরি করেন। চাকর ভিন্ন আর কেউ ছিল না তাঁর বাংলোয়। বাইরে লতানো বুগেনভিলিয়া। ভিতরে তিনখানা ঘরের একখানা শুধু বই দিয়ে ঠাসা। শেলফ থেকে পাড়ি আর পড়ি। যেখানা খুশি, যতক্ষণ খুশি। সঙ্গে করে নিয়ে না গেলেই হলো। চাকরটি বহুকালের চেনা। সেও তো নিঃসঙ্গ। পোষা কুকুরটি মারা গেছে। কাকে নিয়ে সে থাকবে? একরাশ মৃত পুস্তক। তার চেয়ে একটি জ্যান্ত মানুষকে কাছে পেলে দুটো কথা বলেও সুখ। আমি বই পড়তুম আর সে এসে আমাকে দারুণ দারুণ সব প্রশ্ন করত। এই যেমন, 'বাবলুবাবু, জার্মানরা আর কতদূর? কলকাতায় কবে পৌঁছবে?' অথবা 'কে জিতবে বলে তোমার মনে হয়? জার্মান না ইংরেজ?'

আমার উত্তরগুলো নিরপেক্ষ ছিল না। কারণ আমি সারদার সঙ্গে বাজী রেখেছিলুম যে ইংরেজরা যদি হারে আমি একলাখ টাকা দেব আর জার্মানরা যদি হারে সে একলাখ টাকা দেবে। একলাখ তো একলাখ, একশোটা টাকাও আমরা কখনো একসঙ্গে দেখিনি। কিন্তু অত বড়ো একটা মহাযুদ্ধের ফলাফল বিবেচনা করলে ওর কমে বাজী রাখা যায় না। দুঃখের কথা বলি কাকে, যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় সেইদিনই সারদা বেচারির মৃত্যু হয়। দিনকয়েকের ইনফ্লুয়েঞ্জায়। খবরটাও শুনে যেতে পারেনি। তার আগে থেকে অজ্ঞান। শুনলে হয়তো হার্টফেল করে মারা যেত। জার্মানরা হেরে গেছে।

মহিমবাবুর বাংলোয় এন্তার নভেল নাটক ছিল। শুধু তাই নয়, বাংলা ইংরেজী অজস্র ও বিচিত্র বইকাগজ। পড়তে পড়তে আমি নেশায় বুঁদ হয়ে যাই। কোন্‌টা আগে পড়ব, কোন্‌টা পরে এ বিচারশক্তি আমার ছিল না। কঠিনটাই পড়ি আগে, সহজটা পরে। আমাকে গাইড করার জন্যে কেউ ছিল না। কারো কাছে ফাঁস করিনে যে আমি মহিমবাবুর ওখানে পড়তে যাই। তা হলে যদি আর কেউ গিয়ে জোটে! যদি জানাজানি হয়ে যায়! যদি মহিমবাবু ফিরে এসে শুনতে পান! আমি যেন আলীবাবা। আর ওটা যেন গুপ্তধনের ভাণ্ডার।

মহিমবাবুর উপাসনায় বাবা আমাকে নিয়ে যাননি। মহিমবাবু ফেরেন মাস ছয়েক

পরে। ভগ্ন শরীরে। তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওখানকার পাট গুটিয়ে কলকাতা চলে যান। কিন্তু এসব হলো পরবর্তী সময়ের কথা। যখনকার কথা বলছিলুম তখনকার কথার খেই হারিয়ে গেছে। আবার হাতে নিই।

গোলাপ পিসিকে বলি, 'তুমি যে আমার পেছনে এত সময় খরচ করছ তুমি কি মনে কর, গোলাপ পিসি, যে আমাকে দিয়ে এ জীবনে কিছু হবে !'

তিনি এর জন্যে তৈরি ছিলেন না। হকচকিয়ে যান। 'কেন রে ? এখন থেকে ও কথা কেন ? আগে তো তুই বড়ো হ'। তারপর দেখবি তোর চার দিকে কতরকম কত কাজ পড়ে রয়েছে, লোক নেই করবার। থাকলেও তাদের তেমনি প্রস্তুতি নেই, যেমন আছে তোর। এখন তোর প্রস্তুতির বয়স। স্কুল কলেজ মানে আর কিছু নয়, প্রস্তুতির সুযোগ। এ সুযোগ এই বয়সেই মেলে। এর পরে মেলে না। স্কুল কলেজের ক্ষতি না করে যা পারিস্, শিখবি, যত পারিস্ শিখবি। যেমন শিখছিস্ আমার কাছে।'

আমি যে একটা কিছু করার জন্যে এখন থেকেই ছটফট করছি। বলি, 'স্কুল কলেজ শেষ হতে আরো আট দশ বছর। ততদিন প্রস্তুতি ?'

'হাঁ, জয়। ততদিন প্রস্তুতি। বাবুয়াকেও আমি এই কথাই বলতুম। এটা আমার অনেক চিন্তার ফল।' তাঁর গলা ধরে আসে।

'স্কুল কলেজের পরে কী হবে, গোলাপ পিসি ?' শুনতে অধীর হয়ে উঠি।

'তার পরের অধ্যায় শিক্ষানবীশী।' তিনি এককথায় উত্তর দেন।

'শিক্ষানবীশী তো জীবিকার জন্যেই হয়।' বিরস মুখে বলি।

'জীবনের জন্যেও হয়। আর্টের জন্যেও হয়।' গোলাপ পিসি আমার চোখে চোখ রাখেন। 'জানি তুই কী শুনতে চাস্। 'ইটারনাল ফেমিনিনের জন্যেও হয়। রাজপুত্রকে পেরিয়ে যেতে হয় তেপান্তরের মাঠ। তারপরে সে পায় রাজকন্যার সাক্ষাৎ। ততদিনে তার বয়স হয়েছে পঁচিশ কি ত্রিশ।'

তা শুনে আমার উৎসাহ হিম হয়ে যায়। ততদিনে আমার সমবয়সীদেরও বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকবে, আমি হব দ্বিতীয়বার নির্বান্ধব। সমবয়সিনীদের হারিয়ে আমি মুহ্যমান। তার উপর সমবয়সীদেরও হারানো !

আমাকে হতবাক দেখে গোলাপ পিসি বলেন, 'সময় এমন কী বেশী। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। বাবুয়া হলে তাকেও আমি জড়িয়ে পড়তে দিতুম না। তোকেও আমার পরামর্শ, জড়িয়ে পড়িসনে। জড়িয়ে পড়তে আমারই কি ইচ্ছা ছিল ? কিন্তু আমরা হলুম মেয়ে। মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু আসে যায় না। ওই রহস্যময় ব্যাপারটার আগেই ওদের বিয়ে দেওয়া হয়। আমার বেলাও কি এর ব্যতিক্রম হতো ? আমার বরাত ভালো যে আমার বাবা ছিলেন থিয়সফিস্ট। মিসেস বেসান্টের উপদেশ

মেনে চলেন। রুচি বয়সে আমার বিয়ে না দিয়ে বাড়ীতে গভর্নেস রেখে লেখাপড়া শেখান। মাকেও গড়ে পিটে সত্যিকার সহধর্মিণী করে নেন। সমাজভয় তাঁর ছিল না। বেনারসের রইস পরিবার। তবে শরিকদের সঙ্গে সেই যে মনোমালিন্য হয় সেটা আজও আছে। বাবা যদিও নেই।'

আমি দুঃখ প্রকাশ করলে তিনি বলেন, 'সে যে আজ হলো কতকাল! বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি আমার সময়ে বিয়ে দিচ্ছেন না। মার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি পর্দা মানছেন না। তা সত্ত্বেও একদিন বিয়ে হয়ে যায়। তখনো আমি কলেজ পেরোইনি। পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি-এ পাশ করি। ডিসটিংশনের সঙ্গে। শ্বশুরকুল বাধা দেন না। সেটুকু মহত্ব ওঁদের ছিল। তারপরে আবার জড়িয়ে পড়ি। মা হই। বাবুয়া কোলে আসে। ইচ্ছা থাকলেও এম-এ দেওয়া হয় না। দিলে প্রাইভেটই দিতুম। কী আপসোস!'

'এম-এ দিয়ে তুমি করতে কী, গোলাপ পিসি? বিদ্যায় তো তুমি এম-এ'দেরও হার মানাতে পারো।' আমি বলি সান্ত্বনার স্বরে।

'দূর পাগলা! ওই বিদ্যে নিয়ে আমি যাব সেকালের গার্গী আত্রেয়ীদের মতো তর্কযুদ্ধ করতে!' গোলাপ পিসি দাবড়ি দেন।

এরপর তিনি আত্মগতভাবে বলে যান, 'বাবার বোধহয় মনোগত অভিপ্রায় ছিল তাই। তা নইলে এত নাম থাকতে আত্রেয়ী কেন? প্রাচীন ভারতের ঋষিকন্যারা পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন। আমরা কি আবার সেই যুগ ফিরিয়ে আনতে পারিনে? আমরা যে পারি তারই নিদর্শন আমাদের বি-এ, এম-এ ডিগ্রী। দ্বন্দ্বযুদ্ধটা পরীক্ষার হলেই ঘটে যায়। রেজিনা গুহ এম-এ'তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন, শুনেছ? হ্যাঁ, ইংরেজীতেই। জড়িয়ে না পড়লে আত্রেয়ী সেনও তাই হতে পারত। কী আপসোস!'

'তা ত্রিশ বছর বয়সেও তো এম-এ দেওয়া যায়, গোলাপ পিসি।' আমি তাঁকে আশা রাখতে বলি।

'হুঁ! বত্রিশ বছর বয়সেও এম-এ দেওয়া যায় বইকি।' তিনি শুধরে দিয়ে বলেন। 'কিন্তু শরীরে কি আর সে সামর্থ্য আছে! মনেরই বা সে জোর কোথায়! এখন যদি এম-এ দিই তবে লাস্ট ক্লাস লাস্ট। তাতে করে প্রমাণ হবে না যে ঋষিকন্যারা ঋষিপুত্রদের সমকক্ষ। আমার স্বামীরই অহঙ্কার বেড়ে যাবে।'

আমি উচ্চবাচ্য করিনে। চুপ করে শুনি।

'ইবসেন পড়েছিস্? না, পড়ে বোঝবার বয়স হয়নি তোর। বড়ো হয়ে 'ডলস্ হাউস' পড়িস্। আমার জীবনটা ঠিক নোরার মতো নয়, তবে নোরার মতো আমারও একটা প্রশ্ন আছে, তার উত্তর আমিও কি দাবী করতে পারিনে? তুই যখন বড়ো হবি তখন তুই বীর হবি না কবি হবি এখন অবশ্য অনিশ্চিত। যদি কবি হওয়াই স্থির হয় তবে

এটাও একটা বিষয় যেটা তোর লেখনীর জন্যে কাঁদছে। যেমন কাঁদছিল ইবসেনের লেখনীর জন্যে নোরার জীবনের কাহিনী।' গোলাপ পিসি বলে চলেন।

'কেউ কেউ বলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' নাকি ইবসেনের সুরে বাঁধা। ইবসেন তো পড়িনি, কী করে বুঝব সত্য কিনা?' আমি পরের উক্তির পুনরুক্তি করি।

'দু'জনেই স্বাধীনভাবে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পুরুষের বেলা এক নীতি, নারীর বেলা আরেক নীতি, এই দোরোখা নীতি কেন? একে বলে ডবল স্ট্যাণ্ডার্ড। ওদের সমাজ আর আমাদের সমাজ যদিও বিভিন্ন তবু নারীর প্রতি অন্যায়ের বেলা ওরা আর এরা অভিন্ন। এর বিরুদ্ধে লিখতে হবে। বাবুয়া হলে লিখত।' তিনি নিঃসন্দেহ।

আমি কথা দিতে পারিনে যে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরব। আদৌ কলম ধরব কি না সেটাই স্থির হয়নি। ইটারনাল ফেমিনিন যদি আমার অন্বিষ্ট হয় তবে কলম না ধরলেও চলে। আর ইটারনাল বিউটি যদি হয় আমার অন্বিষ্ট তবে অন্য কথা।

'আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি নে, গোলাপ পিসি, যে আমাকে দিয়ে এ জীবনে কিছু হবে।' আমি বিমর্ষ হয়ে বলি, 'সমবয়সিনীরা সব ছেড়ে যাচ্ছে। সমবয়সীরাও সবাই ছেড়ে যাবে। নির্বান্ধবী ও নির্বান্ধব হয়ে আমি একলা কতদূর এগোতে পারব? পাশ-টাস করার কথা ভাবিনে। সে-কাজ কে না করছে! পোজিশনও কেউ না কেউ পায়। জীবিকাও একটা না একটা জুটিয়ে নেয়। বিধিমতো চেষ্টা করলে পাশও করতে পারি, জীবিকাও অর্জন করতে পারি। আমার ভাবনা তা নয়। আমার লক্ষ্য ইটারনাল বিউটির সন্ধান।'

যা অনুমান করেছিলুম তাই। গোলাপ পিসি প্রসঙ্গটাকে নিজের দিকে টেনে নেন। 'ইটারনাল বলে যদি কিছু থাকে তবে তার নাম ইটারনাল ট্রায়াঙ্গ্‌ল।'

সেটাকে আমি আবার আমার দিকে টেনে নিই। 'আমার স্কুলের সাথীরা সকলেই জীবিকার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের মতে 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' আমার কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে না যে গাড়ীঘোড়া চড়ার জন্যেই আমি লেখাপড়া করছি। জীবিকার জন্যে প্রস্তুতি আমাকে একটুও আনন্দ দেয় না। আমার আনন্দ কাব্য উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী পড়ায়। আমারও সাধ যায় লিখতে। যদিও জানি যে আমার লেখা আমারই ভালো লাগবে না পড়তে। আর পাঁচজনের তো নয়ই। যারা পড়বে তারা হাসবে। আমাকে দিয়ে লেখাটেখা হবে না, গোলাপ পিসি। তাই তো ভাবি আমাকে দিয়ে কিছু কি হবে এ জীবনে? হতে পারে বাবার মতো চাকরি। কিন্তু চাকরি করা মানে চাকর হওয়া। বাবার তো ওতে ঘেন্না ধরে গেছে। ওঁকে সেই আঠারো বছর বয়স থেকেই চাকরির ঘানী টানতে হচ্ছে। বাপ মা ভাই বোনের জন্যে। পরে তো আমাদের জন্যেও। না জানি তিনি এ জীবনে কত কী করতে পারতেন।

তাঁর সব স্বপ্ন এখন আমাকে আর আমার ভাইদের ঘিরে। তিনি চান না যে আমরাও ঘানী-টানা বলদ হই। কিন্তু ও ছাড়া আর কী যে হব তাও তো খুব পরিষ্কার নয়। বাবা একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, 'তুই হবি জর্জ ওয়াশিংটন আর তোর ভাই নেপোলিয়ন!' ওঁরা যে কারা তাই জানতুম না। পরে জানতে পারি দুই মহাবীর। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন তো তেমন জাঁকালো নন, যেমন নেপোলিয়ন। ওয়াশিংটন তো কেবল একটামাত্র শক্তির সঙ্গে লড়েছেন, নেপোলিয়ন লড়েছেন চার পাঁচটা শক্তির সঙ্গে। আর কী বারেই জিতেছেন। শুধু শেষ দু'বার বাদ।'

গোলাপ পিসি স্মিত হাসেন। 'হারজিতের খেলায় শেষেরটাই তো আসল।'

আমি আশ্বাস বোধ করি। বাবার উপর অভিমান ছিল যে তিনি আমাকে আমার ভাইয়ের চেয়ে খাটো মনে করেন। কোথায় নেপোলিয়ন আর কোথায় জর্জ ওয়াশিংটন! কিন্তু গোলাপ পিসির কথা শুনে মনে হলো দিগ্বিজয়ী হবার গৌরব বৃথা, যদি তার শেষ পর্ব হয় ওয়াটারলু ও উপসংহার সেণ্ট হেলেনা।

'বাবার মনে কী ছিল কে জানে!' আমি উচ্চস্বরে ভাবি।

'বোধ হয় তাঁর অভিলাষ ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের মতো তুইও তোর স্বদেশকে স্বাধীন করবি। তারপরে হবি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট। আমি হলে বাবুয়ার জন্যে যে মহাসম্মান কামনা করতুম।' তাঁর গলা ধরে আসে।

'বাবুয়াকেই ওটা মানাত। আমাকে নয়, গোলাপ পিসি। ও হয়তো জার্মানী থেকে বা তুরস্ক থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে সৈন্য তালিম করত আর বাজপাখীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত ইংরেজদের সেনাবাসের উপরে। তারপর ওদের ঠেলে নিয়ে যেত সমুদ্রকূলে। সেখান থেকে ওরা জাহাজে উঠে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেত। কিন্তু আমাকে দিয়ে ওসব হবার নয়, গোলাপ পিসি। আমার যে পায়রার মতো বুক। আমি কি বাজপাখীর মতো লড়তে পারি? তাও সিংহের সঙ্গে? যে সিংহ ঈগলপাখীর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে বেলজিয়ামে আর উত্তর ফ্রান্সে।' আমি আঁতকে উঠি।

'বাবুয়া হলে কী না পারত, জয়?' গোলাপ পিসি ভারী গলায় বলেন, 'কিন্তু তুইও তা পারবি, জয়। পায়রার মতো পাঁজরার আড়ালেও বাজপাখীর মতো সাহস থাকতে পারে। সব যুদ্ধই স্পিরিটের সঙ্গে স্পিরিটের দ্বৈরথ। তোর যদি স্পিরিটের জোর থাকে তবে তোর গায়ের জোর না থাকলেও চলে। শরীরচর্চা করতে না পারিস্ আত্মানুশীলন কর।'

'গোলাপ পিসি, গোলাপ পিসি,' আমি আকুল কণ্ঠে বলি, 'এইটুকু মানুষ আমি আমার পক্ষে কী করে অমন অসম যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব!'

'একটি ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে একটা বিরাট বনস্পতি নিহিত থাকে। প্রত্যেকটি মানবশিশুর ভিতরেই অনন্ত অসীম সম্ভাবনা।' গোলাপ পিসি প্রত্যয়ভরে বলেন,

'বড়োদের দায়িত্ব হচ্ছে গোড়া থেকেই আলো হাওয়া জল মাটি উত্তাপের ব্যবস্থা করা। কেবলি খুঁত ধরা কেবলি খাটো করা উচিত নয়। দোষ যদি দেখাতে হয় তো সেটা সংশোধনের জন্যে, দণ্ডদানের জন্যে নয়। আমার ইচ্ছে করে একটা নতুন ধরনের স্কুল খুলতে। কিন্তু এদিকে যে মার বয়স হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো বয়সে মাকে দেখবে কে?'

বাবুয়া হলে কী বলত জানিনে। আমি একটু ভেবে নিয়ে বলি, 'না, গোলাপ পিসি, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্টপদও আমার কাম্য নয়। কারণ ওটা চিরন্তন নয়। আমি চাই এমন কিছু যা চার বছরের বাদশাহী নয়, যা চিরকালের আনন্দ। যেমন ইটারনাল ফেমিনিন। যেমন ইটারনাল বিউটি।'

যা ভেবেছিলুম তাই। তিনি ওটাকে টেনে নিয়ে যান যাব অভিমুখে তাব নাম ইটারনাল ট্রায়াঙ্গল। বলেন, 'আনন্দ। আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি! ওসব কাব্যেই মানায়, বাছা। জীবনে নয়। জীবনে যেটাকে আমরা বার বার দেখি সেটা তোমার ইটারনাল ফেমিনিন বা ইটারনাল বিউটি নয়, ওটা তোমার বাল্মীকি বঙ্কিম রবীন্দ্রের ইটারনাল ট্রায়াঙ্গল। আমার হাতে যদি কলম থাকত আমিও লিখতুম ওই নিয়ে এক উপন্যাস কি নাটক। আয়তনে বড়ো হতো না। তা বলে কম ট্র্যাজিক নয়। তিনজনের একজন গেল মরে। আরেকজন আছে বেঁচে, কিন্তু সে জানে না সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে।'

'লেখ, লেখ, গোলাপ পিসি।' আমি বায়না ধরি। তুমি যে লিখতে পারো তার পরিচয় তো সেই স্মারক গ্রন্থে পেয়েছি। বিষয়টা তো বেশ হৃদয়গ্রাহী। একজন গেল মরে। আরেকজন আছে বেঁচে, কিন্তু সে জানে না সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে, চমৎকার! চমৎকার বিষয়!'

'চমৎকার বলবি তুই ওকে? আমার যে কী বেদনা সে আমিই জানি।' তিনি বিষাদে বিধুর। যেন কাঁটা বিঁধে আছে তাঁর বুকে।

'ওটা তবে তোমার নিজের গল্প।' আমি কৌতূহল বোধ করি ও সঙ্গে সঙ্গে দমন করি। 'তা হলে থাক।'

'গোপন করার মতো কিছু নেই। তা বলে প্রকাশ করার মতোও নয়। বইটই আমার হাত দিয়ে হবে না। ওই স্মারক গ্রন্থই শেষ গ্রন্থ। এ বেদনা আমাকে মুখ বুজে বহন করে যেতেই হবে। আমার দিক থেকেও যে একটা বক্তব্য ছিল সেটা কেউ জানল না, জানবেও না। যার সঙ্গেই ভাব হয় সেই জিজ্ঞাসা করে, কেন তুমি সোয়ামী ছেড়ে সংসার ছেড়ে চলে এলে? তবু রক্ষা যে 'বেরিয়ে এলে' বলে না। যদিও অপর পক্ষের রটনাটা ছিল তাই। ঘটনা যখন পল্লবিত ও বিকৃত হয়ে রটনায় পরিণত হয় তখন সাধুদের মতো মৌন থাকাই শ্রেয়। যদিও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি। মার আশ্রয়ে

আশ্রয় নিয়েছি, এর থেকে লোকের ধারণা আমিও সন্ন্যাসিনী। সেটা ঠিক নয়। আশ্রমের নিয়ম জীবহিংসা না করা, মাছমাংস না খাওয়া। তাই আমিও মার মতো নিরামিষভোজী। আর একটা নিয়ম হলো ব্রহ্মচর্য। সেটা তো ছাড়াছাড়ির পর স্বভাবতই আসে। বাবুয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছেন, ওঁর বেলা অন্য নিয়ম। ওঁর নিয়ম ওঁর, আমার নিয়ম আমার।' গোলাপ পিসি কাহিনীর সূত্রপাত করেন।

আমার ঔৎসুক্য বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু বেশী আগ্রহ দেখাইনে। যদি থেমে যান। মন্তব্য করি, 'বৌ থাকতে আবার বিয়ে করা কি অন্যায় নয়?'

'অন্যায় তো বটেই। তবু আমি দোষ দিইনে। বাবুয়াকে হারিয়ে ওর বাপ আর একটি বাবুয়া চেয়েছিলেন। আমি তাতে নারাজ। বাবুয়ার মতো আর একটি বাবুয়া এলে তারও তো সেই একই দশা হতো। আমি কিছুতেই সহ্য করতুম না আমার শাশুড়ীর মালিকানা।' গোলাপ পিসি ঘোরালো করে তোলেন।

'মালিকানা।' আমি আশ্চর্য হই। 'মালিকানা কার উপর?'

'জয়, তুই কি এতক্ষণেও অনুমান করতে পারিসনি যে, এটাও একপ্রকার ইটারনাল ট্রায়াঙ্গ্‌ল? শাশুড়ী, বৌ আর বাচ্চা। মালিকানা বাচ্চার উপর।' তিনি বিশদ করেন।

এটা একটা নতুন তত্ত্ব। আর কারো মুখে শুনিনি বা নাটক নভেলেও পড়িনি। বিমূঢ় নয়নে তাকাই।

'তুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। ওঁরাই আমাকে পছন্দ করে নিয়ে যান। নইলে আমার বিবাহ দুর্ঘট হতো। অরক্ষণীয়া কন্যা। ওঁদের কাছে এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। বিয়ের পরে তো পরম আদরে থাকি। বাড়ীর মেয়েরাও অত আদর পায় না।' গোলাপ পিসি চোখ বুজে স্মরণ করেন।

'সৌভাগ্য।' আমি তারিফ করি।

'সৌভাগ্য নয় তো কী! আমার সঙ্গে অবশ্য বড়ো কম সোনাদানা জহরত যায়নি। বলতে গেলে সমান ওজনের।' তাঁর মুখে ম্লান হাসি।

'তা হলে আর সমস্যাটা কিসের?' আমি ভেবে পাইনে।

'কোনো সমস্যাই ছিল না, যতদিন না মা হয়েছি। ছেলের মা। আমাকে তো ওঁরা মাথায় করে রাখেন। বাবুয়াই ওঁদের বাড়ীর প্রথম নাতি। ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ও কোলে কোলে ঘোরে।' গোলাপ পিসির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি নীরবে শুনে যাই। গোলাপ পিসি আপন মনে বলে যান। 'কোথায় তা হলে ট্যাজেডীর বীজ? সে বীজ লুকিয়ে ছিল মনের ভিতরে। একদিন অবাক হয়ে দেখি বাবুয়াকে ওঁরা আর আমার কাছে শুতে পাঠাচ্ছেন না। ততদিনে ওর মাতৃস্তন্যের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তা বলে আমার ছেলে আমার কাছে শোবে না? প্রথাটা যে কী

আমার ভালো জানা ছিল না। আমি তো অন্য জগতের মানুষ। ওঁরা বলেন ও বাড়ীর নিয়ম হচ্ছে মাই ছাড়ার পর বাচ্চাকে আলাদা ঘরে শোওয়ানো। তার ঠাকুমার সঙ্গে। চিরকাল নাকি এইরকম হয়ে এসেছে। চিরকাল হবে। আমার কর্তব্য নাকি বাচ্চার ভার ওঁর উপরে সঁপে দিয়ে একমনে পতিসেবা করা।' তিনি সরমে রাঙা হয়ে ওঠেন।

আমি ঠিক বুঝতে পারিনে তাঁর কথার মানে কী। বোকার মতো প্রশ্ন করতে যাই। তিনি এককথায় থামিয়ে দেন। 'চুপ।'

তারপর আবার বলতে শুরু করেন, 'পতি পরম গুরু, তা কি আমি কখনো অস্বীকার করেছি? হিন্দুর মেয়ে আমি। আর সকলের মতো আমারও সেটা সংস্কার। কিন্তু বাবুয়া যে মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। সারারাত কাঁদবে। ওকে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিলে অবশ্য বাইরে বাইরে কাঁদবে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তো কাঁদবে। সে কান্না কি আমার প্রাণের কানে আসে না? আমিও কাঁদি। কাঁদতে কাঁদতে রাত ভোর হয়ে যায়। আমার স্বামী অস্বস্তি বোধ করেন। এমন এক কাঁদুনে বৌয়ের সঙ্গে শুয়ে কোন্ সুখ! তাঁর বিরক্তি দিন দিন বেড়ে যায়। আমরা একটু একটু করে দূরে সরে যাই। অথচ আমার শাশুড়ীর উদ্দেশ্য ছিল তার বিপরীত। তিনি চেয়েছিলেন আর একটি বাচ্চা। নামপর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলেন। বুবুন।' গোলাপ পিসির চোখে জল।

আমি আবার বোকার মতো বলে উঠি, 'বুবুন এখন কোথায়?'

'দূর পাগলা!' গোলাপ পিসি মৃদু স্বরে বলেন, 'কল্পলোকে। ওকে জীবলোকে আসতে দিলে তো?'

বুবুন বেচারি পূর্বপারেই থেকে যায়। তার আর ইহপারে আসা হয়ই না। জননী বিমুখ। আমি দুঃখিত হই।

'আমিও কি কম দুঃখিত? কিন্তু অন্যায় আমি সইতে পারিনে। এই শিক্ষাই আমি ছেলেবেলা থেকে পেয়েছি। আমার ছেলেকে তোমরা যদি ইংরেজদের মতো নার্সারি ঘরে রাখতে তা হলে আমি আপত্তি করতুম না। সেখানে সে তোমাদের সম্পত্তি নয়। কিন্তু তোমরা ওকে শেখাচ্ছ ঠাকুমাকে 'মা' বলে ডাকতে। আর মাকে 'বৌমা' বলে। হতে পারে ওটা নিরীহ একটা প্রথা। বড়ো হলে ও সব বুঝবে। কিন্তু আমার ছেলে যে রোজ বলে, 'মার কাছে শোব' এটা তো আমার কানে আসে। ও জানে কে ওর সত্যিকার মা। ওকে তোমরা 'মা' ভুলিয়ে দেবে। মাকে ও পর মনে করবে। অসহ্য! অসহ্য!' গোলাপ পিসি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

আমি কী বলব, তন্ময় হয়ে শুনি।

'পরে একদিন ওকে আমি জোর করে আমার ঘরে টেনে নিয়ে আসি। তখন ও কী বলে, জানো? 'মার কাছে শোব।' মানে ঠাকুমার কাছে শোব। ছেলেটাকে ওঁরা এর

মধ্যেই হাত করে ফেলেছেন। ও সমস্তক্ষণ ছটফট করে আমার কোল থেকে পালাতে। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখি যে আমি পরাস্ত হয়েছি। তখন আমারও রোখ চেপে যায়। আমিও পরাস্ত করব। কাকে? না আমার শাশুড়ীকে। তাকে আর তাঁর বুবুনের মুখ দেখতে দেব না। যতদিন না আমার বাবুয়া আমার কোলে ফিরে এসেছে। মাঝখান থেকে সাজা পান আমার স্বামী। সত্যি ও ভদ্রলোকের দোষ ছিল না। দোষটা ওঁর মাতৃদেবীর। উনি ছিলেন অসাধারণ মাতৃভক্ত। মাকে একবার গিয়ে বলবেন না যে বাবুয়াকে অন্তত একদিন অন্তর একদিন ওর মার কাছে শুতে দেওয়া হোক। বলবেন কী করে? ওটা যে ও বাড়ীর প্রথা নয়। উনি নিয়মমানা মানুষ। নিয়মভঙ্গ করবেন না। করতে বলবেন না। অত বড়ো মানুষটা, মার সামনে একটি কেঁচো। আর কাউকে দিয়ে বলাতে পারতেন। তাতেও ওঁর ভয়। মা যদি মনে কষ্ট পান। যদি বলেন স্ত্রীর অনুগত! স্ত্রৈণ। বেটা ছেলের পক্ষে ওর মতো লজ্জার আর কী হতে পারে। কথাটা যায় বাড়ীর কর্তার কানে। তিনি বহুদিন থেকে উদাসীন। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। বলেন, একজনকে না একজনকে সয়ে যেতেই হয়। বৌদেরই সইতে হয়। নইলে শাশুড়ীর সম্মানে বাধে। শাশুড়ীকে চটাতে তিনি সাহস পান না। যদিও তাঁর সহানুভূতি আমার প্রতি। শাশুড়ী ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, গুরুজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এ বাড়ীতে কেউ কখনো দেখেনি। বড়ো বৌ বিদ্রোহ নিয়ে এসেছে। এক এক করে সব ক'টিই বিদ্রোহী হবে। এখানে বলে রাখি যে আমার দেওরদের তখনো বিয়ে হয়নি। একটির হব হব করছে। আর একটির হতে অনেক দেরি। তা হলেও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি নাকি ওদের না-হওয়া বৌদের বিদ্রোহ শেখাতে এসেছি।' গোলাপ পিসি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'অলীক অপবাদ।'

গোলাপ পিসি দপ করে জ্বলে ওঠেন, 'সে আগুন কবে নিবে গেছে, জয়। আমাকে দেখে আজকের দিনে কেউ চিনতে পারবে না যে আমি ছিলুম তেজস্বিনী ঋষিকন্যা। আমার আর্যপুত্রও আমাকে ভয় করতেন। তার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয় পড়ে গেছলেন তিনি দুই আগুনের মাঝখানে। কাকে ছেড়ে কাকে হবি দিয়ে তুষ্ট করবেন? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? এখানে দেব নয়, দেবী। আর্যপুত্রকে আমি বলি এই বিদ্রোহিণীকে নিয়ে তুমি করবে কী? এবাড়ীতে এর স্থান নেই। তিনি বলেন, বড়ো বৌ, সহ্য করে যাও। মেজবৌ এলে তোমরা দলে ভারী হবে। মেজ বৌ যখন আসে তখন দেখি একটি কচি খুকী। সবে চোদ্দয় পড়েছে। ও যোগ দেয় শাশুড়ীর শিবিরে। আমার ছেলে তো ওর হাতেই খায়।'

'ছেলেদের কি অত হোঁশ আছে?' আমি বাবুয়ার পক্ষ নিই।

'কিন্তু বড়োদের তো হোঁশ থাকা উচিত। ছেলের মা কী খাওয়াতে চায় সেটা তো

একবার জেনে নেওয়া উচিত। একটি বাচ্চাকে কেমন করে মানুষ করতে হয় এটা বোঝে তার মা। তার জন্যে আমি কত বই যে পড়েছি! শাশুড়ী বলতেন, 'ওসব বিলিতি বই হলো সাহেব বাচ্চাদের জন্যে। তুমি মেমসাহেব হতে পারো, কিন্তু আমাদের এ বাড়ীর বাচ্চারা নেটিভ বাচ্চা। ন্যাংটা থাকলেই এদের গায়ে বাতাস লাগে, রোদ লাগে। তেল হলুদ মাখিয়ে চান করলেই এদের শরীর ঠাণ্ডা থাকে। জল ফুটিয়ে খেলে তার দ্রব্যগুণ নষ্ট হয়। দুধ ফুটিয়ে খেলেও তার পুষ্টিকর অংশ বাদ পড়ে। বড়োদের সঙ্গে একপাতে খেলেই ওরা সব জিনিস খেয়ে হজম করতে শেখে। অসুখ যদি বাড়ে তো টোটকাই ভালো। তাতে যদি না সারায় তো কোবরেজ রয়েছে। ডাক্তার ডাকব কেন?' শুনে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ছেলের জন্যে আমি মেলিন্স ফুড কিনি। আর উনি ওটা দিয়ে মিষ্টি বানিয়ে একে ওকে খাওয়ান। কী অশান্তি! আমার বেবীকে আমি আদর করব, তা দেখে উনি রাগ করবেন। বলবেন, অত আদর পেলে ওর মাটিতে পা পড়বে না। ওকে হাঁটতে দাও, পড়ে যায় তো যাক পড়ে। অমনি করেই মজবুত হবে। ওকে আমি জুতো পরাতে গেলে বলবেন, পায়ে ধুলো লাগতে দাও। কাদা মাখতে দাও। ও কি একটা পুতুল যে তুমি ওকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলবে? ওঁর সব কথা যে ভুল তা নয়, তবু আমার রক্তে আগুন ধরে যায়। ওঁর ছেলে মানুষ করার পদ্ধতি হলো গতানুগতিক। আর আমারটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক। বিরোধ অনিবার্য।' গোলাপ পিসি বড়ো দুঃখের সঙ্গে বলেন।

আমি তাঁকে কী বলে যে সান্ত্বনা দেব! আর দিয়ে ফলই বা কী! কবেকার কথা! আমিও তখন বাবুয়ার মতো শিশু।

'শেষে আমি আর থাকতে পারিনে! বলি বাপের বাড়ী যাব। এর উত্তর ওঁরা কী বলেন, জানো? বলেন, 'যেতে চাইলে কেউ তোমাকে বেঁধে রাখবে না। বাবুয়া এখন মাকে ছেড়েও থাকতে শিখেছে।' আমি বলি, সে কী! আমার ছেলে আমার সঙ্গে যাবে না!' ওঁরা বলেন, আমাদের নাতিকে আমরা যখন পাঠাব তখন ও যাবে। তার জন্যে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। তোমাকে তো আমরা পাঠাচ্ছিনে। তুমিই যাই যাই করছ। কই, তোমার মা বাবা কি তোমাকে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন? অনুরোধ করাই যথেষ্ট নয়। কারণ দর্শাতে হবে।' বাবুয়াকে ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ওকে নিয়ে যাওয়াও সমান অসম্ভব। আমার অবস্থাটা হলো ন যযৌ ন তস্থৌ। না পারি যেতে, না থাকতে। মেজবৌ বলে, 'দিদি, তুমি যেয়ো না। গেলে আর ফিরতে দেবে না।' কী সাংঘাতিক কথা! গেলে ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আমার স্বামীর কাছে নালিশ করি। তিনি বলেন, আমি একান্নবর্তী পরিবারে বাস করি। একান্নবর্তী পরিবারে বাস করে কর্তাগিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করা পোষায় না। আবার, তোমাকে নিয়ে

আলাদা বাসা করে থাকায় অনেক খরচ, আলাদা বাসা করাও পোষায় না। লোকেও নিন্দে করবে যে বৌয়ের প্রেমে মজে বুড়ো বাপ-মাকে ত্যাগ করে গেল। ত্যাগ আমি কাউকেই করতে চাইনে। তোমাকেও না, মা-বাবাকেও না। চেষ্টা করব দুই কুল বজায় রাখতে।' আমার পক্ষে একটিও প্রাণী নেই। না, বাবুয়াও নয়। সেও যে আমার সঙ্গে যেতে উৎসুক তাও নয়। সেও কেমন করে বুঝতে পেরেছে যে সে এ বাড়ীরই ছেলে। এ বাড়ীতেই তার জোর। এখানেই তার শিকড়। আমি একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়ি। মন মেজাজ দিন দিন বিগড়ে যায়। শরীরও সুস্থ থাকে না। ওঁকে বলি, 'আমাকে চেঞ্জে নিয়ে চল।' উনি বলেন, 'যাব আপত্তি নেই, যদি বাবুয়াকে রেখে যাও।' ঠিক যে জিনিসটি আমি পারিনে।' গোলাপ পিসির চোখে জল ভরে আসে।

'কী হৃদয়হীন ওঁরা।' আমি ভারিক্কি চালে টিপ্পনী কাটি।

'শুধু কি হৃদয়হীন? হীন, হীন, ওরা হীন।' গোলাপ পিসি ধিক্কার দেন। 'এক একসময় আমার মনে হতো বাবুয়াকে কিডন্যাপ করে নিয়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়। কিন্তু মামলায় ওদের জিৎ হবে। বাবুয়াকে ওরাই রাখতে পাবে।'

আইন আদালতের কথা আমার জানা ছিল না। সে এক রহস্যময় জগৎ। গোলাপ পিসির দুঃখের কাহিনী শুনে বিগলিত হই।

'শেষে একদিন আমার বাবা এসে আমার শ্বশুরশাশুড়ীর দ্বারস্থ হন। বেনারসের রইস তাঁর মানমর্যাদা বিসর্জন দেন। কিন্তু ওঁদের শর্তে ওঁরা অটল। বাবুয়া যখন বড়ো হবে তখন মার সঙ্গে মামাবাড়ী যাবে, এখন নয়। এখন ওকে ঠাকুমার তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। যে বাড়ীর যা নিয়ম। সব আবেদন, সব নিবেদন বৃথা। বাবা আমাকে ছেলেসুদ্ধ নিয়ে যেতে পাবেন না। ছেলেকে ফেলে আমিও তাঁর সঙ্গে যেতে নারাজ। দু'জনেই কাঁদি। বাবা আর আমি। এর কিছুকাল পরে শুনি বাবা গুরুতর অসুস্থ। শেষ দেখার অনুমতি পাই। কিন্তু বাবুয়াকে রেখে যেতে হয়।' বলতে বলতে গোলাপ পিসির কণ্ঠরোধ।

'তার পরে?' আমি উৎকণ্ঠিত। তাঁর বাবার জন্যে।

'মারা যান!' বলে গোলাপ পিসি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

'মারা যান!' আমিও আকাশ থেকে পড়ি। আমারও কান্না পায়।

'আমার বাবা ছিলেন প্রাচীন ভারতের জনক ঋষি। ব্রহ্মবাদী, অথচ সংসারী। সংসারত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না, একথা যারা বলে তিনি তাদের বলতেন প্রাচীন ভারতের নয়, মধ্যযুগের প্রতিনিধি। তা হলে মা আমার সন্ন্যাস নিলেন কেন? নিলেন শঙ্করাচার্যের প্রভাবে। আর শঙ্করও নিয়েছিলেন বুদ্ধের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে। ঋষি আর সন্ন্যাসী দুই নিয়েই ভারত।' গোলাপ পিসি গল্প থেকে তত্ত্বে চলে যান।

'তুমি তা হলে শ্বশুরবাড়ীতে আর ফিরলে না। বাবুয়াকেও দেখতে পেলে না।' আমি শোনবার জন্যে অধীর হই।

'আরে, না, না। তা কখন বললুম?' গোলাপ পিসি খেই হাতে নেন। 'পিতার পরলোকের পর শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসি। কিন্তু আর জোড় মেলাতে পারিনে। ওরা সবাই যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, কিংবা আমিই গেছি সরে। কোনো মতে কর্তব্য পালন করে যাই। পুত্রবধূর কর্তব্য, পত্নীর কর্তব্য, মাতার কর্তব্য। কেবল শেষেরটাতেই ছিল আনন্দের অমিয় ধারা। ছেলের জন্যে কিছু একটা করতে পেলে আমি ধন্য মনে করি। শাশুড়ী ওকে আগলাতে চাইলেও সব সময় পারতেন না। ও কি কম দুরন্ত! আমি বসে আছি, আমার পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে চোখ টিপে ধরত। আমি বলতুম 'কে? বিল্টু? বিল্লু? হাবলু? কাবলু? গাবলু?' বাবুয়া যতক্ষণ না বলছি ততক্ষণ আমার চোখ থেকে হাত সরিয়ে নেবে না। এইরকম কত রঙ্গ ওর। সেসব কি বলে শেষ করা যায়? কিছুই ভুলিনি। চাও তো শোনাতে পারি।' গোলাপ পিসি শোনাতে চান।

'আরেকদিন শুনব। বাড়ী ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।' আমি উঠি।

পরে বাবুয়ার নানা রঙ্গের বর্ণনা আরো একবার শুনেছি। এতকাল পরে আমার কি সেসব মনে আছে?

পরের দিন গোলাপ পিসি বলেন 'বাবা আমাদের মায়া কাটিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। একদিন না একদিন যেতেন। তাই মর্মাহত হলেও বিপর্যস্ত হইনি। বছর খানেক বাদে মা আমাকে লেখেন যে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে এখন হিমালয়ে প্রস্থান করছেন। তিনি এখন মহাপ্রস্থানের পথে। এক এক করে সমস্ত পার্থিব বন্ধন ছিন্ন হবে। আমার সঙ্গেও তাঁর পূর্বাশ্রমের বন্ধন ছিন্ন হলো। এর পর থেকে আমি যেন তাঁকে মা বলে না ডাকি। তবে তাঁর নাম চিদানন্দ হলেও তাঁকে মাতাজী বলে ডাকা চলবে। আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। মা থাকতেও আমি মাতৃহারা। আমার বাপের বাড়ী থেকে তিনি বিদায় নিচ্ছেন। সেখানে এখন থেকে তাঁর স্থান নেই। তার মানে আমারও ঠাঁই নেই। আবার যে একদিন বাপের বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেব সে পথে কাঁটা। তবে উত্তরাধিকার আমার যেমনকে তেমন থাকবে। সেইটুকুই সান্ত্বনা।'

তাঁর বলতেও কষ্ট, আমার শুনতেও কষ্ট। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। মুখ দিয়ে কথা সরে না। কী বলবার আছে! কী বলব!

'ঘটনাটা একটু অসাধারণ। না?' গোলাপ পিসি বলেন, 'কিন্তু বাবা নাকি যাবার আগে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। স্বামী স্ত্রীর হৃদয় এক হতে পারে, কিন্তু আত্মা এক নয়। যে যার নিজের মোক্ষ বা মুক্তি বা নির্বাণ বা স্যালভেশন নিজের নিজের সাধনা

দিয়ে অর্জন করবে। দুজনের একজন যদি সন্ন্যাস নিতে চান ও তাতেই তাঁর পরলোকে সদ্‌গতি হবে মনে করেন তা হলে অপরজন অন্তরায় হবেন কেন? স্ত্রীরা তো স্বামীদের সন্ন্যাসের অন্তরায় হন না। স্বামীরাই বা কেন হবেন? কিন্তু বাবা কি ভেবে দেখলেন না আমার কী দশা হবে? মা আমাকে মেয়ে বলে স্বীকার করবেন না। শঙ্করাচার্য বলেছেন, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। চিদানন্দ বলবেন, কা তব কন্যা কস্তে দৌহিত্রঃ। হ্যাঁ, বাবুয়াকেও তিনি বর্জন করবেন। আমি তো অভিমানে কেঁদে আকুল হই। কিন্তু একটি আত্মার আধ্যাত্মিক কল্যাণের পন্থায় আমি কে যে কণ্টক হব!'

আমার মাও তো বলেন, 'এটা মায়ার সংসার। কেউ কারো আপনার নয়।' আমার মনে লাগে। তাই আমার সহানুভূতি গোলাপ পিসির প্রতি।

'সত্যি, গোলাপ পিসি, মাতাজীর কী অন্যায়! বাবুয়া বেচারার দিদিমা বলে কেউ রইলেন না। তুমিও তো মা থাকতে মাতৃহারা।'

'তোকে চুপি চুপি বলছি। ফাঁস করে দিস্‌নে। আমি এখনো ওকে মা বলে ডাকি। কিন্তু অন্যের সামনে নয়।' গোলাপ পিসি চোখ টেপেন।

'বাবুয়া থাকলে সেও দিদিমা বলেই ডাকত। না, গোলাপ পিসি?' আমিও তাঁর অনুকরণ করি। চোখ টিপি।

'বাবুয়া থাকলে বলছিস্ কেন? বাবুয়া কি নেই?' তিনি আমার ভুল শুধরে দেন। 'বাবুয়া' আছে। ওর অস্তিত্ব আমি নিত্য অনুভব করি। ঠিক যেমন আগেও অনুভব করতুম। তখন ও থাকত ওর ঠাকুমার ঘরে। এখন ও আছে আর কারো ঘরে, যাঁর নাম আমি জানিনে। যদি এর মধ্যে জন্মান্তর হয়ে থাকে। সম্ভবত হয়নি। ও অপেক্ষা করছে জন্মগ্রহণের জন্যে। মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ডে'র অজাত শিশুদের মতো। তোর কী মনে হয়? মেটারলিঙ্কের ওটা কি মিস্টিক দৃষ্টি না কবিকল্পনা?'

'মিস্টিক দৃষ্টি বলেই তো মনে হয়।' আমি যেন সবজান্তা।

'আমারও তাই মনে হয়।' গোলাপ পিসি খুশি হন। 'কিন্তু যার ওই সন্ন্যাসগ্রহণ আমার জীবনের এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। না জেনে তিনি আমাকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেন। আমার কোথাও যাবার ঠাঁই নেই। বাপের বাড়ী তো শূন্য। শাশুড়ী আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যত ইচ্ছে বকেন, ধমকান, শাসান। আমার আদি অপরাধ আমি বি-এ পাশ করা শিক্ষিতা নারী। তাঁর বিদ্যে তো নিম্ন প্রাথমিক কি শিশুবোধক। না, সেটা ঠিক নয়। রামায়ণ মহাভারত তাঁর মুখস্থ। বটতলার ওই দু'খানি পুঁথির সঙ্গে কবিকঙ্কণ চণ্ডীও ছিল তাঁর ঘরে। সুর করে পড়তেন আর মেজবৌকে শোনাতেন। আমিও মাঝে মঝে শুনতে যেতুম। আহ্লাদিত হতেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাগ পুষে রাখতেন। আমি কেন বিদুষী ও তিনি কেন স্বল্পশিক্ষিতা।'

আমি নীরব থাকি। শিক্ষাবিস্তারের এই পরিণাম!

'আমি তাঁকে ভক্তি করতুম, শ্রদ্ধাও করতুম। বিদ্যার অভাব তিনি পুষিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধিমত্তায়, ব্যবহারিক জ্ঞানে, সাংসারিক গুণপনায়। বাবুয়াকে বাদ দিলে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো বিরোধের কারণও ছিল না। আমরা দু'জনেই ছিলুম বাবুয়াগত প্রাণ। অন্যান্য পরিবারে কি এ সমস্যা নেই? তারা জানে কেমন করে আপন করতে হয়। আমরা জানতুম না। তিনিও অন্ধ, আমিও অন্ধ। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবার পর হোঁশ হয় যে, যাকে আমরা ভালোবাসি সেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে বসেছে।' গোলাপ পিসি কেঁদে ফেলেন।

'কী দুঃখের বিষয়!' আমিও চোখ মুছি।

'সেদিনকার সেই ক্ষত এখনো তাজা রয়েছে গোপাল। আমি যে এখনো তার ভেষজ খুঁজে পাইনি। ধর্ম নিয়ে ডুবে আছি, তবু ধর্মও আমাকে আরাম দেয় না। হ্যাঁ, যা বলছিলুম। সামান্য অসুখের পর বাবুয়া আমাদের সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে রেখে চলে যায়। চলে যায় বলা অবশ্য ঠিক নয়। ও আছে, যেমন ছিল। ওর দেহ চলে যায়। শেষমুহূর্তে আমারও আক্কেল হয় যে একটি নিরীহ নির্দোশ শিশুকে নিয়ে রাতদিন কাড়াকাড়ি করলে আখেরে তাকে হারাতে হয়। বাবুয়া ভিতরে ভিতরে ব্যথা বোধ করছিল, বাইরে যদিও হাসিখুশি। শিশুরা সব বোঝে। ওদের ওটা সহজাত বোধশক্তি। আমরা'ই অবুঝ। আমার নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমি এখন ভেঙে পড়ি যে শাশুড়ীকে তাঁর নির্বুদ্ধিতার জন্যে দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারিনে। সেটা শুনিয়ে দেন আমার শ্বশুর। তিনি যদি উদাসীন না হতেন তা হলে অনেক আগেই এর বিহিত করতে পারতেন! আর আমার স্বামী? পুত্তর ক্রীচার। হাম্বা হাম্বা করেই গোমাতার পুজো করেন। থাক, পতিনিন্দা করতে নেই। ওঁর সাধ্য থাকলে তো উনি অন্যত্র বাসা নিতেন। এ সমাজে সেটা সুদৃশ্যও নয়। না, আমি ওঁকে দোষ দিইনে, গোপাল।' পিসি আমাকে বুকে টেনে নেন।

আমি বেশ বিব্রত বোধ করি। তিনি আমাকে আদর করে বাবুয়াকেই আদর করছেন বুঝতে পারি। তবু বলতে পারিনে যে, আমি বাবুয়া নই, বাবলু বা জয়।

'এর পর আমি আমার স্বামীকে বলি যে আমি বাবুয়ার খোঁজে চললুম। তুমি আর একটি ছেলে চাও তো আর একটি বিয়ে কর।' বাবুয়াই আমার একমাত্র সন্তান। তার দোসর কেউ নয়। গিয়ে আশ্রয় নিই মাতাজীর আশ্রমে। মেয়েমানুষের আশ্রয় তো একটা চাই। পৈত্রিক সম্পত্তি যদিও কম নয়। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও তিনি আমার ও আমি তাঁর এ ভাবটা বছর তিনেক অবধি ছিল। তার পর তিনি আরেকজনকে ঘরে আনেন, আরেকটি ছেলের বাপ হন। আমি আর ওমুখো হবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনে।' গোলাপ পিসি থামেন।

ক্লাসের শেষে ঘণ্টা পড়ে এই তো আমাদের স্কুলের—সব স্কুলের—নিয়ম। কিন্তু একদিন শুনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ছে, যদিও ক্লাস বসেছে সবে দশ পনেরো মিনিট। বিপুল হল্লা। সবাই বেরিয়ে এসেছে ক্লাসরুম ছেড়ে। কিন্তু কী করবে, কোথায় যাবে, মালুম নেই কারো।

হল্লা ক্রমশ হলঘর অভিমুখে চলে। সেইখানে গিয়ে শান্ত হয়। হেডমাস্টার মশায় সবাইকে আসন নিতে বলেন। আমরা যে যেখানে পারি বসে যাই। তিনি সবাইকে বলেন উঠে দাঁড়াতে ও দু'মিনিট চোখ বুজে চুপ করে থাকতে। আমরা আমাদের সহজাত বোধশক্তি দিয়ে উপলব্ধি করি আমাদের শোক প্রকাশ করবার মতো কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে। দু'মিনিটের জায়গায় তিন মিনিট হয়ে যায়। হেডমাস্টার মশায়ের দিকে চুরি করে তাকাই। জলে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ।

অবশেষে তিনি শোককাতর স্বরে বলেন, 'হিজ হাইনেস ইজ ডেড। লং লিভ হিজ হাইনেস।'

ব্যস্। ওইটুকু বলেই তিনি বসে পড়েন। আমরাও তাঁর অনুসরণ করি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনে। আমার পাশে যারা ছিল তারা বলে, 'পঞ্চম জর্জ মারা গেল। লোকটা বড়ো ভালো ছিল রে! এবার কায়জারকে ঠেকায় কে!'

আমার মাথায় বাজ পড়ে। কোথায় পাই একলাখ টাকা! সারদাকে বাজীর টাকা দিতে হবে তো!

হেডমাস্টার কোনো মতে আবার উঠে দাঁড়ান। কিন্তু আমাদের উঠতে বারণ করেন। বলেন, 'আমি অনেক রাজা মহারাজা দেখেছি। কিন্তু আমাদের রাজার মতো নম্র, বিনয়ী, দরদী, নোবল তাঁদের একজনও নন। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন জন্মজন্মান্তরেও আমাদের রাজা হন।'

আমরা করতালি দিতে উদ্যত হতেই নিষেধ করে বলেন, 'করতালি এ সময়ে বেমানান। নিঃশব্দে শুনে যাও। কী প্রচণ্ড শোক! রানীমা অকালে বিধবা হলেন। তাঁর সে বেদনা কি আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করব না! আর সেই নাবালক শিশুগুলি! তাদের একজনই তো সিংহাসনে বসবেন। সবাই তো নয়। রাজসিংহাসন একমুহূর্তের জন্যেও শূন্য থাকে না। যুবরাজ ইতিমধ্যেই রাজা হয়েছেন। তবে তাঁর অভিষেক উপযুক্ত দিনক্ষণ দেখে হবে। আমরা তাঁকে বশ্যতা জানাই। তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করুন। তাঁর পিতাই তাঁর আদর্শ হোন। ভগবানের সব চেয়ে পছন্দসই আশীর্বাদ তাঁর শিরে বর্ষিত হোক।'

আমি আমার পাশের ছেলেটিকে বলি, 'হেভেনস চয়েসেস্ট ব্লেসিংস।'

সভা সেইখানেই ভঙ্গ। হেডমাস্টার মশায় ঘোষণা করেন যে স্কুল বারোদিন বন্ধ

থাকবে। ততদিন কালো বাহুবন্ধনী ধারণ করাই শিষ্টাচার। তবে সেটা দেশীয় রীতি নয় বলে তিনি সকলের কাছে প্রত্যাশা করবেন না।

সপ্তম এডওয়ার্ডের পরলোকের সময় আমরা বামবাহুতে কালো ব্যাণ্ড ধারণ করেছিলুম। সেটা সরকার থেকেই মিলেছিল। ব্রিটিশ সরকার থেকে। রাজসরকার তাঁদের মারফতদার। এবার তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যে পারে সে বানিয়ে নেয়। আমি তাদের একজন।

মনটা খারাপ বলে খারাপ! রাজাসাহেব যতবারই আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে যেতেন একমিনিটের জন্যে থামতেন ও বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে কুশল-প্রশ্ন করতেন। আর আমাদেরও বলতেন, 'সব ভালো তো?'

টেনিসনের 'চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড' আবৃত্তি করে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছি। আমার আবৃত্তি হঠাৎ একজায়গায় আটকে যায়, সবাই হাসে, তিনি অভয় দেন। আহা! এমন মানুষকেও যমে নেয়! আর কীই বা বয়স! গোপাপ পিসির কাছাকাছি। আমার শোক একান্ত আন্তরিক। তেমনি আমার বাবারও।

'রাজ্য এখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসে চলে গেল। নতুন রাজা তো নাবালক। তোবই বয়সী। আমাদের রাজবাড়ীর পাট চুকল। তবে দেওয়ান বদল হচ্ছে না। আর সব যেমনকে তেমন থাকছে। পরে হয়তো রদবদল হবে।' বাবা আমাকে বলেন।

চাকরি একজনেরও যায় না, কিন্তু সেই যে থিয়েটার বা বক্তৃতা উপলক্ষে রাজকীয় জলযোগ সেটায় ছেদ পড়ে। হয়ই না আর বক্তৃতা বা থিয়েটার। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন নিষ্প্রভ হয়। ব্রাহ্ম প্রতিবেশী বিদায় নেন। আমারও আর নাটক নভেল লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার সুযোগ জোটে না।

তিনদিনের কি চারদিনের অসুখ। রাজাসাহেবকে দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে বড়ো ডাক্তার আনাবার আগেই তাঁর শেষ অবস্থা উপনীত। মানুষ কত অসহায়! ডাক্তার দেখে বলেন ঠিকমতো রোগনির্ণয় হয়নি। হলে বেঁচে যেতে পারতেন। তাঁর মতে মেনিনজাইটিস। কে জানে কী তার মানে!

মাতাজী রাজাসাহেবের কাছে যে দক্ষিণা আশা করেছিলেন এত ঘটনার পর তা পান না। দেওয়ান সাহেব বলেন, 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস রাজাসাহেবের ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি পালন করবে না। ওটা আপনি প্রিভি পার্স থেকে পেতে পারেন, কিন্তু তার জন্যে আবেদন করতে হবে রাজমাতার দরবারে।' কালকের রানীসাহেবাই আজকের রাজমাতা। তাঁর মাথার ঘায়ে তিনি পাগল। কে যাবে তাঁর কাছে দরবার করতে!

মাতাজী নিরুপায় হয়ে স্বস্থানে ফিরে যান। আশ্রম তো পরমার্থ দিয়ে চলে না। তার জন্যে চাই অর্থ। নিজের সম্বলে কুলোয় না বলেই রাজা মহারাজার দ্বারস্থ হতে হয়।

এ যাত্রা তাঁকে শূন্য কমণ্ডলু নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এ সব অভিজ্ঞতা এর পূর্বে হয়নি। আমরা তাঁকে সসম্মানে বিদায় দিয়ে আসি। কিন্তু বলতে পারিনে যে, পুনর্দর্শনায় চ। নতুন রাজার গদী পেতে বোধহয় দশ বছর দেরি।

দাদাজীর মুখ শুকিয়ে গেছে। গোলাপ পিসি কিন্তু যেমনকে তেমন। বলেন, 'বেচারি রাজমাতার যা বিপত্তি তার তুলনায় আমাদেরটা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। নারী যখন বিধবা হয় চিরকালের জন্যে হয়। তা সে রাজরানীই হোক আর মেথরানীই হোক। হিন্দুসমাজ কেমন সাম্যবাদী দেখছিস্ তো! মেথরানী তবু সাঙা করতে পারে। রাজরানী তা পারে না। ভাগ্য ভালো যে সহমরণে যেতে হচ্ছে না। এই করুণার জন্যে হিন্দুসমাজকে ধন্যবাদ দেব না লর্ড উইলিয়াম বেনটিঙ্ককে? রানী থেকে রাজমাতা হয়ে তিনি সুখী না অসুখী এটাও একটা কূট প্রশ্ন।'

গোলাপ পিসির সঙ্গে আমার পড়াশুনার সম্পর্ক চুকে যাবার পরও আর একটা সম্পর্ক বাকী থাকে। সেটা পিসি ভাইপোর সম্পর্ক। সেই সুবাদে আমরা পরস্পরকে বলি, 'আবার দেখা হবে নিশ্চয়, কিন্তু কবে আর কোথায় তা ভবিতব্যই জানে। যেন ভুলে না যাই। মনে রাখি।'

গোলাপ পিসির শেষ শিক্ষা হলো এই ক'টি কথা, 'আর সব ভগবানের হাতে, কিন্তু মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে কি না এটা মানুষেরই হাতে। বাবুয়াকে যদি আর দেখতে নাও পাই তা হলেও আমি ওকে ভালোবেসে যাব, যতদিন বাঁচি। জগৎ ইচ্ছা করলেও এতে বাদ সাধতে পারবে না। কেউ তোকে ভালোবাসে কি না এ নিয়ে মন খারাপ করিস্‌নে, জয়। তুই নিজে যেন ভালোবাসতে পারিস্ ও ভালোবাসতে থাকিস্। এই একটি ক্ষেত্রে মানুষ কোনকালেই অন্যনির্ভর নয়। সব সময়ই অনন্যনির্ভর। যম এখানে পরাস্ত। সংসার এখানে পরাজিত। সমাজ এখানে পরাভূত।'

সেই যে তাঁরা গেলেন তার পর থেকে তাঁদের আর কোনো খবর নেই। না একখানা চিঠি, না একখানা পোস্টকার্ড। সত্যিকার বান্ধব বলতে ওখানে তাঁদের ছিলেন মাত্র দু'জন। হেডমাস্টার মশায় আর বাবা। কিন্তু রাজাসাহেবের অবর্তমানে এঁদের সেই প্রভাব প্রতিপত্তিও অবর্তমান। রাজতন্ত্রের অসুবিধে এখানেই। মাতাজীর বোধহয় ধারণা যে এঁরা থাকতে তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণার খেলাপ হতে পারে না। কিন্তু রাজা আর রাজ্য এক জিনিস নয়। পলিটিকাল এজেন্টকে বোঝানো যাবে না যে ওটা একটা আধ্যাত্মিক বা নৈতিক ঋণ। সেটা রাজমাতারও সাধ্য নেই যে শোধ করেন। বান্ধব বলতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যে যার চাকরি বজায় রাখতেই ব্যস্ত। তাঁরাও মাতাজীকে চিঠি লেখবার সময় পান না।

বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, 'গোলাপ পিসির ঠিকানা কি আপনি জানেন?'

'না তো। ওঁরা দেশময় ঘুরে বেড়ান। কখন কোথায় থাকেন কেমন করে জানব! তুই ওঁদের আশ্রমের ঠিকানায় লিখে দেখতে পারিস্।' তিনি উত্তর দেন।

আশ্রমের ঠিকানা তো শুধু আলমোড়া, ইউ পি। লিখি একখানা পোস্টকার্ড। বেশী কিছু নয়। কুশলপ্রশ্ন ও প্রণাম।

ঠিকানা রিডাইরেক্ট হতে হতে সে পোস্টকার্ড কোথায় না যায়! সর্বাঙ্গে মোহরের দাগ নিয়ে আবার প্রেরকের হাতে ফিরে আসে। আমি হাল ছেড়ে দিই। ভুলেও যাই। ও বয়সে ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। মনে রাখাটাই ব্যতিক্রম। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান যদি থাকত তা হলে মনে রাখাও স্বাভাবিক হতো।

মাঝে মাঝে বিজলীর ঝলকের মতো মনে পড়ে যায় যে আমাদের এক জন রাজা ছিলেন, তাঁর অতিথি হয়েছিলেন মাতাজী আর দিদিজী। আর দাদাজী। আর আমার উপর ছিল তাঁদের বিশেষ স্নেহ। সেই তেলুগু বাক্যগুলি তো আমার জিহ্বাগ্রে। মি পেরু এমি? মা পেরু নিরঞ্জন তালুকদার। মি পেরু এমি? মা পেরু মদনপল্লী কুমারস্বামী চিনাপ্‌পা।

আমি যখন কলেজের ছাত্র, মাঝখানে কেটে গেছে সাত আট বছর, হঠাৎ একদিন কাগজে দেখি দাদাজীর ফোটো। প্রোফেসর চিনাপ্‌পা। ইণ্ডিয়ান স্যাণ্ডো। মহাবীর সীস্টেম। ডাম্বেলের পরিবর্তে বাঁশের কাঠি। ব্যায়ামবীরের হয়া ইয়া মাস্‌ল। ঝাঁকড়া চুল। হাসিভরা মুখ। দাড়িগোঁফ কামানো। সব মিলিয়ে যেন একটি স্ট্যাচ্যু।

দাদাজীর ঠিকানা দেওয়া ছিল। লম্বা চিঠি লিখে মনে করিয়ে দিই, 'আমি সেই বালক যাকে আপনি বলেছিলেন পিজন-ব্রেসটেড। সাঁতার কাটতে কাটতে আমি এতদিনে সে খুঁত কাটিয়ে উঠেছি। আপনার শেখানো তেলুগু বুলি আমি টিয়াপাখীর মতো এখনো কপচাই। মি পেরু এমি? মা পেরু নিরঞ্জন তালুকদার। এখন চিনতে পারলেন? কিন্তু, দাদাজী, আপনার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ আছে আমার। মহামান্য মাতাজী এখন কোথায়? আর পূজনীয়া দিদিজী? তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। ইচ্ছে করে প্রণাম জানাতে। আপনাকেও আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম।'

এর উত্তরে আসে একখানি পোস্টকার্ড। 'তুমি যদি আমার সীস্টেম অনুসরণ করো অচিরেই কপাটবক্ষ হবে। আশ্রম উঠে গেছে। মাতাজী ও দিদিজী এখন দেশান্তরে। ঠিকানা অজানা। আমিও আর দাদাজী নই। আমার নিজের প্রতিষ্ঠানের আমি অধ্যক্ষ। শুভকামনা জেনো।'

মনে বিস্ময় জাগে। বৈদিক ভারতের পুনরুজ্জীবন যাঁর জীবনের ব্রত তিনি কেন দেশান্তরে যান! আশ্রম তুলে দেন! আর তাঁর কন্যাও কি বিদেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করছেন! এদিকে যে মহাত্মা শুরু করে দিয়েছেন অহিংস অসহযোগ। বিলিতী কাপড়

-বয়কট হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিলিতী শিক্ষাও। আমি যে কলেজে পড়ি এর জন্যে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারিনে। আমার উচিত ছিল জেলে যাওয়া। অন্তত গ্রামে গিয়ে চরকা কাটা ও লোকসেবা। বিদেশযাত্রার সাধ আমারও ছিল। কিন্তু সংগ্রামের দিনে সেটা বর্জনীয়। সংগ্রামীদের মতে বিশ্বাসঘাতকতা। আগে তো স্বরাজের সাধনা সারা হোক। তার পরে বিদেশযাত্রার পালা।

কোথায় যে হারিয়ে গেলেন গোলাপ পিসি, পৃথিবীর কোন্ দেশে বা কোন্ মহাদেশে, আমি আর খোঁজই পাইনে। এমনি করে কেটে যায় বছরের পর বছর। কলেজ পর্বের পর বিদেশযাত্রা। কিন্তু সেদেশেও সন্ধান মেলে না। 'শ্রী চিদানন্দ ভারতী! কই, নাম শুনিনি তো। তিনি আবার পুরুষ নন নারী। তা কী করে হয়! সঙ্গে তাঁর কন্যা আত্রেয়ী দেবী। না, তেমন কারো নামও তো শুনিনি।'

দেশে ফিরে এসে সাত ঘাটের জল খাই। সংসার করি। পুত্রকন্যা হয়। নানান্ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি। তার একটার নাম সাহিত্যচর্চা। গোলাপ পিসিকে সেই সূত্রে মনে পড়ে যায়। আমাকে তো তিনিই বলেছিলেন আমার লেখনী হবে একসক্যালিবার। কিন্তু কোথায় তুমি, গোলাপ পিসি! আমার লেখা কি কখনো তোমার নজরে পড়েনি? আমার নামটা কি তুমি ভুলে গেছ? আমি যেমন তোমাকে ভালোবাসি তুমি কি আমাকে তেমনি ভালোবাস না! হয়তো আমাকে উপলক্ষ করে বাবুয়াকেই ভালোবাসতে আর আমি ধরে নিতুম আমাকে।

ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাই দেরাদুন অঞ্চলে। হরিদ্বার হৃষীকেশ লছমনঝোলা ঘুরে আসি। সর্বত্র সুধাই, 'চিদানন্দ ভারতীকে চেনেন? তার কন্যা আত্রেয়ী দেবীকে? ওঁরা তীর্থ করতে নিশ্চয়ই এদিকে আসেন। এই পথ দিয়েই কেদার বদরীতে যান।' কেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য। প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবন যাঁদের জীবনের ব্রত, যাঁরা আর্য বলে গৌরব বোধ করেন, আর্যাবর্তে তাঁদের কোনো চিহ্ন নেই। আমার ছুটি ফুরিয়ে যায়। কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাই। কদাচ কখনো মনে পড়ে যায় তাদের। কিন্তু বাবার পরলোকের পর সেই অধ্যায়টাই ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। শেষদিনটি পর্যন্ত রাজবাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল। রাজমাতা তার কাছেই শুনতেন গৌরভক্তিতত্ত্ব। কিন্তু ক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তাঁর হাতে তা ছিল না। সরকারী কর্মচারীরা আর তাঁর কাছে আসতেন না। এমন কি বাবাজী বৈষ্ণবরাও আগের মতো তাঁকে ঘিরে থাকতেন না। তিনিও তাতে সুখী। তবে তাঁর সত্যিকার বন্ধুজনের অভাব ছিল না। প্রতিদিন তাঁরা মিলিত হতেন তাঁর সঙ্গে। উপলব্ধি বিনিময় করতেন। চাকরি থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন। তাই তাঁকে আপিস করতে হতো না। সেবা পূজা ও গ্রন্থপাঠই তাঁর নিত্য কর্ম। বলতে ভুলে গেছি মা আমাদের মায়া কাটিয়ে নিত্যধামে প্রয়াণ করেন আমার

কলেজ প্রবেশের পূর্বে। এই মায়ার সংসারে তাঁর মন ছিল না। শরীরও দুর্বল।

আমার পিসিমাসির সংখ্যা খুব কম নয়। কই, তাঁদের জন্যে তো আমার মন কেমন করে না ? গোলাপ পিসির এমন কী বৈশিষ্ট্য ? কেন তবে ওঁর কথা এত ভাবি ? এতবার ওঁকে স্মরণ করি ? আদর কি কিছু কম পেয়েছি সাক্ষাৎ ও সম্পর্কিত মাসি পিসির কাছে ? এক পাতানো পিসি, তাঁর জন্যে আমি কিনা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কী করে তিনি আমার এতটা আপন হলেন। তাঁর তো বাবুয়া-অন্ত প্রাণ। বাবলু নামটা বাবুয়ার মতো শুনতে। সেই থেকেই না আমার এত খাতির। বাবুয়ার স্বাদ তিনি বাবলুতে মেটাতেন। আর আমি কিনা এমন নির্বোধ যে রোজ বিকেলবেলা তাঁর ওখানে ছুটে যেতুম মালী বাগিচার লোহার বেড়া ডিঙিয়ে। ওই যে বলে মায়ের চেয়ে মাসির বেশী দরদ। এক্ষেত্রে পিসির।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আবার ছুটি নিয়ে হিমালয় দেখতে যাই। যে হিমালয় সর্বপ্রকার হিংসাদ্বেষের ঊর্ধ্বে। যেখানে চলেছে নিরন্তর পরমসত্যের তপস্যা। এবারকার বিশ্রামস্থান আলমোড়া। তেমন জনবহুল বা ফ্যাশনেবল নয়। সাধুসন্ন্যাসীদের প্রিয়।

আমার মনে পড়ে যায় যে গোলাপ পিসি তাঁদের আশ্রমের কথা বলতে গিয়ে এই শৈলাবাসটির নাম করেছিলেন। যাঁর সঙ্গে আলাপ হয় তিনি যদি আলমোড়ার অধিবাসী হয়ে থাকেন তাকেই জিজ্ঞাসা করি মাতাজীর কথা, তাঁর আশ্রমের কথা। কেউ বলতে পারেন না। শেষে একজন স্থবির সন্ন্যাসীর মুখে শুনি, 'বুঝেছি। আপনি যাঁর সন্ধান চান তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল মহালক্ষ্মী দেবী। আর স্বামীর নাম লাডলীমোহন সেন। বেনারসের রইস। কেমন, মিলে যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ, মহারাজ, মিলে যাচ্ছে।' আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

'সে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় কবে। যতদূর মনে পড়ে সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্বের শেষে। আশ্রমের সবাই যে সন্ন্যাসী ছিলেন তা নয়। ব্রহ্মচারী হলেই হলো। ফলে বহু আশ্রমিকের সমাবেশ হয়। কুমারিকা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত কোনো প্রান্ত বাদ যায় না। একটি ছোটমাপের জাতীয় মহাসভা আর কী। কিন্তু আশ্রম চলে টাকার জোরে নয়, আদর্শের জোরে। আদর্শের মধ্যে যদি প্রেরণার উপাদান থাকে তা হলেই আশ্রম জমে ওঠে। নয়তো কর্মীরা ক্রমে ক্রমে সরে যায়। কেমন, ঠিক কি না ?' তিনি আমার দিকে তাকান।

'ঠিক বলেছেন, মহারাজ।' আমি সায় দিই।

'মাতাজীর আরম্ভটা উত্তম হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল তিনি তাঁর কন্যাকেও নিয়ে এসেছেন। একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করলে কা তব কন্যা ? এই গৃহীজনোচিত দুর্বলতা কেন ? আশ্রমটা পরে এক কুস্তির আখড়া হয়ে ওঠে। যেন দেশ উদ্ধারের জন্যে উৎসর্গ

করা হয়েছে। দেশ উদ্ধার করতে চাও তো বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন কর। নইলে একদিন না একদিন সরকারের নেকনজর তো পড়বেই। পুলিশের গুপ্তচরও সাধু সেজে ঢুকবেই। মাতাজীকে আমরা তখনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলুম যে পাঁচরকম আদর্শকে মিলিয়ে একটা পঞ্চামৃত করতে যাবেন না। অমৃত একরকমেরই হয়। পরমাত্মাকে চান তো তাঁকেই একান্ত করুন। দেশমাতাকে চান তো দেশমাতাকে। বন্দে মাতরম্ আশ্রমে মানায় না। পরে দেখা গেল আশ্রমিকদের কতক চলে যাচ্ছে শ্রদ্ধানন্দ স্বামীর গুরুকুলে, কতক মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আশ্রমে, আরো কতক শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে। শেষের দিকে মাতাজীর নব নৈমিষারণ্য যেন নির্জন নিবাস। চেঞ্জার যাঁরা আসেন তাঁরা আর কোথাও ঠাঁই না পেলে ভক্ত সেজে প্রণামী দিয়ে মাতাজীর নির্জন নিবাসকে নব জনারণ্য করেন। শীতকালে আবার সব খাঁ খাঁ। তখন মাতাজী চলেন বেদান্ত প্রচারে। আমরা শীতে হি হি করি। ধুনি জ্বালিয়ে আগুন পোহাই। আর তিনি যেখানে যান সেখানে শীতের দাপট নেই। কী আরাম।' সাধুজী রহস্য করেন।

'না, না, ঠিক তা নয়।' আমি এইবার একটু প্রতিবাদের সুর তুলি। 'আমি তো দেখেছি তাঁর জীবনযাত্রা কত কঠোর।'

'হতে পারে, বাবুজী, হতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো নয়। আমরা কী ভাবে থাকি আপনি যদি দেখতে চান তো শীতকালটা এখানেই কাটান। অবশ্য এমন কথা আমি বলব না যে কৃচ্ছ্রসাধনই পরমাত্মাকে পাবার সদুপায়। তাঁর জন্যে ব্যাকুলতাই আসল।' সাধুজী থামেন।

আমি আরো কিছু জানতে চাইলে তিনি আবার শুরু করেন, 'অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারের মুখে আশ্রমিকরা তৃণের মতো ভেসে যান। যে ক'জন বাকী থাকেন তাঁদেরই নিয়ে কোনো মতে চালাতে হয়। মাতাজী বিমর্ষ। এমন সময় সুদূর আমেরিকা থেকে আহ্বান আসে। মাতাজী সে নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করেন। সঙ্গে যান তাঁর কন্যা। তিনিই হন তার সেক্রেটারি। এর আগে যিনি হতেন তিনি এক দক্ষিণী শিষ্য। লোকে বলত দাদাজী। তাঁকে না নিয়ে যাওয়ায় তিনি মনে আঘাত পান। আশ্রম ত্যাগ করে দক্ষিণে ফিরে যান। শুনি তিনি কুস্তি দেখিয়ে বেড়ান। বলেন নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। কিন্তু এখন পর্যন্ত বলবানদের একজনকেও তো দেখা গেল না পরমাত্মাকে লাভ করতে।' সাধুজী হা হা করে হাসেন।

আমিও নাম করতে পারিনে একজনেরও। আধুনিক কালের অবশ্য। বলি, 'তারপর আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তাঁরা আবার গুছিয়ে বসেন তো?'

'তার আগেই আশ্রম লোপাট। বেওয়ারিশ হলে যা হয়। যাকে যে ভার দিয়ে

গেলেন সে সে ভার ফেলে রেখে চম্পট। অতদূর থেকে কি নজর রাখা যায় না শাসন করা যায়? মাতাজী আমেরিকায় সাদর সম্বর্ধনা পেয়ে সেই দেশেই নতুন এক আশ্রম পত্তন করবেন। এদেশের আশ্রম তুলে দেন। আমরা দুঃখিত হই। হাজার হোক এক-টুকরো পুণ্যস্থান তো।' সাধুজী বিষণ্ণ।

আমি মানুষের সম্বন্ধেই কৌতূহলী, আশ্রমের সম্বন্ধে নয়। জানতে চাই মাতাজী কি আমেরিকায় থেকে যান।

'সেখানেও আশ্রম গড়ে তোলার মতো প্রতিভা তার ছিল। বহু মার্কিন শিষ্য হয় শিষ্যা হয়। আমরা কিন্তু বুঝতে পারিনে তাতে করে প্রাচীন ভারতের আর্য সভ্যতার পুনরুজ্জীবন কেমন করে সম্ভব। যেটা ছিল তাঁর লক্ষ্য। যার জন্যে তার সংসারত্যাগ। যাক, আপনি জানতে চান তিনি সেখানে থেকে যান কি না। তিনি সেখানে বছর বারো তেরো স্বচ্ছন্দেই চালান। যেমন এখানে। তার পরে সেখানেও সেই একই সমস্যা। দেশ থেকে আরো অনেক সাধু সন্ন্যাসী যোগী ঋষি বাবাজী মাতাজী সেদেশে গিয়ে বক্তৃতা দেন, আশ্রম স্থাপন করেন, শিষ্য শিষ্যার পরিবৃত হন। মাতাজীর আশ্রম ক্রমে খালি হয়ে আসে। মাতাজী ও তার কন্যা আবার নিঃসঙ্গ হন। ওভাবে তো চিরদিন কাটানো যায় না। মাতাজী বলেন, 'আমার আর ক'টা দিনের পরমায়ু। তোকেই নিয়ে ভাবনা। বিদেশে বিভুঁইয়ে তোকে ফেলে রেখে যাব কী করে? তার চেয়ে চল আমরা দেশে ফিরে যাই। গঙ্গা আমাকে টানছে। তার ধারেই আমার দেহ দাহ করিস ও তার জলেই ভাসিয়ে দিস ভস্ম। কাশীর বাড়ীতে তো তোর নিজস্ব অংশ আছে। সেটার বাঁটোয়ারা করে নিস। তা ছাড়া এখানকার আশ্রম গুটিয়ে নেবার পরে হাতে যা থাকবে তা দিয়েও আলাদা একখানা বাড়ী হয়। ব্যাঙ্কে তোর নামে নগদ টাকাও মজুত আছে। দেশে ফিরে যাওয়াই তোর পক্ষে শ্রেয়।' তাই হয়। তাঁরা ফিরে এসে কাশীবাস করেন। মাতাজী অবশ্য সন্ন্যাসিনীর মতো স্বতন্ত্র থাকেন। একদিন তার ডাক আসে। তিনি সজ্ঞানে পরমাত্মায় বিলীন হন। শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় গঙ্গাতীরে ও গঙ্গানীরে।' সাধুজী চোখ বুজে করযোড় করেন।

'তার পর তার কন্যার কী খবর?' আমি তখনো কৌতূহলী।

'কাশীর সেই আলাদা বাড়ীতেই আছেন। পৈত্রিক বাড়ীতে দখল পাননি। সে অনেক ঝামেলা। শরিকদের সঙ্গে সদ্ভাব তো ছিল না। আর আত্মীয়রাও মামলায় অনীহা। সম্পত্তি নিয়ে করবেনই বা কী? কাকে দিয়ে যাবেন। কেউ বা আছে তাঁর। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তাঁর আরেক পরিবার। সন্তান একটি হয়েছিল। অকালে এপারের মায়া কাটিয়ে ওপারে ফিরে যায়। খবর মাঝে মাঝে পাই। কাশী গেলে তো দেখা হবেই। মা আমার বড়োই স্নেহশীলা। কিন্তু অতিশয় দুঃখিনী। কী একটা বিদ্যালয়

খুলেছেন। মহেশ্বরী মা কী। বলেন, 'মহারাজ, এই আমার গোপালসেবা। এরাই আমার বালগোপাল। এদের আনন্দেই আমার আনন্দ। আমি মোক্ষ চাইনে।' বেশ তো। ওটাও একপ্রকার সাধনা। ভগবানকে ওভাবেও পাওয়া যায়।' সাধুজী বিদায় নেন।

বেনারস আমার পথেই পড়ে। অনায়াসে অবতরণ করা চলে। কিন্তু দিন দুই পরে ট্রেনে উঠতে গেলে রিজার্ভ করা বার্থ পাওয়া অসম্ভব। বিশেষত যুদ্ধের মরশুমে। আমার একার খেয়ালের জন্যে স্ত্রীপুত্রকন্যাকে কেন অত দুর্ভোগের মধ্যে ফেলি।

গোলাপ পিসির ঠিকানা জানা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়ে ওঠে না। কবে সাতাশ বছর আগে তিনমাসের আলাপ। তাঁর কি আমাকে মনে থাকবে। মনে থাকলেও কীই বা আমি তাঁকে বলব, আর তিনি আমাকে বলবেন? চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ। আমিও কি পারব চিনতে? তার চেয়ে চিঠিপত্রে পুরোনো সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেওয়াই ভালো। দেখা যাক না কী উত্তর দেন।

লিখি, 'পূজনীয়া গোলাপ পিসি, বাবলুকে কি তোমার মনে পড়ে। সেই যাকে তুমি জয় বলে ডাকতে। বলতে জয় অব এ জয় টু মী। সাতাশ বছর কেটে গেছে। মনে না থাকারই কথা। এতকাল আমি কিন্তু তোমাকে মনে রেখেছি। তোমার খোঁজ করেছি। পাইনি। মাত্র সেদিন আলমোড়ায় হরি মহারাজের কাছে পাই। তোমাকে আমি ডাকতুম গোলাপ পিসি। তার কারণ তুমি থাকতে রোজ ভিলা কুঠিতে। যার চলতি নাম গোলাপ বাগ। রোজই আমাকে ইংরেজী শেখাতে আর পুডিং বা কেক খাওয়াতে। কী সুখের ছিল সেই দিনগুলি। হঠাৎ হিজ হাইনেস রাজাসাহেবের পরলোক হয়। নয়তো আরো কিছুদিন মহামান্য মাতাজীর সঙ্গে তুমিও আমাদের ওই রাজ্যের রাজধানীতে থাকতে। আজ আমি আর কিছু লিখব না। শুধু এইটুকুই জানাব যে আমি বড়ো হয়েছি, বিয়ে করেছি আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটিকে হারিয়ে তোমার পুত্রশোকের মর্ম উপলব্ধি করেছি। তোমার জীবনের একটা আভাস হরি মহারাজ দিয়েছেন। কিন্তু সেইটুকুতে আমার আশ মেটেনি। আরো জানতে চাই। মহামান্য মাতাজীর মহাপ্রয়াণে আমি ব্যথিত। তিনি পরমাত্মায় বিলীন হয়েছেন। সেই তো তাঁর সাধনার সিদ্ধি। আমাদের সকলের প্রণাম।'

উত্তর একটা পাই বৈকি। কিন্তু না পাওয়ারই সামিল। 'জয়, সাতাশ বছরে আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বুড়ো মানুষের কি অত কথা মনে থাকে? মাঝখানে কত কী যে ঘটে গেল। লিখতে গেলে মহাভারত হবে। পিসির আশীর্বাদ সবাইকে।'

আমার জীবনের যুগল মেরু হিমালয় আর সমুদ্র। সমুদ্রদর্শন বহুবার ঘটেছে, কিন্তু হিমালয়দর্শন স্বাধীনতার আগে মোট বার তিনেক। স্বাধীনতার পরে আমার বরাতে এমন একটা পদ জুটে যায় যার তুলনা সংসাররূপী বিষবৃক্ষ। যার শাখায় দুটিমাত্র

অমৃতফল। কলকাতার সাহিত্যিকসঙ্গ আর দার্জিলিং-এর দৃশ্যরসাস্বাদন।

প্রথম সুযোগেই দার্জিলিংএ ট্যুর ফেলি। সরকারী কাজ একঘণ্টায় সারা। বাকী সময়টা ম্যালে গিয়ে পদচারণ বা উপবেশন। কাঞ্চনজঙ্ঘা কখন যে তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবে তার ঠিক কী! সমস্তক্ষণ অপেক্ষা করি। হঠাৎ একসময় ঘোমটা খুলে যায়। মরি, মরি! সে কী দৃশ্য! দিগন্তের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি প্রসারিত শুভ্রশীর্ষ গিরিশিখরমালা। একদৃষ্টে চেয়ে রই। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাই। কতক্ষণ যে কেটে যায় তার হিসাব রাখে ঘড়ি, কিন্তু তার দিকে তাকাইনে। তাকালে পাছে দৃশ্যের উপর যবনিকা পড়ে। যবনিকা পতনের সময় অসময় নেই। হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার সখীরা দৃষ্টির আড়াল হয়।

আবার অপেক্ষা করতে হয়। ধৈর্যের পরীক্ষা। যারা সময়ের মূল্য বোঝে তারা একে একে চলে যায়। আমি একলা পড়ে থাকি। ভাবি, এই আমার শাশ্বত ভারত। মাঝে মাঝে মেঘে ঢেকে যায়। বিদেশীর আক্রমণ, পরাধীনতা, অধঃপতন। হয়তো অধঃপতনটাই প্রথমে। তারপরে পরাজয় ও পরাধীনতা। কিন্তু মেঘ আবার সরেও যায়। তাকে সরিয়ে দেয় ভারতের তপস্যা। তপঃশক্তি এদেশের অন্তর্নিহিত। আর সব বাহ্য। বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, যৌথপরিবার প্রভৃতিকে যারা শক্তির আধার মনে করে তারা সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয়।

'কী, মশাই! আপনি এখানে একা একা বসে কী দেখছেন? কুয়াশায় যে মানুষের মুখও দেখা যায় না।' কে একজন ভদ্রলোক আমার বেঞ্চির একপাশে আসন নিয়ে আমাকে সম্ভাষণ করেন।

'দেখছি আমিই একমাত্র ফুল নই। আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল।' আমি চটপট জবাব দিই ও তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিই। 'ফুল' কথাটির উচ্চারণ ইংরেজীতে করি।

তিনি করমর্দন করে বলেন, 'আপনিও কি আমারই মতো অসুখী!'

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, 'অসুখী হলে কলকাতা ছেড়ে দার্জিলিং আসতে যেতুম কেন? আর এখানেও বার ছেড়ে বেঞ্চে হাজির হতুম কেন?'

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ওঠেন। 'আপনার দেখছি বিলক্ষণ পানদোষ আছে। আপনার নামটি কি শিবরাম চক্রবর্তী?'

'না। আমার নাম নিরঞ্জন তালুকদার।' আমি সবিনয়ে বলি।

'নিরঞ্জন তালুকদার। চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আপনিও কি এককালে লিখতেন টিখতেন?' ভদ্রলোক আমাকে আপ্যায়িত করে দেন।

'হাঁ, স্যর। এখনো মাঝে মাঝে লিখি। যখনই সময় পাই ও মাথায় ভূত চাপে। কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলুম না।' আমি সম্মান প্রকাশ করি। এতক্ষণে ঠাহর

করতে পেরেছিলুম যে তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।

'ডক্টর অরবিন্দ গুপ্ত। ডাক্তার নই, অধ্যাপক। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতুম। বহুদিন রিটায়ার করেছি। রিটায়ার করেও তো রি-টায়ার করা যায়। কতজনকে করতে দেখি। আমার কিন্তু অকচি ধরে গেছে। শুধু অধ্যাপনায় নয়, জীবনেও।' তিনি একটা সিগারেট ধরান ও কৌটোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। আমি মাফ চাই।

'আপনার দেখছি ধূমপানদোষও নেই। তা হলে আপনি লেখেন কী করে? লেখার প্রেরণা কি অমনি আসে?' ভদ্রলোক আবার হেসে ওঠেন।

'তা যদি বলেন, আমি চা পান করি। সেটাও তো একপ্রকার পানদোষ। ছেলেবেলায় আমাদের নিষেধ করা হতো।' আমি অন্তত একটা দোষ কবুল করি।

'তাই তো ভাবছি এ কেমন লোক যার পানদোষ নেই! আমার কিন্তু, মশায়, চায়ের পেয়ালায় দুঃখ নিমজ্জন হয় না। আই ড্রাউন মাই সরোজ্ ইন ড্রিঙ্ক। তবে সব দিন নয়। সর্বক্ষণ নয়।' ভদ্রলোক অকপটে স্বীকার করেন।

'আমার সহানুভূতি জানবেন।' আমি দুঃখী দেখলে দুঃখিত হই।

'বুঝতেই পারছি আপনার সুখের জীবন। নইলে আপনাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ড্রিঙ্ক অফার করতুম, মিস্টার তালুকদার। অমন নির্জলা সহানুভূতি নিয়ে আমি করব কী।' ভদ্রলোক প্রকারান্তরে আমাকে পানের আমন্ত্রণ জানান।

'সার, আপনি আমার প্রাক্তন অধ্যাপকের বয়সী আর আমি আপনার প্রাক্তন ছাত্রের। আমার কি আপনার সঙ্গে একত্র পান শোভা পায়? তা ছাড়া সে শখ আমি পুত্রবিয়োগের পর পরিত্যাগ করেছি।' আমি নিবেদন করি।

'আমি কিন্তু পুত্রবিয়োগের পর থেকেই আরম্ভ করেছি।' তিনি মন খুলে বলেন।

হঠাৎ আমার মাথায় খেলে যায় ইনিই তিনি নন তো। বলি, 'ছেলেবেলায় একখানি বাংলা ইংরেজী মেশানো স্মারকগ্রন্থ দেখেছিলুম। তার নাম 'ইন মেমোরিয়াম'। তাতেও ছিল পুত্রবিয়োগের ব্যথা। শোকাতুরদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ গুপ্ত।'

তিনি কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'ও গ্রন্থ আপনি পেলেন কোথায়? কার কাছে? ওটি তো পাবলিক সারকুলেশনের জন্যে নয়।'

আমি গম্ভীরভাবে বলি, 'আপনার ছেলের ডাকনাম বাবুয়া। আমার ডাকনাম বাবলু। সেই সুবাদে বাবুয়ার মা হন আমার পিসি। তিনি থাকতেন গোলাপ বাগে। গোলাপ বাগে থাকতেন বলে গোলাপ পিসি। প্রায়ই যেতুম তাঁর ওখানে। কত বই পড়ে শোনাতেন। কত গল্প বলতেন! কত উপদেশ দিতেন! আমি যে ওঁর নিজের ছেলের মতো ছিলুম। 'ইন মেমোরিয়াম' পড়ে আমিও তো কেঁদেছি। কী চমৎকার

ছেলে ছিল বাবুয়া। ওর ফোটো এখনো আমার স্মরণে জলজল করছে, ডক্টর গুপ্ত।'

তিনি আমার দুই হাত ধরে বলেন, 'আমিই ওর সেই হতভাগ্য পিতা। ওর মায়ের হতভাগ্য স্বামীও বটে।'

যা আন্দাজ করেছিলুম ঠিক তাই। ইনিই তিনি। কোমল স্বরে বলি, 'হতভাগ্য পিতা তো আপনি একাই নন। আরো একজন বসে রয়েছেন আপনার পাশেই। কিন্তু হতভাগ্য স্বামী বলছেন কেন?'

'অমন গুণবতী ভার্যাকে যে সুখী করতে পারে না সে হতভাগ্য নয় তো কী। আমি নিজেকে বার বার ধিক্কার দিই, বাবলু। বাবলু বলছি বলে কিছু মনে করছেন না তো?' তিনি ইতস্তত করেন।

'আমাকে 'তুমি' বললে আরো খুশি হব। গোলাপ পিসি তো তুই বলতেন। আমিও বলতুম 'তুমি'। আপনাকে কিন্তু 'তুমি' বলতে পারব না, সার। আপনি আমার পিতার বয়সী। বাবাকে 'আপনি' বলতুম।' আমি সঙ্কোচ বোধ করি। আর ভাবি কী বিচিত্র যোগাযোগ।

'একেই বলে নিয়তি। দার্জিলিং এসেছিলুম শান্তির সন্ধানে। কিন্তু এসব কথা শুনলে কি হৃদয় শান্ত হয়। মনে হয় কত বড়ো অন্যায় করেছি আমি। ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের মতো।' হাহাকারের মতো শোনায়।

'আপনার অশান্তির কারণ হয়েছি বলে আমি দুঃখিত।' আমি ক্ষমা চাই।

'না, না, ক্ষমা চাইতে হবে কেন? তুমি তো জেনে শুনে আমাকে আমার অপরাধ স্মরণ করিয়ে দাওনি।' তিনি আমার দিকে সস্নেহে তাকান।

অন্যায় বা অপরাধ বলে আমি একটি কথাও উচ্চারণ করিনি। মানুষ মানুষকে বিচার করবার কে? তবে আপনার মনে যদি অনুতাপ জন্মে থাকে সেকথা আলাদা। গোলাপ পিসি শুনলে কত সুখী হতেন।' এটা আমার অনুমান।

'আত্রেয়ী শতবার শুনেছে। কিন্তু সুখী হয়েছে কি না সন্দেহ। তুমি জান না, বাবলু, কীরকম অবস্থায় পড়ে আমি দ্বিতীয় বিবাহ করি। না করলে বংশলোপ হতো। পিতামাতার আদেশ অমান্য করলে তো মহাপাতক। আত্রেয়ীর মতে ওটা নাকি ওর প্রতি বিট্রেয়াল। শুধু তাই নয়, বাবুয়ার শূন্যতা পূরণ করতে যারা এসেছে তাদের আসাটাও নাকি বাবুয়ার প্রতি বিট্রেয়াল। এসব তত্ত্ব আমার আগে জানা ছিল না, জানলে হয়তো আর-কিছু করতুম। যেমন গৃহত্যাগ বা সন্ন্যাসগ্রহণ।' তিনি করুণ কণ্ঠে বলেন।

'না, সার। গোলাপ পিসি আপনার কাছে তেমন কিছু প্রত্যাশা করেননি। যতদূর মনে হয়েছে তিনি চেয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রীতে অন্যত্র বাসা নিতে ও স্বতন্ত্র সংসার পাততে। তা হলে আর দ্বিতীয় বিবাহের কথা উঠত না। শূন্যতা পূরণ প্রকৃতিই করত। কিন্তু

যথাস্থানে।' আমি ইঙ্গিতে সাবি।

'ইয়ংম্যান।' তিনি অসহিষ্ণু ভাবে বলেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ওটা আব এটা একই যুগ নয়। তুমি যদি আমি হতে তা হলে আমি যা করেছি তাই করতে। না করে উপায় থাকত না, বাবলু।'

আমি আবার ক্ষমাপ্রার্থনা কবি। পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে কাব কী লাভ। বেশ বুঝতেই পারা যাচ্ছে গোলাপ পিসির আপত্তি খণ্ডন কবা তাঁব স্বামীব সাধ্যাতীত। মুখে অনুতাপ কবলে কী হবে, মন বলছে যা কবেছি ঠিক করেছি অনুতাপ হলো সত্যিকাব অনুতাপ যদি মন বলে ভুল কবেছি। পতিব্রতা পত্নীব মুখ চেয়ে অনন্তকাল অপেক্ষা কবাই শ্রেয়স্কব ছিল। পিতামাতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বমতে আনাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু এসব কথা একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে প্রথম আলাপে বলা চলে না।

'তোমাব গোলাপ পিসি এখনো ওব জেদ ছাড়েনি, বাবলু। আমাকেই ওব সঙ্গে ওব বাড়ীতে গিয়ে বাস কবতে হবে। তাও সপ্তাহে একদিন আর্বদিন নয়। সর্বদিন। যাবজ্জীবন। মা বাবা আব নেই কিন্তু আব একজন তো আছে। ওব দিকেব পুত্রকন্যা তো বয়েছে। আমি এখন কাকে ছাড়ি কাকে ধবি বল তো।' তিনি সত্যিই আন্দোলিত। না। এব কোনো সবল সমাধান নেই। সে যুগ আব নেই যখন দুই বৌ একঠাঁই থেকে স্বামীকে আধাআধি ভাগাভাগি কবে নিত। এ যুগে দো বৌ ঠাঁই ঠাঁই এক একটি ষোল আনী জমিদাব। অথচ বিবাহবিচ্ছেদেব নাম মুখে আনতে নেই।

আমি সভয়ে এড়িয়ে যাই।

এও তো সেই ইটাবনাল ট্রায়াঙ্গল। গোলাপ পিসি যাব কথা বলতেন। আমাব বাল্যকালে আমি এব কল্পনাও কবতে পাবিনি। কল্পনাটা আমাব মনে অনুপবেশ কবিয়ে দেন তিনিই। এখন সেটা জাগ্রত সত্য। বলতে পাব ট্রুম জলন্ত সত্য কিন্তু যতদূব বঝতে পারছি গোলাপ পিসিব সঙ্গে তাঁব স্বামীব ছাড়াছাড়ি চিববিচ্ছেদের মতোই পাকা। শুধু আইনে তাব স্বীকৃতি নেই, এই যা তফাৎ।

কথাবার্তা আব এগোয় না। তিনি বাব বাব তাড়া দেন। তখন আমি বলি, সাব বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুব একবাব চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপদেশ দিয়েছিলেন 'চাক যখন দেখবে তোমাব কাহিনীব অচল অবস্থা তখন একটাকে মেবে ফেলবে।' আমি, সার, কাউকে অমন কোনো উপদেশ দিইনি। তা ছাড়া আপনাদেব এটা তো উপন্যাস নয়। এটা জীবন। আপনারা তিনজনেই বেঁচে থাকুন ঈশ্বরেব কাছে এই আমাব প্রার্থনা। অচল অবস্থা আপনা হতেই সচল হবে।'

পবের দিন আবাব আমাদেব দেখা। কিন্তু নিভৃতে নয়। তখন তিনিই আমাকে টেনে নিয়ে যান জলাপাহাড়েব পথে। সে পথ জনবিবল। অন্তত বাঙালীবিবল।

'ছাখ, বাবলু', ডক্টর গুপ্ত বলেন, 'তুমি হলে আমাদের বাড়ীর লোকের একজন। তোমাকে বিশ্বাস করে বলতে পারা যায়। তোমার ইচ্ছে হয় তোমার পিসিকে লিখো। না হয় লিখো না।'

'কিন্তু কথাটা কী?' আমি উৎসুক বোধ করি।

'কথাটা পারিবারিক। তোমার পিসির নিজস্ব সম্পত্তি তিনি কাকে দিয়ে যেতে চান তিনি নিজেই স্থির করবেন। আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনে, কারণ ওটা আমার পৈত্রিক বা স্বোপার্জিত নয়। তবে বাবুয়া তো শুধু তাঁর নয়, আমারও ছেলে। বাবুয়ার নামে সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়ে গেলে সেবায়েৎ হবে কে সে বিষয়ে আমার সঙ্গে কি পরামর্শ করা উচিত নয়?' তিনি উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন।

'অবশ্যই উচিত।' আমিও একমত।

'সেবায়েৎরা যে দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এটা এদেশে কে না জানে? তা হলে সব জেনে শুনে পরকে খাওয়ানো কেন? খাওয়াতে হয় বাবুয়ার আর যে দুটি ভাই হয়েছে তাদের খাওয়াও। যারা বাবুয়ার রক্তের শরিক তারা কি ওর আত্মীয় নয়? বাবুয়ার আত্মা কি সুখী হবে, যদি দু'ভাইকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়? এটা অবশ্য ঠিক যে পৈত্রিক সম্পত্তিতে বাবুয়ারও একটা অংশ থাকত, ও যদি জীবিত থাকত। ও নেই, কাজেই ওর কোনো ভাগ নেই। ওর নামে আমি কিছু রেখে যাচ্ছিনে, বাবলু। ইচ্ছে ছিল একটা এণ্ডাউমেণ্ট স্থাপন করে যাব। কিন্তু তাহলে সরোজ নীরজের ভাগে কম পড়ে। ওদের আমি ভয় করি। বাবুয়ার জন্যে ওদের যে প্রাণ কাঁদে তা নয়। কখনো তো চোখে দেখেনি। বাবুয়ার মা যে ওর স্মৃতিরক্ষা করতে যাচ্ছে এটা ওর বাপের পক্ষেও মহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু মা বাপ তো পাহারা দিতে বেঁচে থাকবে না। আমার বয়স এখন সত্তর। আর তোমার পিসিরও ষাট পেরিয়ে গেছে। আমাদের পরে বাবুয়ার নামে উৎসর্গ করা সম্পত্তি কে দেখবে শুনবে? পর কি আপনার হয়? ঘরের ধন পরের পেটে যাবে?' তিনি সত্যিই চিন্তিত।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। 'এসব কথা আমাকে না বলে সরাসরি আমার পিসিকে বললে হয় না? তিনি অবুঝ নন। উচ্চশিক্ষিতা। বারো তেরো বছর বিদেশে কাটিয়েছেন। নিশ্চয়ই বড়ো বড়ো উকীল ব্যারিস্টারের পরামর্শ নিচ্ছেন। আমি কে? আমার সঙ্গে ত্রিশ কি একত্রিশ বছর আগে তিনমাসের আলাপ। সেই সুবাদে আমি কেন পত্রক্ষেপ করতে যাই? কতকাল ধরে খোঁজ করার পর চারবছর আগে আমি তাঁর ঠিকানা আবিষ্কার করে আত্মপরিচয় দিয়ে চিঠি লিখেছিলুম। তিনি চার ছত্রে ডিসমিস করলেন। আবার আমি তাঁকে চিঠি লিখব। না, সার। মাফ করবেন, সার। আমি এর মধ্যে নেই।'

তাঁকে বিমর্ষ দেখায়। 'বাবুয়ার সম্পত্তি বারো ভূতে লুটে খাবে। ওর যে আরো দুটি ভাই আছে তারা অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখবে! না, বাবলু, আমা'র আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটা কেবল উপন্যাসের বেলা নয়, জীবনের বেলাও খাটে। একজনকে মেরে ফেলতে হবে। আমি সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে বলব, একজনকে মরে যেতে হবে। তার মানে আমাকেই।'

আমি শিউরে উঠি। ইটারনাল ট্র্যায়াঙ্গ্ল। ট্র্যাজেডী ভিন্ন এর কি আর কোনো পরিণাম নেই? সেটা কি অনিবার্য?

পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছিলেন মিস্টার নিয়োগী। বিখ্যাত কৌসুলী। পসার থেকে অবসর নিয়ে জীবনটাকে নতুন করে উপভোগ করছেন নববধূর সঙ্গে। একদা আমার সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎ হতো। 'গুড আফটারনুন' বলতেই থমকে দাঁড়ান, কিন্তু চিনতে পারেন না। তখন নিজের মুখে নিজের পরিচয় দিতে হয়। দুটি একটি কথা বলেই তিনি তাঁর সহচরের সঙ্গে তর তর করে নেমে যান।

'জানতুম না যে আপনি একজন জজ।' ডকটর গুপ্ত 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' ধরেন। আমার দিকে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকান। লেখক পরিচয়ে যেটা এতক্ষণ পাইনি। আমি মাথা নত করি।

'গোলাপ পিসিও জানেন না। কিন্তু আমাকে আবার 'আপনি' বলতে শুরু করলেন কেন? 'তুমি' থেকে 'আপনি' হয় না, 'আপনি' থেকেই 'তুমি' হয়। আমাদের কথাবার্তার ছেদ পড়ে গেল, সার। আপনি বলছিলেন একজনকে মরে যেতে হবে আর সে জন আপনি। শুনে আমি অত্যন্ত ব্যথা পেলুম, সার। এ বয়সে আপনার পক্ষে অর্থচিন্তা অশোভন। বারাণসীতে বাস করে পরমার্থচিন্তাই সমীচীন। ভগবান যেদিন ডাক দেবেন সেদিনকার জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।' আমি বিনীতভাবে বলি।

কথাবার্তা আর জমে না। আমরাও পাহাড় থেকে নামি। চৌরাস্তায় থামি। সেখানে তখন লোকারণ্য। তিনি তার মধ্যে হারিয়ে যান। খুঁজে পাত্তা পাইনে। বিদায় দেওয়া ও নেওয়া হয় না। পরের দিনই আমি দার্জিলিং ছাড়ি।

এর পরে আমাকে আবার বদলী করে। জজ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেট থেকে পুনর্মূষিক। লেখার কাজ মাথায় ওঠে। সরস্বতী আমার হাত থেকে লেখনী কেড়ে নেন। ম্যাকসিম গরকীর সেই যে নামকরা গল্প আছে, 'ক্রীচার্স দ্যাট ওয়াজ ওয়েয়ার মেন'। আমিও তো সেইরূপ একটি ক্রীচার। পুনর্বার ম্যান হবার একটিমাত্র পন্থা ছিল। দিনরাত তার কথাই ভাবি। গোলাপ পিসির কথা ভাবব কখন! তাঁর স্বামীর কথাও ভুলে যাই।

হ্যাঁ, আবার আমি কলকাতায়। একদিন আপিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরছি, বসবার

ঘরে ঢুকতেই আমার স্ত্রী বলেন, 'ইনি অনেকক্ষণ হলো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

চেয়ে দেখি এক ভদ্রমহিলা। বব করা চুল। রঙিন রেশমী শাড়ী। নতুন ডিজাইনের সোনার বালা, নেকলেস, দুল। সিঁথিতে সিঁদুরের ছোঁওয়া। বয়স কত হবে? পঞ্চাশ কি দু' একবছর বেশী। কে এই আগন্তুক! আমি তো চিনতেই পারিনে। আমার জন্যে অপেক্ষা করা কেন? আমি তাঁকে যথারীতি নমস্কার করি।

'কী রে! অবাক হয়ে কী দেখছিস্! গোলাপ পিসিকে চিনতে পারছিস্ নে?' তিনি নমস্কারের উত্তরে হাত নাড়েন।

তখন আমি দারুণ অপ্রতিভ হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ি। গোলাপ পিসি? অ্যাঁ! কেমন করে চিনব, বল। তুমি তো লিখেছিলে তুমি বুড়োমানুষ। কই, বুড়োমানুষ কোথায়? বুড়োমানুষ যদি বল তো সে আমি।'

'দূর পাগলা! তুই কেন বুড়ো হতে যাবি।' তিনি আমাকে টেনে নিয়ে আদর করে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দেন। আরে, ছি ছি! একটা চুমুও খান।

এমন হাসিখুশি তো তাঁকে আমি কোনোদিনই লক্ষ করিনি। এমন সাজসজ্জা করতেও দেখিনি। তবে কি বাবুরাম শোক সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন? যেন মরা গাঙে বান এসেছে।

'তুই বোধহয় ভাবছিস্ গোলাপ পিসি কেন তবে ওকথা লিখেছিল? লিখেছিল যখন তখন ওকথা সত্য ছিল। কিন্তু এখন আর সত্য নয়। তার শবরীর প্রতীক্ষা সফল হয়েছে। সে এখন জয়ী হয়েছে।' তিনি ঘোরালো করে বলেন।

'শুনতে হবে তো কী করে ওটা সম্ভব হলো। আপাতত কিঞ্চিৎ চা-যোগ করা যাক।' এই বলে আমি আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে চোখ ঠারি।

'তুই কি আমাকে শুধু চা খাইয়ে তৃপ্ত করবি? লে আও পুডিং, লে আও কেক। জানো, বৌমা, ওকে আমি কতরকম কেক আর পুডিং খাইয়েছি। ওর গায়ে যাতে একটু মাংস লাগে। কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। দাদাজী বলতেন পায়রার পাঁজরা।' গোলাপ পিসি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকান।

'তুমি যতদিন ইচ্ছে থাকো, যত ইচ্ছে কেক খাও, পুডিং খাও। এতকাল পরে তোমাকে পেয়েছি যখন তখন কি তিনমাসের আগে ছেড়ে দিচ্ছি? গোলাপ পিসি এ বাড়ী ছেড়ে তুমি আর কোথাও যেয়ো না।' আমি আবদার ধরি।

'আস্ত পাগল! না, চৌত্রিশ বছরেও কোনো উন্নতি হয়নি। তেমনি দুবলা পাতলা মাথাপাগলা। বৌমা, তোমাকেই ওর পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে, বাছা। আমি কলকাতায় এসেছি কর্তাকে নিয়ে ওঁর একটা অপারেশনের জন্যে। যদি দরকার হয়। উঠেছি এক আত্মীয়ের ওখানে।' তিনি আবার আমাকে অবাক করে দেন।

'কেন, গোলাপ পিসি ? সরোজ নীরজের মা থাকতে আপনি কেন ?' আমি ক্ষণেক হতভম্বের মতো থেকে সবাক হই।

'আমি এর উত্তরে পালটা প্রশ্ন করব, বাবুয়ার মা থাকতে সরোজ নীরজের মা কেন ?' তিনি কৌতুকের সঙ্গে, কিন্তু কঠোর স্বরে বলেন।

'আমি বিষম অপ্রস্তুত হই। মুখ খুলতে পারিনে।

'তা হলে শোন, বাবা গোপাল। তোমার পিসিমার বনবাস বৃথা যায়নি। দার্জিলিং থেকে ফিরে কর্তার ভাবান্তর দেখা দেয়। উনি একদিন লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বলেন, দেবি, আশ্রয়ং দেহি। ব্যাপার কী। আমি তো হাঁ। উনি বলেন, আমি সংসার ত্যাগ করেছি। আর ফিরে যাচ্ছিনে। কাত্যায়নী ওর ঘরসংসার নিয়ে থাকুক। আমি এখন থেকে থাকব মৈত্রেয়ীর সঙ্গে। যে মৈত্রেয়ী এতকাল অমৃতের সাধনা করেছে। দাও, দাও, একবিন্দু অমৃত দাও। প্রাণ জুড়োক। পরমায়ু তো শেষ হয়ে এল। অমৃত যদি পাই তা হলেই আমি বাঁচব। নয়তো আমার মৃত্যু আসন্ন।' গোলাপ পিসি আমাকে নাটক না প্রহসন শোনান।

'খুব আশ্চর্য ব্যাপার তো! দার্জিলিংএ তো এর আভাসটুকুও পাইনি।' আমি ওখানকার কথোপকথন স্মরণ করতে চেষ্টা করি।

'হ্যাঁ, পরে শুনেছিলুম যে দার্জিলিংএ তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমার উচ্চ প্রশংসা করলেন। তারপর যা বলছিলুম শোন। আমি তাঁর যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করি। লোটাকম্বল লিলিয়ে দিই। বলি, আমার শর্ত দশটি নয়, পাঁচটি নয়, একটি। সেটি হচ্ছে এই যে তুমি আর ও-বাড়ীতে ফিরে যাবে না। ওরা যদি তোমাকে দেখতে চায় ওরাই এ-বাড়ীতে আসবে। আমি ওদের স্বাগত জানাব। ওরা কেউ আমার পর নয়। কিন্তু ও-বাড়ীতে আমি আমার বাবুয়াকে হারিয়েছি। ওখানে গেলে আবার সব মনে পড়ে যাবে। সব অপমান, সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা। কেমন, এ শর্তে রাজী ? তিনি বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ঘাড় নাড়েন। আমি বলি, তা হবে না, মুখ ফুটে বলতে হবে, রাজী। উনি মন্ত্র পড়ার মতো করে বলেন, রাজী। তখন আর কী! আমি ওঁর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। আমিও কথা দিই যে, আমি সাবিত্রী। তোমাকে আমি যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনব। এখন বুঝতে পারলে তো সরোজ নীরজের মা থাকতে আমি কেন ওঁকে অপারেশনের জন্যে নিয়ে এসেছি। যদি দরকার হয়। ডাক এসেছে বুঝতে পারলে ওদেরও ডেকে পাঠাব।' গোলাপ পিসি বিজেতার মতো বিজিতদের উপর সদয়।

অসুখটা গুরুতর। আমি উদ্বেগ প্রকাশ করি। 'সাবিত্রীর মতো তুমিও তোমার সত্যবানকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারবে, গোলাপ পিসি।'

'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, বাবা গোপাল। কিন্তু তুই বোধহয় ভুলে গেছিস যে

সত্যবান আমার ছেলের নাম। তার বেলা আমি ব্যর্থ হয়েছি।' তিনি করুণ স্বরে বলেন।

'সব মনে আছে, গোলাপ পিসি। যেন সেদিনকার কথা। বাবুয়া যদি আজ থাকত তোমার আনন্দের ষোলকলা পূর্ণ হতো।' আমি আবেগভরে বলি।

'থাকত বলছিস কেন রে! বাবুয়া কি নেই? বাবুয়া আছে, আমরাই দেখতে পাচ্ছিনে। মাঝখানে ঝুলছে একটা পর্দা। সেটা সত্য নয়, মায়া। পর্দাটা একদিন সরে যাবে। সেদিন দেখবি সে আছে।' প্রকারান্তরে আমার হারানো ছেলের কথাও বলা হলো।

আর একটু হলে ওঁর চোখে জল এসে পড়ত। আমারও। তাই প্রসঙ্গটার ওইখানেই ইতি। সংবৃত হয়ে বলি, 'আমার বয়ঃসন্ধিতে আমাকে তুমি মিষ্টিক দীক্ষা দিয়েছিলে, গোলাপ পিসি। তুমি আমার জীবনের ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়েছিলে। তার থেকে যদিও আমি বহুদূরে সরে এসেছি, কোথায় এসে পৌঁছেছি তাও স্পষ্ট করে জানিনে তা হলেও আমি ভিতরে ভিতরে মিষ্টিক রয়ে গেছি। স্রোতের ফুলের মতো ভেসে বেড়িয়েছি কূল থেকে কূলে। জানিনে কবে কোন্ কূলে স্থিতি পাব। তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় তোমার জীবনে স্থিতি এসেছে। ছিলে বিষাদের প্রতিমা, হয়েছ আনন্দের প্রতিমূর্তি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছলে। এখন পাতা ধরেছে, ফুল ফুটেছে। হরিনামের গুণে গহনবনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। ছেলেবেলায় শুনেছি। গোলাপ পিসি, এ যেন তারই নিদর্শন।'

গোলাপ পিসি গোলাপফুলের মতো গোলাপী হন। 'হরিনামের নয়, প্রেমের কী অমোঘ শক্তি। তপস্যার কী অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। আটত্রিশ বছর ধরে যাঁর প্রতীক্ষা করেছি তিনি আপনি এসে ধরা দিলেন। এই তিনবছর তিনি আর কোথাও যাননি; গেলে পরপারেই যাবেন। কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, যেতে নাহি দিব। সপত্নী আর যম দুই আমার চোখে সমান। ব্যর্থ হলে আমিও থাকছিনে, গোপাল।'

আমি ছেলেমানুষের মতো আবদার ধরি, 'না, গোলাপ পিসি, তুমি যাবে না।'

ওদিকে আবেকজন সক্রিয় ছিলেন। কে জানে কোন্ মন্ত্রবলে কেক আর পুডিং সমেত চা এসে হাজির হয়। তা দেখে গোলাপ পিসি চমকে ওঠেন। 'ওমা। সত্যি সত্যি পুডিং আর কেক। চায়ের সঙ্গে পুডিং খায় কেউ? তোমার বাচ্চাদের জন্যে ওটা তুলে রেখো, বৌমা। আমার বাচ্চার জন্যে এটাই যথেষ্ট। এখন এস তো, বাবা নাড়ুগোপাল। হাঁ কর তো দেখি। আবার আমরা ফিরে যাই চৌত্রিশ বছর আগে।'

—

চতুরালি

দম্পতী

মোহিত

তার স্ত্রী রেবা

নীরেন

তার স্ত্রী বুলবুল

(রেবা তার শোবার ঘরে আলমারি দেরাজ বাক্স তোরঙ্গ সুটকেস বিছানা একবার খুলছে, একবার বন্ধ করছে। ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। শীতকালের সাড়ে পাঁচটা। অন্ধকার হয়ে আসছে। নীরেন প্রবেশ করল।)

নীরেন। ওঃ! আপনি!

রেবা। (জোরসে বেডিং বাঁধতে বাঁধতে) হ্যাঁ। আমিই।

নীরেন। ও কী! কোথাও যাচ্ছেন নাকি!

রেবা। হ্যাঁ। চললুম। বিদায়!

নীরেন। দিন, আপনি পারবেন না, আমাকে দিন। (চামড়ার স্ট্র্যাপ টানতে টানতে) কই, কোথাও যাবার কথা তো ছিল না।

রেবা। (ইতিমধ্যে সুটকেসে এক রাশ শাড়ী ঠেসে বন্ধ করতে না পেরে হাঁপাতে হাঁপাতে) যাঃ। কিছুতেই বন্ধ হবে না দেখছি।

নীরেন। (তখনো বেডিং বাঁধা সারা হয়নি) দাঁড়ান। আমি আসছি।

রেবা। দাঁড়াবার সময় থাকলে তো? আমি যে এক মিনিট সবুর করতে পারছিনে।

নীরেন। ট্রেনের তো এখনো ঢের দেরি।

রেবা। না, না, আমাকে যেতে হবে। কোই হ্যায়? গাড়ী বোলাও।

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। (সুটকেসের উপর বসে চাপ দিতে দিতে) বেশী কিছু নিতে চাইনে। এই সুটকেসটা, ওই বিছানা আর ঐ বেতের বাক্সটা।

নীরেন। ওটা তো খালি পড়ে রয়েছে। কী কী দিতে হবে ওর মধ্যে?

রেবা। আপনি পারবেন না। আমি দেখছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এই সুটকেসটা—

নীরেন। নিশ্চয়। নিশ্চয়। (সুটকেসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে) এক কাজ করলে হয়। বিছানাটা খুলে খানকয়েক শাড়ী গুঁজে দিই।

রেবা। (বেতের বাক্সটাতে নানা খুচরো জিনিস ঢোকাতে ঢোকাতে) তা হলেই হয়েছে আমার যাওয়া। থাক, খুলতে হবে না।

নীরেন। কিন্তু এই সুটকেসটা—

রেবা। আমি জানি ও সুটকেসটা শয়তান। জায়গা আছে, তবু জায়গা ছাড়বে না। আমিই জব্দ করছি ওটাকে।

নীরেন। (সুটকেসের সঙ্গে কুস্তি করতে করতে) শয়তান্!

রেবা। (হেসে) রাখুন। আমি আসছি।

নীরেন। (দাঁত কিড় মিড় করে) এই বার!

রেবা। (শশব্যস্তে) গেল। গেল ওটা। ফাটবার আওয়াজ হলো না?

নীরেন। দুঃখিত।

রেবা। (কাষ্ঠ হেসে) আপনার দোষ কী! ওটার দস্তুর ওই রকম। চলুক ওই ভাবে। কুলীর উপর কড়া নজর রাখতে হবে আর কী! কোই হ্যায়?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। গাড়ী তৈয়ার?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। (আয়নার সামনে গিয়ে চুল ঠিক করতে করতে) বাতিটা জ্বালিয়ে দিতে পারেন?

নীরেন। (সুইচ টিপে) এই যে।

রেবা। ধন্যবাদ।

নীরেন। আপনি যাচ্ছেন, কিন্তু মোহিতকে তো দেখছিনে।

রেবা। বুলবুলকেও দেখছেন কি? (আয়নায় মুচকি হাসি)

নীরেন। তাই তো। বুলবুল কোথায়?

রেবা। আমি কী করে জানব?

নীরেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জেগে দেখি বুলবুল নেই, কেউ নেই। আপনাকেও দেখব আশা করিনি। আপনার ঘরে আওয়াজ শুনে ভেবেছিলুম চোর নয় তো!

রেবা। ওঃ! তাই আপনি চোরের মতো ঢুকলেন!

নীরেন। অন্যায় করেছি। আচ্ছা, যাই।

রেবা। যাবার আগে একটা কাজ করে দিয়ে যান। আমার চাবীটা সুটকেস থেকে খুলে নিয়ে আলমারিটা আরেক বার খুলুন। কিছু টাকা নিতে হবে। আমি এই আসছি।

নীরেন। চাবী? কই দেখছিনে তো।

রেবা। সে কী! খুঁজুন না একটু দয়া করে। আমার এই শেষ হলো।

নীরেন। না, বৌদি। আমার চশমায় অত পাওয়ার নেই।

রেবা। (রাগ করে) সেই আমাকেই আসতে হলো। যান, আপনি কোনো কাজের নন।

নীরেন। (যেতে উদ্যত) সবি।

রেবা। কই, না! কে নিতে পারে! কেউ তো আসেনি এ ঘরে।

নীরেন। যদি আমাকে না ধরেন।

রেবা। আপনি নেবেন কেন? কী আপদ! খাটের নিচেও নেই, আলমারির নিচেও নেই। (ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাতড়ে বেড়ানো)

নীরেন। কত টাকা দরকার, বৌদি?

রেবা। (আলমারি ভাঙতে চেষ্টা করে) খুলবে, খুলবে, খুলতেই হবে।

নীরেন। (আরেকবার চাবী খুঁজতে খুঁজতে) দাঁড়ান। ভাঙবেন না।

রেবা। দাঁড়াবার সময় থাকলে তো। খুলবে, খুলবে, খুলতেই হবে। (আলমারির একটা পাল্লা ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রেবাও আছাড় খেয়ে পড়ল।)

নীরেন। (ছুটে গিয়ে রেবাকে ধরে খাটে শুইয়ে দিয়ে) লাগেনি তো ?

রেবা। লাগুক। মরণ হলেই বাঁচি। আলমারিটা শুদ্ধ উলটিয়ে মাথায় পড়লে ঠিক মরে যেতুম। না ?

নীরেন। ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই। ভালোই হলো যে আপনার যাওয়া হলো না, বৌদি।

রেবা। হলো না কী রকম ? আমি যাবই। কোই হ্যায় ? (বিছানা থেকে ওঠা)

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। ড্রাইভারকো বোলাও। সামান লে যায়েগা।

নেপথ্যে। হুজুর।

নীরেন। কাল আমরা এলুম আপনাদের অতিথি হয়ে। আর আজ আপনারা চললেন ?

রেবা। আমরা নই। আমি।

নেপথ্যে। বাই বাই, বুলবুল। সী ইউ লেটাব।

নেপথ্যে। থ্যাঙ্কস্ ফর দ্যাট লাভ্‌লী গেম অফ টেনিস।

মোহিত। (ঘরে ঢুকে) হ্যালো।

নীরেন। হ্যালো।

মোহিত। (টেনিস র‍্যাকেট রেখে) কী ব্যাপার বলো দেখি। এসব বাক্স প্যাঁটরা কিসের ? আর ওই আলমারি—

নীরেন। বৌদি কোথায় যেন যাচ্ছেন।

মোহিত। যাচ্ছেন ! কই, তা তো শুনিনি।

রেবা। (আলমারি থেকে টাকা বার করতে করতে) আহা, শোনেননি ! কী আফসোস ! এতক্ষণ যখন শোনেননি তখন দু'মিনিট পরে শুনলেও চলবে।

মোহিত। তুমি বলতে পারো ?

নীরেন। দুঃখিত। আমি তোমার চেয়েও কম জানি।

মোহিত। কই, টেলিগ্রাম কোথায় ?

রেবা। কিসের টেলিগ্রাম ?

মোহিত। তবে যাচ্ছ কী পেয়ে ?

রেবা। এমনি।

মোহিত। (বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে) ওয়েল, আই নেভার—

নেপথ্যে। আসতে পারি ?

রেবা। তোমার ইচ্ছা।

বুলবুল। (ঘরে ঢুকে নীরেনকে লক্ষ করে) এঁর গলার সুর শুনে ভাবলুম দেখি না কী হচ্ছে।

রেবা। দেখ বসে।

বুলবুল। কেউ কি কোথাও যাচ্ছে ?

রেবা। হ্যাঁ। আমি কলকাতা যাচ্ছি। বিদায় !

বুলবুল। সরি টু হীয়ার দ্যাট। কার অসুখ ?

রেবা। কারুর না।

মোহিত। ভালো কথা। তোমার মাথাধরা কেমন আছে ?

রেবা। যাক, এতক্ষণে মনে পড়ল ! আমার মাথা ধরা সার্থক।

বুলবুল। মাথাধরার খবর তো পাইনি।

রেবা। ঐ যাঃ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে ভুলে গেছি। কোই হ্যায় ?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। ড্রাইভার আয়া ?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। চললুম। বুলবুল, তুমিই দেখবে শুনবে। এ সংসারের ভার তোমাকেই দিয়ে গেলুম, বোন।

বুলবুল। বা, আমরা এলুম দু'দিনের জন্যে বেড়াতে। সংসারের ভার কী রকম !

রেবা। দু'দিনের জন্যে কেন ? চির দিনের জন্যে।

বুলবুল। ও কী বলছ, দিদি !

রেবা। ঠিকই বলেছি। চাবীটা তোমাকে দিয়ে যেতে পারলুম না, কিন্তু আমিও নিয়ে যাইনি। এই ঘরেই আছে কোথাও।

মোহিত। এটা কি তামাশা হচ্ছে !

রেবা। কী বললে ? তামাশা ? না, তামাশা নয়। সত্যি আমি যাচ্ছি। সাত বছর সহ্য করেছি। আর না। তোমরা সুখী হও।

নীরেন। (হঠাৎ কী মনে করে) আমরাও সুখী হব, বৌদি। আমাদের প্রোগ্রামটি তো কম লোভনীয় নয়। কলকাতা থেকে আগ্রা, সেখানে তাজমহলেই আমাদের কত পূর্ণিমা কাবার হবে, তার পর বসন্তে আমাদের লীলাভূমি কাশ্মীর—সেখানে কেবল আপনি আর আমি।

বুলবুল। তুমিও যাচ্ছ নাকি?

নীরেন। যাব না? ওই যে সুটকেসটা দেখছ ওটা কে গুটিয়েছে? আর এই যে বেডিংটা এটা কে বেঁধেছে? আমি।

বুলবুল। অসম্ভব! তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে।

নীরেন। চোখ বুজে অপেক্ষা করছিলুম কখন তুমি যাবে। যেই তুমি গেলে অমনি আমিও গুছিয়ে নিলুম। ওই সুটকেসটাতে আমার সুট দুটো ভরতে গিয়ে ঐ বিপত্তি।

বুলবুল। বলো কী! তোমার সুট ওই সুটকেসে!

নীরেন। আর আমার শেভিং সেট ওই বেতের বাক্সটায়।

বুলবুল। সর্বনাশ! কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা।

নীরেন। কাশ্মীরে বরফের উপর স্কী খেলা খেলতে।

বুলবুল। কী খেলা খেলতে?

নীরেন। স্কী খেলা। কেউ কেউ বলে স্কী খেলা। তুমি হলে বলতে লীলাখেলা।

মোহিত। ওঃ! বুঝেছি। আমার কথাটা কি শুনবে দয়া করে?

রেবা। শোনার কী আছে? চেনাটাই আসল। তোমাকে চিনিনে?

মোহিত। বাড়ীতে গেস্ট এসেছে, টেনিস খেলতে চায়, নিয়ে গেলুম ভদ্রতার খাতিরে। তোমার মাথা না ধরলে তুমিও তো যেতে।

রেবা। কী অনুগ্রহ! আমি কি অত অনুগ্রহের যোগ্য।

মোহিত। নীরেনের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু শীতকালের দিন, খেলতে হলে দেরি করা চলে না। ভেবেছিলুম নীরেনও একটু পরে আসছে।

রেবা। জানি গো জানি। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। কৈফিয়তের অভাব কোন দিন হয়েছে যে আজ হবে। সারাক্ষণ চোখে চোখে না রাখলে তুমি যে কখন কার সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হও তা কি এই প্রথম!

নীরেন। আমিও এই তিন বছর জর্জরিত হয়েছি। একটু আরাম করে ঘুমোবার জো নেই। ঘুম ভাঙলে দেখি দশ দিক শূন্য। নাঃ। কোনো কৈফিয়ৎ শুনব না, বুলবুল।

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। কে? ড্রাইভার? সবুর করো।

বুলবুল। আচ্ছা, আমি কেন এ ঘরে শুধু শুধু রয়েছি? (প্রস্থান)

নীরেন। ও কী! দাঁড়াও। আমার বিদায় নেওয়া হয়নি। (প্রস্থান)

রেবা। বেশ আছে ওরা দুটিতে। যত গণ্ডগোল আমাদের বেলা।

মোহিত। আমরাও তো বেশ থাকি, রেবা। মাঝে মাঝে কেউ বেড়াতে এলেই তোমার এই পাগলামি চাপে। কেন তোমার এত সন্দেহ!

রেবা। বা, চোরকে সন্দেহ করব না?

মোহিত। কে চোর? আমি না নীরেন? যাকে আজ আমার শোবার ঘরে আবিষ্কার করলুম। যার সঙ্গে তুমি ইলোপ করতে যাচ্ছিলে।

রেবা। যাই বলো, তোমার মনটা বড় ছোট।

মোহিত। কিন্তু আলমারিটা ভাঙল কী করে?

রেবা। ওটা আমারই কীর্তি। চাবী না পেয়ে টান মেরে ভেঙেছি।

মোহিত। এত বল তোমার। অবলা কেন তবে এত বলে।

রেবা। ফলও তেমনি হাতে হাতে পেয়েছি। পিঠে চোট লেগেছে।

মোহিত। (হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) পাগল মেয়ে!

রেবা। যাও, তুমি তো আমার জন্তে ভারি কেয়ার করো। খেলতে চললে আমার মাথাধরা দেখেও। সেই বা কেমন। স্বামী ঘুমোচ্ছে দেখে পা টিপে টিপে চলল র‍্যাকেট হাতে!

মোহিত। না গেলে তুমি খুশি হতে?

রেবা। কে না হয়?

মোহিত। আচ্ছা, তা হলে আর টেনিস খেলব না।

রেবা। তা কে তোমাকে বলছে?

মোহিত। অর্থাৎ টেনিস খেলব তোমার পাহারায়। এই তো?

রেবা। অমন কথা বললে আমি সত্যি চলে যাব। আমার মনটা অত ছোট নয়।

মোহিত। না, আমিই যাব।

রেবা। বা, তুমি কেন যাবে।

মোহিত। আমি যে যাব বলে কথা দিয়েছি।

রেবা। কাকে?

মোহিত। বুলবুলকে।

রেবা। ওমা, এত!

মোহিত। গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়েছে, আমি আর দেরি করব না। বুলবুলও তৈরি হয়ে থাকবে এত ক্ষণে। সেইজন্তে তো উঠে চলে গেল।

রেবা। (কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে) কথা দিয়েছ বুলবুলকে।

মোহিত। হ্যাঁ, টিকিটও কিনে রেখেছি।

রেবা। (বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে) এত দূর!

মোহিত। টাইম হলো, যাই, চেঞ্জ করি।

রেবা। (কেঁদে) ওমা! আমি তবে কী করব।

মোহিত। ছি, কাঁদছ কেন? তুমিই তো যাব যাব করছিলে।

রেবা। (মাথা খুঁড়ে) মরব। মরব। নিশ্চয় মরব।

মোহিত। (গুন গুন করে) মরিব মরিব, সখি, নিশ্চয় মরিব।

রেবা। আমাকে মেরে ফেল। মারো মারো আমাকে।

মোহিত। তুমি মরবে, তবু হুকুম করা ছাড়বে না?

রেবা। না, ছাড়ব না। (জড়িয়ে ধরা)

মোহিত। অমন করে দেরি করিয়ে দিলে আজ আর যাওয়া হবে না।

রেবা। না হলেই বাঁচি।

মোহিত। পরে তুমিই আমায় বকবে।

রেবা। না, আমি বকব না।

মোহিত। চার চারখানা টিকিট মাটি হলে তুমি বকবে না?

রেবা। (স্তম্ভিত হয়ে) চার চারখানা কেন?

মোহিত। বা, তোমাকে কি আমরা সত্যি ফেলে যেতুম নাকি? মাথাধরা থাকলেও টেনে নিয়ে যেতুম। এই অমনি করে।

রেবা। কোথায়?

মোহিত। সিনেমায়।

(রেবার মুখে স্বর্গীয় আভা। ধীরে ধীরে মোহিতের বাহুপাশে—)

য ব নি কা

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

১৯৩৮ (?)

ওলট পালট

আচার্য চক্রবর্তী, বৈজ্ঞানিক

ভাস্কর মজুমদার, সহকারী

ডি এন পালিত ও তাঁর স্ত্রী

মাঙ্গিরাম যোধপুরিয়া

কাছেমজী হাজী এছমাইল

চুণীলাল সাহা ও তাঁর স্ত্রী

নিস্তারণ নন্দী ও তাঁর স্ত্রী

অন্যান্য শরণাগত নারী ও শিশু

পঞ্চা, আচার্যের চাকর

স্বরেশ চট্টোপাধ্যায় ওরফে চট্স্কি, প্রাক্তন ছাত্র

লেনিন, ভট্টাচারস্কি, আলিন, ঘোস্কি, ধরকী, মিত্রোভ,

ওসমানোভ, ফকিরোভিচ প্রভৃতি বিপ্লবী

আচার্য চক্রবর্তী। (গবেষণাগারে পরীক্ষণরত। পায়ের কাছে প্রিয় কুকুর টম। হঠাৎ পিছন ফিরে) কী রে আজ তোর এত দেরি হলো কেন? বারোটা বাজে।

ভাস্কর মজুমদার। (উত্তেজনা দমন করে) আচার্যদেব, আপনি বোধ হয় শোনেননি, কাল রাত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে।

আচার্য। বিপ্লব! এখনো তোর মাথায় রাজনীতি ঘুরছে। আবার জেল খাটবি? যা, তোর নিজের জায়গায় বসে কাজ কর গে।

ভাস্কর। আজকের দিনেও কি আপনি কাজ করবেন, আচার্যদেব?

আচার্য। কেন, আজ কি সরস্বতী পুজা? এটা কোন মাস রে?

ভাস্কর। মে মাস।

আচার্য। তা হলে তো সরস্বতী পুজা হতে পারে না?

ভাস্কর। না, আচার্যদেব। বিপ্লব।

আচার্য। আবার ওই পলিটিক্‌স্! অমন করলে এ জীবনে এ দেশে সাংশ্লেটিক নাইট্রেট উদ্‌ভাবন করে ফসলের ফলন দশ গুণ করা হবে না। সোনার বাংলা সোনার বাংলা করে জেলে গেলে কী হবে। হাতে কলমে দেখাতে হবে যে সত্যি এ দেশে সোনা ফলে।

ভাস্কর। দেখাতে হবে বৈ কি। কিন্তু তার জন্যে তো বিপ্লব অপেক্ষা করবে না।

(জন সাত আট শরণাগতের প্রবেশ। সঙ্গে নারী ও শিশু। আচার্যের পায়ের ধুলোর জন্যে কাড়াকাড়ি। দু এক জন ভাস্করের পায়ের দিকেও হাত বাড়ালেন।)

এক সঙ্গে তিন চার জন। দোহাই আচার্যদেব। দোহাই আপনার। আমাদের প্রাণে বাঁচান।

আচার্য। কেন, কী হয়েছে তোমাদের? (একটি ছেলেকে কোলে টেনে—) কী রে, তোর নাম কী? ভোম্বল। আর তোর বোনের নাম?

তিন চার জন। আজ্ঞে, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। আমরা সপরিবারে ভাসলুম।

আচার্য। আবার বন্যা! এবার কোন নদীতে? কর্ণফুলী না তিস্তা?

ডি. এন. পালিত। না, সার, বন্যা নয়।

আচার্য। তবে কী? দুর্ভিক্ষ? কই, তোমার ভুঁড়ি দেখে তো মনে হচ্ছে না? (ভুঁড়িতে একটি মৃদু ঘুঁষি।)

পালিত। সার তা হলে খবরটা পাননি। কাল রাত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে।

আচার্য। তুমিও বলছ বিপ্লব! ব্যাপারটা কী বুঝিয়ে বল দেখি! আবার একটা ফাণ্ড খুলতে হবে, চাঁদা তুলতে হবে? তা হলেই হয়েছে আমার নাইট্রেট!

মাঙ্গিরাম যোধপুরিয়া। হুজুর, কলকত্তা শহরমে—

আচার্য। হিন্দী চলবে না। বাংলা।

মাজিরাম। কলকত্তা শহরে আর কোনোখানেই আশ্রয় মিলল না. তামাম জায়গায় ওদের ঘাঁটি। যেখানেই যাই সেখানেই লাল কোর্তা। কালীঘাটে গেলাম। বললাম, কালী-মায়ীর দর্শন মাঙছি। ওরা বলল, ওরে বলির পাঁঠা পাওয়া গেছে রে। খাঁড়া নিয়ে আয়।

কাছেমজী হাজি এছমাইল। আরে ভাই হামি গেছলাম কড়েয়া মসজেদে। সেখানকার ইমাম তো বিলকুল লাল বন গিয়া। হামাকে দেখে পুছল, আপনি কি কাছেমজী হাজি এছমাইল? আমি বললাম, হুঁ। সে বলল, বাঁচাতে পারব না। দেখলাম সেখানেও জবেহ্ করার বন্দোবস্ত। কসাইরা হামাকে তাড়া করল।

আচার্য। (অন্যমনস্ক ছিলেন) নোট করছিস তো, ভাস্কর। আমাকে দু'কথায় বুঝিয়ে বল দেখি এঁদের দুঃখটা কিসের।

ভাস্কর। আপনারা কী চান? দয়া করে খুলে বলুন।

সকলে। আজ্ঞে, আমরা আশ্রয় চাই। এর মতো নিরাপদ স্থান কলকাতা শহরে আর নেই।

আচার্য। কেন, তোমাদের বাড়ীঘরের কী হলো?

নিস্তারণ নন্দী। বাড়ী? এই কলকেতায় আমার নিজেরই তো সতেরোখানা বাড়ী। তা ছাড়া বন্ধক রেখেছি সাতাম্ন খানা। অধমের নাম নিস্তারণ নন্দী।

আচার্য। আরে, ও কে! ধর্মভীরু নিস্তারণ নন্দী! তুমি! তোমার এ দশা! কেন, তোমার সেই স্বদেশী পাটকলের কী হলো!

নিস্তারণ। (কাঁদতে কাঁদতে) আর বলবেন না, ঋষি। ইঁদুরকে সার্টিফিকেট দিয়ে বাঘ বানিয়ে দিলেন। কিন্তু কাল রাত্তির থেকে পুনর্মূষিক।

আচার্য। (ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক) ভাস্কর, এঁদের চা দেওয়া হয়েছে? ঐ যে খোকা-খুকুরা রয়েছে ওদের হাতে বিস্কুট দিয়েছিস তো? মা লক্ষ্মীরা কী খাবে গো?

মহিলারা। আমাদের প্রাণে বাঁচান, দেবতা। আমাদের স্বামীদের, ছেলেমেয়েদের অভয় দিন। আপনার পায়ে পড়ি।

আচার্য। খুব গয়না পরেছ যে! সে বার যখন দেশের জন্যে চাইলুম তখন তো গয়না খুলে দিলে না কেউ?

নন্দীজায়া। এই নিন, কত চান? কিন্তু এই কাচ্চাবাচ্চাগুলি আজ থেকে আপনার।

মিসেস্ পালিত। আমার মিন্টুর আজন্মের সাধ আপনার মতো বিজ্ঞানতপস্বী হবে। তাকে যদি দয়া করে কাছে রাখেন। এই মিন্টু, ও কী হচ্ছে? কুকুরের সঙ্গে ইয়ার্কি!

চুনীলাল সাহা। আমাকে রিসার্চ স্কলার বলে চালিয়ে দিন। আমি মদের দোকান করতে করতে চোরাই মদ চোলাই করতে শিখেছি।

পালিত। (ভাস্করকে কানে কানে) বেশী নয়। কোয়ার্টার পেগ পেলে চলবে।

ভাস্কর। এটা ডিষ্টিলারি নয়, ল্যাবরেটরি।

পালিত। দেখছি চা ছাড়া উপায় নেই।

ভাস্কর। পঞ্চা। ও পঞ্চা। চা কর দেখি। (ভৃত্যের প্রবেশ। মাথায় লাল টুপি)

পঞ্চা। দাদাবাবু, আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ।

ভাস্কর। কেন, তোকে অমানুষ বলছে কে ?

পঞ্চা। আপনিই বলছেন। আমার নাম হলো গিয়ে পঞ্চানন। ডাকলেই পারেন, পঞ্চানন মশাই। আমি তো আপনাকে 'আপনি' বলি, আপনি কেন আমাকে 'তুই' বলেন ?

ভাস্কর। এখন থেকে 'আপনি' বলতে হবে নাকি ? আচ্ছা, তর্কপঞ্চানন মশাই, আপনি এঁদের সকলের জন্যে চা তৈরি করুন দেখি। আমি যাই বিস্কুট খুঁজতে।

পঞ্চা। আমি কেন চা করব ? আমি কি চাকর ?

আচার্য। (অন্যমনস্ক ছিলেন) এত চেঁচামেচি করছে কে ? পঞ্চা ?

পঞ্চা। এজ্ঞে, কর্তা।

আচার্য। ঝট করে কিছু ফুলুরি ভাজিয়ে নিয়ে আয়। গরম গরম।

পঞ্চা। ফুলুরিওয়ালা আজ ফুলুরি ভাজবে না। আজ হরতাল।

আচার্য। হরতাল কেন ? আবার কে গ্রেপ্তার হলো ?

(লাল পোশাক পরে সুরেশের প্রবেশ।)

সুরেশ চট্টোপাধ্যায়। (পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে মনে পড়ল ওটা ফিউডাল প্রথা। আকাশে হাত ছুঁড়ে স্যালিউট করল।)

আচার্য। কে ও, সুরেশ নাকি ? এমন লাল কেন ? আজ বুঝি দোল ?

সুরেশ। না, আচার্যদেব আজ বিপ্লব।

আচার্য। (পিঠে একটা কিল বসিয়ে) তোর গায়ে তেমন জোর নেই কেন ? খাওয়া-দাওয়া করছিস না শুধু পলিটিক্‌স্ করে বেড়াচ্ছিস ?

সুরেশ। ভাস্কর, আমি এসেছি ওয়ার্নিং দিতে।

ভাস্কর। কেন বলো তো ?

সুরেশ। মধ্যবিত্তরা এখানে আশ্রয় পাচ্ছে।

ভাস্কর। ওটা কি একটা অপরাধ ?

সুরেশ। জান না ? আজ ভোরে একটা ফতোয়া জারি হয়েছে। রেডিওতে শোননি ? মধ্যবিত্তদের জন্যে একটা কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প খোলা হয়েছে। যে সব মধ্যবিত্ত সেখানে না গিয়ে অন্য কোথাও যাবে তাদের ধরে চালান দেওয়া যাবে। যারা আশ্রয় দেবে তাদেরকেও চালান।

মাঝিরাম। (কাঁপতে কাঁপতে) দোহাই ধর্মাবতার।

সুরেশ। আমাকে খোসামোদ করে কী হবে ? আপনার যা বলবার আছে তা পিপ্‌ল্‌স্‌ কোর্টে বলবেন।

পালিত। পিপ্‌ল্‌স্‌ কোর্ট।

সুরেশ। হাঁ, ব্যারিস্টার সাহেব। জন আদালত। সেখানে একশো একজন বিচারক ও বিচারিকা। গাড়োয়ান, বিড়িওয়ালা, গণিকা—

মিসেস্‌ পালিত। ওমা, কী হবে গো।

আচার্য। পঞ্চা, তুই এখনো দাঁড়িয়ে! যা ব্যাটা। যা, ফুলুরি না পাস মুড়কি নিয়ে আয়। ভোম্বলেব নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। ও ভোম্বল, তুমি যে বড চুপ।

ভাস্কব। (একটা টাকা পঞ্চার হাতে দিয়ে) জল্‌দি।

আচার্য। ওরে ভাস্কব, বলি এটা কোন্‌ মাস ?

ভাস্কব। মে মাস।

আচার্য। তবে আজ দোলযাত্রা নয় ?

ভাস্কর। না, আচার্যদেব।

আচার্য। তবে, সুরেশ, তোব এ সাজ কেন ?

সুরেশ। জানেন না, আচার্যদেব ? আজ বিপ্লব।

আচার্য। বিপ্লব বিপ্লব সবাই বলছে। দু'কথায় বুঝিয়ে দে আমাকে, মানে কী ?

সুবেশ। মধ্যবিত্তদের দিন ফুরিয়েছে। তাবা কে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে আমরা সেই সন্ধানে ঘুবছি। ধনকুবেরদেব ইতিমধ্যে ধবপাকড করা হয়েছে। তাবা এখন লালবাজারে।

আচায। ভাস্কর, নোট করছিস তো ? এক কথায় বুঝিয়ে বল দেখি ব্যাপার কী ? আমার তো সময় নেই। সোনা ফলাতে হবে।

ভাস্কর। এক কথায়, কিষাণ মজদুর বাজা হয়েছে।

আচার্য। বটে! তা হলে লাল রং কেন ?

সুরেশ। ও যে আমাদের বুকের রক্ত।

(যে সময় আচার্যের সঙ্গে ভাস্কর ও সুরেশ কথা বলছে সেই সময় শরণাগতরা কথোপকথন করছে।)

মাঝিরাম। দাদা, পান আছে ?

নিস্তারণ। আছে, কিন্তু পানের ভাও জানেন তো ? এক খিলি এক রুপেয়া।

মাঝিরাম। নিন, তা হলে দশ খিলির দাম এই নোট।

নিস্তারণ। এ নোট তো চলবে না। মোহর নেই ?

মাঙ্গিরাম। দাদা, কিষাণ মজদুর একজোট হতে পারে। আমরা পারিনে ?

কাছেমজী। আলবৎ। শেঠজী, আপনার পকেটে সিগারেট কেস দেখছি। হামাকে দিতে পারেন একটা সিগারেট ?

মাঙ্গিরাম। অমন অন্যায় আবদার করবেন না, জনাব। এই সিগারেটই আমার মুখাগ্নি। জলন্ত চিতায় জ্যান্ত পুড়ে মরছি, দেখতে পাচ্ছেন না ?

পালিত। আমার কাছে আছে সিগারেট। হাজি সাহেব, আসুন বার্টার করা যাক। সিগারেট নিয়ে জর্দা দিন।

মাঙ্গিরাম। দাদা, অনুগ্রহ করলেন না ? পানের বদলে কী চান, বলুন ?

নিস্তারণ। (কানে কানে) কোকেন।

মাঙ্গিরাম। দিতে পারি। তবে—একটা কথা আছে।

(কোমরে কাঁধে ও হাতে হাতিয়ার সমেত লাল গরিলার প্রবেশ। সেনিন, ভট্টাচারস্কি, আলিন, ঘোস্কি, মিত্রোভ, ধরকী, ওসমানোভ, ফকিরোভিচ প্রভৃতি।)

সেনিন। (সুরেশকে) চট্স্কি, তুমিও !

সুরেশ। আমি শুধু এঁদের সতর্ক করে দিতে এসেছি।

সেনিন। সতর্ক করতে, না ষড়যন্ত্র করতে ?

ওসমানোভ। চট্স্কি, তোমাকে আমরা বন্দী করলুম।

সুরেশ। আমি এর প্রতিবাদ করি।

ওসমানোভ। প্রতিবাদ পিপ্‌ল্‌স্ কোর্টে কোরো।

আলিন। বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে পিপ্‌ল্‌স্ কোর্ট নয়। তাদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। সরাসরি কোতল।

সুরেশ। সরাসরি কোতল ! এটা কি মগের মুল্লুক !

মিত্রোভ। খবরদার ! রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অমন উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহ।

আলিন। ঐ একটি উক্তিতেই প্রমাণ হচ্ছে তুমি প্রতিবিপ্লবী। চট্স্কি, ভালো চাও তো স্বীকার করো তুমি টাকা খেয়েছ।

সুরেশ। আমি যে এখানে ওয়ার্নিং দিতে এসেছি এ কথা কে না জানে ? জিজ্ঞাসা করো এঁদের প্রত্যেককে।

সেনিন। (মাঙ্গিরামকে) এই বুর্জোয়া। তুমি কিছু জান ?

মাঙ্গিরাম। জী হুজুর। যা বলবেন সব জানি।

সেনিন। ইনি কি এখানে এসে ষড়যন্ত্র করছিলেন ?

মাঙ্গিরাম। সব ঠিক।

সেনিন। আর তুমি ? তুমি জান ?

কাছেমজী। এক দম ঠিক।

সেনিন। তুমি—তুমি অমন করে কাঁপছ কেন ? তুমিও এর মধ্যে আছ ? না ?

নিস্তারণ। আজ্ঞে আমি কোকেন সম্বন্ধে কিছু জানিনে।

সেনিন। কোকেন ? কোকেনের কথা হচ্ছে না। বল, ইনি তোমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিলেন ?

নিস্তারণ। ভীষণ ষড়যন্ত্র। সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র।

সেনিন। চট্স্কি, তোমার সাক্ষীরাই তোমার বিপক্ষে বলছে। আর কেউ আছে ?

সুরেশ। ভাস্কর, তুমি তো জান।

ভাস্কর। সুরেশ আমার সহপাঠী। সে আমাকে ও আচার্যদেবকে বলতে এসেছিল যে মধ্যবিত্তদের আশ্রয় দেওয়া একটা অপরাধ।

ভট্টাচাবস্কি। সহপাঠীর জন্যে আপনি যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন দেখছি।

গুলমানোভ। একেও বন্দী করা যাক। কী নাম ?

ভাস্কর। ভাস্কর মজুমদার।

আলিন। মজুতদার ? এই সেই গোপন মজুতদার—

সেনিন। যাই হোক, চট্স্কি আমাদের কমরেড। তাকে সরাসরি কোতল করা যায় না। তাকে—শুনছ, ফকিরোভিচ ?

ফকিরোভিচ। সর্দার।

সেনিন। তাকে কমরেড নম্বর বিরাশী'র কাছে দিয়ো। তিনি নেপথ্যে বিচার করবেন। আর এই মজুতদারকেও সঙ্গে নিয়ো। (পঞ্চার প্রবেশ)

পঞ্চা। ও কী। দাদাবাবুকে তোমরা পাকড়াও করছ কেন ? ও কর্তা।

আচার্য। (অন্যমনস্ক ছিলেন) কই, মুড়ি এনেছিস ?

পঞ্চা। কর্তা, মুড়ি মিছরির এক দর। মুড়িওয়ালা চাঁদি রুপো চায়।

আচার্য। বটে ! ব্যাটাকে পুলিশে দিয়ে এসেছিস, না ভাস্করকে পাঠাব ?

ফকিরোভিচ। পুলিশ তো আমিই। আমার বিনা হুকুমে কে মুড়িওয়ালার গায়ে হাত দেয় ! সে যে গোটা দুই সোভিয়েটের মেম্বর ! একটা, পাড়ার লোকের গণ সোভিয়েট। আরেকটা, চিড়েমুড়ি চানাচুরওয়ালাদের শ্রেণী সোভিয়েট।

আচার্য। ওরে ভাস্কর। এরা এসব কী বলছে ! আমাকে দু'কথায় বুঝিয়ে দে। ও কী। তোকে বাঁধল কে। তাই তো ! তোমরা কারা হে ? তোমাদের হাতে হাতিয়ার কেন হে ?

সেনিন। আমরা লাল ফৌজের মোবাইল কলম (mobile column)। আপনার গবেষণাগার দেখছি প্রতিবিপ্লবীদের আড্ডা।

ভট্টাচারস্কি। আমরা ভেবেছিলুম আপনাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। আপনিই একমাত্র বুর্জোয়া যাকে সোভিয়েট বাংলার প্রয়োজন আছে। নাইট্রেট আমাদের এই মাসেই দরকার। কিন্তু আপনার আশ্রয়ে এই সব প্রতিক্রিয়াশীলদের আবিষ্কার করে আমরা আপনাকেও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

আচার্য। য়্যাঁ! এসব কী বকছে! পঞ্চা, তুই তাড়াতাড়ি সিরাপ দিয়ে সরবৎ তৈরি করে নিয়ে আয়। রিফ্রিজারেটরে বরফ আছে। আগে এদের মেজাজ ঠাণ্ডা হোক।

চুণীলালের বৌ। আহা, বেচারাদের কী কষ্ট! এক গা গয়না নয় তো, বন্দুক পিস্তল সঙীন ছোরা!

নন্দীজায়া। সেকালের মেয়েদের গয়নার মতো বইতেও পারে না, খুলতেও পারে না!

মিসেস পালিত। ঘুরে ঘুরে ঠগ বাছাই করা কি সোজা কাজ! ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় না হয়!

সেনিন। ওসমানোভ!

ওসমানোভ। সর্দার!

সেনিন। এদের সবাইকে রাউণ্ড আপ কর। এদের নিয়ে যাওয়ার ঠিকানা পিপ্‌ল্‌স্ কোর্ট। বুঝলে?

ওসমানোভ। অপ্রিয় কর্তব্য। মহিলারা মাফ করবেন।

ধরকী। (ঘোস্কিকে) সব লক্ষ্য করছি। একদিন লিখব আমার গণ উপন্যাস।

ঘোস্কি। আমার গণ কাব্য তো কাল রাত্রেই আরম্ভ করেছি।

(এমন সময় রাস্তায় ব্যাণ্ডের বাজনা ও মিছিলের গান। ভিতরে মহিলাদের আর্তনাদ ও শিশুদের ক্রন্দন। সব মিলে গণসঙ্গীত)

দেখছ যা সব কিছু আমাদের।
নয় নয় মামাদের।
এইসব রাজপথ আমাদের
এইসব ইমারত আমাদের
এইসব দোকান তো আমাদেরই
এইসব মোকান ভি হামাদের।
নয় নয় মামাদের।

—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

ওই সব আলমারি আমাদের
ওই সব মনিহারী আমাদের

ওই সব জামাশাড়ী আমাদের গো

ওই সব পুরনারী আমাদের।

নয় নয় মামাদের।

দেখছ যা সব কিছু আমাদের।

সব কুছ হামাদের।

হানিফের লতিফের সামাদের।

রামাদের শ্যামাদের বামাদের।

সব কিছু আমাদের।

নয় নয় মামাদের।

—মামুলোগ মুর্দাবাদ।

দেখছ যা সব কিছু কাদের ? আমাদের।

নয় কাদের ? মামাদের।

আমাদের, আমাদের, আমাদের।

সব কুছ হামাদের, হামাদের।

(বাইরে যতক্ষণ গান চলছিল ভিতরে ততক্ষণ গ্রেপ্তার ইত্যাদি। ক্রমশ ঘর খালি হয়ে গেল। রইলেন শুধু আচার্য।)

পঙ্কা। (প্রবেশ করে) সরবৎ এনেছি, কর্তা।

আচার্য। (চোখ মুছে) কে, পঙ্কু ? অতিথিরা চলে গেছেন। অতিথিসেবা করতে পারলুম না।

পঙ্কা। দাদাবাবু ?

আচার্য। তাকেও ধরে নিয়ে গেছে। মারবে না কী করবে কে জানে !

পঙ্কা। না, না। মারবে না। আমি তাঁকে উদ্ধার করে আনব।

আচার্য। কিছু বুঝতে পারছি নে। একরাত্রে পৃথিবী উল্টে গেল। পঙ্কা বলছে উদ্ধার করবে ভাস্করকে ! আর আমি ! আমি রক্ষা করতেও অক্ষম। হা ভগবান ! (কুকুরটা কেঁদে উঠল।)

য ব নি কা

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

১৯৪২ (?)

হাসব না কাঁদব

লেডী নিস্তানন্দী গ্যাংগুলী

রানী কেশবকামিনী দেবী

শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবী

রেবা, সুলতা, শোভনা, নীলা, সবিতা প্রভৃতি মেয়েরা

(পরচর্চা পরিষতের অধিবেশন। এতক্ষণ পরচর্চা চলছিল। এইমাত্র সাময়িক প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। এমন সময় লেডী নিভাননী গ্যাংগুলীর প্রবেশ।)

মেয়েরা। আসুন, লেডী গ্যাংগুলী। আ-সুন। আসুন, লেডী গ্যাংগুলী। আ-সুন।
নিভাননী। আপনারা আমাকে অপমান করছেন ?
রেবা। ওমা, অপমান কাকে বলছেন ? আমরা যে আপনাকে সম্বর্ধনা করব বলে সংকল্প করেছি। টাউন হল তো পাওয়া যাবে না। দেখি যদি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট জোগাড় করতে পারি।
নিভা। কেন, সম্বর্ধনা কেন ? আমি কী এমন করেছি যে—
সুলতা। কী না করেছেন ! আপনার জন্তেই তো হিন্দু সমাজ এ যাত্রা বেঁচে গেল, মাসিমা। নইলে রাও কমিটি তো তাকে জবাই করতে যাচ্ছিল।
শোভনা। বাস্তবিক, বয়সে আপনি আমাদের চেয়ে খুব বেশী বড় নন। কিন্তু মনটা আপনার বাহাত্তুরের চেয়ে বুড়ো।
রেবা। যা বলেছিস। ত্রেতাযুগে মন্থরার মন ছিল এমনি উঁচু দরের।
নিভা। আবার অপমান ! আমি মন্থরা !
নীলা। না, না, মন্থরা নন, মন্থরা নন। আমি বলব ?
সুলতা। না, তোকে বলতে হবে না। আমার মাসিমা যদি মন্থরা কি মন্দোদরী হন আমি হব হিড়িম্বা কি উলূপী।
নীলা। না, না, মন্দোদরী নন। মনুসংহিতা।
রেবা। যাঃ ! অমন নাম কি মানুষের হয় !
নীলা। হবে না কেন, শুনি ? গীতা কার নাম ? গায়ত্রী কার নাম ? মানুষের না আর কারো ?
রেবা। তা হলেও মনুসংহিতা ! আমি বলি মনুমর্দিনী !
নিভা। অসহ্য ! ডেকে এনে অসভ্যতা। চললুম রে, সুলতা।
সুলতা। সে কী, মাসিমা ! রানীমা এখনো এসে পৌঁছননি।
নিভা। ওঃ রানীমাকেও আসতে বলেছ ? বসি তা হলে। দেখি রানীর কী রকম অসম্মান হয়।
সবিতা। না, না, ওটা আপনার ভুল, লেডী মাসিমা। অসম্মান আমরা আপনাকে করতে চাইনি। অসম্মান যদি করতে চাইতুম তা হলে লেডী বলতুম না।
নিভা। লেডী বলতে না শুনে সত্যি আশ্বস্ত হলুম। কেননা হিন্দু নারীর পক্ষে ওর চেয়ে আপত্তিকর উপাধি আর নেই। রাও কমিটি তো আমার সাক্ষ্য নেবার সময় মুচকি মুচকি হাসছিল।

সুলতা। এই ছুঁড়ি! থাম। বলুন, মাসিমা, রাও কমিটির ঘরের খবর। ওরা কি সত্যি ক্ষেপেছে!

শোভনা। এই, তুই কী বলছিলি? লেডী না বলে কী বলতিস?

সবিতা। জানিসনে? এ তো পুরোনো কাসুন্দী।

শোভনা। কানে কানে বল।

সবিতা। নেড়ী।

শোভনা। ওমা, কী ঘেন্না! নেড়ী!

সবিতা। শুনিসনি? সত্যকিঙ্কর সাধুখাঁ যেবার নাইট উপাধি পান তাঁর স্ত্রী কোথায় আনন্দ করবেন না কেঁদে আকুল।

শোভনা। সত্যি?

সবিতা। তা হলে শুনিসনি ঠিক। শোন তবে। সার সত্যকিঙ্করের সত্তর আশিজন ঝি চাকর এক বাক্যে বলে, নেড়ী সাধুখাঁ। মুদি গয়লা পানবিড়িওয়ালারাও বলতে আরম্ভ করে, নেড়ী সাধুখাঁ। কথাটা যখন কানে এলো লেডী বললেন লর্ডকে, অর্থাৎ স্বামীকে, তুমি যদি রাজা উপাধি পেতে সকলে আমাকে রানী বলে ডাকত। তুমি সরকারকে বলো, এ উপাধি চাইনে, ও উপাধি চাই।

শোভনা। হা হা হা!

নীলা। এত হাসি কিসের! এত হাসি একা হাসতে নেই। শেয়ার করতে হয়।

(এমন সময় প্রবেশ করলেন খয়রাকোটের রানী কেশবকামিনী দেবী।)

সকলে। আ-সুন, রানীমা, আ-সুন। আ-সুন, রানীমা, আ-সুন।

নিভা। এসো, দিদি, এসো, তোমার জন্তেই এ শরশয্যায় শুয়ে আছি।

রানী। শরশয্যা!

নিভা। তা নয় তো কী! এত অপমান সহ্য হয় না, দিদি। ওরা ভাবছে আমার কান নেই, শুনতে পাইনে। রানী নই বলে আমি যেন কিছু নই। আমি যেন একটা সঙ। আমাকে মনু বলেছে, নেড়ী বলেছে, যার তার সঙ্গে তুলনা করেছে—

রানী। এই বাঁদর মেয়েরা! তোমাদের মনে যদি এই ছিল তো আমার ওখানে ধন্না দিতে গেলে কেন?

রেবা। বা, আপনি সহায় না হলে আমরা সভা করব কী করে?

সবিতা। সভানেত্রী হবে কে? চাঁদা দেবে কে?

সুলতা। লেডী মাসিমার সম্বর্ধনার ভার তো বলতে গেলে আপনার উপরেই।

রানী। সে কথা ঠিক। হিন্দু সমাজের জন্তে নিভা যা করেছে তার তুলনা নেই। ও নিজে দিন রাত সাহেবমেমের সঙ্গে নাচছে খাচ্ছে। কী করবে, উপায় নেই। ওর স্বামী

একজন খনকুবের। কিন্তু হিন্দু সমাজের জন্যে ও সত্যি ভাবে। আমি নিজে দেখেছি ওর রাত্রে ঘুম হয় না।

সুলতা। রাত্রে ঘুম হয় না, তা আমিও দেখেছি। কিন্তু ওটা কি হিন্দু সমাজের জন্যে ভাবতে গিয়ে, না ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে?

রানী। একই কথা। মেয়েরা যদি সম্পত্তির শরিক হয় স্বামীর ব্যবসা চৌচির হয়ে যাবে। তখন তো এক একজন এক একটি কোটিপতি হবে না। হবে বড় জোর নিযুতপতি। এ কি কম দুঃখের কথা! আমার তো বুকে ব্যথা দেখা দিয়েছে।

শোভনা। আপনার কিসের ব্যথা, রানীমা। ময়রাকোটের কয়লার খনির ইজারা থেকে তো আপনার বছরে সাড়ে তেইশ লাখ টাকা আসে।

রানী। কিন্তু সেও তো সাত আট ভাগ হয়ে যাবে। আমার এক পাল মেয়ে। এত দিন এক পাল ভেড়ার মতো ব্যা ব্যা করত, এখন এক পাল বাঘের মতো হালুম হালুম করছে। ছেলে দুটো তো ভয়ে কাঠ। ওদেরও বুকের ব্যামো শুরু হয়েছে। বাঁচে কি না সন্দেহ।

রেবা। না বাঁচলে তো মেয়েদের আরো সুবিধে।

রানী। সে কি আমি বুঝিনে। সেইজন্যে আমার প্রাণে ভয় কোন দিন না ওরা ওদের ভাইদের ভাতে বিষ মেশায়! আমার বুকের ব্যথার কারণ তো শুনলে। এখন বলো দেখি এর কী দরকার ছিল। মুখপোড়া রাও কমিটি কেন আমার বাছাদের সর্বনাশ করে। শুধু কি আমার বাছাদের? দেশময় যত বাছা আছে—

সবিতা। বাছুর আছে—

নিভা। এই মেয়েটাই আমাকে নেড়ী বলেছে। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি। আমার বাছাদের বলছে বাছুর। আমি চললুম!

রানী। অমন যদি করো তো আমিও উঠে যাব, সবিতা।

সবিতা। কেন, আমি তো আপনাকে ময়রানী বলিনি, যেমন বলেছিলুম মিদনাপুরের ময়রানীকে।

রানী। ওমা! মিদনাপুরের ময়রানী বললে কাকে? মেদিনীপুরের মহারানীকে?

সবিতা। মহারানীরা যখন রাজমর্যাদা ভুলে সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান তখন আমরা তাঁদের মিষ্টি কথার মিষ্টান্ন খেয়ে বলি, আহা সাক্ষাৎ ময়রানী।

রানী। মহারাজারাও তো তাই করছেন দেখি। তাঁদের বেলা কী বলবে?

সবিতা। তাঁদের বলব ময়রা রাজা। সংক্ষেপে ময়রাজা।

নিভা। আর আমাদের স্বামীদের?

সবিতা। নেড়ীদের স্বামীদের কী বলা উচিত। নেড়া নিশ্চয়। কিন্তু সার হিমাংশু তো

শুনে লজ্জা পাবার পাত্র নন। তাঁর যে মাথাজোড়া টাক। আর সিন্দুকভরা টাকা। সার হিমাংশুকে আমরা বলব—থাক, বলে কাজ নেই।

শোভনা। অত কুণ্ঠা কেন? বলে ফেল।

সবিতা। সার হিমাংশুকে কিছু না বলাই ভালো, কিন্তু সার হর্ষবর্ধন ঘোষ হাজরাকে বলব, শ্বা হর্ষবর্ধন।

নিভা। তার মানে কী হলো? কোন দেশী শব্দ ওটা?

সবিতা। সংস্কৃত। শ্বাপদ হয়েছে ওর থেকে।

নিভা। কী! আমার স্বামী কুকুর!

সবিতা। তা আমি কী করব! শ্বা মানে কুকুর, কে না জানে।

নিভা। কিন্তু তুমি ছাড়া কে বলছে 'সার'কে 'শ্বা'?

রানী। মহারানীকে ময়রানী?

মেয়েরা। আমরা সকলে।

নিভা। আপনাদের সম্বর্ধনাসভা তা হলে এই রকমই হবে! এমনি অশ্রদ্ধার সঙ্গে!

সুলতা। না না, আমরা সত্যি আপনাকে মানপত্র দিতে চাই। আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন।

নিভা। রক্ষা করেছি মানে?

সুলতা। আমরা ভেবে দেখলুম যে পিতার সম্পত্তিতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার ভাইয়ের অর্ধেক নয়, ভাইয়ের সমান। আমরা যদি রাও কমিটির প্রস্তাব মেনে নিই তো অর্ধেক হারাব। সুতরাং ও প্রস্তাব যেমন আপনাদের চক্ষুঃশূল তেমনি আমাদেরও।

রানী। সববোনাশ! তোমরা তলে তলে এই ফন্দী এঁটেছ! আমাকে সভানেত্রী করে আমার বাছাদের আরো বঞ্চিত করবে!

সুলতা। আমরাও কি আপনাদের বাছা নই, রানীমা? আমরা কি আসমান থেকে নেমে এসেছি? এমন জানলে কে আপনাদের মেয়ে হয়ে জন্মাতে রাজী হতো?

রানী। না, তোমরাও আমাদেরই কোলের সন্তান। কিন্তু তোমাদের তো, মা, স্ত্রীধন দেওয়া হবে। তোমাদের কিসের অভাব! ওদিকে শ্বশুরকুলের সম্পত্তিও তো ভোগ করবে।

রেবা। আমরা প্রস্তাব করি এখন থেকে ছেলেদের স্বামীধন দেওয়া হোক! আর আমাদের দেওয়া হোক পিতার সম্পত্তির ষোলো আনা উত্তরাধিকার।

রানী। উঃ! আমার বুক গেল! আমি আর বাঁচবো না!

নিভা। আমি চললুম। আর এক মুহূর্ত সহ্য হয় না এই ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ।

(হেনকালে প্রবেশ করলেন শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবী, লেখিকা)

মেয়েরা। আসুন, মহাসতী দেবী, আ-সুন। আসুন, মহাসতী দেবী, আ-সুন।
মহাশ্বেতা। কিন্তু আমার নাম তো মহাসতী নয়।
সবিতা। কী! আপনি মহাসতী নন! শুনলি রে, শোভনা?
শোভনা। আমারও সেই সন্দেহ ছিল।
রেবা। তবে যে উনি সেদিন দু'হাজার লোকের সভায় দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ভারতনারীর সতীত্ব হবে অতীতের বস্তু—
সবিতা। অতীতের বস্তু! মহাভারতের নায়িকার নাম পাঞ্চালী। তাঁর পঞ্চপতি। তাঁর শাশুড়ীর নাম পৃথা। পৃথার পতি যদিও একটি সন্তানের পিতা চারটি। অতীতকে বর্তমান করা হোক।
মহাশ্বেতা। ছি ছি ছি! কেন আমাকে তোমরা এখানে ডাকলে!
সুলতা। জানেন না? আমরা যে লেডী মাসিমাকে সভা করে মানপত্র দিতে যাচ্ছি। আপনি দু'কথা না বললে জমবে কেন?
রেবা। আপনার নামই তো আমাদের বিজ্ঞাপন।
নীলা। বলতে গেলে আপনিই সে সভার হ্যামলেট। আপনাকে বাদ দিয়ে সভা হয় না।
সবিতা। এবারেও ওই রকম একটি মর্মভেদী উক্তি করে সব যুক্তির মূলে কুঠার হানবেন।
শোভনা। এবার বলবেন, আমার পরেই প্লাবন। ভারতে সতী বলে আর একজনও থাকবে না।
মহাশ্বেতা। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। দেশ দিন দিন কোথায় যাচ্ছে!
সুলতা। কিন্তু সতী মাসিমা, আপনি রাও কমিটির প্রস্তাব নাকচ করে আমাদের রক্ষা করেছেন। আপনি এক বিবাহের পক্ষপাতী নন, বহু বিবাহের পক্ষে। আমরাও এক বিবাহ চাইনে, বহু বিবাহ চাই। কুন্তী আর দ্রৌপদী আমাদের আদর্শ।
মহাশ্বেতা। শ্রীহরি! শ্রীহরি! মধুসূদন! গেল! গেল! হিন্দুত্ব গেল! ভারত গেল!
নিভা। আমি চললুম। আর এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশ নয়।
রানী। আমার কি চলার জো আছে? মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।
রেবা। ও কী! মানপত্র নিয়ে যাবেন না! আমরা সারা দিন বসে বসে মুসাবিদা করেছি। একটি বার শুনে যান।
নীলা। এক মিনিট বসতে অনুরোধ করি। একটা ফোটো তুলে নিই।
সুলতা। সত্যি তা হলে উঠলেন? বড় দুঃখ পেলুম আমরা।
মহাশ্বেতা। ওঃ কী লাঞ্ছনা! শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা! দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!
সবিতা। রাও কমিটি গেছে। আপদ গেছে। কিন্তু যা আসছে তার হাত থেকে উদ্ধার নেই।

মহাশ্বেতা। কী আসছে?

সবিতা। বায় কমিটি।

বানী। ওমা, ওটা আবাব কোন জন্তু।

সবিতা। দেখবেন, যদি বেঁচে থাকেন।

নিভা। শুনি একটু।

সবিতা। মেয়েদেব বহু বিবাহেব অধিকাব তো স্বীকাব কবা হবেই, ভাইদের সঙ্গে বোনদের সমান অধিকাব প্রতিষ্ঠা কবা হবে। আমরা অর্ধেক অংশ নেব না, সমান অংশ নেব। তাতে যদি ভাইদেব আপত্তি থাকে তাবা কিছু নগদ টাকা আব দানসামগ্রী নিয়ে বিয়ে কবতে পাবে।

মহাশ্বেতা। তাব আগে যেন আমাব মরণ হয়।

সবিতা। ষাট, ষাট, ও কী অলক্ষুণে কথা। আপনাকে শতায়ু হতে হবে, শতায়ু হয়ে স্বচক্ষে দেখে যেতে হবে যে ভাবত আবাব মহাভারত হয়েছে। কেবল কি মহাভাবত। শ্রীমদ্ ভাগবত। যাতে গোপীদেব বৃত্তান্ত আছে।

মহাশ্বেতা। প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং। বাবা বিশ্বেশ্বব। বাবা বৈদ্যনাথ।

নীলা। বাস। আমার ফোটো তোলা শেষ।

বানী। শেষ? কখন তোলা হলো? সতর্ক করে দিতে হয়।

শোভনা। ভালোই উঠবে, বানীমা। পোজ দিতে আপনাবা আজীবন অভ্যস্ত।

নিভা। য়্যাঁ। এটা কী বললে।

শোভনা। বলছিলুম সারাজীবন তো অভিনয় কবে কাটিয়ে দিলেন। এক একটি পৌবাণিক চরিত্র। মঞ্চেব বাইরে যে যুগ বদলে গেছে তা কি কেউ আপনাদের জানায়নি? একটু সতর্ক করে দেয়নি?

নিভা। কেন? আমরা কি কম আধুনিক? এব চেয়ে আপটুডেট সাজপোশাক তোমবা পাবে কোথায়?

বেবা। এটাও একটা অভিনয়েব মেকআপ।

মহাশ্বেতা। আব না। এবাব উঠতেই হলো। (তিনজনেই উঠলেন)

সুলতা। না, না, উঠতে দেব না। আগে মিষ্টিমুখ করুন। লেডী মাসিমাব জন্যে বিশুদ্ধ বিদেশী কেক আনিয়েছি। সতী মাসিমাব জন্যে পুরীর মহাপ্রসাদ। আর বানীমার জন্যে সবভাজা সরপুরিয়া।

য ব নি কা

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

হাওয়া বদল

বৈজয়ন্ত

তার স্ত্রী রাণু

তার স্ত্রীর বান্ধবী হেনা

তিন জনেরি বন্ধু শিশির

স্থান দার্জিলিং। ছোট একখানা বাড়ীর বিলিতী ধরনে সাজানো বসবার ঘর। কাল মধ্যাহ্ন। বৈজয়ন্ত তখনো ড্রেসিং গাউন পরে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছে। কত বেলা হয়েছে খেয়াল নেই। হেনা ততক্ষণ বাগানে ছিল। ফুলের তোড়া হাতে ঘরে ঢুকল।

হেনা। এই নাও।

বৈজু। বাঃ কী সুন্দর। [একটি রোডোডেনড্রন খুলে নিয়ে হেনার খোঁপায় গুঁজে দিল।]

হেনা। ছিঃ ও কী করছ। কেউ দেখলে কী মনে করবে।

বৈজু। সেই কথাই তো ভাবছি।

হেনা। ভাবছ ? কী ভাবছ ?

বৈজু। ভাবছি··ভাবছি··ভাবছি। ভাবনার কি আদি আছে না অন্ত আছে।

হেনা। শুনতে পাই ?

বৈজু। শুনবে ? ·শুনবে ? ·শুনতে কি ভালো লাগবে তোমার।

হেনা। খানিকটে শুনলে বলতে পারব ভালো লাগবে কি না।

বৈজু। ভাবছি—মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা। বারো বছর আগে আমি যখন বার্লিনে তখন ফিরে আসার প্যাসেজ জোটাতে পারিনে। অথচ ফিরে আসা আমার চাই। নইলে হিটলার যে কোনো দিন যুদ্ধ বাধাবে, আমাকে আটক করবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। বাবাকে চিঠি লিখি। তিনি বলেন তিনি ইনসলভেন্সী নিয়েছেন টাকা পাঠালে ধরা পড়বেন। আর টাকাই বা কে তাঁকে ধার দেবে। যারা দিতে পারত তারা মাল খরিদ করছে, চোরা বাজারে বেচবে।

হেনা। তখন ?

বৈজু। তখন রানু কেমন করে জানতে পায়। একটি কথা না বলে গা থেকে গয়না খুলে নিয়ে বন্ধক দেয়। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম বাবা পাঠিয়েছেন বেনামীতে। দেশে ফিরে এসে দেখি দেবী আমার নিরাভরণা। সেইজন্যেই তো ওকে এত ভালোবাসি।

হেনা। শুনে সুখী হলুম।

বৈজু। তার পর দেশে ফিরে এসে বন্ধক ছাড়িয়ে আনি। কিন্তু এমনি আমার বরাত। খনিতে হলো য়্যাকসিডেন্ট। অমন তো কত হয়। এঞ্জিনীয়ার জখম হয় কখনো। আমার বেলা যত রাজ্যের গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। যমে মানুষে টানাটানি। যমের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনল কে ? আমার সাবিত্রী। আমার রানু। সেইজন্যেই তো ওকে এত—

হেনা। ভালোবাসো। আনন্দ হয় শুনে।

বৈজু। কেন ? এই তো সেদিন। পানিবসন্ত হলো আমার। কী সেবাটাই না করল

রাহু। সামান্য পানিবসন্ত। সেবাটা কিন্তু রাজকীয়। যেন রাজার অসুখ। রাজযক্ষ্মা।

হেনা। ছিঃ অমন কথা মুখে আনতে নেই। তা ছাড়া যার উদ্দেশে এসব বলা হচ্ছে সে তো কান পেতে শুনছে না। সে এখনো বাড়ী ফেরেনি।

বৈজু। আরে না, না। তার কাছে আমার মুখ পুড়ে গেছে। কোন মুখে বলব! তোমাকেও কি বলতুম! তুমি জানতে চাইলে কী ভাবছি। তাই বলতে হলো।

হেনা। থাক, তোমার ভাবনা তোমারই থাক। রাহুর জন্যে তুলে রাখতে পারো।

বৈজু। হেনা, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কথাও ভাবছি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে এ কথা শেষ করে দিই।

হেনা। কী কথা?

বৈজু। বলছিলুম যার কাছে কৃতজ্ঞতায় মাথার চুল বিকিয়ে গেছে তার সঙ্গে—তার মতো দেবীর সঙ্গেও—কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে!

হেনা। বিশ্বাসঘাতকতা কি তুমি ঐ একজনের সঙ্গেই করেছ? আরেক জনের সঙ্গে করনি? ভেবে দ্যাখ। যে মুহূর্তে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সেই মুহূর্তে আমার সঙ্গেও করলে।

বৈজু। তাই কি?

হেনা। হাঁ, তাই। দূর থেকে তোমাকে পূজা করে এসেছিলুম এই দশ বৎসর। কোনো দিন জানাইনি। সেই অ্যাক্সিডেন্টের সময় প্রথম দেখা। আর কাউকে বিয়ে করিনি, করলে স্বামীকে ভালোবাসতে পারতুম না, অপরাধ হতো। কে চেয়েছিলো দার্জিলিং আসতে? কে চেয়েছিলো গ্যাংটক যেতে? আমি না। তবে কেন অমন অঘটন ঘটলে? কেন অমন অঘটনের সুযোগ নিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করলে? এখন আমি করি কী? কোথায় দাঁড়াই? যদি সন্তান আসে আমি তো তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না, ফেলে দিতে পারব না।

বৈজু। তা হলে তো আমি বর্তে যাই। তা হলে তো আমি নির্মল বিবেক নিয়ে তোমাকে বিয়ে করি। তখন আর এটা পাপ বলে মনে হবে না। এ আমার সন্তানলাভের হেতু।

হেনা। সন্তান চাও তুমি?

বৈজু। কে না চায়?

হেনা। সত্যি বলছ?

বৈজু। সত্যি সত্যি তিন সত্যি।

হেনা। রাহুর সন্তান হয়নি বলে তোমার মনে আফসোস্ ছিল?

বৈজু। খুব ছিল। তা বলে আমি আবার বিয়ে করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

হেনা। এখন না হয় তোমার সমস্যার সমাধান হলো। ওর সমস্যার সমাধান হবে কী করে? ও কি মা হতে চাইবে না? আমাকে বিয়ে করে তুমি কি ওর সন্তানলাভের হেতু হবে ভেবেছ?

বৈদ্য। তা-না-না-না-হাঁ-না।

হেনা। ওটা কি একটা উত্তর হলো? তোমার সামনে দুটিমাত্র পছন্দ। আমাকে যদি বিয়ে কর রাহুর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। এ গেল একটা।

বৈদ্য। আর একটা?

হেনা। আর একটা হচ্ছে আমাকে বিয়ে না করা। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বার হবে না। সন্তান যে আসবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, এলেও তোমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমি হাসপাতালের কাজ নিয়ে পাকিস্তানে চলে যাব, বিধবা বলে পরিচয় দেব। কেই বা আমার বিয়ের সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে? হিন্দুর বিয়েতে সার্টিফিকেট কোথায়?

বৈদ্য। কী ভীষণ দোটানায় ফেলেছ তুমি আমায়!

হেনা। তুমিও আমায়। তোমার যা শরীর তার জন্যে নিত্য হেফাজত চাই। রাহু এর কী জানে! সে তো পাশ-করা নার্স নয়। তাই কথায় কথায় আমাকে ডেকে পাঠায়। আমি পয়সা নিইনে। কী করে নিই! সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তার আপদে বিপদে আমি না দেখলে কে দেখবে। বেচারি সরল মানুষ। বোঝে না যে আরো একটা কারণ আছে। আমি আমি নিজের প্রিয়জনকে সারিয়ে তুলতে। বাঁচাতে। কোনো দিন কি স্বপ্নেও ভেবেছি এই আমার স্বামী হবে এক দিন! এখন মনে হবে স্বার্থের জন্যে করেছি।

বৈদ্য। হাঁ, তুমিও আমাকে ঋণের শিকলে বেঁধেছ। রাহু আমার সেবা করেছে, তুমি করেছ শুশ্রূষা। আরো কত বার তোমার শুশ্রূষার দরকার হবে কে জানে! যা শরীর আমার! একটা না একটা লেগেই আছে! ভাগ্যিস্ কিছু জমাতে পেরেছি। নেহাৎ যদি অকর্মণ্য হই তা হলে ইনভ্যালিড পেনসন তো পাবই। এবার শুধু যে হাওয়া বদলের জন্যে এখানে এসেছি তা নয়। শুনেছি আজকাল এখানে জলের দরে বাড়ী বিক্রী হচ্ছে। একখানা কিনে ফেলি। কী বলো!

হেনা। সে তুমি জানো আর তোমার রাহু জানে। আমার কপালে পাকিস্তান নাচছে। রণদা সাহার হাসপাতাল।

বৈদ্য। আচ্ছা, এবার তা হলে তোমাকে একটা গোপন কথা বলি।

হেনা। কী কথা?

বৈদ্য। ভালোবাসাটা একতরফা ছিল না।

হেনা। মানে রাহুর সঙ্গে তোমার ভালোবাসা ?

বৈজু। না গো না। হেনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা।

হেনা। এটা বানানো। তিন দিন আগেও আমি এর আঁচ পাইনি।

বৈজু। পাবে কী করে ? রাহু ছিল সব সময় সামনে বা কাছে।

হেনা। ওমা !

বৈজু। ও যে কী মনে করে তোমাকে আমার সঙ্গে গ্যাংটক যেতে দিল ওই জানে। বোধ হয় র‍্যাকসিডেন্টের ভয়ে। নিজে গেল না, পাহাড়ী পথে মোটরে ওর গা বমি বমি করে। সেইজন্তেই তো ও পাহাড়ে আসতে চায়নি। কিন্তু সস্তায় বাড়ী কেনার খেয়াল ওকেও পেয়ে বসেছে। এই ছাখ না, সকাল থেকে আজ বাড়ী দেখতে বেরিয়েছে। এত হাঁটতেও পারে। এর মধ্যেই ভাব করে ফেলেছে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে। গেল বছর রাস্তাঘাট ভেঙে যাবার পর থেকে তাঁরাও তো নিঃসঙ্গ।

হেনা। না, রাহুর মতো মেয়ে আর হয় না। এমন বধূ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। এখন আমার সমস্যা হচ্ছে কী বলে তোমায় ডাকি। আর তোমাকে বৈজুদা বলা যায় না। দাদার মতো বিশ্বাস রক্ষা করনি। যদি জানতুম এক দিন ঘটনাচক্রে একটা ভুল করে ফেলেছ তা হলে ক্ষমা করতুম হয়তো। কিন্তু তুমি বলছ তুমি আমাকে এত কাল ভালোবেসে এসেছ, শুধু জানাবার সুযোগ পাওনি।

বৈজু। কথাটা মিথ্যা নয়।

হেনা। অতি অদ্ভুত কথা! একই সঙ্গে দু'জনকে ভালোবাসবে। তাও বিবাহিত অবস্থায়! আচ্ছা, এই যে রাহু বেড়াতে বেরিয়েছে—আচ্ছা, ও যদি কোথাও রাত কাটিয়ে ফেরে তা হলে তুমি কী কর ?

বৈজু। কে! রাহু! সর্বনাশ!

হেনা। সর্বনাশ কেন ? তা হলেই যে ওর সন্তানসাধ মিটতে পারে। পাপ নয়। সন্তান-লাভের হেতু।

বৈজু। না, না। শুনতে চাইনে। চাইনে। ওঃ আমার হয়তো আবার একটা শক্ত অসুখ বাধবে। রাহু সারা রাত সারা দিন কাছে কাছে থাকবে, চোখে চোখে থাকবে। ওকে আমি বাইরে যেতে দেব না। দেব না।

হেনা। হয়েছে! এই তোমার ভালোবাসা! আমি জানতুম। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শুধু একটু মুখ বদলানোর জন্তে। হাওয়া বদল নয় তো, মুখ বদল।

বৈজু। ছি ছি! আমাকে তুমি এত ছোট ভাবলে! ভাবতে পারলে! সেদিন যা ঘটেছে সে কি শুধু কায়িক ঘটনা! মনের পরশ, হৃদয়ের ছোঁওয়া পাওনি তাতে! শ্রদ্ধার পরিচয়, সম্ভ্রমের পরিচয়!

হেনা। পেরেছি। সেইজন্যেই আমি ছোট হয়ে যাইনি। তোমাকেও ছোট মনে করিনি। ওটা আমাদের বিয়েই বটে। গান্ধর্ব মতে।

বৈজু। আমিও তাই বলি। তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী।

হেনা। তা হলে রাহু তোমার কী?

বৈজু। সেও তাই।

হেনা। রাহু আমার কী?

বৈজু। রাহু তোমার—

হেনা। বলো, বলো—

বৈজু। রাহু তোমার বন্ধু।

হেনা। রাহু আমার বন্ধু ছিল। এখন তা নয়। আবার বন্ধু হবে যদি আমাকে আমার স্বামী ছেড়ে দেয়।

বৈজু। তা কি কেউ পারে!

হেনা। তা হলে রাহু থাক তার স্বামী নিয়ে। আমি যাই আমার ভাগ্য নিয়ে।

বৈজু। হেনা, তুমি আমাকে ভালোবেসে এসেছ দশ বছর। কিন্তু বুঝতে পারলে না একদিনও। তুমি ভাবছ আমি একটা উভচর জীব।

হেনা। অবিকল তাই। তুমি লাখ কথার এক কথা বলেছ। উভচর। তোমার সমাজ আছে, সমাজের জন্যে একটি স্ত্রী চাই। তোমার শরীর আছে, শরীরের জন্যে একটি নার্স চাই। ওকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছ, আমাকে মন্ত্র দিয়ে মুগ্ধ করেছ।

বৈজু। তোমাকেও আমি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করব, হেনা। সমাজের চোখে তুমিও আমার স্ত্রীর মর্যাদা পাবে। তখন রাহুও বাধ্য হবে তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে দিতে।

হেনা। আমার সঙ্গে তুমি থাকলে রাহু থাকবে কার সঙ্গে। তাকে চোখে চোখে রাখবে কে?

বৈজু। সেটা একটা সমস্যা বটে। আমি দোটানায় পড়েছি। আমাকে সময় দাও ভাবতে।

হেনা। বেশ তো। নাও যত খুশি সময়। কিন্তু রাহুর অসাক্ষাতে আর আমার সঙ্গে মেলামেশা কোরো না। এই লুকোচুরি আমার দু'চক্ষের বিষ। এতে আমাকে ছোট করে। তোমাকেও।

বৈজু। হেনা—

হেনা। আমার হাত ছেড়ে দাও। আমি যাই। ছিঃ। তোমার লজ্জা করে না। দাও ছেড়ে আমাকে। ছেড়ে দাও, বলছি। তুমি কি ভেবেছ তোমার গায়ে জোর বেশি? ভুলে যাচ্ছ এখনো তুমি কনভ্যালেসেন্ট। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে জোরজার করিনে।

অত সহজে হার মানি। [কোলের কাছে বসল।]

বৈজু। হার আমার কাছে মানবে কেন ? মানবে প্রেমের কাছে।

[রাহুর প্রবেশ। হেনা তৎক্ষণাৎ সরে গেল]

রাহু। ওমা ! ও কী ! মানিকজোড় !

বৈজু। এই যে, রাহু, এসো। তোমার কথাই হচ্ছিল।

রাহু। আমার কথা নয়। প্রেমের কথা, বলো।

বৈজু। একই কথা। তুমিই আমার প্রেম।

রাহু। বটে। কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছি, বুঝে উঠতে পারছিনে কী ব্যাপার। কেন এমন অর্থপূর্ণ ভাবে এরা তাকায় ! কী আছে এদের মনে ! ষোলো বছরের স্বামী, বিশ বছরের সখী। এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে পারে কখনো। খারাপ দিকটা সব প্রথমে মাথায় আসে না। মাথায় ঢোকে সব শেষে। পাঁচ মিনিট আগেও বুঝতে পারিনি।

বৈজু। তা বলে ওই নিয়ে মাথা খারাপ কোরো না, লক্ষ্মীটি। সন্দেহ থেকে এ জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। তোমার তো কথায় কথায় সন্দেহ।

রাহু। সন্দেহ কি সাধে করি ! করতে ভালো লাগে আমার ! সন্দেহ করি, সন্দেহ করি বলে বার বার খোঁচাতে। তাই ভাবলুম প্রমাণ করে দেখাব যে আমি সন্দেহপরায়ণ নই, আমি বিশ্বাসপরায়ণ। আমি আমার স্বামীকে বিশ্বাস করে পরের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। নইলে আমার এমন কী দায় পড়েছিল সারা সকালটা গোরু খোঁজার মতো করে বাড়ী খোঁজার ! এখন হলো তো ! বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলে তো !

বৈজু। আচ্ছা, শালীর সঙ্গে দুটো রসের কথা কেউ বলে না ? এটা এমন কী একটা নতুন কথা হলো ! তোমার বোনদের নিয়ে কত রঙ্গরস করেছি। ভুলে গেলে ?

রাহু। হেনা কবে থেকে তোমার শালী হলো ? এইটেই একটা নতুন কথা। ওরে হেনা, তুই কি ওঁর শালী হয়েছিস্ ?

হেনা। না, রাহু, আমি ওঁর গান্ধর্ব বিবাহের পত্নী।

রাহু। কী। কী ! কী বললি ! ও: ! ও: ! এতক্ষণে মালুম হলো ! [গড়িয়ে পড়ল।]

বৈজু। ধরো, ধরো। মানুষটা মারা যাবে। যাও, যাও, জল নিয়ে এসো। [হেনা গেল।]

রাহু। হা ভগবান ! [প্রায় মূর্ছা যাবার মতো।]

[বাইরে থেকে]

শিশির। ওহে বৈজু। বাড়ী আছ হে ! ওহে বৈজু। অত গোলমাল কিসের ?

[ব্যাগ হাতে শিশিরের প্রবেশ]

শিশির। কী ! হয়েছে কী ! ফিটের ব্যারাম তো ওর ছিল না। এখানে এসে হয়েছে

বুঝি! দেখি ওর নাড়ীটা দেখি। না, ও কিছু নয়। রাহু, এই ছাখ, আমি এসেছি। শিশিরদা। অনেক নতুন গান এনেছি তোর জন্তে। পাড়া কাঁপিয়ে গাইব। শেষকালে ল্যাণ্ডস্লিপ না হয়!

[হেনা জল নিয়ে এলো। কয়েকটা ওষুধ।]

রাহু। শিশিরদা, আমি বাঁচব না।

শিশির। আমি তোকে গান দিয়ে বাঁচাব।

রাহু। না, না, আমি বাঁচব না। বাঁচব না, শিশিরদা। আমি বেঁচে থাকতে এদের বিয়ে হবে না। এদের বিয়ে দিয়ো, শিশিরদা। গান্ধর্ব বিবাহ তো সমাজে চলে না।

শিশির। ও কী। ও কী বলছিস্, রাহু। বৈজু, হেনা, এসব কী শুনছি রে!

বৈজু। আমাকে ক্ষমা করো, রাহু।

হেনা। আমার কি ক্ষমা আছে! আমাকে বিদায় দে, রাহু!

রাহু। হেনা, আমি চলে গেলেও সংসার চলবে, কিন্তু তুই চলে গেলে অচল হবে, ভাই। তুই থাক। আমি যাই।

হেনা। তা কি হয়। তোর সুখের সংসার ধ্বংস করে কার সংসার সচল রাখব আমি! আমি যাই, তৈরি হই। ছুটোর সময় শিলিগুড়ির মোটর। [হেনার প্রস্থান।]

বৈজু। আরে আরে। তুমি চললে নাকি। শোন, শোন। [বৈজুর প্রস্থান।]

শিশির। কী হয়েছে, রাহু? আমার কাছে লুকোস্‌নে। ডাক্তারের কাছে রোগ লুকোতে নেই। আমি মনের ডাক্তার। তা তো জানিস্।

রাহু। আমি কি সব কথা জানি। হাওয়া বদলের জন্যে যখন পাহাড়ে আসা স্থির হয় উনি বললেন একা আসবেন। আমি বললুম তুমি এখনো কনভ্যালেসেণ্ট। তোমার সঙ্গে একজনের যাওয়া দরকার। আমি যাব। বললেন, আমাকে তোমার এত সন্দেহ কেন? লেপচা সুন্দরীরা আমার মনোহরণ করবে বলে? এ রকম কথা এই প্রথম নয়, শুনে শুনে বিরক্তি ধরেছিল। আমার জানাশুনার মধ্যে সব চেয়ে নিরাপদ মেয়ে ছিল হেনা। দেখতে ভালো নয়। সেইজন্তে বত্রিশ বছর বয়সেও বিয়ে হয়নি। অতি সৎস্বভাব। ছেলেবেলা থেকে আমার বন্ধু। নার্সের কাজ করে। ওটা অবশ্য শখ। হেনাকেই বললুম আমাদের সঙ্গে চেঞ্জে আসতে। তারও চেঞ্জের দরকার ছিল। এখানে আসার পর কর্তার কী এক খেয়াল চাপল। বাড়ী কিনবেন। ওঁকে তা বলে বেরোতে দেওয়া যায় না। আমিই বাড়ী দেখে বেড়াই। উনি থাকেন নার্সের জিম্মা। কোনো দিন যদি বাড়ী দেখা বন্ধ রাখি অমনি শুনিয়ে দেন, এত সন্দেহ কেন?

শিশির। হুঁ! তার পর?

রাহু। একটু শক্তি ফিরে পেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন সিকিম বেড়িয়ে আসবেন। এক

দিনের যাতায়াত। আমার বদ্যি পায় চড়াই উৎরাই করতে—মোটরে। কী করে সঙ্গে যাই? কী করেই বা একা যেতে দিই! বলে বসলেন, এত সন্দেহ কেন? সিকিমী মেয়েরা সুন্দরী বলে? শুনে আমার মাথা বিগড়ে গেল। মহত্ব দেখাবার জন্যে হেনাকে সঙ্গে দিলুম। পথের মধ্যে অসুখ করলে নার্স চাই তো। হেনা ওজর আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারছি ওটা অভিনয়। উনিও মন্দ অভিনয় করেননি। আহা, তখন যদি টের পেতুম। আমার কুষ্ঠীতে লিখেছে পশ্চাদ্‌বুদ্ধি।

শিশির। তার পর?

রাণু। গ্যাংটক থেকে সন্ধ্যাবেলা এদের ফেরার কথা। তার এলো, ধস নেমে রাস্তা বন্ধ। কী দুর্ভাবনায় যে রাতটা কাটল আমার! কিন্তু সব রকম দুঃসম্ভাবনার কথা ভাবলেও সব চেয়ে খারাপটা আমি ভাবিনি, ভাবতেই পারিনি। পরের দিন ওরা ফিরল ঠিকই। কিন্তু যাবার সময় যে চেহারা নিয়ে গেছল ফেরবার সময় সে চেহারা নিয়ে ফেরেনি। কেমন একটা লাজুক লাজুক ভীতু ভীতু ভাব। চোরা চাউনি চোখে। উত্তেজিত ভাবে কথা বলে। কথার তোড়ে চাপা দিতে চায় কী এক রহস্য। আমার কল্পনার দৌড় বেশি দূর নয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি। সব চেয়ে যেটা কুৎসিত সেটা কিন্তু আমার মাথায় ঢোকে না। তোমার আসার একটু আগে হেনা মুখ ফুটে স্বীকার করল ওদের গান্ধর্ব বিবাহ হয়েছে। তা শুনে আমি মনে মনে বললুম, মা ধরণী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে আশ্রয় নিয়ে বাঁচি। কেন আমাকে বাঁচাতে এলে, শিশিরদা! [কান্না।]

শিশির। কাঁদিস্‌নে, বোন। শান্ত হ। আমি যখন এসে পড়েছি উপায় একটা হবেই। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেলে আমার হোটেলে নিয়ে যাব তোকে। আমার জিনিসপত্তর পড়ে আছে হোটেলে। ভেবেছিলুম স্নান আহার সেরে আসব, সারা দিন থাকব তোদের সঙ্গে, কিন্তু শুনলুম রান্নার দেরি আছে। চলে এলুম গানের স্বরলিপি-গুলো দিয়ে যেতে। দশ মিনিটের জন্যে আসা। তা দেখছি আমি দৈবপ্রেরিত। আমাকে একটু চিন্তা করতে দে। হুঁ। হুঁ।

রাণু। তুমি যেয়ো না, শিশিরদা। তোমার সব ব্যবস্থা এইখানেই করছি।

শিশির। হুঁ। হুঁ। আচ্ছা, তুই যা। ব্যবস্থা কর। বৈজু, বৈজু কোথায় গেলে হে?

[রাণুর প্রস্থান। বৈজুর প্রবেশ]

বৈজু। আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলুম, শিশির। আসতে ভরসা পাচ্ছিলুম না।

শিশির। হেনা কোথায়? চলে গেছে না আছে?

বৈজু। চলে যাচ্ছিল। অনেক করে বুঝিয়ে বলায় খাওয়া দাওয়া করতে রাজী হয়েছে। বৈজু। কিছুই স্থির করতে পারছিনে। রাণু যা বলেছে শুনেছ তো সব। দোষটা

আমারই। হেনার নয়। আমি ওর অসহায়তার সুযোগ নিয়েছি। এখন আমি যদি ওকে বিয়ে না করি ওর বিয়ে হবে না কোনো দিন, অথচ—কে জানে হয়তো ওর সন্তান হবে। মানে আমারই সন্তান। বলো, শিশির, কী আমার কর্তব্য? ত্যাগ করা সোজা, পাশে দাঁড়ানো কঠিন।

শিশির। কিন্তু কেন এমন হলো? হেনার অসহায়তার সুযোগ নেবার আগে ভেবে দেখলে না কেন? তুমি তো ছেলে-মানুষ নও, তোমার বয়স হলো প্রায় চল্লিশ।

বৈজু। কী করব, বলো। মানুষ কি সব সময় সব দিক ভেবে কাজ করে? তোমাকে বলিনি, আমি নিজে জানতুম না, হেনা আমাকে দশ বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে, আমাকে ভালোবাসে বলে অপরকে বিয়ে করেনি। আমিও কয়েক বছর হলো তার অনুরাগী। সে তার আত্মীয়ের মতো শুশ্রূষা করে এসেছে আমার। আমিও তার শুশ্রূষা নিয়ে এসেছি আত্মীয়ার মতো। এই যাদের ভিতরকার সম্পর্ক তাদের পাহারা দিয়ে দিয়ে তুমি কতকাল আগলাবে! তুমি তো জানো, ওর দাদা ডাক্তার, ওদের অবস্থা ভালো। বিয়ে করতে রাজী হলে কবে বিয়ে হয়ে যেত, আমার চেয়ে কত যোগ্য পাত্র জুটত! ও যদি আমার জন্যে দশ বছর ধরে তপস্যা করে থাকে ওর তপস্যার কি কোনো ফল নেই? আর আমি! আমার কি সব সাধ মিটেছে? রানু কি আমার পিতৃত্বের সাধ মিটিয়েছে?

শিশির। হুঁ। তা তুমি যখন সমস্ত জেনেশুনে এ কাজটি করেছ তখন তুমিই প্রস্তাব করো তুমি কী করতে চাও, আমি রানুকে বলে দেখি। হেনাকেও। আমার নিজের যদি কোনো প্রস্তাব থাকে সেটা পরের কথা। সেটা সব শেষে।

বৈজু। হেনাকে আমি বিয়ে করতে চাই, শিশির।

শিশির। হেনা রাজী হবে তো?

বৈজু। হেনা রাজী হবে যদি আমি রানুর কাছে ফিরে না যাই।

শিশির। তাতে রানু কেন রাজী হবে?

বৈজু। রাজী না হলে আমাকে ডাইভোর্স করতে পারে। আমি বাধা দেব না।

শিশির। কিন্তু হিন্দুবিবাহে তার ব্যবস্থা থাকলে তো?

বৈজু। জানি। তার জন্যে কি আমি দায়ী? না হেনা দায়ী? হিন্দু আইন তো আমাদের বিবাহের অন্তরায় নয়। অন্তরায় একালের শিক্ষিত লোকের ন্যায়বোধ। তারা কেন বুঝেও বুঝছে না যে রানুর প্রতি যদি অবিচার হয়ে থাকে তবে তার প্রতিকার হেনার প্রতি অবিচার নয়। বরং রানুকে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারদান।

শিশির। হিন্দুবিবাহ সেকালে রানুকেও একটা অধিকার দিয়েছিল, বৈজু। একালে সেটা কেড়ে নেওয়া হয়নি, তবে অপ্রচলিত রয়েছে। কে জানে হয়তো রানুই আবার সেটা চালু করে দেবে।

বৈজু। কী। কী অধিকার!

শিশির। রাত্নুর বিয়ের পর ষোলো বছর কেটে গেল, এখনো সন্তান হলো না। কুন্তী বা মাত্রী হলে কি এত দিন ধৈর্য ধরতেন! এত দিনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে অপর কোনো পুরুষের সঙ্গে নিয়োগ সূত্রে মিলিত হতেন। তা তোমারও তো অনুমতি আছে বলে ধরে নিতে পারি। কী বলো, বৈজু!

বৈজু। না—না—না—না, আমার অনুমতি আছে কবে বললুম, শিশির? কে বলেছে তোমায়? রাত্নু?

শিশির। না, রাত্নু কেন বলবে? আমিই বলছি। বিবাহবিচ্ছেদ যাঁরা অনুমোদন করেননি সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিরা অনুরূপ অবস্থায় যে বিধান দিয়ে গেছেন সেটি হিন্দুসমাজে আবার চালু করতে হবে, নইলে রাত্নুর মতো সতী স্ত্রীরাই অবিচারে ভুগবে। তাদের মাতৃত্বের সাধ মেটাবে কে?

বৈজু। আচ্ছা, আমি রাত্নুকেও মাঝে মাঝে সঙ্গ দেব। তাতে যদি তার মা হবার সাধ মেটে।

শিশির। এখন এই চমৎকার প্রস্তাবটা একবার ওঘরে গিয়ে রাত্নুকে শুনিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ হেনার সঙ্গে কথা বলি।

বৈজু। বেশ। [প্রস্থান]

শিশির। হেনা কোথায় গেলি রে? কেউ কি আমাকে চা এক পেয়ালা দেবে না? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে। [হেনার প্রবেশ।]

হেনা। শিশিরদা, ডাকছিলে?

শিশির। হাঁ, ডাকছিলুম। আয়। চা কি কফি কিছু একটা দিতে হয় অতিথিকে। ভুলে গেলি?

হেনা। আমি তো এ বাড়ীর কেউ নই। আমি কে যে আমাকে বলছ!

শিশির। ওটা অভিমানের কথা হলো।

হেনা। কেন অভিমান করব না? আমার কি কোনো দাবী নেই? আমি কি কেউ নই?

শিশির। তুই কে?

হেনা। কেন? তা কি তুমি জান না? আমি শকুন্তলা।

শিশির। শকুন্তলারই মতো দশা হবে তোর।

হেনা। আমি তার জন্যে প্রস্তুত, শিশিরদা। আমি পাকিস্তানে গিয়ে হাসপাতালের কাজ নেব।

শিশির। তোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কিন্তু কথা বলছিস্ অর্বাচীনের মতো। আর একটি নারীর অভিশাপ কুড়িয়ে কী করে মঙ্গল হবে তোর! যাবার আগে ওর আশীর্বাদ নিয়ে

যা। ও তোর বাল্যসখী। তোকে সব চেয়ে বিশ্বাস করত, এই একটু আগেও।

হেনা। [কেঁদে] ওর কাছে মুখ দেখাতে পারব না, শিশিরদা। ও কি কোনো দিন আমাকে ক্ষমা করবে! পারে কেউ! আমি হলে পারতুম! ভবিষ্যতেও কি পারব এই লোকটি যদি আমাকে বিয়ে করে আবার ওর কাছে যায়!

শিশির। আচ্ছা, হেনা, তুইই বল এখন রাত্নুর কী কর্তব্য।

হেনা। আমি কী করে বলব? মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। নিজেকে নিয়ে আমি বিব্রত। না খেয়েই আমি চলে যাচ্ছিলুম। উনি আটকালেন। খাওয়া দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়ব। ট্যাক্সিতে।

শিশির। অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না। রাত্নু তোর বাল্যসখী। ওর কাছে সমস্ত খুলে বল।

হেনা। এ কি কাউকে বলতে পারে কেউ! আমার কি লজ্জা নেই! না তোমার বিশ্বাস তাও আমার গেছে! আমাকে তুমি কী মনে করেছ, শিশিরদা? আমি ঘৃণ্য! আমি পাপী! না?

শিশির। না, তেমন কিছু মনে করিনি। তোর কী দোষ! বৈজু দায়ী।

হেনা। তুমি ওঁর ওপর অবিচার করছ উনি পুরুষ বলে।

শিশির। তা হলে সুবিচারটা কী? কেউ দায়ী নয়? প্রকৃতির পরিহাস?

হেনা। নিয়তির। নইলে গ্যাংটক যাওয়া হবে কেন? পাহাড় ধ্বসবে কেন? ডাকবাংলায় একখানিমাত্র ঘর জুটবে কেন? কম্বলের অভাবে হাত পা জমে আসবে কেন? উত্তাপের জন্যে পাশাপাশি শুতে হবে কেন? [কেঁদে ফেলল]

শিশির। বুঝেছি। এখন কিসে মঙ্গল হবে সেইটেই ভাবতে হবে। কিসে সকলের মঙ্গল।

হেনা। আমার দাবী আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু কে জানে যদি কিছু হয় তা হলে তার দাবী সে কেন ছাড়বে? সে কি জানতে চাইবে না তার বাপ কে?

শিশির। হুঁ। ঘোরালো ব্যাপার। কেবল তিনজনের নয়, আরো একজনের মঙ্গল কিসে হবে।

হেনা। আমি তা হলে আসি, শিশিরদা। যাবার আগে দেখা করে যাব। [প্রস্থান]

শিশির। আমিও একবার ঘুরে আসি হোটেলে খবর দিয়ে। শুনছ হে, বৈজু?

[বৈজুর প্রবেশ]

বৈজু। যাচ্ছ? খাবে না এখানে?

শিশির। না, খাবার সময় তোমাদের দুজনের নিরিবিলি থাকা দরকার। তোমার আর রাত্নুর। হেনার খাবার অন্য ঘরে—তার নিজের ঘরে—দিতে বলো। আমি ফিরে এসে আমার মীমাংসা জানাব। [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেই দিন। বেলা দেড়টা। শোবার ঘরে রাত্নু
শুয়ে আছে। বৈজু তার পায়ের কাছে বসেছে।]

বৈজু। আমাকে বিশ্বাস করো। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি ইচ্ছা করে তোমাকে ঠকাইনি। সব কথা শুনলে—

রাত্নু। শুনতে চাইনে। চাইনে শুনতে। ইল্লৎ ঘাঁটতে।

বৈজু। কে জানে এই হয়তো আমাদের শেষ দেখা।

রাত্নু। কেন? শেষ দেখা কেন?

বৈজু। হেনা চলে যাচ্ছে। আমিও চলে যাচ্ছি তার সঙ্গে।

রাত্নু। আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তুমি। আমি কী অপরাধ করেছি যে আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে। [কান্না।]

বৈজু। কোনো অপরাধ করনি তুমি। কিন্তু একজন কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে, আরেকজন যে তাকে কলঙ্কিত করেছে সে সাধু সেজে সমাজের সম্মানভাগী হবে, এটা কি ন্যায় না ধর্ম। এর পরে কি আমার শরীর সারবে ভেবেছ? শুশ্রূষা করবে কে? হেনা থাকলে তো?

রাত্নু। তোমার মনের ইচ্ছা যদি তাই হয় তবে তাই হোক। হেনাও থাকুক, তুমিও থাক। শুধু আমাকে অনুমতি দাও, আমি যাই।

বৈজু। তুমি যাবে কোথায়?

রাত্নু। যেদিকে দু'চোখ যায়। মনে কোরো না যে আমি পাশটাশ করিনি বলে একান্ত অসহায়। গান তো শিখেছি। শেখাতে পারব না?

বৈজু। পাগল যাকে বলে। গান শিখিয়ে ক'টাই বা টাকা মিলবে। তাতে তোমার কুলোবে?

রাত্নু। বলা যায় না। তোমার যেমন নার্স দেখলে অসুখ করে আর কারুর তেমনি গায়িকা দেখলে গান শেখার বাতিক জন্মায় হয়তো।

বৈজু। অ্যাঁ। আছে নাকি তেমন লোক তোমার সন্ধানে। রাত্নু, সত্যি বলো। কে সে?

রাত্নু। কী করে জানব। নিজেই জানিনে। বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখব।

বৈজু। ওঃ। তামাশা করছিলে? না, না, তোমার গান শিখিয়ে কাজ নেই।

রাত্নু। আগে তো যাই, তার পরে ভেবে দেখব তোমার হিতোপদেশ।

বৈজু। না, রাত্নু। যেয়ো না। তোমার জন্যে আমার অন্য প্ল্যান আছে। দার্জিলিঙে

তোমার জন্তে বাড়ী কিনে দেব। মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাব। বাগান করবে। দার্জিলিং তো ফুলের রাজ্য। আনন্দে থাকবে।

রান্থ। অর্থাৎ তোমার বাগানবাড়ীতে রক্ষিতার মতো বাস করব।

বৈজু। ছিঃ। অমন কথা বলতে নেই। তুমি আমার সহধর্মিণী।

রান্থ। তা হলে হেনা তোমার কে?

বৈজু। হেনা? কী করে বোঝাব? এটা এমন একটা দুর্বার আকর্ষণ! একটা বিপরীত আকর্ষণ!

রান্থ। হঠাৎ এ বয়সে বিপরীত আকর্ষণ কেন? আমি তোমার সন্তানকামনা মেটাতে পারিনি। কী করে এতটা নিশ্চিত হলে যে হেনা পারবে?

বৈজু। য়্যাঁ! তাই তো। তাই তো।

রান্থ। ধরো, ষোলো বছর পরে যদি দেখ সেও আমারই মতো অক্ষম তখন কী করবে? আর একটি বিয়ে? আর একটা বাগানবাড়ী?

বৈজু। না, তা কি হয়! তা কি আমি পারি!

রান্থ। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে অক্ষমতাটা আমার নয়, তোমার নিজের? এই ষোলো বছর তুমিই আমাকে সন্তানসুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ!

বৈজু। য়্যাঁ! বল কী! বল কী! আমি! আমি অক্ষম!

রান্থ। কে জানে তুমি কি আমি! কিংবা কেউ নয়। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয়নি। হলে তোমারও মনস্কামনা পুরত। আমারও।

বৈজু। রান্থ, আমার মাথা ঘুরছে। থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমি মানছি তোমার কথাই সত্য।

রান্থ। তা হলে যেতে দাও আমাকে। আমি জানি হেনা তোমাকে হতাশ করবে এক দিন। সে দিন তুমি আবার আমার কাছে আসতে চাইবে। সেইজন্তে আমাকে হাতে রাখতে চাও। কিন্তু তোমার ও-প্ল্যান আমি উলটে দেব। তুমি আমাকে সন্তানসুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলে, এখন স্বামীসুখ থেকেও বঞ্চিত করলে। এর পরে তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! কেন মাসোহারা নেব!

বৈজু। রান্থ, রান্থ, লক্ষ্মীটি। ভুল বুঝো না আমাকে। আমি নেহাৎ হতভাগা। কৃপার পাত্র। কিন্তু আমি ইমানদার। হেনার যে ক্ষতি করেছি তার পূরণ করতে হবে আমাকে।

রান্থ। আর আমার যে ক্ষতি করেছ তার পূরণ করতে হবে না?

বৈজু। কিন্তু রান্থ, ইচ্ছা করে কি আমি অবিশ্বাসী হয়েছি? আমাকে বলতে দাও সব কথা।

রাত্নু। আমি জানি তুমি কী বলবে। পাহাড়ের ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ। মোটর ফিরে গেল গ্যাংটক। ডাকবাংলায় একখানিমাত্র ঘর খালি ছিল। সঙ্গে কম্বল ছিল না। শীতে হাত পা হিম হয়ে যাচ্ছিল। উত্তাপের জন্যে—যাক। ওসব কথা মুখে আনতে ঘেন্না করে। মনে আনতেও।

বৈজু কী করে জানলে বলো তো? তুমি কি সর্বজ্ঞ? রাত্নু, আমাকে ক্ষমা করো।

রাত্নু। ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু ভুলতে পারব না। তুমি হলে আমাকে ক্ষমাও করতে না। সরাসরি ত্যাগ করতে।

বৈজু। তা না—না—না। তবে কিনা—

রাত্নু। থাক, আর ভণ্ডামি করতে হবে না। আমি ক্ষমা করলুম। এর পরে তুমি মনস্থির করো থাকবে না যাবে।

বৈজু। থাকতে পারি যদি হেনাও থাকে।

রাত্নু। বেশ তো, হেনাও থাকুক না। কিন্তু দ্বিতীয় বার এমন ঘটনা ঘটবে না এ কথা শপথ করে বলতে পারো?

বৈজু। হেনা যদি শপথ করে আমিও করব।

রাত্নু। তা হলে ডাক হেনাকে। ওর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

[বৈজুর প্রস্থান। হেনার প্রবেশ।]

হেনা। আমাকে ডেকেছিস?

রাত্নু। বোস। কথা আছে।

হেনা। কী কথা, রাত্নু?

রাত্নু। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বারো বছর বয়স থেকে। তোর মতো বন্ধু আমার কেউ নেই। মানে তিন দিন আগেও ছিল না। বিপদে আপদে কত বার তোর সাহায্য চেয়েছি, চাইতে না চাইতে পেয়েছি। যখনি ডেকেছি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিস্। কী নিস্‌নি। তোর কাছে আমার ঋণ জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। সেই পাহাড় কি শেষে ধ্বস হয়ে নামল আমার কপালে। ঋণের দায়ে আমার স্বামীসুদ্ধ বিকিয়ে গেল।

[কান্না।]

হেনা। আমাকে বিশ্বাস কর, রাত্নু। সাহায্য যাকে বলছিস্ সে আমি নিঃস্বার্থ ভাবে করেছি। নিষ্কাম ভাবে কোনো দিন তার বদলে কিছু চাইনি, নিইনি। কাবুলীর মতো এক দিন সমূলে আদায় করব এমন কোনো অভিসন্ধি আমার ছিল না, এখনো নেই। আমি আমার ভাগ্য নিয়ে আজ একটু পরে চলে যাচ্ছি, আর কাউকে সঙ্গে নিতে চাইনে। তোর স্বামী তোর কাছেই থাক।

রাত্নু। অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুই যাবি কেন? আমিই যাচ্ছি। আমি একা।

হেনা। কী মুশকিল! তুই যাবি কোন অপরাধে! অপরাধ যার সেই যাবে। তার দ্বীপান্তর।

রাহু। হেনা, তোর সঙ্গে ঝগড়া করা আমার সাজে না। আমি সত্যি ঋণী।

হেনা। বন্ধু কি বন্ধুর কাছে ঋণী হয় কখনো? তুই যে ও কথা বলতে পারলি এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তুই আর আমাকে বন্ধু ভাবিস্‌নে। আমি তোর শত্রু। না রে?

রাহু। তুই যদি আমার অবস্থায় পড়তিস্ আর আমি পড়তুম তোর অবস্থায় তা হলে কী ভাবতিস্?

হেনা। বুঝি তোর কষ্ট। কিন্তু বিশ্বাস কর, যা ঘটেছে তা আমার ইচ্ছায় ঘটেনি। কার ইচ্ছায় ঘটেছে তাও ঠিক জানিনে। কেমন করে যে কী হয়ে গেল। দেখতে দেখতে গাড়ীচাপা পড়ার মতো। রাহু, এটাও একটা অ্যাকসিডেন্ট। তবে এর সাজা আছে। আমি সাজার জন্যে তৈরি।

রাহু। আচ্ছা, হেনা, আমি তোকে ক্ষমা করছি। কিন্তু তুই আমাকে কথা দে আর অমন কোনো অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে না। তা হলে তুই যেমন ছিলি তেমনি থাকতে পাববি। যেতে হবে না তোকে বা তাকে বা আমাকে। বিশ্বাস ফিরে আসবে আবার। বন্ধুতাও।

হেনা। রাহু, আমার সাধ্য থাকলে আমি কথা দিতুম, নিশ্চয় দিতুম। কিন্তু যে নারী প্রেমে পড়েছে তার সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে। দশ বছর কি বড় কম সময়! যৌবনের সবটাই তো গেল প্রতীক্ষায়। আর ক'টা দিন বাকী আছে, বল। জানি তোর উপর অন্যায় করা হচ্ছে। কিন্তু সে কি আমার দোষ, না প্রেমের দোষ! প্রেম যে অন্ধ!

রাহু। সত্যি ভালোবাসিস্?

হেনা। ভালোবাসিনে? কিসের আকর্ষণে আসি তোর বাড়ীতে? কেন শুশ্রূষা করি বিনি পয়সায়? বন্ধুত্বের খাতিরে? বন্ধুত্ব কি একতরফা হয়? তুই ক'বার গেছিস আমার বাড়ী? ক'বার হাত বুলিয়ে দিয়েছিস আমার গায়ে, আমার মায়ের পায়ে?

রাহু। ভালোবাসতিস্? সত্যি?

হেনা। ভালোবাসা কথায় বোঝানো যায় না। বোঝাতে হয় কাজে।

রাহু। ভালোবাসতিস? সত্যি? এ যে বিশ্বাস হয় না, হেনা।

হেনা। বিশ্বাস করা না করা তোর মর্জি। বিয়ে করলে লোকে অধিকারসচেতন হয়। কেবলি ভাবে আমিই অধিকারী। আমি ভালোবাসছি কি না তাতে কিছু আসে যায় না। আর কেউ ভালোবাসলেই সেটা হয় অনধিকারচর্চা। তাই অবিশ্বাস্য।

রাহু। অধিকারসচেতন হয় সেটা ঠিক। কিন্তু কর্তব্যসচেতনও তো হয়। আমি কি কোনো দিন কর্তব্যে হেলা করেছি? ভালোবাসার কমতি করেছি কোনো দিন?

হেনা। না, সে কথা আমি বলব না। আমি বলব তোর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে এটা

তোকে একটা অধিকার দিয়েছে, আমাকে দেয়নি। বিয়ে না হয়ে থাকলে তুই হয়তো ওকে ভালোই বাসতিসনে। আমি কিন্তু ওকে সমানে ভালোবাসতুম। অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন বাদ দিয়ে ভাবতে পারবি ? পারলে দেখবি তোর ভালোবাসা নিখাদ নয়। আমার ভালোবাসা নিখাদ।

রাহু। আমি বিশ্বাসই করব না যে তুই ভালোবাসতিস্।

হেনা। কি করে করবি। তা হলে তোর দাবী দুর্বল হয়ে যায় যে। তুই ওর স্বত্বাধিকারী। তোর সর্বস্বত্বসংরক্ষিত। তোর ধারণা আমি যা নিয়েছি চুরি করে নিয়েছি বা জোর করে নিয়েছি। ভালোবাসা দিয়ে নিইনি।

রাহু। এ বিশ্বাস শুধু আমার নয়। প্রত্যেক স্ত্রীর। তোরও, যদি বিয়ে হয়ে থাকত তোর।

হেনা। বিয়ের সম্বন্ধ অনেক বার এসেছে। বিয়ে করব না বলে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখনো কি করতে চাই ? যদি করি সন্তানের মুখ চেয়ে করব। যদি সন্তানের আগমনী শুনি।

রাহু। তার জন্যে দ্বিতীয় বার অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো ? কথা দে।

হেনা। না, আর অ্যাকসিডেন্ট নয়। কিন্তু বিয়ে যদি এক বার হয় তার পরে আমার অধিকার আমিও বুঝে নিতে জানি। যেমন করে পারিস বিয়ে বন্ধ কর।

রাহু। এটা তোর মনের কথা তো ?

হেনা। হ্যাঁ, রাহু। আমার মনের কথা। তুই ওকে পাগলা গারদে পাঠাতে পারিস, জেলখানায় পুরতে পারিস, ঘরে রেখে নজরবন্দী করতে পারিস, যেটা তোর খুশি। কিন্তু এক বার যদি ও ছাড়া পেয়ে আমাকে তাড়া করে তা হলে বিয়ে ঠেকানো আমার সাধ্য নয়, তোরও না।

রাহু। বিয়ের পরে কী হবে তার জন্যে আমি ভাবিনে, কারণ তখন হয়তো আমি থাকব না। কিন্তু বিয়ের আগে দ্বিতীয়বার না হয়। কথা দে। দিদি ?

হেনা। দিয়েছি তো।

রাহু। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। তা হলে তুই আরো কয়েক দিন থাকতে পারিস্।

হেনা। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমি আর এক ঘণ্টাও থাকব না।

রাহু। তবে তুই চললি ? সত্যি চললি ?

হেনা। ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল তো ?

রাহু। কী যে বলিস্।

হেনা। আচ্ছা, এখন আমি যাই। গোছানো বাকী।

[হেনার প্রস্থান। বৈজুর প্রবেশ]

বৈজু। তার পর ?

রাহু। হেনা শপথ করেছে। এবার তুমি করো।

বৈজু। হেনা শপথ করেছে ? য়্যাঁ !

রাহু। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তবে হেনাকে ডাকব ?

বৈজু। না, না, ডাকতে হবে না। তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি।

রাহু। তা হলে শপথ করবে ?

বৈজু। একজন করলেই আরেক জনের করা হয়ে গেল। এক হাতে তালি বাজে না।

রাহু। না, তোমাকে ঠিক ওরই মতো শপথ করতে হবে।

বৈজু। এটাও এক রকম বিয়ের মন্ত্র নাকি। তুমি আমাদের পুরুত ঠাকুর ?

রাহু। তা হলে শপথ তুমি করবে না ?

বৈজু। করব না কখন বললুম ? করছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে বলি। আমি আবার অসুখে পড়ব। সে অসুখ এমন অসুখ যে নার্স না ডাকলে সারবে না। আর সে নার্স এমন নার্স যে প্রাণহীন প্রেমহীন কর্তব্য করে যাবে না। ভালোবাসবে। ভালোবাসা জাগাবে।

রাহু। ওঃ ! তাই নাকি ! তা হলে অসুখেই তোমার সুখ।

বৈজু। হাঁ, রাহু। অসুখেই আমার সুখ। যদি না সুখের অন্য উপায় থাকে।

রাহু। অন্য উপায় আছে।

বৈজু। কী উপায় !

রাহু। হেনাও থাকবে, তুমিও থাকবে। থাকব না শুধু আমি। তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলুম।

বৈজু। সর্বনাশ ! তুমি যাবে কোথায় !

রাহু। যেদিকে দু'চোখ যায়। ধরো, শিশিরদার হোটেলে।

বৈজু। স-র্ব না-শ ! শহরের লোক বলবে কী !

রাহু। বললে আমাকেই বলবে, তোমাকে তো বলবে না ?

বৈজু। তোমার অপযশ আমার গায়ে লাগবে না ? আমার মাথা কাটা যাবে না ?

রাহু। আমি আত্মহত্যা করলে কী তোমার সুযশ হবে ?

বৈজু। আত্মহত্যা !

রাহু। ওটা সর্বনাশ নয় ! ওতেই তোমার সুবিধে ! না ?

বৈজু। ছিঃ। যা তা বলতে নেই। রাহু, তুমি দেবী। তোমাকে আমি মনে মনে পূজা করি।

রাহু। আচ্ছা, তুমি দেবীর কাছে কী প্রত্যাশা করো ? কোনো দেবী যদি তোমার

ঘরনী হতেন—লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা কালী—তা হলে কি তিনি এই ঘটনার পর এক দণ্ড তিষ্ঠোতেন ? আমি তাতেও রাজী। এমন কি আমি হেনাকেও ঠাঁই দিতে রাজী। কেবল তুমি একবার আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো যে দ্বিতীয় বার অমন ঘটনা ঘটবে না।

বৈজু। কিন্তু যা ঘটে গেছে তার ফলে যদি হেনা বিপন্ন হয়—

রাহু। তা হলে তার সন্তানের স্বীকৃতির জন্যে তাকে বিয়ে করতে পারো, কিন্তু আত্ম-সুখের জন্যে তার অঙ্গস্পর্শ করবে না। তার সুখের জন্যে তো নয়ই।

বৈজু। বাড়ীর বাইরে গিয়েও না ?

রাহু। বাড়ীর বাইরে গিয়েও না। তুমি হলে বাড়ীর মাথা। তুমি বাড়ী না থাকলে বাড়ীই থাকে না। আমি কোথায় থাকি তা হলে ?

বৈজু। বাড়ী থাকবে না কেন ? বাড়ী তো প্রত্যক্ষ সত্য।

রাহু। না। বাড়ী হচ্ছে একটা আইডিয়া। একটা সৃষ্টি। ইংরেজরা যাকে বলে হোম। কথায় কথায় তাদের হোম ভেঙে যায়। তার মানে কি ইট-কাঠের বাড়ী ভেঙে যায় ? ভেঙে যায় স্বপ্ন। ভেঙে যায় সৃষ্টি। তুমি যদি বাড়ীর বাইরে গিয়ে যা খুশি কর তোমার আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল, জেনো। তুমি তোমার নতুন স্বপ্ন নিয়ে থাকবে। আমি থাকব কোন স্বপ্ন নিয়ে ?

বৈজু। আমি একদিন ফিরে আসতে তো পারি।

রাহু। তা হলে হেনাকেও হারাবে। আমাকে তো হারালেই।

বৈজু। এ কী সঙ্কট। কী সঙ্কট ! নদীর এক কূল গড়লে আরেক কূল ভাঙবে ? দু'কূল একসঙ্গে গড়বে না ?

রাহু। না।

বৈজু। ভাঙা কূল তো আবার গড়ে শুনি।

রাহু। ভুল শুনেছ। যা গড়ে তা অন্য জিনিস। ভাঙা হৃদয় কিছুতেই জোড়া লাগে না।

বৈজু। তুমি দেবী, তুমি দয়া করলে তাও সম্ভব। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিচ্ছি। ভবিষ্যতের অর্জনের অর্ধেক তুমি পাবে। তুমি দেবীর মতো মন্দিরে বিরাজ করবে।

রাহু। আর তুমি পূজারীর মতো মাঝে মাঝে এসে ফুল নৈবেদ্য দিয়ে যাবে। তার পর ছুটবে আরেক দেবীর অর্চনা করতে। বোধ হয় একই মন্দিরের অপর প্রকোষ্ঠে।

বৈজু। রাহু, তুমি বড় অযৌক্তিক। নিজের দিকটাই দেখবে। আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই।

রাহু। বেশ, তাই। কিন্তু অমন করে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। শপথ করো।

বৈজু। ঐ যে বললুম। একজন শপথ করলে আরেক জনের শপথ করা হয়ে যায়।

রাহু। তা হলে আমার স্থিতি এক ঘণ্টা। দেবীদেব তো বিসর্জনও হয়।
বৈজু। তুমি চললে ? সত্যি চললে ?
রাহু। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। না ?
বৈজু। কী যে বল! আমি ভেবে মরছি কী করে দু'কূল রাখব। আর তুমি ভাবছ আমি আহ্লাদে আটখানা। তা কোথায় উঠবে ? হোটেলে ? বিলটা আমার নামে আসবে তো।
রাহু। না, তোমার নামে কেন ? তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! সমাজের চোখে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু হৃদয় কি সমাজের বাধ্য ?
বৈজু। ধর্ম ? হিন্দুর মেয়ে তুমি। ধর্মের অনুশাসন মানবে না ?
রাহু। যারা অধর্ম করেছে, করছে, করবে বলে বদ্ধপরিকর তারা যদি ধর্মের কাহিনী শোনাতে আসে আমি কিছুতেই শুনব না, শুনব না, শুনব না। আমার ধর্মই আমাকে বলছে তাদের সংস্রব ছাড়তে।
বৈজু। আইন ? আইনের ভয় নেই তোমার ? আমি যদি আদালতে যাই, সহবাস দাবী করি ?
রাহু। কাপুরুষের শেষ অস্ত্র। যাই, তৈরি হইগে। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[সেই দিন। এক ঘণ্টা পরে। বসবার ঘর।
বৈজু, রাহু, হেনা ও শিশির বসে আছে।]

বৈজু। যা ছিল সিরিয়াস তাই ক্রমশ কমিক হয়ে উঠেছে, শিশির। প্রথমে হেনা স্থির করল আজকেই যাবে। ঐ দেখছ তো। তৈরি হয়ে বসে আছে যাবার জন্যে। তার পর আমি স্থির করলুম আমি যাব ওর সঙ্গে। আমিও তৈরি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। এখন রাহু জেদ ধরেছে সেও যাবে। আমরা নিলে আমাদের সঙ্গে। না নিলে তোমার সঙ্গে। ওই দ্যাখ রাহুও তৈরি।
শিশির। বাঃ। ভারী মজা তো! এক নৌকায় তিন জনে। তা যদি না হয় তবে হেনার নৌকায় তুমি আর আমার নৌকায় রাহু। কেমন এই তো পরিস্থিতি ?
বৈজু। হাঁ, কিন্তু এর কোনোটাই সম্ভব নয়।
শিশির। কেন ? কেন ?
বৈজু। হেনার নৌকায় আমি উঠতে পারি, কিন্তু রাহু উঠতে রাজী হবে কেন ?
শিশির। হেনা, তুই রাজী নস্ ?

হেনা। না, আমি রাজী নই। আমার নৌকাটি ছোট। তিনজনের ভার সইতে পারে না।
শিশির। তা হলে রাহু উঠবে আমার নৌকায়। রাহু, রাজী?
রাহু। আমি তৈরি।
বৈজু। আমার আপত্তি আছে।
শিশির। তা যদি হয় তবে তুমিও চলে এসো আমার নৌকায়। আমার নৌকাটি বড়। তিনজনের ভার সইবে।
বৈজু। তার মানে হেনা হবে পথি নারী বিবর্জিতা। আমার মতে ওইটাই অধর্ম।
শিশির। ওঃ তুমি ধার্মিক। তবে তুমি হেনার সঙ্গে যাও।
বৈজু। আর রাহু?
শিশির। রাহু হবে প্রবাসে নারী বিবর্জিতা। তোমার মতে সেটা ধর্ম।
বৈজু। বাড়ীতে ঝি চাকর আছে। বিশ্বাসী লোক ওরা। পাহাড়ীরা লোক ভালো।
শিশির। আজকেই আমি সব ক'টাকে বিদায় করে দেব। রাহু এ বাড়ীতে থাকবে না।
বৈজু। তুমি! তুমি কোন অধিকারে এসব করবে! তুমি কি মালিক?
শিশির। তুমি নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে গেলে তার পরে এসব হবে। ছাড়ছ কেন?
বৈজু। ছেড়ে দিয়ে মানে এই যে সব অফিসার স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে টুরে যাচ্ছে এরাও কি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে? আবার তো আমি আসছি।
হেনা। তাই নাকি? তা হলে তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমি একা যেতে পারব। রাতটা শিলিগুড়িতে কাটিয়ে সকাল বেলা বাগডোগরায় প্লেন ধরব।
বৈজু। না, না, সে হতে পারে না। তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারিনে।
হেনা। তা বলে তোমাকে আমি ফিরে আসতে দেব না। যদি আমার সঙ্গে যাও।
শিশির। তা হলে, বৈজু, কী করবে স্থির করে ফেল। ফিরে আসতে পারবে না, এ কথা জেনেও কি তুমি যাবে? হেনা যদি একা যেতে না পারে আমি তাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। তুমি এদিকে রাহুকে সামলাও দেখি। ও যদি আপনা আপনি আমার হোটেলে গিয়ে ওঠে আমি কী করতে পারি!
বৈজু। তুমি প্রশ্রয় না দিলে ও কখনো আপনা হতে যাবে না। তুমি এসেছ বলেই রাহু ওটা ভাবছে।
শিশির। নইলে বাপের বাড়ীর কথা ভাবত। তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?
বৈজু। আলবৎ আপত্তি আছে। ওখানে গেলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। শ্বশুরবাড়ীতে আমি মুখ দেখাব কী করে? দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।
শিশির। বৈজু, তুমি কি বাউরা হলে? বৈজু বাউরা! তুমি একটা মানুষকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখবে, তাকে কোনো রকম সুখে সুখী করবে না, সুখী হতে দেবে না?

বৈজু। এই ষোলো বছর ও ছাড়া আর কী করেছি আমি ? বলুক, রাহু বলুক।

রাহু। সত্যি আমি ধন্য।

বৈজু। লোকটা আমি খারাপ নই, শিশির। কিন্তু পড়ে গেছি গোলোকধাঁধায়—পথ বলতে পারো ?

শিশির। পারি। কিন্তু তা কি তোমার মনে ধরবে ?

বৈজু। শুনি তো।

শিশির। তোমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হবে। তিনজনের মধ্যে তুমি সব চেয়ে বেশি ভোগ করেছ। তুমি সব সব চেয়ে বেশি ত্যাগ করবে।

বৈজু। আমি ! ত্যাগ করব ! আত্মসুখ !

শিশির। চমকে উঠলে যে ! জীবনটা কি কেবল ভোগময় ! ত্যাগে ত্যাগে জর্জর নয় !

বৈজু। তা বলে আটত্রিশ বছর বয়সে আমার সব সুখ ফুরিয়ে যাবে ! তা হলে আমার অসুখ কি কোনো দিন সারবে ! একটার পর একটা লেগে থাকবে না !

শিশির। অসুখ মনে করলেই অসুখ। বেশির ভাগ অসুখই মানসিক। কায়াকে আশ্রয় করে যদিও।

বৈজু। না শিশির। আমি পারব না। আমার বহু সাধ অচরিতার্থ।

শিশির। তা হলে, রাহু। তোকেই আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হয়। বৈজুর পরে তুই সব চেয়ে বেশি ভোগ করেছিস। বৈজু যখন ত্যাগ করবে না তুই কর।

রাহু। শিশিরদা, এই হলো তোমার বিচার। আমি কি সব চেয়ে বেশি সেবা করিনি, যত্ন করিনি, কষ্ট সইনি ? আমার কি সব সাধ চরিতার্থ হয়েছে ?

শিশির। তা হলে, হেনা, ত্যাগ করতে হয় তোকেই। তুই আত্মসুখ বিসর্জন দে।

হেনা। কেন ? আমি কি প্রাণ দিয়ে শুশ্রূষা করিনি ? আমি কি প্রতিদান চেয়েছি ? প্রতিদানে যদি কিছু পেয়ে থাকি তবে সে কি আমার প্রাপ্য নয় ? যে ভালোবাসে সে কি ভালোবাসা পেলে নেয় না ? ওটা ত্যাগ করলে জীবনে আর কী থাকে, শিশিরদা ? কী নিয়ে থাকব ?

শিশির। হেনা, প্রাপ্য ত্যাগ করাই তো মহত্ত্ব। ওটা বাদ দিলেও অনেক কিছু থাকে জীবনে।

হেনা। রাহু তার দৃষ্টান্ত দেখাক। আমি ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

শিশির। রাহু, তুই এর উত্তর দে।

রাহু। আমি কার পদাঙ্ক অনুসরণ করব ? কে আমাকে দৃষ্টান্ত দেখাবে ?

শিশির। বৈজু, তুমি এর উত্তরে কী বলবে ?

বৈজু। আমি ইমানদার। হেনার প্রতি আমার একটা ইমানদারি জন্মেছে। আমি কি বেইমানী করতে পারি? আমার কি ত্যাগ করার স্বাধীনতা আছে?

শিশির। আত্মসুখ ত্যাগ করার স্বাধীনতা সব সময় সব মানুষের আছে।

বৈজু। কিন্তু যেক্ষেত্রে একজনের সুখের সঙ্গে আরেক জনের সুখ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেক্ষেত্রে একজন ত্যাগ করলে আরেকজনকেও ত্যাগ করতে হয় অনিচ্ছাসত্বে। আমাকে ত্যাগ করতে বলা মানে হেনাকেও ত্যাগ করতে বাধ্য করা।

শিশির। তোমাকে অনুরোধ করা নিষ্ফল। আমার অনুরোধ রাহুকে ও হেনাকে।

রাহু। আমার সুখের নীড় হঠাৎ একদিনের ঝড়ে ভেঙে পড়বে এ কি আমি কল্পনা করতে পেরেছি? এই ভাঙনকে আমি মাথা পেতে নিতে পারি। কিন্তু সেটা স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়।

শিশির। তা হলে আর ত্যাগ কিসের। দুর্ভোগকে ত্যাগে পরিণত করার কৌশল শেখ, রাহু।

রাহু। সেটা হলো আত্মপ্রতারণা, শিশিরদা।

শিশির। না, আত্মপ্রতারণা অন্য জিনিস। বল, আমি দানীর মতো পেয়েছি। দানীর মতো দান করলুম। আমি কাঙাল নই। কাঙালের মতো চাইনে।

রাহু। কাঙালের মতো চাইনে। কিন্তু চাইনে কেমন করে বলি?

শিশির। বলতে শেখ। সেইখানেই মহত্ত্ব।

রাহু। না, শিশিরদা। যার উপর অন্যায় করা হয়েছে মহত্ত্বের পালা তার নয়।

শিশির। হেনা কি আমার অনুরোধ শুনবে?

হেনা। কেন, শিশিরদা। আমি অন্যায় করেছি বলে?

শিশির। না, তা নয়। ন্যায় অন্যায় বিচার করবার আমি কে। আমি শুধু একটা পথ নির্দেশ করছি। যে পথে চললে সকলের মঙ্গল। কারো অমঙ্গল নয়

হেনা। তা বলে আমিই কি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। তুমি কি জান না, শিশিরদা, কত বার আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, ভেঙে গেছে আমারই ইচ্ছায়। এত ত্যাগের উপর আবার ত্যাগ।

শিশির। তা হলে ত্যাগ তোরা কেউ করবিনে? একজনও না?

[সকলে নীরব।]

শিশির। আমি বলি এক কাজ করলে কেমন হয়? লটারি? লটারিতে যার নাম উঠবে সেই ত্যাগ করবে। বৈজু। রাহু। হেনা।

বৈজু, রাহু, হেনা। [একবাক্যে] না, না, না।

শিশির। না, না, না? সব তাতেই না, না, না? আমার কোনো কথাই যদি কেউ না

শোনে তা হলে আমার দ্বারা এর সমাধান হবে না। তোদের সমাধান তোরাই কর বসে। আমি চলি। [প্রস্থানোদ্যত]

বৈজু। ও কী! চললে যে! না, না, যেয়ো না।

রাহু। যেয়ো না, শিশিরদা।

হেনা। যেয়ো না, ভাই।

শিশির। যাব না? তবে তোরা শুনবি আমার কথা?

রাহু, হেনা। শুনব। শুনব।

শিশির। বৈজু, তুমি?

বৈজু। শুনব।

শিশির। শোন তা হলে। রাহু, তুই এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যা। যাবি আমার হোটেলে। খবরদার দেরি করিস্‌নে।

রাহু। আসি, শিশিরদা। ওগো, আসি। [প্রস্থান]

শিশির। আর হেনা, তুই বেরিয়ে যা ওই দরজা দিয়ে। সোজা মোটর অফিসে যাবি। খবরদার, সবুর করিস্‌নে!

হেনা। আসি, শিশিরদা। এই, আসি। [প্রস্থান]

শিশির। এবার, বৈজু! এ বাড়ীতে তুমি আর আমি দুই বন্ধু বাস করব। দু'জনে দু'জনকে পাহারা দেব।

বৈজু। এ কী। ওরা চলে গেল যে। [ডান দিকের দরজায় গিয়ে] রাহু! রাহু! রাহু! [বাঁ দিকের দরজায় গিয়ে] হেনা! হেনা। হেনা! [ডান দিকের দরজায়] রাহু! রাহু! [বাঁ দিকের দরজায়] হেনা। হেনা! [ডান দিকের দরজায়] রাহু! [বাঁ দিকের দরজায়] হেনা! [এদিক ওদিক] রাহু, হেনা। রাহু, হেনা! রা—হে—রা—হে—রা—হে—

যবনিকা পতন

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

১৯৫৪

—

পাহাড়ী

॥ এক ॥

রাজবাড়ীর পিছন দিকে ঐ যে পাহাড়টি দৈত্যের মত ডন্ ফেলছে ওর নাম গড় পর্বত। রাজবাড়ী ঐ পাহাড়ের সংলগ্ন একটি 'রগড়া'র উপর দাঁড়িয়ে। রাজবাড়ীর সঙ্গে প্রায় মুখোমুখি এবং রাজবাড়ীর থেকে সিকি মাইল দূরে আর একটি 'রগড়া'র উপর 'সারকিট হাউস।' সারকিট হাউসকে ডাইনে এবং রাজবাড়ীকে বামে রেখে রাঙা মাটির যে সড়কটি পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে তারই একধারে চঞ্চলদেব বাড়ী।

গড় পর্বত ছাড়া আরো পাহাড় আছে। পূব দিকে সূর্য ওঠে যার ওপার থেকে সেটা একটা নাম-না-মনে-রাখা পাহাড়। আর পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবে যার ওপারে সেটার নাম কুটুনিয়া। সেটাকে দেখতে একটা ত্রিভুজের মত। তাব কিছু দক্ষিণে এক মস্ত পাহাড় খাঁড়ার মত উঁচানো। ওর নাম কোরিয়া। দিনের বেলায় একলা মানুষ ওর কাছ দিয়ে যায় না।

তারপর সেই যে নাম-না-মনে-রাখা পাহাড় তার দক্ষিণে-পূবে মেঘা। মেঘার থেকে কিছু দূরে কপিলাস। ওখানে শিবরাত্রির সময় নানা দেশেব লোক আসে। মেঘার কাছ দিয়ে কপিলাস যাবার পথে একবার এক ঘোড়-সওয়ারকে বাঘে তাড়া করে। বাঘ ঘোড়াটার ল্যাজে মুখ লাগিয়েছে এমন সময় ঘোড়-সওয়ার লাফ দিয়ে এক গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে। তার নিজের প্রাণ বাঁচল কিন্তু খুব দামী বড় ঘোড়াটি দিনে দুপুরে বাঘের পেটে গেল। অবশ্য তারপর নাকি সেই বাঘও রক্ষা পায়নি, রাজাব গুলিতে মরেছে।

চঞ্চলের বাবা যখন রাজার কর্মচারী হয়ে প্রতাপগড়ে প্রথম আসেন তখন কোনো দিকে জঙ্গল ছাড়া বড় কিছু ছিল না। সন্ধ্যার পর কেউ বাড়ী থেকে বেরোত না, পাড়ায় বাঘ আসত। রোজই এর গোরু তার ছাগল হারিয়ে যেত এবং ফিরত না। শবর বলে এক জাতের মানুষ জঙ্গলে কাঠ কেটে ও শাল পাতা কুড়িয়ে থালার মত করে গেঁথে বাজারে বেচে তারা, তাদের একটা না একটা রোজ বাঘের খোরাক জোগায়। মাঝে মাঝে চঞ্চলদের বাড়ী ভিক্ষা করতে আসে এমন কেউ যার নাক চোখ নেই, ভালুকে ছিঁড়ে নিয়েছে। বুনো হাতীর উপদ্রবও কম নয়। পাহাড় থেকে গভীর রাত্রে হাতীর পাল নামে দূরে নদীতে জল খাবার জন্য। পথে যা কিছু পায় মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে যায়। ক্ষেতের

পর ক্ষেত উজাড় করে দেয়। বরাহকে তোমরা বরাহ-অবতারের ছবিতেই দেখেছ। কিন্তু সেই দুরন্ত জানোয়ারের সুমুখে পড়ে কত লোকের প্রাণ গেছে। অবশ্য তারা মাংসাহারী নয়। কিন্তু ফসলের তারা যম। চিতা বাঘ, ছোট বাঘ ইত্যাদি আরো কত রকম ভীষণ জন্তু ঐ সমস্ত পাহাড়ের জঙ্গলে বাস করে এবং দুপুর রাত্রে লোকালয়ে বেড়াতে আসে।

কেবল ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা শুনে মনে কোরো না চমৎকার শিংওয়ালা চিত্র-বিচিত্র হরিণ বুঝি কিছু কম। বড় বড় বোঁওয়ালা বড় বড় বেঁজি, কি সুন্দর তাদের চোখ। ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর। গাছে গাছে চন্দনা ময়না। ঝোপে ঝোপে বনমোরগ।

শবরদের নাম করেছি। এক সময় ওরাই ছিল মালিক। ওদের রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে একজন বিদেশী রাজপুত রাজ্য অধিকার করেন। ক্রমশ বনজঙ্গল কেটে দুর্গ তৈরী করা হয়, ব্রাহ্মণ, করণ (কায়স্থ) ইত্যাদি জাতকে জমি দিয়ে বসানো হয়। সে বোধ করি চারশো বছর আগে। দুর্গের এখন চিহ্ন নেই, কিন্তু শ' দুয়েক বছর আগে মারাঠা আক্রমণকারীরা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি, বাইরে থেকে অবরোধ করে সময় ও শক্তি অপচয় করেছে। প্রতাপগড়ের বলীয়ার সিং মারণা সিং চম্পতি সিংদের সঙ্গে লড়ে নাগপুরী ভোঁসলারা যখন বাংলাদেশের দিকে রওনা হয় তখন তাদের সৈন্যবল অনেক কমে গেছল, প্রতাপগড় দখল না করতে পেরে মনের বলও গেছল দমে। পলাশীতে জিতে ইংরেজের তখন খুব প্রতিপত্তি হয়েছে, বর্গীরা তাই শুনে মানে মানে সরে পড়'ল। ওদিকে আহমদ শাহ দুরানী হানা দিয়েছে মারাঠারা চারিদিক থেকে সৈন্য সামন্ত ফিরিয়ে নিয়ে দলাদলি ভুলে দুরাণীর সঙ্গে লড়তে চলল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে চঞ্চলদের প্রতাপগড়ের উল্লেখ নেই, তবু ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে প্রতাপগড় যদি ভোঁসলা বাহিনীকে বিনাবাধায় দুর্গ ছেড়ে দিত এবং বেশীদিন আটকে না রাখত তবে হয়ত ক্লাইব পলাশীতে জেতার আগে বর্গীরা কলকাতায় হাজির হতো।

যাক, চঞ্চলের জন্মভূমির নাম মুখস্থ বলে নম্বর পাবার সোভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তোমরা আফশোষ করতে থাকো। চঞ্চলের আক্ষেপ নেই। সে তার শবর, জুয়াঙ্গ, পাতুয়া, পাণ ও কন্ধ প্রভৃতি সমজন্মাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রতাপগড়ের প্রতাপ স্মরণ করে রোমাঞ্চ বোধ করুক। তার শবর ধাত্রী তাকে ক্ষুদ কুঁড়োর 'পোড়পিটা' খাওয়াতে খাওয়াতে ন'অঙ্ক দুর্ভিক্ষের রোমহর্ষণকর কাহিনী বলতে থাকুক।

আহা, সেই 'শুকুয়া' অর্থাৎ শুটকিমাছ ভোজন-সুখী বৃদ্ধা আজ কোথায়! সে নেই। চঞ্চল যাকে 'মা' বলে ডাকত অথচ যিনি ছিলেন তার ঠাকুমা, তিনিও আজ নেই। আর যাকে সে 'খোকার মা' বলে ডাকত অথচ জানত না যে তিনি ছিলেন অন্য কোনো খোকার নয় তারই নিজের মা, তিনিও আজ নেই। বাংলা দেশের গোপন গ্রামে দীঘির

পাড়ের আম্র-কুঞ্জে বেদুইনের মত তাঁবু খাটিয়ে, বাঁশের ঝাড় বটের ঝুরি ও তালের ডালের ভিতর দিয়ে কখনো হু হু করে কখনো হা হা করে কাঁদতে-ও-হাসতে-থাকা যেতে-ও-আসতে-থাকা পাগলা হাওয়ার মত চঞ্চলের মন আজ চঞ্চল।

রোজ সকালে উঠে যাদের মুখ দেখতে হতো সে সব পাহাড় এখানে কই। ফাল্গুন যাচ্ছে, চৈত্র আসছে, এইতো পাহাড়ে আগুন লাগার সময়। দিনের বেলা স্পষ্ট দেখা যায় না, সন্ধ্যা হলে কোনো পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে, কোনো পাহাড়ের ডাইনে থেকে বাঁয়ে, কোনো পাহাড়ের বাঁয়ের থেকে ডাইনে—চীনীয় লিপি, খরোষ্ঠী লিপি, ব্রাহ্মী লিপি, অগ্নিবর্ণে লেখা।

নব-বর্ষার দিনে গড় পর্বতের চূড়ায় একটুখানি সাদা মেঘের ছোঁয়া লাগে, যেন কোন পাখীর বুকের রোঁয়া। দেখতে দেখতে সব সাদা হয়ে যায়, ওখানে যে একটা গাছ, পাথরের পাহাড় ছিল তা তুমি জোর করে বলতে পারবে না। হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির বিরাম হলে ঢল নামে। নয়ন-জুলিতে কাগজের নৌকা ভাসাবার ধুম। কখন এক সময় পাহাড় তার ভোজবাজির পর্দা সরিয়েছে, জল-জ্যান্ত পাহাড়খানা যথাস্থানেই ছিল দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

চঞ্চলদের বাড়ী থেকে বেশী দূর তো নয়, মাত্র এক মাইল। মাঝখানে রাজার বাগান ও রাজবাড়ী। গড় পর্বতের চূড়ায় যে সব বড় বড় গাছ আছে সেগুলোকে চঞ্চলদের বাড়ী থেকে দেখতে ছোট ছোট গাছের মত। কোনটা কী গাছ বলা শক্ত। চূড়ার উচ্চতা প্রায় হাজার ফুট হবে।

যদিও খুব ছোট বেলায় চঞ্চলের মনে হতো ওর চেয়ে উঁচু আর কিছু থাকতে পারে না, ওর উপরের আকাশটাই স্বর্গ। ওর ওপারে যে কাদের বাড়ী প্রশ্ন করে চঞ্চল ঠাকুমার কাছে মনের মত উত্তর পেত না। চঞ্চলের স্থির বিশ্বাস ছিল ওর ওপারে জন-মনুষ্য নেই, ঐখানেই পৃথিবীর শেষ। থাকতে পারে রাক্ষসপুরী, রূপকথায় যার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণ এবং রূপকথা এই দুই দিয়ে শিশু চঞ্চলের জগৎ। তার ঠাকুমা তাকে এই জগতের অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রূপকথার চেয়ে পুরাণই তার ভালো লাগে। সে বই না পড়ে জেনে নিয়েছে অর্জুনের বন্ধু নাম, রাবণের কয় ছেলে, ঐরাবত আর উচ্চৈঃশ্রবা কার বাহন, কার রথের নাম গরুড়ধ্বজ ও কার রথের নাম শিখিধ্বজ, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে কোন কোন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে-ছিলেন, কলিযুগ শেষ হতে আর কত দেরি।

দুর্গ প্রাচীরের কিছুই অবশিষ্ট নেই, কিংবা সামান্য আছে রাজবাড়ীর পিছনে, গড়-পর্বতের গা ঘেঁষে। দুর্গ পরিখার চিহ্ন কিন্তু এখনো দেখা যায়। চঞ্চলদের বাড়ীর উত্তরে যে সড়ক সেই সড়কের প্রায় ওপাশে গড়খাইয়েরই গর্ত আছে, গর্তটা জঙ্গলে ভরে

গেছে, জঙ্গলের ভিতরে বোধ করি সাপ থাকে। গর্তটা থেকে বেশী দূরে নয় একটা বড় ডোবা, তার নাম ওটিয়া জরি। ওটিয়া নাম কেন হলো কেউ বলতে পারে না; সম্ভবত জরির জলে এক সময় একটা উট ডুবে মরেছিল। গড়খাইয়ের অংশ বিশেষ যে কালক্রমে জরিতে পরিণত হয়েছে, একথা অনুমান করার কারণ আছে। জরির পূর্বদিকে রথগড়া অর্থাৎ যেখানে প্রত্যেক বছর জগন্নাথের রথ তৈরী হয় কাঠ দিয়ে, সেখানটার উত্তরে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী নাম জাঁউলি পুকুর। জাঁউলি হলো জামল অর্থাৎ জোড়া। জোড়া নৌকায় করে আগে সেই পুকুরে চন্দন-যাত্রা হতো। গর্ত, জরি ও জাঁউলি পুকুর একই বৃত্তের জ্যা। পরিখাটিকে কোথাও বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথাও কেটে চতুষ্কোণ করে পুষ্করিণী করা হয়েছে।

জরিতে ফোটে লাল ফুল, জাঁউলি পুকুরে ফোটে পদ্ম। রাশি রাশি ফোটে, এত ফোটে যে লতা পাতার জালায় স্নান করা কঠিন। চঞ্চলকে প্রতিদিন স্নান করাতে নিয়ে যায় তাদের বাড়ীর বামুন। চঞ্চল তাকে কাকা বলে ও ভয় করে। চঞ্চল তার নামকরণ করেছে দিদেই কাকা। দিদেই কেন হলো, তার কৈফিয়ৎ নেই। এক একটা শব্দ শিশুদের পছন্দ হয়ে যায়। হয়ত তাকে ডাকতে শুনেছে 'দিদি' এই শব্দটা, সেইটেকে ভেঙেচুরে খাড়া করেছে 'দিদেই', যার মুখে শুনেছে তার সঙ্গে জড়িয়ে মনে রেখেছে। দিদেই কাকা তাকে লাল ফুল তুলে দেয়, পদ্ম ফুল তুলে দেয়। ফুল না পেলে স্নানের স্বার্থকতা কি থাকল, এত কষ্ট করে মানুষ স্নান করবে কেন? স্নান করা দূরে থাক, তেল মাখবে কেন?

দুপুর বেলা ঠাকুমা তাকে নিজের কাছে শোয়ান। কিন্তু স্নানের বেলা যেমন ফুল, শোয়ার বেলা তেমনি ফুটবল। একটা ফুটবলকে মাথার কাছে না রেখে শুলে তার ঘুম আসে না, সে ছাদের উপরের দিকে চেয়ে আবোল তাবোল বকতে থাকে, মাঝে মাঝে ধড়ফড়িয়ে উঠে বলে 'একটু দেখে আসি সূর্য নামল কিনা।' ফুটবলটা তার নিজের নয় তার ছোটকাকা ইস্কুলের ছেলেদের ক্যাপটেন, ইস্কুলের বল বাড়ীতে এনে সকাল বেলা উঠোনে প্র্যাকটিস্ করেন। চঞ্চলও দু' একটা কিক্ করতে শিখেছে। অবশ্য চঞ্চলের কিক্ খেয়ে বল এক ফুট এগোয় না, কারণ ওটা তিন নম্বরের বল। চঞ্চলের কায়দা চুপ করে এক সময় বলটাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দৌড় দেওয়া, এক নিশ্বাসে ঠাকুমার কাছে হাজির হয়ে বলা, 'মা, আমি এটা রাখবো, কাউকে দেবো না।' ছোটকাকা ও তার ভক্তবৃন্দ খোসামোদ করেন, ঘুষ দেবার লোভ দেখান, অবশেষে শাসিয়ে যান। চঞ্চল ফুটবলটাকে পাশ বালিশ করে শোয়, সুবিধে হয় না, মাথার বালিশ করে, মাথাটা পিছলে গিয়ে ঠকাস করে মাদুরে ঠেকে। কখন এক সময় ঘুম লেগে যায়। ঘুম ভাঙলে চঞ্চল দেখে ফুটবল নেই। বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায়

দাঁড়িয়ে দেখে 'মালী বাগানে'র পশ্চিমে রাজবাড়ীর দক্ষিণে যে মাঠ সেই মাঠের উপর বহু ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াদৌড়ি করছে, তাদের পায়ের মার খেয়ে ফুটবলটা লাফ দিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে এত উঁচুতে উঠছে যে চঞ্চলের চোখ যায় না। দশটা ছেলে এক সঙ্গে মাথা পেতে দিচ্ছে, ফুটবলটা যার মাথায় ঢুঁ খাচ্ছে সে কি ভাগ্যবান। অবশেষে অনেক কান্নাকাটি করে চঞ্চল একটা ফুটবল উপহার পেয়েছিল, দম বেরিয়ে যাওয়া পুরাণো ফুটো পাঁচ নম্বরের ফুটবল, তার পেটে খড়কুটো পুরে তার মুখটা মুচিকে দিয়ে সেলাই করা। ওটাকে পঞ্চাশবার মাথায় করে 'হেডবল' করা ছিল চঞ্চলের মস্ত আমোদ।

একটা পায়ের উপর আরেকটা পা'কে সওয়ার করে রাজ্যের কাঁথা ও বালিসের উপর মাথা রেখে দিবানিদ্রা দিতেন চঞ্চলের ঠাকুরদা। শান্ত নিরীহ স্বল্পভাষী মানুষটি, তাঁর বৈকালের কাজ ছিল বাইরের বারান্দার পিঠওয়ালা বেঞ্চির উপর বসে গোরুগুলির প্রতীক্ষা করা। ওরা বাড়ী ফিরলে ওদের গোয়ালে বেঁধে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। না ফিরলে সে রাত্রে তাঁর আহার নিদ্রা বন্ধ। তিনি জীবনে অনেক কিছুতে হাত দিয়ে বিফল হয়েছিলেন, শত্রুর চক্রান্তে জেল পর্যন্ত খেটেছিলেন কিন্তু ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ। গো-চিকিৎসা ও গোসেবা তাঁর বিশেষ জানা ছিল। কেল্লা-জাতীয় সাপুড়েদের সঙ্গে ভাব করে তিনি তাদের কাছে সর্পাঘাতের ওষুধ জারমহুরা আদায় করেছিলেন শুধু জারমহুরা নয়, সাপের মাথার মণি। সেই মণিটিকে সোনার মাদুলিতে পুরে চঞ্চলের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক গাছ-গাছড়ার নাম-ধাম জানতেন। তাদের একটার নাম ছিল বিশল্যকরণী, আরেকটার নাম গদ। একটাতে কাটা ঘা সারে, অপরটাতে সারে পেটের অসুখ। এগুলো চঞ্চলদের বাগানেই ছিল।

বাজার খরচের টাকা তাঁর জিম্মা থাকত। চঞ্চল রোজ তাঁর কাছে গিয়ে আব্দার ধরত 'বাবা বাবু, একটি পয়সা।' পয়সা নিয়ে 'ডালাবালা'র কাছ থেকে চিনেবাদাম কিনবে। 'চাই চিনাবাদাম, চি-ই না বাদাম, গরমাগরমা, কল্‌কত্তাসে লায়া।' বুড়ো মুসলমান ফেরিওয়ালা, তার ডালাতে কতরকম খেলনা, খাবার, সৌখীন জিনিস। 'চাই কিস্‌মিস্‌ খেজুর, কল্‌কাত্তি মাল, আইয়ে খোকাবাবু বুঢাবাবু সে পৈসা লাইয়ে।' কোনো কোনো দিন খোকাবাবুকে জিনিসটি ধরিয়ে দিয়ে বুঢাবাবুর কাছে নালিশ করে। বলে, 'আপনার নাতি জোর করে কেড়ে এনেছে।' ঠাকুরদা অমনি দামটা চুকিয়ে দেন। চঞ্চলকে একটা ধমক পর্যন্ত দেন না। বড় ছেলের বড় ছেলে, সে কি কম আদরের ?

চঞ্চলের নামে যত রাজ্যের নালিশ—তার বিচারক ছিলেন তিনি। বিচারে চঞ্চলের যদি বা হার হতো তবু সাজা একেবারেই হতো না। একদিন ঢিল ছুঁড়ে একটা হাড়ির ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেয়। পাছে সে কোন দিন অপমান করে সেই ভেবে ঠাকুরদা

দিলেন মোটারকম খেসারৎ। পাশের বাড়ীর একটি মেয়েকে চঞ্চল একটা পাতকুয়ার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি। রাগ করে নয়, দুষ্টামি করে।

সোডাওয়াটারের বোতলের ভিতর থেকে গুলি বের করে নিয়ে মার্বেল খেলতে হবে, তাই বাড়ীর যতগুলো সোডাওয়াটারের বোতল ছিল সব কয়টাকে আছড়ে ভাঙলো। বেড়াল-ছানাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে ছুঁড়ে ফেলে দিল বড় কাকিমার ভাতের থালায়। ঠাকুরদার কাছে তাকে ধরে নিয়ে গেলে তিনি কাতর কণ্ঠে বলতেন 'আহা ছেলে মানুষ।' মাঝে মাঝে তার আফিমের কৌটা চুরি গেলে তিনি দুনিয়া খুঁজে হায়রান হতেন, কিন্তু তাঁর গুণবান নাতির কথা তাঁর মনে উঠত না। অবশেষে চঞ্চলই গিয়ে প্রস্তাব করত 'আমাকে একটা পয়সা দিলে আমি বলে দেব কোথায় আছে।' পয়সা আদায় করে চঞ্চল ঠাকুমার জিম্মা রাখত। এবং যখন যা কিনতে চায় কিনত। শেষ পর্যন্ত ঠাকুমার ব্যাঙ্কে তার চারটি টাকা জমেছিল। একদিন কেমন করে সেই চারটি টাকা বাজেয়াপ্ত হলো, উপরন্তু পিঠে কয়েক ঘা বেত পড়ল সে কাহিনী যথাকালে বলব।

জন্মের কয়েকমাস পর থেকে চঞ্চল ঠাকুমার কাছে মানুষ। মাকে ও বাবাকে আপনার বলে জানত না। তাঁরা থাকতেন উত্তর ভিটার ঘরে, ঠাকুমা ও ঠাকুরদা থাকতেন দক্ষিণ ভিটার ঘরে। তাঁদের সঙ্গে চঞ্চলের সম্বন্ধ কম ছিল। চঞ্চলের ছোট ভাই নির্মল তখন কোলে। সেও একদিন এসে ঠাকুমার অপর পাশে শুতে সুরু করে দিল। মার কোলে তার জায়গা নিল নতুন জন্ম-নেওয়া বোন, ললিতা।

ঠাকুমা কার দিকে পাশ ফিরে শোবেন তাই নিয়ে চঞ্চল ও নির্মল দুবেলা ঝগড়া করত। তবে ঝগড়ার একটা সহজ মীমাংসা এই হতো যে নির্মল খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে ঠাকুমার দখল ছেড়ে দিত। ততক্ষণ চঞ্চল চোখ বুজে পরাজয়ের ভান করত। চঞ্চলকে চোখ বুজতে দেখলে নির্মলও চোখ বুজত এবং চোখ বুজামাত্র নির্মলের ঘুম আসত। চঞ্চল একবার উঠে বসে ঠাকুমার উপর ঝুঁকে পড়ে নিজের চোখে দেখত যে নির্মল সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে, চঞ্চলের মতো ভান করে নয়। তারপর চুপি চুপি ঠাকুমার হাত ধরে ধীরে-ধীরে টানত।

চঞ্চল ও নির্মলকে নিয়ে ঠাকুমা গল্প বলতে বসতেন। চঞ্চল তাঁকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলত। কলিযুগে নাকি সাতজন অমর, সেই সাতজন এখন কোথায়। বিভীষণ নাকি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে পুরীতে জগন্নাথ দেখতে আসেন, তাঁকে কেউ দেখতে পায় কি না। এই সব কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে ঠাকুমা যখন ব্যাপৃত ঠিক অমনি সময়ে একটা গোরু শিং উঁচিয়ে একদিন চঞ্চলের দিকে ছুটে এল। চঞ্চল ভয় পেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমার দিকে যতই সরে যায় ঠাকুমাও ততই চিৎকার

করে লোকজন ডাকেন। একা নির্মল অকুতোভয়ে গোরুটার দুই শিং দুই হাতে ধরে তাকে ঠেলা দেয়। অতি অল্প বয়স থেকে সে এমনি দুঃসাহসী, তার মাথার চুলগুলো খাড়া। চোখের চাউনি কড়া। সে যে ভবিষ্যতে একজন বীরপুরুষ হবে সে বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ ছিল না।

দেড় বছর বয়স পর্যন্ত চঞ্চল হাঁটতে শেখেনি, কিন্তু দশ মাস বয়সে নাকি নির্মল মাংস চিবিয়ে খেয়েছে। যত রাজ্যের বাঁদরামীতেই চঞ্চলের মাথা খেলে, কিন্তু নির্মল হচ্ছে রীতিমতো ডানপিটে। ঢিল ছুঁড়ে একটা পাখীর বাসা পেড়েছিল। পাঁচন হাতে করে গোরুগুলোকে খেদিয়ে গোয়ালের মধ্যে ঢোকায়। মল্লযুদ্ধে চঞ্চলকে ধরাশায়ী করে। চঞ্চলের চেয়ে বড় থালায় বেশী ভাত না দিলে খেতে বসে না।

॥ দুই ॥

চঞ্চলদের পাশের বাড়ীতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তারা চঞ্চল ও নির্মলকে ডেকে নিয়ে চোর চোর খেলে। তাদের মধ্যে দুর্দান্ত হচ্ছে নেপাল। ন্যাড়া মাথা, কানের কাছে ও কপালের কাছে ছোট ছোট তিন গোছা চুল। কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে, গজায়নি। কয়েকটা সবে গজাচ্ছে। অদ্ভুত চেহারা। চঞ্চলের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। কথায় কথায় কান মলে দেয়, হাত মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলার মতো করে, বিষম চিমটি কাটে। তবু তার স্বভাবে কি যাদু আছে চঞ্চল থাকে থাকে নেপালের কাছে ছুটে যায়। এক পয়সা দামের ন্যাকড়ার বল নিয়ে খেলা করে। নেপাল প্যাঁচ মেরে চঞ্চলকে চিৎপাত করে বলটি আত্মসাৎ করলে চঞ্চল কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে আসে। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাতে পারে না। ঠাকুরদা ভালাবালার কাছ থেকে নূতন বল কিনে দেন, ঠাকুমা নেপালের মার কাছে নালিশ করেন, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন নির্মল নেপালদের বাড়ী আক্রমণ করে তার পোষা পায়রার থেকে একটাকে নিয়ে দে দৌড়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। নেপাল ভূপালের জ্যাঠতুত ভাই ভরত ও জ্যাঠতুত বোন পুষ্প আর তুলসী চঞ্চলদের বাড়ীর এক একটা ঘরে এক একজন ঢুকে হাতের কাছে যা পায় তাই লুট করতে লাগে। উভয় পক্ষের গুরুজন সন্ধি ঘটিয়ে দিলে চঞ্চল গিয়ে আবার নেপালের সঙ্গে ম্যাচ খেলে। হাডুডু খেলায় কোনো পক্ষ তাকে ছাড়তে চায় না, চঞ্চলকে দলে পাবার জন্য নেপালের সঙ্গে ভরতের মল্লযুদ্ধ, তুলসী ও পুষ্প দুজনে চঞ্চলের দুই হাত ধরে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে টান মারে। যেমন তাদের শত্রুতা তেমনি তাদের প্রীতি।

কোনো কোনো দিন তারা চঞ্চলকে ও নির্মলকে সন্ধ্যাবেলা আটকে রাখে ও নিজেদের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়। কেউ খুঁজতে এলে উত্তর দেয়, 'ওঃ চঞ্চল? নির্মল? কই, ওরা তো এখানে নেই! কখন চলে গেছে।' ঘরের কোণের সঙ্গে অন্ধকারে লেপটে থেকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চঞ্চল ও নির্মল স্তব্ধ থাকে। দিদেই-কাকা কিংবা ইশারার মা বুড়ী যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, চঞ্চল ও নির্মল বিদায় নিয়ে বলে, 'আজ আসি ভাই; নইলে সেজকাকা এখুনি বেত হাতে করে খুঁজতে বেরোবে।'

বলা নেই কওয়া নেই কখন এক সময়ে সাপুড়ে কেলারা চঞ্চলদের বাড়ী আশ্রয় নিয়েছে। বাইরে উঠানে তাদের রান্না করা চলেছে। তারা খায় না এমন জিনিষ অল্পই আছে। সাপ এবং বেঁজী দুই তাদের সমান প্রিয়। সন্ধ্যাবেলা বল্লম হাতে করে তারা বাদুড় শিকার করতে বেরোয়। তাদের এক জনের সঙ্গে চঞ্চলের বিশেষ ভাব। তার নাম অঁইঠা, অর্থাৎ এঁঠো। বোধ হয় তার বড় ভাই বোন হয়েই মারা গেছে বলে তার মা বাবা তাকে যমের পক্ষে অরুচিকর নাম দিয়েছে। অঁইঠা চঞ্চলকে সাপের মাথার মণি দেবে বলেছে, তাই নেপালদের ওখানে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে চঞ্চল বলে, 'আমার ধর্মভাই অঁইঠা দাদা বলেছে আমাকে আসল সাপের মাথার মণি দেবে।'

চঞ্চলের ধর্মভাই ধর্মবোন ধর্ম মামা মামী মেসো মাসি ইত্যাদি প্রায়ই আসা-যাওয়া করত, বেশী আসত রথযাত্রার সময়। কোথায় যে তাদের বাড়ী কোন পাহাড়ের ওপারে, কোন নদীর ধারে চঞ্চল অবাক হয়ে ভাবত। চঞ্চল তাদের সবাইকে ভাল করে চিনতও না, কিন্তু তারা পরিচয়ের দাবী করে বলত, 'খোকাবাবু, মনে পড়ে?' চঞ্চল জানত না যে চঞ্চলের বাবার কাছে তাদের নানা সরকারী কাজ, তারই সুবিধার জন্যে তারা চঞ্চলকে উপহার দেয়; তার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতায়। যাদের বিশেষ কোনো কাজ থাকে না তারাও সম্বন্ধ পাতায় সম্মানের খাতিরে। এই সব পাতানো আত্মীয়রা ভারে ভারে মাছ, দই, আম, কাঁঠাল, চিড়ে, মুড়কি, মোওা, মিষ্টান্ন আনে। চঞ্চলের ডাক পড়ে ভাগ পেতে। কাজেই চঞ্চল এদের উপর খুবই সন্তুষ্ট। নেপালদের ওখানে গিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'আমার ভোলা সাহু ময়রা মেসো আজ যা খাজা পাঠিয়েছে কি আর বলব।'

নেপালদেরও এই শ্রেণীর অনেক কুটুম্ব ছিল। নেপালদের বাড়ীতে কেলারা আশ্রয় না নিক, নাগা সন্ন্যাসীরা নিত। নেপাল তাচ্ছিল্য করে বলত, 'ভারি তোর ময়রা মেসো অঁইঠা দাদা! জানিস আমি রাজার কোচম্যানের সঙ্গে ফিটন গাড়ী হাঁকাই, হাতীর মাহুত বলেছে দশ্তা হাতীর পিঠে চড়তে দেবে?'

কোচম্যান বুড়োর বাড়ী যদিও চঞ্চলদের বাড়ীর পিছনে, তবু নেপালদের সঙ্গে তার নাতীনাৎনীদের চলাফেরা ও খেলাধুলা। পাড়ার সব ছেলেমেয়ে নেপালদের

বাড়ীতেই জড় হয়, চঞ্চলদের বাড়ী কেউ আসে না। এর প্রধান কারণ চঞ্চলরা সংখ্যায় কম, নেপালরা ষষ্ঠীর কোলে একটি সমষ্টি। জনতা দেখলেই জনতা বাড়ে। অন্যান্য কারণ এই যে নেপালরা খুব মিশুক আর জোগাড়ে, চঞ্চলদের মতো লাজুক আর কুনো নয়।

রাস্তা দিয়ে অচেনা মানুষ যাচ্ছে, নেপালরা মাতব্বরের মতো জিজ্ঞাসা করে, 'কি হে, কতদূর যাচ্ছো?' কিংবা 'তোমাকে এত রোগা দেখছি কেন হে?' চঞ্চল অচেনা মানুষ দেখলে এক নিঃশ্বাসে ঠাকুমার কাছে উপস্থিত। বলে 'মা, ওর পরনে লাল পোষাক। বর্গী, ছেলে ধরা। না?'

রাজার হাতীশালে হাতী অনেক, ঘোড়াশালে ঘোড়া অনেক। নেপালরা একটা না একটাতে চড়ে বেড়ায়। রথযাত্রার দিন রথের উপর, চন্দন-যাত্রার সময় মদনমোহনের নৌকায় নেপালদের দল আছেই। চঞ্চলরা আমল পায় না। কারণ চঞ্চলরা জোগাড়ে নয়, মুখ ফুটে জানায় না তারা কি চায়। চঞ্চলের বাবা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাঁকে বিরক্ত করা যায় না, চঞ্চলদের দৌড় ঠাকুমা পর্যন্ত। ঠাকুমা জানান ঠাকুরদাকে। ঠাকুরদা বলেন, 'বেঁচে থাকুক। কত হাতী ঘোড়া চড়বে। কোচম্যানকে খোসামোদ করে চুরি করে গাড়ী চড়বে আমার নাতি!' ঠাকুরদা অবশ্য ভবিষ্যৎদর্শী ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত চঞ্চলদের সাধ মিটত না, খেদ থেকে যেত। তারা ভাবত ঠাকুরদা কোনো কাজের লোক নন। ঐ যে বাবা বলে মানুষটি ওঁকে জানালে ফল হতে পারে। কিন্তু সাহস হয় না ওঁর কাছে যেতে, গেলেও মুখ ফোটে না। লোক ভালো, ডেকে আদর করেন, কিন্তু কই এদিকে তো তেমন মন দেন না। চঞ্চল ও নির্মল ভেবে উঠতে পারত না যে বাবা মানুষটি পরের হাতী-ঘোড়াকে গাধা জ্ঞান করতেন, তাতে না চড়াটাকেই তিনি সম্মানের বিষয় মনে করতেন।

কি জানি কি গুণে চঞ্চলের বাবা ছিলেন রাজবাড়ীর থিয়েটারের অনাহারী ম্যানেজার। ঠিক অনাহারী বলা যায় না, যেহেতু অভিনয়ের পরে অভিনেতাদের একটা ভোজ হত, কোনো কোনো দিনে আহূত ও অনাহূত দর্শকরাও আসন দখল করে পোলাও লুচি আম সন্দেশ মুখে ও পকেটে পুরত। এ বিষয়ে চঞ্চলের অধ্যবসায় যে কারুর চেয়ে কম ছিল তা নয়। স্টেজের গ্রীনরুমে তার অবাধ প্রবেশাধিকার থাকায় সে অভিনেতাদের জলখাবারেরও ভাগ পেত। অবশ্য সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পোষাক পরচুলা ও পাউডার দেখতো। হয়তো দস্যুদলপতি ধার করা গোঁপে তা দিতে দিতে তাকে বলতেন 'কি খোঁখা, কি দেখছ? তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাব।' চঞ্চল সত্যিই ভয় পেয়ে পালাবার ছল খুঁজত। দস্যুদলপতি হয়তো খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলতেন। চঞ্চলের চোখের জল চক্ চক্ করে উঠত। তখন মাজিয়ানা হয়তো বাধা

দিয়ে বলতেন, 'আহা কর কি, কর কি ? নাও খোকা, এই সন্দেশখানা খাও !' চঞ্চল একবার দস্যুর দিকে একবার মাজিয়ানার দিকে তাকিয়ে সন্দেশটা মুখে পুরে দে দৌড়। তারপর অভিনয় দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়ত, ঘুম ভাঙলে দেখতে পেত, তার কোন কাকা তাকে কাছে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন, মস্ত ভোজের আয়োজন। তখন সে নেপাল ভূপালকে দেখতে পেত না। তাদের বাবা রাজবাড়ীর কর্মকর্তা, ঠাকুর-চাকরের পরিচালক, তারা সকলের আগে খেয়ে মুখ ধুয়ে পুঁটলি বেঁধে গাড়ীতে করে বাড়ী গেছে। চঞ্চল পায়ে হেঁটে কিংবা কোন দয়ালু বান্ধবের কাঁধে চড়ে বাড়ী ফিরত। নির্মলকে ঠাকুমা ভুলিয়ে সন্ধ্যার আগে থেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, সে হয়ত মাঝে একবার উঠে প্রশ্ন করেছে, 'দাদা কোথায় ?' মিথ্যা উত্তর শুনে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

থিয়েটারে ধ্রুব সাজত একটি ছেলে ; চঞ্চলের থেকে বয়সে বছর দুই বড়। ওর মা নেই, বাপ মাতাল, ভিক্ষা করে বেড়াত, কেমন করে থিয়েটারে নেমেছে। ওকে দেখলে মায়া হয়। ঘোর অরণ্যের বাঘ-সিংহের মুখে পড়েও যখন হরিনাম করে তখন দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যায়। চঞ্চলের ঠাকুরদা ওকে বলেন, 'সেই গানটা গাও দেখি, রতন।' রতনলাল খেলাধুলায় কাঁচা, লেখাপড়াও তেমন জানে না। যাত্রার দলে পাঠ মুখস্থ ও গান কণ্ঠস্থ করে এসেছে এতকাল। সে হলো চঞ্চলের প্রথম বন্ধু। সে নেপালদের বাড়ী যায় না, এই তার প্রধান গুণ। রতনকে বন্ধুরূপে পেয়ে চঞ্চল নেপালের উপর টেক্কা দিল।

নেপালদের বৈঠকখানায় পাঠশালা বসত। অতি বৃদ্ধ গুরুমশায়ের পঞ্চাশ বছরের পুরোনো তেল চুক চুকে বেতখানার খ্যাতি চঞ্চলকে ওমুখো হতে দেয়নি। তবে তার বয়েস অনেক হল, প্রায় পাঁচ হতে চলল, লেখাপড়া না শিখলে গোরুর ঘাস কাটতে হবে যে। ঠাকুমা তাকে ক্ষীর খেতে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঠশালায় পাঠালেন। চঞ্চল পৌঁছে গুরুমশায়ের কাছে বেত্রবিহীন অভ্যর্থনা পেল, তিনি মাটির মেজের উপর খড়ি দিয়ে একটা শূন্য এঁকে তাকে দাগা বুলাতে বললেন। অখণ্ড মণ্ডলাকার পরম ব্রহ্মের প্রতিমূর্তি, না ওড়িয়া বর্ণমালার স্বাভাবিক ও সাধারণ আকৃতি এই শূন্য ? পাঠশালা না হাটশালা। একত্র বহু শিষ্য তুমুল বিক্রমে পাঠ মুখস্থ করছে, কেউ নামতা, কেউ বর্ণপরিচয়। যারা সব চেয়ে দুর্দান্ত ছেলে বলে পাড়ায় প্রসিদ্ধ তাদের গুরুভক্তি অতিরিক্ত সশব্দ। যতক্ষণ কোলাহল চলতে থাকে গুরুমশাই ঝিমতে থাকেন, যেই কেউ চিৎকার না করে ফিস্ ফিস্ করে অমনি অন্য কেউ বলে ওঠে, 'বলব ? গুরুমশাইকে বলব ?' গুরুমশাই তন্দ্রার ঘোরে একবার বেতখানাকে উঁচিয়ে তক্তার গায়ে আছাড় মারেন। মুক্ত তরবারির মতো সেই সুপক্ক বেত্রযষ্টি ক্ষণকাল ঝিকিয়ে ওঠে, পড়ুয়াদের চোখ ঝলসে দেয়। ওরা তীব্র স্বরে গর্জন করে ওঠে, এক ক্রোশ দূরের লোক টের পায় যে বুড়া অবধানের পাঠশালায় গর্দভরা মনোযোগী হয়েছে।

চঞ্চল একমনে শূন্যের উপর দাগা বুলিয়ে যায়, কথাটি কয় না, একেবারে নির্বাক। ঐ শূন্যটা দেখে একটা শূন্য এঁকেছে, অবশ্য ঠিক গোলাকার হয়নি। অবধান তার দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'কিরে তোর গলায় জোর নেই কেন? খেয়ে আসিসনি বল, ঠ অ, ঠ অ, ঠ অ।' চঞ্চল তাই বলে। জানে না যে ওড়িয়া ভাষায় ঠ অক্ষরটা সম্পূর্ণ গোলাকার বলে সেইটে সব আগে শিখতে হয়।

দু একদিন পরে চঞ্চল নেপালদের পাঠশালায় আসা ছেড়ে দিল। বলল, 'ওখানে কিছু শেখায় না। আমার নিজের একটা পাঠশালা চাই।' তাই হলো। বুড়া অবধানের এক ছোকরা আত্মীয় হলো চঞ্চলের গুরুমশাই। ঘটা করে ঠাকুমা চঞ্চলের হাতে খড়ি করালেন। স্লেট এল, পেনসিল এল, কাগজ এল, কলম এল। এক কাকা বাংলা বর্ণ পরিচয় করালেন, আর এক কাকা ইংরাজী। মাস কয়েক পরে সেই বিদ্যার জোরে চঞ্চল হাই স্কুলের লাস্ট ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেল। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় ও তার টিফিনে ভাগ বসায় রতনলাল।

ইস্কুলে ভর্তি হয়ে চঞ্চল ভেবেছিল পাঠশালা থেকে প্রমোশন পেল। যে সে ছাত্র নয় ইস্কুলের ছাত্র। 'ক গৌরব। কিন্তু যদু অবধান পাকড়াও করে বলল, 'সামনে সরস্বতী পূজা। তুই আমার বড় চাট' প্রধান শিষ্য। তোকে ছাড়ছিনে।'

প্রতাপগড়ের সরস্বতী পূজার তুলনা কোথাও আছে কিনা জানিনে। তার একটা বর্ণনা দেওয়া যাক। একটা ঝুনো নারকেলের ছাল ছাড়িয়ে সেটাকে একটা ঝুঁটিওয়ালা নেড়া মাথার মতো করা হয়। তারপর সেটাকে শক্ত করে কাপড়ে মুড়ে তার উপর সরস্বতী আঁকা হয়। সরস্বতীর বাহন একটা বিছে থাবা চাক। পূজার পরদিন 'বড চাট' নারকেলটি হাতে করে দলবল সমেত বাড়ী বাড়ী ঘুরে যা আদায় করে তার সমস্তটা এবং ঐ নারকেলটা অবধানের পাওনা। প্রত্যেক বাড়ীতে একটি 'ছান্দ' আবৃত্তি করতে হয় দলবলে ও সুর করে। বন্দহ হরি দেব মুরারি লক্ষ্মী দেবীঙ্কর কান্ত।' এই তার আদ্য। আগাগোড়া আবৃত্তি করেও যদি সাড়া না মেলে, যদি গৃহস্থ কৃপণ হয়, তবু 'বড চাট' নাছোড়বান্দা। সে আর একটি 'ছান্দ' সুরু করে। 'কোইলি লো বেশব যে মথুরাকুগলে, মথুরাকুগলে পুত্র বাহুড়ি নইলে, লো কইলি।' এর মর্মোদ্ধার করুণ রস গৃহস্থের স্ত্রী কন্যাকে কাঁদিয়ে ছাড়ে।

এসব ছান্দ' পাঁচশো ছ'শো বছর আগের। এত কাল পড়ুয়াদের মুখে মুখে চলিত হয়ে আসছে। 'কোইলি' শ্রেণীর 'ছান্দ' অবশ্য শুধু পড়ুয়াদের মুখে কেন রাখাল মাঝি ভিখারীর মুখেও শোনা যায়।

কিন্তু চঞ্চলের মনের ধারা অন্য রকম। সে কোনো জিনিষ মুখস্থ কিংবা কণ্ঠস্থ করতে চাইত না, পারত না। ভয়ানক লাজুক, সুর করে আবৃত্তি করা—বিশেষ করে পরের

বাড়ীতে অনাহুত উপস্থিত হয়ে—তাকে দিয়ে হবার নয়। দলবল থাকলে হয়তো পাবা যায়, কিন্তু চঞ্চল আব নির্মল দুই ভাই এই কবে বেড়াবে। বেড়ালো দুই এক বাড়ী, কিন্তু এমন জায়গায় বসলো যেখানে কারু চোখে পড়ে না, এমন সুবে আবৃত্তি করল যেন কারুব কানে যায় না। অবধানেব লোকসান চঞ্চলেব ঠাকুবদা পুষিযে দিলেন।

চঞ্চল যেদিন ইস্কুলে ভর্তি হতে যায় সেদিন ইস্কুলেব কেরাণী একটি ক্লাস নিচ্ছিলেন। চঞ্চলেব কাকা তাকে সেই ক্লাসে উপস্থিত কবলেন। চঞ্চলেব থেকে বয়সে চার-পাঁচ বছব বড় বুড়ো ছেলে চঞ্চলের দিকে হাঁ কবে চেয়ে বইল। চঞ্চল ভাবল, এই ক্লাসে যদি ভর্তি হই বেশ মজা হবে, বড় বড় ছেলের সঙ্গে বন্ধুতা হবে। কেবাণী জিজ্ঞাসা কবলেন, 'ফার্স্ট বুক পড়েছ ?' চঞ্চল ইংবেজী বিদ্যা জাহিব কবে বলল, 'নট।' অর্থাৎ না। তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি পড়ে গেল। চঞ্চল পালাতে পাবলে বাঁচে।

তাকে নিয়ে লাস্ট ক্লাসে পৌঁছে দেওয়া হলে তাব কাকা তাকে অকূলে ভাসিযে দিয়ে বিদায় নিলেন। বাজ্যেব দুবন্ত ছেলে সেই ক্লাসে জুটেছে, তাদেব কারুর কারুব বয়স চঞ্চলেব চেযে তিন চাব পাঁচ বছব বেশী। জলজ্যান্ত নেপাল সেখানে বসে। নেপালেব ছোট ভূপালকে দেখে চঞ্চলেব ভরসা হল যে তাব সমবযসীও সেখানে আছে। কিন্তু ভূপালকে ভর্তি হবাব অযোগ্য বলে মেজেতে অন্যান্য অনেকেব সঙ্গে বসিয়ে বাখা হয়েছে। চঞ্চলকে দেখে তাব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ভাবল চঞ্চল বুঝি তাবই দলেব। তা নয়। মাস্টার চঞ্চলকে বললেন, 'ঐ বেঞ্চিতে গিয়ে বসো।' কিন্তু বেঞ্চিতে তিল ধারণেব স্থান ছিল না। একটা বেঞ্চিতে প্রায় ত্রিশ জন ছেলে বসেছে, তাদেব সামনে একটা অতি পুবাতন ও অতি দীর্ঘ ডেস্ক। বেঞ্চিব মাঝখানে বসেছিল চঞ্চলেব স্বল্প পবিচিত প্রীতিকুসুম। চঞ্চলকে ইসাবা কবে বললে, 'এসো।' কিন্তু ঢোকবাব উপায় কি ? বেঞ্চির এক কোণা থেকে মাঝখানে যেতে হলে অনেক ধস্তাধস্তি কবে অতিকায ডেস্কটাকে নড়াবার চেষ্টা কবতে কবতে অগ্রসব হতে হয়। চঞ্চল টুপ কবে ডেস্কেব তলা দিয়ে প্রীতিকুসুমেব কাছে মাথা তুলল। কিন্তু বসবাব মত ফাঁক পেল অতি সংকীর্ণ। সেদিনকার মতো প্রায় দুটি ছেলের কোলেব উপর তাকে বসতে হলো। তাব সঙ্গে কোনো বই ছিল না বলে তাকে পড়া দিতে হলো না, মাস্টাব মশাই তাকে বইয়েব ফর্দ দিলেন। সেদিনকার মতো সে ছুটি পেয়ে আবাম পেল, তাব দুটি বাহনকেও আবাম দিল।

পরদিন সে খুব সকাল সকাল স্কুলে গেল। মতলবটা এই, সে বেঞ্চিতে সকলেব আগে জায়গা পাবে। পেলো জায়গা, প্রচুর জায়গা, কিন্তু একে একে অন্যান্য ছেলেরা এসে তাকে দুধাব থেকে ঠেলতে ঠেলতে তার জায়গার পনেবো আনা দখল কবল। অবশেষে জনকয়েক ষণ্ডা ছেলে সকলের শেষে এসে বেঞ্চির এক কোণার ছেলেকে এমন ধাক্কা

দিল যে সেই ধাক্কার জোরে বাকী সমস্ত ছেলে দু'হাত পিছলে গিয়ে অন্ত কোণার থেকে গোটা কয়েক ছেলে ছিটকে ডিগবাজি খেলো। চঞ্চলের যখন জ্ঞান ফিরলো সে দেখলো আবার যে-কে সে। আগের দিনের মতো সে দুটো ছেলের কোলের উপর বসে আছে।

একদিন স্নান করে উঠে চঞ্চলের ঠাকুরদা শীত-শীত বোধ করলেন এবং তার দিন কয়েক পরে চঞ্চলের ঠাকুমা আছাড় খেয়ে কাঁদলেন ও দুই হাতের চুড়ি আছড়ে ভাঙলেন। চঞ্চল তার আগে সত্যি সত্যি জানতো না মৃত্যু কাকে বলে, যদিও কখনো কখনো তার মনে হতো ঠাকুমা যদি মরে যায় তো সেও মরে যাবে। ঠাকুরদাকে আর দেখা গেল না বাইরের বারান্দার বেঞ্চির উপরে তাঁর অভ্যস্ত স্থানটিতে। তাঁর কাছে পয়সা চাইবার সুযোগ হলো না আর। ইস্কুলে গিয়ে টিফিনের ঘণ্টায় গজা খাওয়াও বন্ধ। ঠাকুরদার বন্ধু সেই সব কেলারা আর আসে না। কিছুদিন বাদে চঞ্চল ও নির্মলের এমন অসুখ করলে যে বাঁচে কি না বাঁচে। চঞ্চলের পরীক্ষা দেওয়া হলো না, কাজেই প্রমোশনও হলো না। তার ক্লাসের ছেলেরা তাকে পিছনে ফেলে চলে গেল। চঞ্চলের প্রথমটা ভারি লজ্জা বোধ হয়েছিল ওদের কাছে মুখ দেখাতে। কিন্তু নতুন ঘরে তাকে নিয়ে নতুন ক্লাস যখন বসল তখন চঞ্চল নতুন ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে ফেলল।

॥ তিন ॥

দিল্লীতে দরবার হয়ে গেছে, তার জের প্রতাপগড়ে চলছে। পে গ্রাউণ্ডে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হচ্ছে। চঞ্চল সাহেবী স্যুট পরে বুকে সম্রাট সম্রাজ্ঞীর মেডেল ঝুলিয়ে থিয়েটার দেখতে যায়। থিয়েটার দেখতে দেখতে তার সাধ যায় থিয়েটারের বই লিখতে ও বাড়ীতে অভিনয় করতে। চঞ্চল লিখেও ফেলল একখানা নাটক। তার মূল কথা—'ধরো অস্ত্র, করো যুদ্ধ।' তার যবনিকা পতনের আগে পতন ও মৃত্যু। দিল্লী দরবারের সময়কার পোষাক চঞ্চলদের থিয়েটারের কাজে লাগল। কাশ্মীরী শাল দিয়ে হলো থিয়েটারের সীন। গোটাকয়েক তীর ও ধনুক তৈরী করে নিতে হলো। নেপাল তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়ে। সে একবার হাঁটুগেড়ে বসে চঞ্চলকে তাক করে, আবার উঠে দাঁড়ায় ও ঘুরে বেড়ায়। দর্শক বলতে যে ক'জন বোঝায়, অর্থাৎ উভয় পক্ষের ঠাকুমা ও ছোট ভাইবোন, তাঁরা হাই তুলতে তুলতে পরামর্শ দিতে থাকেন। নাটক লেখার ঝকমারি এই যে নাট্যকারের নির্দেশ অনুসারে অভিনেতারা থামে না।

ঠাকুরদা মারা যাবার পরে চঞ্চলের সঙ্গে তার বাবার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল। তিনি

তাকে তাঁর বইয়ের আলমারির চাবি দিলেন। চঞ্চল বইয়ের মেলায় দিশেহারা হয়ে গেল। বুঝুক না বুঝুক রাজ্যের বই পেড়ে নিয়ে পড়ে ফেলল। একখানা নাম-পাতা ছেঁড়া বইতে ছিল ওয়াশিংটন, ম্যাজিনি, গারিবল্ডি প্রভৃতির জীবন-কথা। এক প্রকাণ্ড জীবন চরিতের নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নামের অর্থ যে কি তাই চঞ্চল ভাল বুঝতে পারত না। ভাবত নেপালে বোনা পাটের শাড়ী-টাড়ী কিছু হবে। পড়ত। পড়ে নিজের ভুল বুঝত। বাবার কাছে একথা পাড়লে তিনি বলতেন, 'বড় হয়ে তুই হবি জর্জ ওয়াশিংটন আর নির্মল হবে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।' চঞ্চল ভাবত জর্জ ওয়াশিংটন ক'টা যুদ্ধ জিতেছে, নেপোলিয়ন হলেই ভালো হয়।

চঞ্চলের বাবা কি একটা কাজে মফঃস্বলে যাচ্ছিলেন ; চঞ্চল তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভাইবোনকে না নিয়ে একলা তাঁর সঙ্গী হলো। ভাইবোনকে ভুলিয়ে পাঠিয়ে দিল ঠাকুর দেখতে ; তারা টেরও পেল না দাদা কখন ও কোথায় গেল।

গোরুর গাড়ী পশ্চিম মুখে চলল। ডানদিকে একটা উই ঢিবি। ওটাতে হাজার কাঁকড়া বিছের বাসা। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন উই পোকাদের ডানা গজায় তখন কাঁকড়া বিছেরা ওদের শিকার করতে গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসে। বাঁদিকে অনেকগুলো আম গাছ। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই সব আম গাছে দোলনা খাটিয়ে ছোট বড় সকলেই দোলে।

গাড়ী উত্তরমুখী হলো। দুদিকে গুড়িয়াসাহি (ময়রাপাড়া) ; নায়কসাহী, সেখানে যারা থাকে তারা পুরুষানুক্রমে জ্যোতিষী ও গুরুমশাই। যদু অবধান এই জাতের ও এই পাড়ার লোক। দুটো একটা মুদির দোকান ছাড়িয়ে হনুমানের আস্তানা। এখানে রাজ্যের যত গুলিখোর রাত্রে জড় হয়। তাদের অধিকাংশ নাপিত। দিনের বেলা এই নাপিতেরা এইখানকার বকুল গাছতলায় গুলির হুঁকো ছেড়ে ক্ষুর কাঁচি নিয়ে বসে। নিকটেই করণসাহী। করণদের পেশা কলম চালানো। তারা এদেশের কায়স্থ। শিক্ষা-দীক্ষায় তারা খুব অগ্রসর। তবে তাদের সম্বন্ধে শোনা যায় তারা খালি পেটেও ঢেকুর তোলে, গোঁপের গোড়ায় একটুখানি ঘি লাগিয়ে তারা বোঝাতে চায় তারা আজ ঘি-ভাত খেয়েছে। কথায় বলে করণ সামন্তের 'ঢম' (বড়াই)।

হাটখোলা ডানদিকে ও বালিকা বিদ্যালয় বাঁ দিকে রেখে চঞ্চলদের গোরুর গাড়ী ঢিমে চালে চলল। পাশে আরো একটা করণসাহী, তারপরে পাঠানসাহী (মুসলমান পাড়া)। প্রতাপগড়ে মুসলমান সাত-আট ঘরের বেশী না, খ্রীষ্টান দুই ঘর, ফিরিঙ্গী এক ঘর, ব্রাহ্ম এক ঘর। চঞ্চলদের বাড়ীর কাছে ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের বাংলো। মুসলমান কোচম্যান তো চঞ্চলদের প্রতিবেশীই, একজন খ্রীষ্টানও।

ব্রাহ্মণশাসন বাঁ দিকে রেখে গোরুর গাড়ী চলতে থাকে। ব্রাহ্মণশাসন হচ্ছে উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণদের পাড়া। শাহী না বলে শাসন কেন বলে? সম্ভবত শাসন শব্দের

এক্ষেত্রে অর্থ, রাজদত্ত ভূমি। এরা কোনকালে কান্যকুব্জ থেকে এসেছিল, এখনো সেই গর্বে অপরকে নিজের পা-ধোয়া জল খাওয়ায়। তবে এই অহঙ্কারী ব্রাহ্মণদের কুলজী ঘাঁটলে অনেক মজার মজার খবর প্রকাশ হয়ে পড়ে। কাউকে কুড়িয়ে পেয়ে কোন এক রাজা মানুষ করেছিলেন। তার পদবী ছিল 'দাশ'। তারপরে রাজার ইচ্ছায় সেই পদবী বদলে হলো 'ত্রিপাঠী।' সেই যে গল্পে আছে একদা এক ঋষি এক ইঁদুরকে ক্রমে ক্রমে বাঘ করে দিয়েছিলেন, তেমনি 'ত্রিপাঠী' থেকে 'পানি', তার থেকে 'শতপথী', তার থেকে 'মিশ্র।' রাজরোষে 'মিশ্রও' ক্রমশ 'দাশ' হন। এদিকে ব্রাহ্মণের পুঁথিতে রাজবংশও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হয়ে পৌরাণিক পূর্বপুরুষ দাবী করেছেন।

গোরুর গাড়ী ডাক্তারখানার কাছে আবার পশ্চিমে ফিরল। গড়টাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে—উপরগড় ও তলগড়। রাজবাড়ী ও চঞ্চলদের বাড়ী উপরগড়ে। ব্রাহ্মণশাসন ও ডাক্তারখানা তলগড়ে। তলগড়ের পরেও গড়ের সম্প্রসারণ হয়েছে। ছুতোর মুচি ইত্যাদি নানা জাতের লোক এসে বাসা বেঁধেছে। তাদের সাহীর নাম মাণ্ডবাসাহী। মাণ্ডবাসাহী নামটা বোধ করি মণ্ডপ থেকে। দোলমণ্ডপ সেই সাহীতেই। দোলযাত্রার সময় এইখানে উৎসব হয়। প্রতাপগড়ের উৎসব ও উৎসব স্থানগুলোর বিবরণ ও বর্ণনা যথাসময় দেওয়া যাবে। এখন চঞ্চল যাচ্ছে অনেক দূর—বউলপুর। মাণ্ডবাসাহী শেষ হতেই তার একটু একটু ভয় করতে লেগেছে। বাঁদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের নাম যাচিত্র বাটিয়া। এর পরিমাণ শ দুই বছর আগে ৬০ বাটি ছিল। ১ বাটি=২০ মাণ। ১ মাণ=১ একর। ১ একর=৩ বিঘা। তাহলে ৬০ বাটি হলো গিয়ে ৬০×২০×৩=৩৬০০ বিঘা। আগে ওখানে যুদ্ধ হতো, এখন ওখানে চাষ হয় ও শবর ইত্যাদি বুনোরা কুঁড়ে তৈরী করে বাস করছে। এখনো বিজয়া দশমীর দিন একটা নকল যুদ্ধ হয়। কিন্তু সে কথা পরের। আগে তো চঞ্চল বউলপুরে পৌঁছাক।

সামনে কোরিয়া পাহাড় দেখে চঞ্চলের মনে পড়ে গেল এখানে দিনে-দুপুরে বাঘের ভয়। যে সে বাঘ নয়, মহাবল বাঘ, যাকে বলে Royal Bengal Tiger. সে দিন একটা মরা বাঘকে গোরুর গাড়ীতে বোঝাই করে এনেছিল, তার সবটা আঁটেনি। কি বিকট গন্ধ, কি বড় বড় ডোরা, মূলোর মতো দাঁত, ঝাঁটার মতো গোঁপ, ওর নখের তুলনায় বেড়ালের নখ যেমন মাংসের হাড়ের তুলনায় মাছের কাঁটা। দুটো গোরুকে দুই বগলে পুরে লাফ দিয়ে বাড়ী যায় এই বাঘ। মানুষ তো এর স্কুলের টিফিন। চঞ্চলের ইচ্ছা করতে লাগল গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে বাড়ী ফিরতে। কিন্তু সে যে ভয়ানক লজ্জার কথা। বাবার দুই বন্ধু পিছনের গাড়ীতে করে আসছেন। তাদের একজনকে চঞ্চল নাম দিয়েছে পাশা খেলার রাজা। পাশা খেলবার সময় তিনি পোয়া বারো, দশ দুই বারো ইত্যাদি এমন হুংকার ছেড়ে বলেন, তাঁর গোঁপ এমন জোঁকালো এবং থিয়েটারে তিনি

ডাকাত সেজে এমন চোখ পাকান যে চঞ্চল তাঁর কাছে নেহাৎ জড়সড়। কাজেই তার বলতে সাহস হয় না, বাবা, ফিরে যেতে চাই। তার বাবাও কড়া মেজাজের মানুষ। যদি বলেন, 'ফিরে যাবি তো আসতে বলছিল কে?'

চঞ্চল বলল, 'বাবা, আর কতদূর?' তার বাবা বললেন, 'এখনো অনেকটা পথ বাকী।'

কোবিয়ার কাছে দিয়ে যাবার আগে চঞ্চল ঘুমিয়ে বাঁচল। সন্ধ্যাবেলা যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে দেখল গাড়ী এক জায়গায় থেমেছে, বাবা নেই। একটি মাটির ঘরের বারান্দায় চাপরাশী বানু রান্না চড়িয়েছে। চঞ্চল নেমে একটু পায়চারি করল। এই বউলপুর? সে যেমন কল্পনা করেছিল তেমন নয়। সরু রাস্তার দুধারে কাঁচা বাড়ী, মাটির উপর খড়। কতগুলো ন্যাংটা ছেলেমেয়ে উঁকি মেরে তাকে দেখছে ও ফিস ফিস করে কি বলাবলি করছে।

পরদিন সকালবেলাটা চঞ্চলের চমৎকার কাটল। গ্রামের প্রধানরা এসে তাকে অভ্যর্থনা করল, বেড়াতে নিয়ে গেল। কিন্তু দুপুরে বিছানায় শুয়ে তার কেবল মন কেমন করে। মনে হয়, না এসে থাকলেই ভালো করে থাকত। সকলে ইস্কুলে যাচ্ছে, নেপালদের আঙিনায় লুকোচুরির খেলা জমছে, নির্মল নিশ্চয় দাদার কথা ভেবে কাঁদছে। চঞ্চলের কান্না পায়, সে চুপি চুপি কাঁদে।

বৈকালে একটি সমবয়সী ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হলো। ছেলেটির পরনে গেরুমাটি দিয়ে ছোপানো কাপড, কোঁচা দিয়ে চাদরের মতো করে গলা জড়ানো। তার দুই হাতে দুগাছা আঁট বালা—রুপোর কি কাঁসার—তার নাম গুরুবারী। বোধহয় গুরুবারে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে তার জন্ম। গুরুবারীকে প্রশ্ন ক'রে চঞ্চল জানল পড়াশুনায় সে পশ্চাৎপদ। গ্রাম্য ছেলে, গ্রামের ইস্কুলে যা পড়ায় তাই তো সে পড়বে। ইংরেজী শেখেনি। কিন্তু সাহিত্য-পুস্তকের পদ্যগুলি সুর করে আবৃত্তি করতে শিখেছে। চঞ্চলরা যেখানে উঠেছে সেইটেই গুরুবারীদের ইস্কুল। চঞ্চলদের আগমনে ইস্কুলের ছুটি হয়েছে।

ছেলেটি প্রিয়দর্শন, নম্র অথচ সপ্রতিভ। চঞ্চলকে সে কত গল্প বলল। কাছেই ব্রাহ্মণী নদী। তার সঙ্গে গিয়ে স্নান করতে চঞ্চলের অভিলাষ ছিল। নদী, চঞ্চলের পক্ষে এক অপূর্ব দৃশ্য। পাহাড়ের মানুষ নদীর কি জানে?

কিন্তু তার বাবার সেখানকার কাজ ফুরিয়ে গেল দু'দিনেই। কাজেই চঞ্চলকে বিদায় নিতে হলো অকালে এক সকালে।

আমেরিকা আবিষ্কার করে এসে কলম্বাস যতটা উৎফুল্ল হয়নি বউলপুর ঘুরে এসে চঞ্চল হলো তার বেশী। সে ব্রাহ্মণী নদীতে স্নান করেছে, কোবিয়া পাহাড় দুই দুইবার

পার হয়েছে, জ্যান্ত বাঘ না দেখুক বাঘের গর্জন শুনেছে। ঝুঁটি-বাঁধা প্রধানরা তাকে আদর করে বাড়ী নিয়ে গেছে, তাদের বাড়ীর বৌ-ঝিরা তাকে যত্ন করে পিঠা খাইয়েছে। প্রধান মশাইদের কানে কুণ্ডল, গলায় চাদর, পরনে মোটা খাদি। তাদের গিন্নিদের শাড়ীও মোটা খদ্দরের, গ্রামের তাঁতির তৈরী। গিন্নিদের নাকে কানে হাতে পায়ে কাঁসা ও পিতলের মস্ত ভারি ভারি গয়না। পায়ে বেড়ীর মতো গয়না, হাতে চোঙের মতো গয়না, গলায় সিকি-আধুলির মালা, নাকে অন্তত তিনটে নাকচনা ফুলগুনা দণ্ডী, কানের আধখানা কেটে ঝুলে পড়ছে গয়নার ভারে। অনবরত হলুদ মাখতে মাখতে এদের গায়ের রং হলদে হয়ে গেছে। এদের বাড়ীতে কাঁসা পিতলের ইয়া ভারি ভারি থালা বাটি 'বেলা' ঘটি ঘড়া। মোটা মোটা কাঠের চিরুণী বেতের কিংবা বাঁশের পেড়ি. বুনো পাতার মাদুর, শিকায় তোলা হাঁড়িতে রাখা চাল ডাল ঘি তেল গুড়।

চঞ্চল যা দেখে এসেছিল তা বহুগুণ বাড়িয়ে বলল; তার বন্ধুরা প্রতিদিন তার কাছে গল্প শুনতে আনাগোনা করল; কয়েকদিন পরে বউলপুরের কোনো কোনো প্রধান রাজকার্যে এসে তার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করে গেল তখন চঞ্চলের শ্রোতারা বুঝল চঞ্চল সামান্য মানুষ নয়।

বউলপুর থেকে ফিরে চঞ্চলের চোখে পৃথিবীটার চেহারা বদলে গেল! পাহাড়ের সঙ্গে তার প্রত্যহ দেখা হয়, কিন্তু পাহাড় যে কী জিনিষ তা সে হাতে-কলমে জানত না। তার ধারণা ছিল পাহাড় হচ্ছে হিমালয়ের ছেলে, মৈনাকের ভাই. ইন্দ্র তাদের ডানা কেটে ফেলেছে। ওরা যে আবার কোন দিন উড়ে নিরুদ্দেশ হবে এমন আশঙ্কা চঞ্চলের ছিল! এবার কোরিয়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে গিয়ে সে পরিষ্কার বুঝতে পারল পাহাড় আর কিছু নয় মাটি পাথরের ঢিবি, তার উপর আম জাম কাঁঠাল কুল ইত্যাদি অতি পরিচিত গাছপালা দাঁড়িয়েছে, কাঠবিড়ালী খেলা করছে, ঘুঘু ডাকছে। অবশ্য খুব উপরে উঠতে পারলে অপরিচিতের নাগাল পাওয়া যেতো। বড় হলে বন্দুক হাতে করে যাওয়া যাবে।

চঞ্চলের চোখে পাহাড়ের সে রহস্য আর রইল না। পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে তার যে ভ্রান্তি ছিল তাও দূর হল। আগে ভাবত, উঃ কত কাছে! এখন জানল বেশ কিছু দূরে। পৃথিবীটা প্রতাপগড়ের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর বিস্তৃত। গড় পর্বতের ওপারে নিশ্চয়ই লোকালয় আছে। কোরিয়ার ওপারে যদি থাকে তবে গড় পর্বতের ওপারেও থাকবে না কেন? ওরাও হয়ত ভাবছে এপারে বুঝি কেউ নেই, কিছু নেই।

চারদিকে চারটে দেয়ালের মতো পাহাড়। ঘরের ভিতর দিক থেকে এতদিন তাদের দেখা যেতো। এবার বাইরের দিক থেকে তাদের একটাকে দেখে আসা গেল। বাইরে থেকে দেখতে কিন্তু ঠিক এই রকমটি নয়! সে দিকে হয়ত জঙ্গল বেশী, সিঁড়ির মতো

অনেক ধাপ। ছুরির যেমন দুই পিঠ সমান পাহাড়ের তেমন নয়, কাঁচির যেমন দুই পিঠ বিষম, পাহাড়ের তেমনি।

পাহাড়ের মতো নদী সম্বন্ধে চঞ্চলের জ্ঞান তার ক্ষুদ্র জগৎটিকে একটুখানি বৃহৎ করল। সে পুকুরে স্নান করতে ও পদ্ম তুলতে গিয়ে এখন ভাবে না যে এত জল কোথাও নেই, এপার থেকে ওপারে চোখ যায় না। পুকুরের আকর্ষণ চঞ্চলকে তেমনি উতলা করে, কিন্তু নদীর স্মৃতির দ্বারা পরিমাপ করলে পুষ্করিণীকে চোখে ধরে না।

যে পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে চঞ্চল ইস্কুলে যেতো সে পথের পরিমাণ আগে মনে হতো কি জানি কয় ক্রোশ, কোনো মতে ফুরাতে চায় না। এখন চঞ্চল সকাল সকাল ইস্কুলে পৌঁছায়। তার চলার গতি বেড়েছে, না পথের অর্ধেকটা কেউ চুরি করেছে? সেই কারখানা-ঘর সেই খেলার মাঠ, সেই শাল-বাংলা, সেই চড়াই-বগড়া ইত্যাদি আছে, টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো গুণলে সেই ক'টাই হয়, তবু কোথায় যেন কি ছিল আর নাই। সব জিনিষের আকার ছোট হয়ে গেছে, বিপুলতা লোপ পেয়েছে। আগে চঞ্চল হাঁ করে চেয়ে থাকত, কোথা দিয়ে কখন ইস্কুলের ঘণ্টা বাজত টের পেত না, ইস্কুলের হাতায় ঢুকে দেখত বাইরে কোনো ছেলে নেই সকলেই ভিতরে, অমনি ভয়ে তার পা কাঁপতো। লেট! কি জানি ক' মিনিট লেট। এখন বউলপুরের রাস্তার তুলনায় ইস্কুলের রাস্তা এতটুকু, যে লেট হতে চঞ্চলের লজ্জা করে।

দিন দু-তিন ইস্কুল কামাই করে তার ইস্কুলে যাবার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়েছিল। ইস্কুলের পড়াশুনার প্রতি তার তেমন মনোযোগ ছিল না, কিন্তু সমবয়সীদের সঙ্গে একত্র হয়ে পড়া খেলা গল্প ও মারামারি করতে তার উৎসাহ কারুর চেয়ে কম ছিল না। তার সহপাঠীদের মধ্যে কিন্তু সমবয়সী ছিল মাত্র কয়েকজন। অন্যেরা পাড়াগাঁয়ের ধাড়ি ছেলে, বিয়ে করে সহরে পড়তে এসেছে, যেমন বিলেতে যাবার সময় আমাদের যুবকরা বিয়ে করে যায় ও কম বয়সের ইংরেজের ছেলের সঙ্গে বি. এ. পড়ে।

সমবয়সী সহপাঠী না পেলে পড়াশুনায় প্রতিযোগিতার ভাব আসে না। চঞ্চল জানে সে যতই মন দিয়ে পড়ুক নটবর, নবঘন, দীনবন্ধু, দৈত্যারি কোমর বেঁধে বই মুখস্থ করছে। ওরা গ্রামের পাঠশালা থেকে পাটীগণিত যা শিখে এসেছে তা নিয়ে ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত তাদের অনায়াসে চলবে। ব্যাকরণ তাদের কণ্ঠস্থ, বিশেষত যাদের বাড়ীতে সংস্কৃত চর্চা আছে। তাদের ভাষা তারা ভালো বোঝে, কাজেই সাহিত্যে তারা অপরাজেয়। ইতিহাসে মস্তিষ্কের চেয়ে স্মৃতিরই পরাক্রম বেশী, ওরা প্রত্যেকটি লাইন যত্ন করে মনের শিকায় তুলে রেখে দিয়েছে। মাস্টার যদি জিজ্ঞাসা করেন অশোকের কথা, ওরা সুরু করে, 'একদা চন্দ্রগুপ্ত নামক মৌর্যবংশীয় যুবক—'

একমাত্র ইংরেজীতেই চঞ্চলের যা কিছু ব্যুৎপত্তি এবং ভূগোলের প্রতি তার আন্তরিক

প্রীতি। ড্রয়িং তার ভালো লাগলেও ড্রয়িং বুকের নকল তার পছন্দ হয় না। মাস্টার-মশাই বইয়ের নক্সার সঙ্গে ছাত্রের নক্সা মিলিয়ে এক নম্বর নকলনবীশকে দেন সব চেয়ে বেশী নম্বর, আর বেচারা চঞ্চল যে টুল আঁকতে গিয়ে ব্যাং এঁকেছে সে জন্য পায় গোল আলু—মাস্টারমশাইয়ের স্বহস্তে অঙ্কিত গোল আলু—

ইংরেজীর দরুন ক্লাসের বুড়ো ছেলেরা চঞ্চলকে খাতির করে পাশে বসাতে ব্যগ্র হয়, বিপদে পড়লে চুপি চুপি তার কাছে শব্দের বানান কিংবা উচ্চারণ কিংবা মানে জেনে নেবার আশা রাখে, ডিক্টেশনের সময় তার খাতার থেকে এক চোখে চুরি করে। বোধ হয় সেই একই কারণে মাস্টারমশাইরাও চঞ্চলকে একটু অতিরিক্ত স্নেহ করেন। অন্যের পিঠে পড়বার বেতের কন্‌ট্রাক্ট তাঁরা চঞ্চলকে দিয়ে রেখেছেন, অর্থাৎ অপরে যে বেত খাবে চঞ্চল সেই বেত সংগ্রহ করে আনবে। বেত যাদের নিত্যকার খোরাক সে সব ছেলেরা চঞ্চলকে খোসামোদ করে বলে, 'দেখিস ভাই, বেতখানা যেন হালকা ও ঘুন ধরা হয়। তা হলে মাস্টারেরও মান থাকে আমাদেরও প্রাণ থাকে।'

॥ চার ॥

অন্যান্য ছেলেরা বই পড়ে মারের ভয়ে, কিংবা পাশ হবার আশায়। চঞ্চল বই পড়ে কৌতূহল মেটাতে। প্রতাপগড়ের বাইরে কত দেশ কত নদী কত পর্বত কত সমুদ্র কত রাজপ্রাসাদ কত মন্দির কত দোকান পাট কত যুদ্ধ ক্ষেত্র, কত রকমের মানুষ কত রকমের জীবজন্তু আছে, বইতে সে কথা লিখেছে। সাদা কাগজের পিঠে কালো কালির হরফ, বানান করে পড়তে জানলে ওরই ভিতর যা লুকানো রয়েছে তার সন্ধান পাওয়া যেন আলিবাবার পক্ষে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া। চঞ্চল বইয়ের বাছবিচার করে না, যা হাতে পায় তাই পড়ে অবাক হয়ে যায়। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা কোম্পানীর ক্যাটালগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী তার কাছে সমান আশ্চর্যকর। একই রকম কাগজ ও হরফ, কিন্তু এমন করে সাজিয়েছে যে একেবারে স্বতন্ত্র জিনিষ হয়ে উঠেছে। এক একখানা বইয়ের মধ্যে এক একটি রাজ্য, প্রত্যেকটি অপরিচিত, প্রত্যেকটি চঞ্চলের নিজের আবিষ্কার। সে তার নিজের বিদ্যার দ্বারা এই সমস্ত জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে, এদের মধ্যে প্রবেশ করে সে প্রতাপগড়কে বিস্মৃত হতে শিখেছে। যতক্ষণ সে আয়েষা তিলোত্তমা ওসমান জগৎসিংহের সঙ্গ পায় ততক্ষণ নেপাল ভূপালরা তার সঙ্গ পায় না।

বাবার আলমারির চাবি হাতে পেয়ে চঞ্চল যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছে। তাকে নিষেধ

করবার কেউ নেই, সে যখন খুশি বইগুলোকে নামিয়ে তাকে তাকে সাজায়, যেটা ইচ্ছে সেটা পড়তে বসে, বাকীগুলোকে মেজেতে ফেলে রাখে। চঞ্চলকে বই যেমন তন্ময় করে, কোনো দৃশ্য তেমন করে না। কেউ যদি তাকে নন্দনকাননে ছেড়ে দেয় ও একখানা বই তার সামনে ফেলে রাখে, তবে সে বইখানাই আগে পড়বে, তারপরে চেয়ে চেয়ে দেখবে পারিজাত ফুটেছে।

আলমারিতে ইংরেজী বই কিছু ছিল। ক্ষুদে হরফে পাৎলা কাগজের উপর ছাপা মোটা একখানা শেক্‌স্‌পীয়ার তাদের মধ্যে। চঞ্চল একবিন্দু বুঝতে পারত না, শুধু পাতা উল্টিয়ে ছবি খুঁজে বের করত। বিদেশী পোষাক পরা স্ত্রী পুরুষ, বিদেশী আসবাব ভরা ঘর, বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র ধরা যোদ্ধা। এই শেক্‌স্‌পীয়ার থেকে তার কাকারা ও তাঁদের বন্ধুরা একবার জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পরে ব্রুটাস ও য়্যাণ্টনীর পালা অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের একটি কথাও সে বুঝতে পারেনি, কেবল লক্ষ করেছিল বাবার আফিসের একজন কর্মচারীকে সাদা কাপড়ে ঢেকে মড়া বানানো হয়েছিল। মড়াটি উৎরেছিল বেশ। তবে তাকে স্টেজ থেকে সরানোর সময় সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ভূতের মতো।

কাকাদের ইংরেজী প্রাইজের বইও সেই আলমারিতে ছিল। তাতেও ছবি। তবে একটু ভিন্ন ধরনের। প্রায় সবগুলি ছোট ছেলেমেয়ের ছবি। বিলিতী মাঠ বাগান কুকুর ভেড়া ঘোড়া। গির্জে চিম্‌নিওয়ালা বাড়ী, রেলগাড়ী। এ সব বই পড়তে তার এত ইচ্ছা করে, কিন্তু কে পড়াবে? ইস্কুলে তখনো ফার্স্ট বুক চলছে। কাকারা কলেজে পড়তে প্রতাপগড় থেকে চলে গেছেন। মাঝে মাঝে ছুটিতে বেড়াতে এসে অভিনয় করেন, ফুটবল খেলেন, চঞ্চলের ইস্কুলের পড়া ধরেন। বাবার উপর সংসারের ভার এই প্রথম পড়েছে, ঠাকুরদার মৃত্যুর পর। তিনি চঞ্চলকে সাহায্য করবার সময় পান না। চঞ্চল করবে কি? তার মনে বড় কষ্ট হয়। ভাবে বড় হয়ে ঐ সব ইংরেজী বই পড়ে বুঝতে পারবে। বড় হয়ে কত কাজ শেখবার আছে, কত দেশ দেখবার আছে, কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে, প্রতিযোগিতা হবে। বড় হওয়া পর্যন্ত এত জিনিষ মুলতুবি থাকলে, ইংরেজী বইয়ের রহস্যভেদ সেও কেন স্থগিত থাকবে না? তবু মনটা খারাপ হয়ে যায়। কবে বড় হবে কে জানে?

বড় বড় ছেলেদের প্রতি চঞ্চলের যেমন শ্রদ্ধা তেমনি ঈর্ষা তেমনি ভয়। ইস্কুলের উপরের ক্লাসে যারা পড়ে নীচের ক্লাসের ছেলেরা তাদের ছায়া মাড়ায় না, তাদের সম্বন্ধে কথা উঠলে 'বাবু' বলে তাদের উল্লেখ করে। 'গোবিন্দবাবু' রাইট উইংএ খেলেন, 'বসিরবাবু' (মুসলমান) গোলকীপার থাকেন, 'স্যামুয়েলবাবু' রেফারী হন। ভোলিবাবু (ভোলানাথ) সেদিন একজন মাস্টারের অসুখ করায় তাঁর ক্লাস নিয়েছিলেন। ক্লাস নিতে

এসে তাঁর শৈশবে তিনি যত বেত পেয়েছিলেন একদিন বিনা বেতনে মাস্টারি করে তার সমস্ত শোধ করে দিলেন। ক্লাসের কটা ছাত্রকেই গাধার টুপি পরিয়ে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে কিংবা নীল ডাউন করিয়ে তিনি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'এ ক্লাসে পড়াশুনা আজকাল একেবারে হয় না। আমাদের সময় আমরা ফার্স্ট বুক খানাকে নাটকের মতো অভিনয় করেছি। তাই এখনো সমস্ত আমার কণ্ঠস্থ আছে। বই দেখতে হয় না। ইস্কুলে এসে যা শিখলে তা যদি বাড়ীতে গিয়ে প্রয়োগ না করলে তবে তোমাদের শিক্ষা বৃথা। আমি যখন তোমাদের ক্লাসে পড়তুম তখন বাজার করতে গিয়ে দোকানদারকে ভয় পাইয়ে দিয়ে চার পয়সার চিনি তিন পয়সায় কিনতুম। দোকানদারকে হাঁক দিয়ে বলতুম, **If you wish to be stout and strong get up at five ; go to bed at nine.**

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা ছড়ি হাতে সামনে দাঁড়িয়েছে, মস্ত বড় একটা মাটির ফুটবল (তাকে নাকি বলে গ্লোব) নাড়া চাড়া করছে, লাইব্রেরী থেকে ছবিওয়ালা ইংরেজী বই বাড়ী নিতে পাচ্ছে, ডোরাকাটা রঙিন পোষাক পরে ফুটবল ম্যাচ খেলছে, দলবল নিয়ে দেশ ভ্রমণ কিংবা বনভোজনে যাচ্ছে, এসব দেখে চঞ্চলের ঈর্ষা হয় ও ইচ্ছা করে রাতারাতি বড হয়ে উঠতে। তখন সকলে তাকে চঞ্চলবাবু বলে ডাকবে, তুই কিংবা তুমি না বলে আপনি বলবে, হাত তুলে নমস্কার করবে। নাঃ, বড় না হয়ে সুখ নাই।

হেড মাস্টারমশাই ক্বচিৎ চঞ্চলদের ক্লাসে আসতেন। তিনি কাউকে মারতেনও না, বকতেনও না, কিন্তু ব্যঙ্গ করতেন। তাঁর আদর করবার পদ্ধতি ছিল মাথাব চুল ধরে টানা। পিঠে নরম নরম কিল মারা। মানুষটি মিঠে কড়া। ছুটি চাইলে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেন। প্রমোশন সহজে দিতেই চান না। কথায় কথায় ব্যঙ্গ। আবার কত গরীব ছেলেকে নিজের খরচে পড়ান। ছাত্রের অসুখ শুনলে নিজে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেন।

অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার কেউ স্থায়ী হন না। এক এক জনের এক এক রকম স্বভাব। অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে যাদের সঙ্গে চঞ্চলদের প্রতিদিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাঁদের একজন হচ্ছেন সেকেণ্ড পণ্ডিত, ইংরেজী মাত্র তিনটি অক্ষর জানেন—B. M. S. অর্থাৎ ভজমন সাহু। ইনি নিজের বেত নিজে সংগ্রহ করে সঙ্গে রাখেন, আস্ফালন করেন বেশী, প্রহার করেন কম। ইনি বসে বসে দুলতে থাকেন, যেন দোলনা চেয়ারে বসেছেন। মাঝে মাঝে ঢুলতেও থাকেন। এঁর ঘণ্টায় ছেলেদের স্বরাজ। তারা নানা ছলে ছুটি নিয়ে আমবাগানে ছুটে হল্লা করে। ঘণ্টা বাজলে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসে। আর একজন হচ্ছেন মোতিবাবু, ক্লার্ক। ইনি বেত পছন্দ করেন না। এঁর সব চেয়ে ভাল লাগে পেন্সিলের আগাটিকে ছুরি দিয়ে ছুঁচলো করে ছাত্রের কানের মাংসল অংশে

কাঁটার মতো বিঁধে বেশ কিছুক্ষণ মোচড় দিতে। নূতন নূতন শাস্তি উদ্ভাবন করতে ইনি অদ্বিতীয়। বেঞ্চির উপর দাঁড়াও, কিন্তু ডান কানটি বাঁ হাতে ও বাঁ কানটি ডান হাতে পাকড়ে। ইনি ড্রিল মাস্টারিও করেন। মাঝে মাঝে ভুলে যান যে অঙ্কের ঘণ্টায় ড্রিল শেখানোর কথা নয়। নতুবা দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর করে বসে কোমরে হাত রেখে টাল সামলাবার জন্য 'বায়া চক্রা' (পাগলা চক্রধরকে) হুকুম দিতেন না।

প্রীতিকুসুমের দাদামশাই এঞ্জিনীয়ার ও রায়বাহাদুর। বৃদ্ধ বয়সে প্রতাপগড়ে চাকুরি নিয়েছেন। তাঁর পুসপুস্ গাড়ীতে চড়ে তিনি রাস্তা, পুল, এমারৎ তদারক করে বেড়ান। তাঁর বাড়ীতে নদীয়া থেকে কীর্তনের দল আসে, তিনি পরম বৈষ্ণব। তাঁর প্রভাববশত প্রতাপগড়ের রাজাও বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের পছন্দ করেন, কেবল বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের কেন বাঙ্গালী জাতটাকেই। প্রতাপগড়ের রাজবাড়ীর থিয়েটারে যে বাংলাভাষায় অভিনয় হয় এবং সেই অভিনয়ের ভাষা শেখে প্রতাপগড়ের লোক, এই অপূর্ব ব্যাপারের মূলে রায়বাহাদুরের প্রভাব।

চঞ্চলের বাবাকে রায়বাহাদুর স্নেহ করেন, তাই চঞ্চলরা প্রীতিকুসুমদের বাড়ী যায়, তাদের সঙ্গে ব্যাড্‌মিন্টন খেলে। প্রীতিকুসুমদের ওখানে যেমন গানের ও ছবি আঁকার, খেলাধুলা ও অভিনয়ের চর্চা, তেমন আর কোথাও নয়। প্রতাপগড়ের মতো একটা বুনো জায়গায় প্রীতিকুসুমদের বাড়ীটি যেন একাই একটি সহর। তাদের লোকসংখ্যাও অনেক, প্রায়ই তাদের আত্মীয়স্বজন দেশবিদেশ থেকে আনাগোনা করেন। প্রকাণ্ড বেড়া দেওয়া কম্পাউণ্ড। বাইরে অত্যুচ্চ দেবদারু গাছের সারি। রাত্রিবেলা ওখানকার সড়ক দিয়ে চলাফেরা করতে গা ছমছম করে। প্রীতিকুসুমদের সঙ্গে খেলা করে সন্ধ্যার আগে চঞ্চলরা বাড়ী ফেরে। যদিও দুই বাড়ীর ব্যবধান মাত্র দুশো হাত, তবু ছোট ছেলেদের চোখে সেই অনেকখানি। বিশেষতঃ সন্ধ্যার অন্ধকারে, দেবদারু বীথিকায়।

নিজেদের বাড়ীতে চঞ্চল যে আবহাওয়ার অভাব বোধ করত প্রীতিকুসুমদের বাড়ীতে তাই পেত। অথবা প্রীতিকুসুমদের বাড়ী যা পেতো নিজেদের বাড়ীতে তার অভাব বোধ করত। ওরা যা খায় যা পরে, যে ধরনে ও যে বিষয়ে কথা বলে চঞ্চলের তাই মনে ধরে। ওদের বাড়ীতে প্রতাপগড়ের প্রভাব পড়েনি, ওরা প্রতাপগড়ের মানুষের সঙ্গে মেশে না। কত রঙিন ছবি ও ছবিওয়ালা বই ওদের বাড়ীতে। ছোট ছেলেদের মাসিক পত্র যে থাকতে পারে চঞ্চল আগে জানত না। বড়দের মাসিক পত্রও তাদের বাড়ী আসত না। আসত ইংরেজী ও বাংলা খবরের কাগজ ও খবরের কাগজের উপহার গ্রন্থাবলী। মাঝে মাঝে কাকারা এক-আধখানা মাসিক পত্র পড়তে এনে চঞ্চলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন, বোধকরি ভাবতেন যে চঞ্চল ছবি ছিঁড়বে। চঞ্চল মাসিক

পত্রের সন্ধানে ঘর তোলপাড় করত। ঠাকুমা যদি জিজ্ঞাসা করতেন 'কি করছিস রে,' একটা কিছু বানিয়ে বলত। চুরি করা মাসিক পত্র নিয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়েও নিষ্কৃতি নেই। যাকে বিশ্বাস করে চোরাই মালের ভাগ দেয় সেই নির্মল কিনা মিথ্যা কথা বলতে পারে না। শেষকালে চঞ্চল গ্রেপ্তার হয়ে মাসিক পত্রের মায়া ত্যাগ করে। যা হোক, তার আগ্রহ দেখে কাকারা তাকে ও নির্মলকে 'শিশু'র গ্রাহক করে দিলেন।

থিয়েটারে প্রীতিকুসুমবা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখা সেজে গান করে। চঞ্চলের ও নির্মলের ভারি শখ তারাও কিছু সাজে। বাবার কাছে প্রস্তাবটা পাড়তে চায়, সাহস পায় না। বাবা যদি নাও চটেন তবু খানিক হাসবেন। চঞ্চলের মতো লাজুক ছেলের পক্ষে একথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। সে বারবার বাবার কাছে যায়, কিন্তু কথাটা তুলতে পারে না, লজ্জায় ফিরে আসে। একদিন মরিয়া হয়ে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলে ফেলল, 'বাবা, প্রীতিকুসুমবা কেমন রাখাল বালক সাজে; আমরা কেন সাজতে পাইনে?' বলেই সে পালিয়ে আসতে চাইলে, লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা গেল। বাবা হাসলেনও না, চটলেনও না, চিন্তা করে বললেন, 'ওসব করলে পড়াশুনায় মন লাগে না।'

রাজবাড়ীতে সকলের প্রশংসা পাওয়া যখন ভাগ্যে নেই তখন চঞ্চল করে কি? নিজেই নাটক লেখে, নিজেরাই তার অভিনয় করে। একদিন তার 'কুরুক্ষেত্রের' অভিনয় হয়ে গেছে, ভরত তার নিজের লেখা প্রহসনে সাহেব সেজে চেয়ারে বসে চুরুট টানতে যাচ্ছে এমন সময় সশব্দে চেয়ারটার একটা পায়া গেল খসে। প্রহসনটার বদলে প্রহসনই হলো, তবে দর্শকের মধ্যে উপস্থিত হলেন চঞ্চলের বাবা। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'রাজার থিয়েটার পার্টির পেশা গেল। এরাই লায়েক হয়ে উঠেছে।'

বাবার ব্রাহ্ম বন্ধু সুরেশবাবু ছিলেন রায়বাহাদুরের মতো আর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। গোড়াতে তিনি ছিলেন প্রাইভেট সেক্রেটারী, পরে হলেন ম্যাজিস্ট্রেট। বয়সে চঞ্চলের বাবার চেয়ে বড় হলেও তিনি অবিবাহিত। তাঁর প্রশস্ত বাংলোতে তিনি কতটা সাহেবী ধরনে থাকেন। তাইতে তাঁর সম্বন্ধে সকলের বিশেষ কৌতূহল। তিনি প্যাণ্ট না পরে ধুতিই পরেন, তবু তাঁর পোষাকে চশমায় ও চেহারায় আভিজাত্য। রায়বাহাদুরের মতো মিশুক নন, তবু গোপনে তাঁরই মতো দাতা। তাঁর ধর্মবিশ্বাস খুব স্পষ্ট ছিল না, তাঁর বাড়ীতে কিংবা বাইরে তিনি উপাসনা করতেন না, তাঁর মুখে তত্ত্ব কথাও কেউ শোনেনি। তাঁর লাইব্রেরী ছিল ঘর জোড়া। তিনি পড়াশুনা করতেন ও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। কিন্তু লোকে তাঁর জীবনের এদিকটার সংবাদ রাখত না। লোকে জানত তিনি কড়ামেজাজী হাকিম, তাঁর কাছে ভিড়তে পারে কার সাধ্য।

চঞ্চলও তাঁকে ভয় করত। তবু তাঁর উপর প্রসন্ন ছিল একটি কারণে। তাঁর ওখানে বাবার সঙ্গে গেলে মাঝে মাঝে চা ও কেক খেতে পাওয়া যেত। এই কেক জিনিষটি

চঞ্চলদের কিংবা প্রীতিকুসুমদের বাড়ীতে ঢোকে না, এতে নাকি মুরগীর ডিম মেশানো থাকে। সুরেশবাবু মুরগীর যম। মুসলমানের বাড়ীর মতো তাঁর বাড়ীতেও মুরগী কিলবিল করে। তাঁর বাবুর্চি একটা নাপিত না তেলী। ভয়ানক ম্লেচ্ছ। চঞ্চলের বাবা তাঁর বাড়ী যান বলে ঠাকুমা খুব খুশি নন। চঞ্চল ভারি খুশি—তাকে সুরেশবাবু চেয়ারে বসতে দিয়ে তার সামনের টি-পায়ের উপর চা পরিবেশন করান। এত মান সে অন্যত্র পায় না। বাড়ীতে তো পিঁড়ির উপর বসে খাওয়া।

প্রীতিকুসুমদের বাড়ীতে যেমন বাংলা বই কাগজ, সুরেশবাবুর বাংলোতে তেমনি ইংরাজী।

চঞ্চল একবার গেলে কিছু না কিছু হাতে নিয়ে আসে। বিলিতী 'গ্রাফিক' বা 'পিয়ার্সন্স্ ম্যাগাজিন'। পড়ে বোঝা যায় না। কিন্তু ছবি দেখে বিস্ময় বোধ হয়। ঘোড়াদৌড়, ক্রিকেট খেলা, monocle-চোখে ইংরাজ রাজপুরুষ, কত রকম মহিলাদের গাউন। চঞ্চল এক সুদূর রাজ্যের আভাস পায়। বিলেত? না জানি কেমনতর সে দেশ! ঠাকুমার কাছে শুনেছে সেটা একটা দ্বীপ। নদীর দ্বীপ সে দেখেছে। সমুদ্রই দেখেনি, সমুদ্রের দ্বীপ কেমন কে জানে? বিলেত হচ্ছে সাহেবদের দেশ। সাহেব সে জন দুই দেখেছে—একজন তো প্রতাপগড়েই থাকেন, লেডী ডাক্তারের স্বামী (ফিরিঙ্গী)। তার বাবা তাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেছেন। তাঁরাও চঞ্চলদের বাড়ী এসেছেন। আর একজন ভ্রাম্যমান স্কুল ইন্স্পেক্টার। (ডোমিসাইল্ড্ ইউরোপীয়ান)। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া তাঁর আকার আয়তন, দাড়ি বুকের উপর চামর ঢুলাচ্ছে। দাড়ির কথায় উঠে আতাহার মিঞার কথা। চঞ্চলের বাবা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিনি প্রতাপগড়ে কিছুদিন চাকরী করে অন্য কোথায় চাকরী নিয়ে চলে যান। যেমন তাঁর দাড়ি, তেমনি তাঁর ভুঁড়ি। তিনি যখন হাসেন তখন তাঁর ভুঁড়ি থলথল করে একতাল জেলির মতো। লোকটি হাস্যরসিক। খাওয়া-দাওয়া নবাবী চালে করেন। চঞ্চলদের কিছু হালুয়া দিয়েছিলেন। চঞ্চল বড় হয়ে তেমন সুস্বাদু হালুয়া কোথাও খুঁজে পায়নি।

মুসলমান, খ্রীষ্টান, ফিরিঙ্গী, ব্রাহ্ম চঞ্চলের বাবা-কাকারা তাকে সকলের বাড়ী নিয়ে যান। সকলের কথা-বার্তা শোনবার সুযোগ দেন। সকলের মনুষ্যত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ হতে শেখান। প্রতাপগড়ের মতো ছোট্ট জায়গায় সর্বদা পরস্পরের খোঁজ খবর নিতে হয়। ওঁরাও চঞ্চলদের বাড়ী আসেন। চঞ্চল ও নির্মলকে কৃত্রিম ভয় দেখান, দু হাতে তুলে নিয়ে ভুঁড়ির উপর বসান, মজার গল্প বলেন, মিছিমিছি ক্ষেপিয়ে তোলেন। বাড়ীতে ঠাকুমার শিক্ষা, বাইরে এই সকল মানুষের সঙ্গে পরিচয়—পরস্পর বিরোধী এই প্রভাব পরস্পরকে সংশোধন করেছিল। চঞ্চলের জীবনের ভিত্তিপত্তনকালে তার ভাগ্যবিধাতা কোনো একটা উপাদানকে একান্ত প্রাধান্য দেননি।

॥ পাঁচ ॥

একদিন সকালে উঠে চঞ্চল দেখে তাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে যে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা রাস্তা, সেই রাস্তার ধারে জায়গা করে নিয়ে দোকানপাট বসতে যাচ্ছে। কোনো দোকানে ছেলেদের খেলনা, বাঁশী, তালপাতার সেপাই, ঘোড়ার চুল দিয়ে একখানা কাঠিতে বাঁধা ব্যাঙের মতো আওয়াজ করতে থাকা মাটির সরা, কোনো দোকানে তেল ঘি নারকেল ক্ষীর ছানা চিনির রঙীন খাবার। কোথাও ছড়ানো কাঁঠালের কোয়ায় মাছি ভনভন্ করছে। কোথাও মনোহারী দোকান আয়না চিরুণী ছুঁচ সুতো ছুরি কাঁচের গেলাস সাবান। বেলা যতই বাড়ে লোক সমাগমও বৃদ্ধি পায়। বেশীর ভাগ পল্লীগ্রাম থেকে এসেছে। স্ত্রী, পুরুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের পোষাক, গহনা ও সজ্জা থেকে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। খাটো মোটা শাড়ী ও ধুতি, মস্ত ভারি কাঁসা পিতলের খাড়ু ও মল, পুরুষদেরও কানে নোলি ও হাতে বালা, শিশুদের চোখে কাজল ও মাথায় ঝুঁটি। স্ত্রীলোকদের গায়ে মাখা হলুদবাটা ভালো করে শুকিয়ে যায়নি। চঞ্চলদের বাড়ীতেও এরা দলে দলে এসে উপস্থিত হয়। জল চেয়ে নিয়ে চিড়ে ধুয়ে খায়। হয়ত গত বছর এসেছিল পরিচয় দেয়। ব্যাপার কি? রথযাত্রা। দুটো রথ তৈরি হয় প্রত্যেক বছর। কাঠের রথ। একটা খুব বড়, অন্যটা ছোট। রথের উপরটা রঙীন কাপড় দিয়ে ঘিরে দেয়। ভিতরে থাকেন দেবতা, বাইরে কাঠের সারথি। ঘেরা ঘরের চারিদিকে আঙিনার মতো, সেখানটা বেড়া দেওয়া। নানা রকম কাঠের চ্যাপ্টা মূর্তি বেড়ার কাঠামোর সঙ্গে আঁটা। রথের সামনের দিকে দুটো কাঠের ঘোড়া ও নীচে বারোটা কি আটটা চাকা। শক্ত মোটা পাকানো দড়ি চারটে কি ছ'টা। পঞ্চাশ জন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে টানতে পারে—এমন লম্বা। সে সব মানুষও গ্রাম থেকে আমদানি। তারা বেগার দিতে ধরা হয়ে এসেছে। জংলী মানুষ। রথযাত্রার সারথির কাজ করে এক বৃদ্ধ। কাঠের সারথির কাছে দাঁড়িয়ে সে লাঠি উঁচু করে হাঁক দেয়—'এ ভাই রে।' জবাব আসে—'হুঁ হুঁ।' তখন বুড়ো চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে একটি ছড়া। খুব ভদ্র ভাষায় নয় কিন্তু। বেগারের মানুষরা পরম উৎসাহে চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো লাফ দিয়ে দৌড়ায়। তাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। শেষকালে রথটা ঠেকে গিয়ে কারুর দালানের গায়—অর্ধেকটা দেওয়াল ধসিয়ে। কিংবা নিম গাছের একটা ডাল ভেঙে রথের চূড়ায় লটকে যায় ও দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা গাছ চলৎশক্তি পেয়েছে। বন্দুকের আওয়াজ করে সেই সব উৎসাহী অশ্বকে নিবৃত্ত করতে হয়। তাদের তো বলগা নেই যে টান দিলেই থামবে।

রথ 'গুণ্ডিচা ঘরে' পৌঁছবার অনেক আগেই হয় তো সন্ধ্যা হয়। সেদিনকার মতো সেইখানেই রথ থাকে। লোকের ভিড় মিলিয়ে যায়। রথের উপরকার আঙিনায় কোনো উপায়ে বসবার অধিকার পেয়ে চঞ্চল এতক্ষণ আমোদ পাচ্ছিল, এখন নামে এবং বাড়ী গিয়ে সবাইকে বলে, রথে চড়েছিলুম। মন্দ আমোদ নয়। রথ যখন নড়বড় করে চলে বারোটা চাকার উপর গড়গড় করতে করতে তখন কোনো গাড়ীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তবে চলে যত অচল হয় তার বেশী।

দোকানপাট রথের সঙ্গে সঙ্গে চলে। সকালে যে সব দোকান চঞ্চলদের বাড়ী থেকে দেখা যেতো দুপুরে তারা উঠে গিয়ে আবার উত্তরে বসেছে। যতই বেলা যায় ততই তারা চঞ্চলদের বাড়ীর নিকট থেকে দূরে যায়। চঞ্চলের তাতে ভারি আফশোষ। যেন তার নিজের দোকান।

রাত্রি হলে তার মা ঠাকুমা ও প্রতিবেশিনী মেয়েরা রথে ঠাকুর দর্শন করতে যান। চঞ্চল সঙ্গে যায়। তখন দিনের আড়ম্বর নেই, জনসমুদ্রের গর্জন ক্রমে স্তব্ধ হচ্ছে। অন্যান্য পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে মা ঠাকুমার আলাপ হয়। তাঁরা চঞ্চলকে দেখে নথ নাড়তে নাড়তে বলেন, 'এইটি চঞ্চল? এত বড়টি হয়েছে?' ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বামুনের হাত থেকে যা ফিরে পাওয়া যায় চঞ্চল তার অংশ পায়। অন্য পাড়ার মহিলাদের কাছেও।

রামায়েৎদের মঠে হয় ঝুলন উৎসব। সেখানকার মোহান্ত সৌখীন লোক। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা ঝুলতে ঝুলতে গুটি-পো'র গান শোনেন। গুটি পো হচ্ছে নর্তকীর বেশে সজ্জিত একটি বালক। সে হাত নেড়ে নেড়ে গান করে, হাঁটু পেতে বসে কখনো, কখনো ঘুঙুর-পরা পায়ে ঘুরপাক খায়। এক এক করে সকলের সামনে গিয়ে গানের ছন্দে হাত পাতে। তার পিছন পিছন ঘোরে একজন বেহালা-বাদক, একজন পাখোয়াজী। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ওস্তাদ। পাওনাটা যায় তাঁর টাঁাকে। যে বয়সে অন্য ছেলেরা স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করে সে বয়সে এই সব হতভাগ্য বালক ওস্তাদের হাতে দেদার বেত খায় ও কঠিন সুর সাধে।

প্রতাপগড়ের প্রধান দেবালয় হচ্ছে বলরামের মন্দির। জগন্নাথও সেই মন্দিরে ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি জগন্নাথের জন্যে স্বতন্ত্র মন্দির সেই একই বেড়ার মধ্যে বানানো হওয়ায় তিনি পৃথক হয়েছেন। বলরামের মন্দির বহু পুরাতন। তার ভিতরকার গন্ধ ও তার বাহিরের রং বেশ বনেদী। সূর্যের আলো প্রবেশের ছিদ্র পায় না। চূণকাম করাও বোধ করি নিষেধ। বলরামের মন্দির প্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে ভোজ হয়। চঞ্চলরা নিমন্ত্রিত হয়। শালপাতার থালায় ঠোঙায় করে নিতান্তই বলরামী ডাল ভাত ও দেশী আলুর ব্যাপার। তবু বাড়ীর বাইরে কোথাও খাবার নিমন্ত্রণ থাকলে চঞ্চলের মন চঞ্চল হয়ে

ওঠে। বাড়ীর খাওয়া তো প্রতিদিন দু'বেলা আছেই।

চন্দন যাত্রা হয় 'নূতন পুকুরে'। জগন্নাথকে নড়ানো যায় না, তাঁর প্রতিনিধিরূপে মদনমোহন মূর্তি যান নৌকা বিহার করতে। ঘাটের মন্দিরে বিশ্রাম করেন। চন্দন-চর্চিত হন। পদ্মফুলের মালা পরেন। ভারে ভারে আম খান। তারপর নৌকায় ওঠেন। জোড়া নৌকা। চঞ্চল প্রভৃতির বসবার জায়গা থাকে। তারাও মদনমোহনের সঙ্গে পুষ্করিণী পরিক্রমা করে। সংকীর্তন কিংবা শুট পো'র গান শোনে। আম খায়। চন্দন মাখে। রাত করে বাড়ী ফেরে। একুশ দিন ধরে চন্দন-যাত্রা। শেষের দিকে ধুমধাম হয়। বিস্তর বাজি পোড়ে। পুকুরের ধারে ধারে রামায়ণ মহাভারতের বিষয় নিয়ে যাত্রা অভিনয় হয়। জোড়া নৌকা মানুষের ভারে ডুবু ডুবু করে। শোনা যায় দু'একবার নৌকাডুবি হয়েছে।

প্রতাপগড়ের দুর্গাপূজার ধরন আলাদা। রাজবাড়ীর স্থায়ী দুর্গা প্রতিমার কাছে যা হয় তা দেখতে কেউ যায় না। কোনো জাঁকজমক নেই। কোনো বাড়ীতেই পূজার জন্যে বিশেষ প্রতিমা নির্মাণ হয় না। চঞ্চলদের বাড়ীতে হয় স্তূপীকৃত বই ও তলোয়ারের সামনে পুষ্পাঞ্জলি। দশমীর দিন রাজা যান দিগ্বিজয়ে। তাঁর সৈন্য তো নেই। আছে পুরোনো আমলের সৈন্যদের বংশধর। তারা জায়গীর ভোগ করতে করতে চাষা হয়ে গেছে। মরচে ধরা বাঁকানো তলোয়ার নিয়ে তারা হনুমানের মতো লাফায় আর হর্ষধ্বনি করে। তাদের বলে পাইক অর্থাৎ পদাতিক। তারা আতে খণ্ডায়েৎ অর্থাৎ খণ্ডা (খাঁড়া) ওয়ালা। সেই উল্লম্ফনকারী বীরপুরুষদের নিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে-বাজাতে রাজা ও সামন্তগণ রণক্ষেত্রে যাত্রা করেন। রাজা চড়েন সাজানো গাড়ীতে, বসেন ছত্রের নীচে।

গড়ের বাইরে খাচিত্র-বাটির একটি চির নির্দিষ্ট অংশে তীর-ধনুকযোগে লক্ষ্যভেদ হয়। তারপর রাজা ফেরেন তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদের সম্মুখে একটি খোলা জায়গায় খেলা-ধূলার আয়োজন। রাজা তখন দিব্যি ধুতি-পাঞ্জাবিপরা চাদর গায়ে দেওয়া নিরীহ ভদ্রলোক। তখন তাঁর পার্ষদ হচ্ছেন তাঁর আধুনিক আমলাবৃন্দ। চঞ্চলরা রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গাধার দৌড়ে যে গাধাটা লাস্ট হয় সেই পায় পুরস্কার। চঞ্চলরা হো হো করে হেসে ওঠে। চর্বিলিপ্ত স্তম্ভের উপর চড়বার বারংবার চেষ্টায় সকলে বিফল হলো। তাই দেখে একটা লোক এগিয়ে এসে দুই হাত দিয়ে প্রথমে স্তম্ভটাকে জড়িয়ে ধরল, তারপরে ডিগবাজি খেয়ে পা দুটোকে তুলে দিল স্তম্ভের চূড়ার অভিমুখে। ভেবেছিল আর একটা ডিগবাজি খেলেই হাত দুটো ঠেকবে ঠিক চূড়ায়। কিন্তু স্তম্ভটা পিচ্ছিল। লোকটার হাত দুটো গেল সোঁ করে পিছলে। মাথাটা নারকেলের মতো মাটিতে পড়ে ফট করে ফাটে আর কি! মাথায় মস্ত ঝুঁটি ছিল। তাইতে বাঁচিয়ে দিল। এদিকে চঞ্চলরা হাসতে হাসতে মারা যায়।

দোলের সময় মদনমোহন গড়ের উত্তরে মাওবাসাহীব দোলমণ্ডপে গিয়ে বসেন। মেলা বসে। সে রাত্রে গোয়ালাদের উৎসব, কারণ কৃষ্ণ নাকি গোয়ালা ছিলেন। তারা খড়ম পায়ে দুটো কাটি বাজিয়ে খট খট করে মার্চ করে চলে। গায় বাখালী গান। মুখে আবীর মাখে ও মাথায় অভ্র ছড়ায়। বকাসুর থেকে থেকে ঠোঁট খুঁলে হাঁ করে। অঘাসুর একটা মানুষের পিঠে আর একটা মানুষ উঠলে যত উঁচু হয় তত উঁচু। দোলমণ্ডপে গড়ের সকলে জড় হয়। সে এক রাত।

প্রতাপগড়ের পূব দিকের রাস্তা ধরে জঙ্গল দু ধারে রেখে অন্য একটি দেশীয় রাজ্যের ভিতর দিয়ে বিশ মাইল দূরে গেলে প্রকাণ্ড এক নদী। নদীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ চর। সেই চরের এক পাশে নৌকা থেকে নেমে অপর পাশে নৌকায় উঠতে হয়, চরের উপর দিয়ে যেতে হয় গোরুর গাড়ীতে চড়ে। ওপারে ব্রিটিশ ভারত। ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রাদেশিক রাজধানী। রাজধানীতে চঞ্চলের মামাবাড়ী।

ডাইনে বায়ে জঙ্গল, দিনে দুপুরে বাঘ হানা দেয় দলবল না জুটিয়ে কেউ রাস্তায় পা বাড়ায় না। রাত্রে যখন গোরুর গাড়ী চলে তখন এক সাথে বিশ খানা করে চলে। সমস্ত পথ সোরগোল করতে করতে মশাল জ্বালিয়ে যাত্রা। বাঘ না দেখলেও 'বাঘ 'বাঘ' বলে চিৎকার করে গাড়ে ধাঁগুনি লাগিয়ে দেয়। চোখ বুঁজে চঞ্চল ঠাকুমার ইষ্টদেবতা পৌর্ণমসী ওরফে পূর্ণমাসীর নাম জপ করে। ভাবে, বুঝি ভোর হওয়ার চোখ বন্ধ হলে বাঘেরও চোখ বন্ধ।

যেখানে ভোর হয় সেখানে একটা ঝরণা। জায়গাটার নাম দাঁড়িয়ে গেছে 'ঝরণা'। জল খাবার জন্য সেখানে সকলে গাড়ী থামায়। সেখান থেকে কিছু দূর গেলে 'খুঁটনি'। পান দুই তিন দোকান ঘর ও একটা জল-বিরল পুষ্করিণী নিয়ে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে রান্না করে খেতে হয়। তারপর আবার সেই শাল পিয়াশাল শিমুল পলাশ কেঁচিলা ইত্যাদির বন ভেদ ক'রে শকটের 'কারা ভান' দুর্গম পথ চক্রমুখরিত করে।

অবশেষে মহানদীর কূল। নদী না হতেই নদীর হাওয়া গায়ে এসে লাগে। খেয়াঘাটে পৌঁছে নদীর এ পার থেকে ও পারের গাছপালা আকাশের ছায়ার মতো অস্পষ্ট দেখায়। সেই বিরাট নদীর উপর নৌকা ভাসাতে হবে ভাবলে বোমাঞ্চ বোধ হয়।

তবে নৌকারও বৃহৎ পাটাতন। কালো কাঠের উপর লাল নক্সা। নৌকার আকার প্রকার দেখে মনে সম্ভ্রম জাগে। যেন তাদেরও প্রাণ আছে। নৌকায় চড়ে পিছন ফিরে তাকালে একে একে অনেকগুলি পাহাড় মাথা তোলে। নিকটের পাহাড় দূরের পাহাড়। আকৃতি কোনোটার রামধনুর মতো, কোনোটার পিরামিডের মতো। একটি ছোট পাহাড়ের উপর রাজার বাংলা। সুদূরে নদীর চরে আর একটি ঘরে উদ্যান বেষ্টিত শিবমন্দির। সেখানকার চরটি সংকীর্ণ পার্বত্য। আর চরের আশে পাশে নদীর গভীরতা

এতই বেশী যে মাঝিরা লগি দিয়ে তল পায় না। নদীর সেরূপ স্থলকে বলে 'গণ্ড'। বর্ষাকালে ওখানে প্রায়ই নৌকাডুবি হয়।

খেয়াঘাটের নৌকা চঞ্চলদের চরের এক প্রান্তে নামিয়ে দিয়ে অন্য লোক নিয়ে ফিরে যায়। চঞ্চলরা তাদের নিজেদের গোরুর গাড়ীতে চড়ে চরের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে অপর প্রান্তের খেয়া নৌকার খোঁজে চলে। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা হয়ত চঞ্চলদেরই মতো পথিক। কিংবা চরে তরমুজের ও লাল কুমড়ার আবাদ করেছে; ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে রাত্রে পাহারা দেবে।

সমস্তটা চর অতিক্রম করে হয়ত দেখা গেল সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। যে নৌকা গাড়ী নিতে আসে তার মাঝি ডাক শোনে না। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। মজুর-মজুরনীরা ছোট নৌকায় করে পাড়ি দেবার সময় আশ্বাস দিয়ে গেল মাঝিকে খবর দিতে ভুলবে না। কিন্তু কোথায় মাঝি! আরে হো—ও—ও—মাঝ্—ই—ই—ই। ওপার থেকে উত্তর আসে ই—ই—ই। মনে হয় ব্যাটা এইবার সাড়া দিয়েছে। আসবে ঠিক। ওপারে ঘাটের গায়ে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে; ছলাৎছল শব্দ শুনে অনুমান হয় জলের গায়ে লগির চোট লাগছে।

নিরাশ হয়ে চঞ্চলরা চরের উপর বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়ে। বড়রা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে এনে মাটি খুঁড়ে চুলো বানিয়ে রান্না চাপিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে এক একবার হাঁক ছাড়ে আরে হো···ও···ও···ও···ও মাঝ্—ই। শেষের কথাটা উচ্চারণ করবার আগে দম ফুরিয়ে যায়।

অবশেষে সত্যি সত্যি হয়ত মাঝি মহাপ্রভু সাড়া দেন। ততক্ষণে তাঁর নিজের উদর পূর্তি হয়েছে, এইবার মোটা রকম বখ্‌শিষ আদায় করে পকেটে ভর্তি—পকেট তো নেই, ট্যাঁক ভারি—করবেন।

অনেক রাত্রে ওপারে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। কিন্তু ভয়ের অবসান হয়নি। একটা বিশাল বটগাছ পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। ঐ বটগাছে এক কালে ফাঁসি দেওয়া হতো। এর অদূরে 'গোরা কবর।' অর্থাৎ ইংরেজদের গোরস্থান। দেশী ও বিলাতী কত রকম ভূত ঐ গাছে ও ঐ গোরস্থানে আস্তানা করেছে কে জানে। বাঘ বড়, না, ভূত বড়? যেই বড় হোক চঞ্চলের কাছে উভয়েই ভয়ঙ্কর। চঞ্চল চোখ বুঁজে পূর্ণমাসীকে স্মরণ করে। করতে করতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ছয় ॥

চঞ্চলের মামাবাড়ী যদিও একই সহরে তবু সে উঠেছে তার বাবার মামাবাড়ীতে। সেখানে তার ঠাকুমার অধিকার খাটে। তাছাড়া সেখানে হবে তার বাবার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে। বিয়েবাড়ীতে একটি ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল। সেও ইস্কুলে পড়ে, চঞ্চলের চেয়ে বয়সে কিন্তু বড। তার ঘুড়ি ও লাটাই আছে। সে ছাদের উপরে উঠে ঘুড়ি ওড়ায়। ওস্তাদ ছেলে। চঞ্চল তার সঙ্গে বাজার দেখতে চলল। প্রথমেই দেখল একটা সোডা লেমনেডের দোকান। লাল হলদে বেগুনে রঙের জল। দোকান-দারকে পয়সা দিতেই ভস্ করে একটা আওয়াজ হলো, ফেনা উথ্‌লে পড়ল। চঞ্চল ও নগেন দুজনে দুটো বোতল নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলল। এবং পরে তারা যে দোকানে গেল সেখানে পাওয়া যায় লাট্টু, লজেঞ্চুষ, রবারের বল ও মার্বেল। কিন্তু চঞ্চলের পুঁজি মোটে চার পয়সা আর নগেন হয়েছে বিনা পুঁজিতে তার পাণ্ডা। দোকানদারটাও একেবারেই দোকানদার। বাবো আনার মোটর গাড়ী এক পয়সাও ছাড়বে না, যতই দরাদরি করো। অতএব চার পয়সার কি পাওয়া যায় সেইটেই হয় চঞ্চলের জিজ্ঞাস্য। অনেক জিনিষ পাওয়া যায়—ছুঁচ-সুতো, চাবীর রিং, বোতাম, পেনসিল, রবার, সেফ্‌টিপিন, এমন কি একটা ভোঁতা ছুরি। কাঠের মনি বাকস কিনে উপরের ফুটোর ভিতর দিয়ে টুপ করে একটা পয়সা ফেলে দেবে, একটা একটা করে অনেক পয়সা জমাবে, তারপরে সেই সব পয়সা বের করে মোটর গাড়ী কিনবে, এই তার অভিলাষ। কিন্তু মনি-বাকস চার পয়সায় হয় না।

অগত্যা কিছু লজেঞ্চুষ কিনে নগেনকে অর্ধাংশ দিয়ে চঞ্চল সেদিনকার মতো বাসায় ফেরে।

অন্ধকার রাত্রে বন্ধ গাড়ীতে চড়ে চঞ্চল চলেছে রেল স্টেশনে। পথের ধারে দূরে দূরে এক একটি ল্যাম্প পোস্ট এক পায়ে দাঁড়িয়েছে আরতি দীপ ধরে। গাড়ী ছুটেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ল্যাম্প পোস্টও স্থির হয়ে নেই। সে যেন এক পথিককে আরতি করে অন্য পথিকের অভিমুখে অপসৃত হচ্ছে। ল্যাম্প পোস্টের সংখ্যা গুনতে গুনতে চঞ্চল যতই স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল তাদের সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকল। শেষে এক সময় তারা হলো অগুনতি। চঞ্চলের গাড়ীর মতো অনেক গাড়ী থেমেছে। লোকজন সোরগোল করছে। মনিহারীর দোকান, ময়রার দোকান, পান বিড়ি দেশলাইওয়ালা, নীলপোষাক পরা কুলী—এই সব দেখতে দেখতে চঞ্চল গেল টিকিটঘরে। সেখানে কেবল ধাক্কাধাক্কি হাঁকাহাঁকি চলেছে। কে আগে টিকিট কিনবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি। চঞ্চলের

একজন আত্মীয় অভিমন্যুর মতো সেই ব্যূহ ভেদ করে অভিমন্যুরই মতো আর ফিরে আসেন না। এদিকে ট্রেন কখন এসে পড়বে ও চঞ্চলকে ফেলে যাবে সেই ভাবনায় চঞ্চলের মন অস্থির। প্ল্যাটফর্মের উপর তার ঠাকুমা জিনিষপত্র পাহারা দিতে দিতে তাকে কাছে টেনে রাখছেন, পাছে সে ছুটোছুটি করতে করতে লাইনের উপর ট্রেন চাপা পড়ে।

টিকিট যখন এলো তখন চঞ্চল সেগুলোর আকার-প্রকার দেখে একটু নিরাশ হলো। এইটুকু জিনিষের এত দাম। এত দরকার। টিকিট না থাকলে নাকি ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে দেয়। পাছে তার হাত ফস্কে হারিয়ে যায় সে জন্যে তার ঠাকুমা টিকিটগুলোকে নিজের শাড়ীর এক কোণায় শক্ত করে বাঁধলেন। বারংবার ঘণ্টা পড়লেও ট্রেন আসে না। লোকের ভিড় ও হট্টোগোল বাড়ে। একটি অপরিচিত মহিলা সদলবলে ঠাকুমার কাছে জায়গা নিয়ে আলাপ জমিয়েছেন। নিজের নাতি-নাতনীর ফর্দ দিয়ে ঠাকুমার কাছে চঞ্চলের পরিচয় নিচ্ছেন। চঞ্চল কিন্তু এক দৃষ্টে ও এক মনে ট্রেনের প্রতীক্ষা করছে। খুব দূরে একটা আভা দেখা দিল। তারপরে ঝক্‌মক্ করে উঠলো একটা তারা। সেই তারা যতই এগিয়ে এলো ততই তার আয়তন বৃহৎ হলো. জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে চঞ্চলকে ছুঁয়ে ফেলল। এতক্ষণ রেলের লাইন ভালো করে চঞ্চলের নজরে আসেনি। এখন ঝলসে উঠলো। চঞ্চলকে ভাববার সময় না দিয়ে হুস হুস করে ট্রেন যেন তার দিকে তাক করে ছুটে এলো। কি একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে ট্রেনের দিকে আকর্ষণ করলো। তার চোখের পাতা পড়ল না। ঠাকুমা তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলেন। এক নিমেষের মধ্যে সে যে কত কি দেখল তার হিসাব হয় না। শুধু এইটুকু বুঝল যে মাথায় আলোর টিপ পরা একটা কালো জানোয়ার উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে তার কাছ ঘেঁষে দৌড়িয়ে গেল। সেই বাহনের পিছু পিছু সংখ্যাতীত রথ আলো-ঝলমল হয়ে অফুরন্ত শোভাযাত্রা রচনা করল।

ট্রেন যখন থামল চঞ্চলের কল্পনায় তখনো সেই শোভাযাত্রার বিরাম হলো না, তার চোখ বিশ্বাস করল না যে বিরাম হয়েছে। ঠাকুমা তার হাতে টান দিয়ে বললেন, আয়, আয়, গাড়ী ছেড়ে দেবে। সকলে হুড়মুড় করে গাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, যারা নামতে চায় তাদের নামতে দিচ্ছিল না। চঞ্চলরা কোনমতে গাড়ীতে উঠে একটু জায়গা করে নিল। গাড়ী কখন ছাড়বে এখন এইটেই হলো চঞ্চলের চিন্তা। সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাইল ইঞ্জিনটা কত দূরে। কিন্তু ঠাকুমা তাকে টেনে নামিয়ে দিলেন। অবশেষে ট্রেন যখন হাঁফাতে হাঁফাতে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করল ও চঞ্চল যে নদী নৌকা দিয়ে পার হয়েছিল সেই নদীর পুলের উপর দিয়ে ঝুম ঝুম ঝড় ঝাড় করে দৌড় দিল তখন চঞ্চল ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখলো ট্রেন তাকে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভোর

হয়ে আসছে একটা ছোট স্টেশনের খোলা ওয়েটিংরুমে। সামনে একটা পাহাড়। তার নাম মহাবিনায়ক, সংক্ষেপে মহাবিনা। চঞ্চলেরা যে গাড়ীতে এসেছিল সেই গাড়ীতেই চঞ্চলের দূর সম্পর্কীয় কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এসেছিল, অন্য কামরায়। তাদের সঙ্গে চঞ্চলের ভাব হয়ে গেল। তখন সকলে মিলে 'লঙ্কাজড়া' গাছের ডাল ভেঙে গাছ থেকে ঝরতে থাকা ক্ষীরে ফুঁ দিয়ে বুদ্বুদ তৈরী করল। একজনের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার নাম রমা দিদি। রমা দিদি আগে সেই পাহাড়ের উপর উঠেছে। সেখানে অনেক রকম বন্য ফল পাওয়া যায়। ঝর্ণা আছে। লোকে তীর্থ করতে যায়। কোনো হিংস্র জন্তু নেই। চঞ্চলের ইচ্ছা হল তার শিখরে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখতে। সে পাহাড়ী মানুষ, তার ভালো লাগে উর্ধ্বগতি। উর্ধ্ব থেকে পৃথিবী কেমন দেখায়, এই তার চির কৌতূহল।

কিন্তু চঞ্চলকে যেতে হলো বিপরীত দিকে। রমা দিদির বাড়ী যে গ্রামে সেই গ্রামে চঞ্চলের পিসিমার বাড়ী। আবার গোরুর গাড়ীতে চড়া। কিন্তু এবার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নয়। এবার ধানের ক্ষেত, ছোট বড় গ্রাম, বট অশ্বত্থ আম কাঁঠাল বাঁশ ইত্যাদি গ্রাম্য গাছ, কোথাও মন্দির, কোথাও গাছতলায় গ্রাম দেবতা, হাট বাজার পাঠশালা। পথে যেতে নদী নালা দু তিনটে। সব কটাতে পুল নেই। জল শুকিয়ে এসেছে বলে নৌকাও নেই। গোরুর গাড়ী গাঙের উপর দিয়ে চলল।

রমা দিদি চঞ্চলকে সমস্ত চিনিয়ে দেয়। ওসব পরিচয়ের সঙ্গে চঞ্চলের জংলী অভিজ্ঞতার মেলে না। মেলে না বলে খুব আশ্চর্য লাগে।

॥ সাত ॥

সেই গ্রামে চঞ্চলের পিসিমার বাড়ী। তিনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু তাঁর ছেলে এসে চঞ্চলকে পাকড়াও করল।

চঞ্চল ভাবল, ও বাবা, এ কোন দেশী বুলি? এর তো একবর্ণ বুঝতে পারিনে।

'ইক্ মনা বত্তো? লব্, লব্।' চঞ্চল তো হতভম্ব।

বুঝতে পারলিনে? 'তোর নাম কি? বল বল?'

চঞ্চল বুঝতে পেরে হেসে উঠল। উত্তর দিল, 'আমার নাম চঞ্চল। ইক্ মনা রতো?'

'তুমি তুকি মনা রমাঞ্জা।'

চঞ্চল আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কিছু মিছু সেটা কি একটা নাম হতে পারে?'

'আলবৎ পারে। চঞ্চল যদি মানুষের নাম হয় তবে কিছু মিছু খাসা নাম।'

চঞ্চল ভাবল, নিজের প্রকৃত নাম না বলাটাই এ দেশের রীতি। আমি নিজের প্রকৃত নাম বলে বড্ড ঠকে গেছি। বলল, 'আমার নাম চঞ্চল বুঝি? তোর শ্রবণ-শক্তি তো বেশ তীক্ষ্ণ! বলি আমার নাম—(চঞ্চলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো)—ষ্যাংকড়া।'

'কি বললি? আবার বল।'

'ষ্যাং—ষ্যাংকড়া।'

তৎক্ষণাৎ চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল একটা বনমানুষ এসেছে, তার নাম ষ্যাংকড়া। গ্রামের ছেলেমেয়েরা দলে দলে ষ্যাংকড়া দেখতে ছুটে এল। হুলুস্থুল ব্যাপার।

চঞ্চলের দিকে সাহস করে কেউ ঘেঁষতে পারে না। পিসতুত ভাই শিছু মিছু তাদের সাবধান করে দিয়েছে, ষ্যাংকড়া মানুষের মাংস খায়। চঞ্চল ভদ্রতার সঙ্গে, যতই বলে, 'এসো', তারা ততই পেছিয়ে যায় ও সভয়ে তাকায়।

অপদস্থ হয়ে চঞ্চল ঠিক করে ফেলল, এমন গ্রামে আর এক মুহূর্ত নয়। সে ঠাকুমার কাছে সব কথা বলতেই তিনি বললেন, 'অম্বর তোর চেয়ে ছ'মাসের বড়, তোর দাদা। পাড়াগাঁয়ে থেকে যত সব অসভ্যতা শিখছে। ওকে আমরা প্রতাপগড়ে নিয়ে যাবো।'

অম্বর চঞ্চলকে বলল, 'ওরে ষ্যাংকড়া, গুচি খেলবি?'

চঞ্চল বলল, 'সেটা কি খেলা?'

একটা কাঠের কিংবা বাঁশের লম্বা টুকরাকে একটা উঁচু জিনিষের উপর—ধরো, একখানা ইটের উপর—এমনভাবে রাখতে হয় যেন টুকরাটার সেই দিকে একটা ঘা দিলে টুকরাটা লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে নির্দিষ্ট এক জায়গায় পড়া চাই।

চঞ্চলকে অম্বর ছুরি খেলাও শেখাল। 'ছুরি' নাম শুনে কেউ যেন না মনে করেন এর উপকরণ পেনসিল-কাটা ছুরি। 'ছুরি' বলে খেলোয়াড়রা চেঁচিয়ে ওঠে, সেই থেকে খেলার নাম 'ছুরি'। খেলতে হয় উঠানের উপর ছাইয়ের ছক কেটে, দল বেঁধে। সেই সূত্রে, গ্রামের বহু ছেলের সঙ্গে ষ্যাংকড়ার ভাব হয়ে গেল। নদীর বালুর উপর হাডুডু খেলাতেও ষ্যাংকড়া যোগ দিল। ঘন গাছের ছায়াশীতল গ্রামটি—তার একধারে নদী, অন্যধারে সরকারী কেনাল। ফসল নয়ত, সোনা ফলে। পাহাড়ীদের তুলনায় এদিকের লোক সুখী। গ্রামে গ্রামে যাত্রার আখড়া।

অম্বরদাকে নিয়ে চঞ্চল প্রতাপগড়ে ফিরল। পড়াশুনায় অম্বরদা পেছিয়ে পড়েছিল, চঞ্চলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হল। কিন্তু কেমন করে রটে গেল সে মস্ত পণ্ডিত। 'এই পণ্ডিত' 'এই পণ্ডিত' বলে স্কুলের ছেলেরা যখন তাকে ঘিরে দাঁড়ায় সে তখন চোখ পাকিয়ে গুরুগম্ভীর গর্জনে বলে, 'নেসরিক লগো, ল্যপা।' ছেলেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। কি এর অর্থ। কি এভাষার নাম—সংস্কৃত না আরবী না চীন! একমাত্র চঞ্চলই ও

ভাষা বোঝে, একমাত্র সেই সাহস করে পণ্ডিতের সঙ্গে ঐ ভাষায় ভাঙা ভাঙা কথা বলে। কিন্তু ধরা পড়তে পণ্ডিতের দেরী হলো না। তখন তার নাম বদলে হলো 'ভণ্ডিপ'।

অম্বরদা দেখতে দেখতে ফুটবলের ক্যাপ্টেন, হাডুডুর সর্দার ইত্যাদি জনপ্রিয় পদগুলি দখল করে চঞ্চলকে আড়াল করে দাঁড়াল। সে যে চঞ্চলের দাদা ও বন্ধু এজন্য চঞ্চল গর্ব বোধ করল। তাকে খুশি করবার জন্য চঞ্চল নাটক লিখল, সে নিল নায়কের ভূমিকা। নেপাল তার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে না পেরে তার বশ্যতা স্বীকার করল। ভরত তার এক 'পটকন' খেয়ে মাথা ঘুরে মাটি কামড়াল। পণ্ডিত তো নয়, পালের গোদা। সবাইকে তার দলে ঢুকতে হলো, তার হুকুম মানতে হলো।

একদিন চঞ্চল তার নূতন ক্লাসে বসে আছে, এমন সময় উপরের ক্লাসের একটি ছেলে এসে তাকে বলল, 'এস, আমাদের মাস্টার তোমাকে ডাকছেন'। চঞ্চল যেতেই তিনি বললেন, 'তুমি কাল থেকে এই ক্লাসে এসে বসো।' অর্থাৎ ডবল প্রমোশন। দুঃখের বিষয় এই যে, একটু দেরিতে হলো। চঞ্চল তাঁকে স্যালিউট করে যেই চলে যাবে অমনি তার হাত লেগে একজনের দোয়াত উল্টলো। চঞ্চলকে পিছু ডেকে তিনি বললেন, 'কি হে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।' চঞ্চল ভাবল এর জন্য একদিন সাজা পেতে হবে। পরের দিন সে যখন সেই ক্লাসে জায়গা খুঁজল তখন প্রায় ছেলেরই তার উপর ঈর্ষা আর বিরাগ। কেউ তাকে কাছে বসায় না। যে ছেলেটা লাস্ট বয়, যাকে সকলেই কৃপাচক্ষে দেখে, সেই ছেলেটি চঞ্চলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাকে নিজের বেঞ্চিতে এক ইঞ্চি জায়গা দিল। অর্থাৎ লাস্ট বয় হবার গৌরব মুকুট চঞ্চলের মাথায় পরিয়ে দিল।

দিন সাতেক পরে মাস্টার মশাই ফার্স্ট বয়ের কাছে প্রশ্নের যথোচিত উত্তর না পেয়ে সেকেণ্ড বয়কে সেই প্রশ্ন করলেন। সেও ভুল উত্তর দিল। পরপরের ছেলেরা নিরুত্তর। প্রশ্নটি যখন চঞ্চলের কাছে এসে পৌঁছল তখন চঞ্চল বলল, 'Box করা মানে মুষ্টিযুদ্ধ করা।' মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কোনো মানে হয়?' চঞ্চল বলল, 'কান Box করা মানে কানে চড় মারা।' তিনি বললেন, 'তবে সকলের তাই করতে করতে ফার্স্ট সীটে উঠে এসো।'

লাস্ট বয় তার কানে ফিস ফিস করে বলল, 'আমি তোকে জায়গা দিয়েছি। আমারটা আস্তে। ওদেরগুলো খু-ব জোরে জোরে।' চঞ্চল তার কথা রাখল। কিন্তু ত্রিশ বত্রিশ জোড়া কান সজোরে মর্দন করা সামান্য মানুষের কর্ম নয়, মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষেই সম্ভব। চঞ্চল মনে মনে আফশোষ করে বলল, 'আহা হয়ে থাকতুম যদি অম্বরদার মতো পালোয়ান তবে কি স্বর্গীয় আনন্দই না অনুভব করতুম। এমন সুযোগ জীবনে দুবার আসে না।' যতই সে ফার্স্ট বয়ের দিকে এগিয়ে চলল ততই তার কবজি কনকন করতে লাগল, হাত কাঁপতে লাগল। কোনোমতে দুই হাতে কান দুটোকে ছুঁয়ে সে কর্ণ মর্দন

অনুষ্ঠানটার নাম রক্ষা করল।

কুতব মিনারের চূড়ায় উঠলে যেমন প্রতিমুহূর্তে মনে হতে থাকে, এইবার পড়লুম, এইবার পড়েছি, তেমনি ফার্স্ট সীটে বসে চঞ্চলের ভয় হলো, এইবার কান দুটির উপর সারা ক্লাসের নেকনজর। বেহুঁশিয়ার একটা ভুল করলে আর রক্ষা নেই। চঞ্চলের চেয়ে আকারে ও বয়সে ওরা সবাই বড়। লাস্ট বয়টা তো একটা ষণ্ড। কানদুটো থেকে যে মানুষের সোয়াস্তি নেই এই ভেবে চঞ্চল দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ল। অন্যান্য ছেলেরাও বোধকরি কানে হাত বুলাতে বুলাতে ফিস্ ফিস্ করে বলাবলি করছিল যে, 'ভালোই হলো। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। নিজের কান সামলানোর জন্যই ঐ হতভাগাটাই এখন থেকে আমাদের সকলের হয়ে পড়া তৈরী করবে। আর ও যদি ভুল করে তবে আমরা সকলেই ভুল করব।'

খুশি হলো একমাত্র লাস্ট বয়। ক্লাসের শেষে চঞ্চলকে ডেকে নিয়ে বলল, 'ওদের সকলের কানমলা খেয়ে খেয়ে আমি তো এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছি। তুই আমার কানে হাত দিয়ে এমন কিছু নূতনত্ব দেখাসনি, কিন্তু ওদের সকলের কান রগড়ে দিয়ে আমার গায়ের জ্বালা মিটিয়েছিস।'

পরের দিন ক্লাসে গিয়ে চঞ্চল তার পুরাতন সীটে বসল। ফার্স্ট সীটে বসতে তার লজ্জা করছিল, ভয়ও। লাস্ট বয় বলল, 'খবরদার। এ বুড়ো বয়সে আর কানমলা সহ্য হবে না। তুই আমার এদিকে বস।' লাস্ট বয়ের উপরের সীটে যে ছেলেটি বসেছিল সে চমকে উঠে বলল, 'অসম্ভব। আমার কান এখনো জ্বালা করছে। তুমি আমার এপাশে বসো।' এমনি করে প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে উঠে চঞ্চলকে নিজের উপরের সীটে বসিয়ে দেয়।

চঞ্চলের বাবা ও বিজয়কাকা দুজন পুরন্ধর ডিপে'ম্যাটের মতো ইউরোপের মানচিত্রখানার উপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল বুলাচ্ছিলেন ও একজনের কথায় অন্যজন ঘাড় নাড়ছিলেন। তাঁদের কথাবার্তা শেষ হলে চঞ্চল বিজয়কাকাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকা, কী হয়েছে?'

'তুই ছেলেমানুষ, ওসব বিষয়ের কী বুঝবি?'

'আমি বুঝি না বুঝি, তুমি বল না শুনি।'

'অস্ট্রিয়ার যুবরাজ খুন হয়েছেন। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার চরকে সন্দেহ করে সার্বিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে যায়। দেখে রাশিয়া নিয়েছে সার্বিয়ার পক্ষ।'

চঞ্চলের এক সহপাঠীর কাকা থাকেন আমেরিকায়। ছাত্র অবস্থায় পালিয়ে গেছেন, গিয়ে সেখানে এখন চিনি তৈরীর কাজ শিখছেন। পাতালে যে মানুষ থাকে ও তাদের মধ্যে একজন এই প্রতাপগড়ের মানুষ, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—কারণ চঞ্চলের ভূগোলেই তো ক্যালিফর্নিয়ার উল্লেখ আছে আর তার ম্যাটলাসে আছে ওদেশের ছবি।

নিজের য্যাটলাসখানাকে চঞ্চল খুবই ভালোবাসে, কিন্তু সুযোগ পেলে পরের য্যাটলাস নিয়েও নাড়াচাড়া করে।

চঞ্চলের বাবা 'বসুমতী' সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক। চঞ্চল ঐ কাগজে মহাযুদ্ধের বর্ণনা মন দিয়ে পড়তে সুরু করে দিল আর নেপালের য্যাটলাসখানা বারংবার চেয়ে নিয়ে চোখের কসরৎ করতে থাকল। 'বসুমতী'র উপহার হিসাবে তার বাবা আনলেন ফ্রাঙ্কো প্রাসিয়ান, রুশ জাপানী ও বলকান যুদ্ধের ইতিহাস। চঞ্চল ও-বই গ্রাস করল।

॥ আট ॥

ইংলণ্ড বেলজিয়ামের উপর জার্মানীর অন্যায় আক্রমণ দেখে স্থির থাকতে পারেনি, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। তার ফলে চঞ্চলের বাবা আফশোষ করে বলেছেন, 'ভাইয়ে ভাইয়ে আবার কুরুক্ষেত্র! পরিণামে উভয় পক্ষের সর্বনাশ অনিবার্য।' চঞ্চল একথা শুনে বিজ্ঞের মতো বলেছে, 'বাচ্চা বেলজিয়াম কার কী করেছিল! নিরীহের উপর অত্যাচার আমাদের সম্রাট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, ওটা কি একটা কথা হলো।'

যুদ্ধ বাধবার খবর তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন বাধল, কার সঙ্গে কার আগে বাধল—অত খুঁটিনাটির মধ্যে কেউ যায় না। শুধু জানে ইংরাজের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ—জার্মান ভারি জোর লড়াই করছে। কোথায় যে লড়াইটা হচ্ছে তাও কারুর জানতে বাকী নেই—দিল্লীর কাছে। বুড়ো রাম সিং চঞ্চলকে জিজ্ঞাসা করে, 'হাঁ, বাবু। তুমি তো গেজেট পড়। বল দেখি জার্মানী এখন কত দূর এসেছে। আমি তো গুজব শুনছি—কলকাতা পর্যন্ত।'

রাম সিং একজন প্রসিদ্ধ গুলীখোর। তার যিনি মনিব তিনি চঞ্চলের বাবার মতে ভারতবর্ষের দু-তিন জন সেরা বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন। গুলী খেতে খেতে তাঁর বুদ্ধিটা হয়েছে ঘায়েল। বর্মাদেশে তাঁর মস্ত চাকরী ছিল, তারপরে একে একে ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নেই যেখানে তিনি চাকরী করেননি। রাম সিং এঁর সাগরেদি করে সন্ধ্যাবেলায়। সেই সময় গুজব শোনে সারা দুনিয়ার।

চঞ্চল উত্তর দেয়, 'রাম সিং, তুমি বুড়োমানুষ, এসব বিষয়ে কী বুঝবে। ভূগোল তো কোনোদিন পড়লে না, মানচিত্র তো কোনোদিন দেখলে না। কেমন করে তোমাকে বোঝাবো যে জার্মানরা এখন উত্তর ফ্রান্সে।'

রাম সিং বলে, 'হুঁ'। জান আমার বাবুর মাথা গবর্ণমেণ্ট এখন থেকে কিনে রেখেছে?

একদিন ঐ মাথার খুলির নীচে কোনখানে এত বুদ্ধি লুকানো ছিল তার খোঁজ হবে। বাবু বলেন কলকাতা আর তুমি বলছ—কী—কী—'

'ফরাসী দেশের উত্তর।'

'হাঁ, হাঁ, ফরাসডাঙার উত্তর।'

এই বলে রাম সিং গান ধরে,

'গোল গোল কালো কালো
তার নেশা বড় ভালো।'

গান শুনে হাসতে হাসতে চঞ্চলের দম আটকে যাবার মতো হয়।

তখন রাম সিং খোস মেজাজে গলা ছাড়ে ;

'আরে—গুলী খেয়ে মাথার খুলি
বেচেছে বি গাঙ্গুলী
(B. Ganguli)'

নেপালদের মাস্টারমশাইয়ের কাছে চঞ্চলরা গিয়ে রাত্রে পড়া করে। ভদ্রলোক 'busy'র উচ্চারণ শেখান 'বজী'। তিনি গুলী না খেলেও তাঁর মতো বানিয়ে গল্প বলতে গুলীখোররাও পারে না। যুদ্ধে জার্মানী যে কি রকম ওস্তাদী দেখাচ্ছে তার টাটকা খবর তিনি ডাকঘরে গিয়ে পান ও পাড়াশুদ্ধ সবাইকে শুনিয়ে বেড়ান। জার্মানের সঙ্গে ইংরেজ পারবে কেন? জার্মান এই মাটিতে তো এই আকাশে! এই আকাশ থেকে বোমা ছোঁড়ে তো এই পাতাল থেকে ভূমিকম্প ঘটায়। মেঘের উপর থেকে ইন্দ্রজিৎ যেমন লড়াই করে লক্ষ্মণকে নাকাল করেছিল তেমন রণকৌশল জার্মান জানে। কারণ জার্মান পণ্ডিতেরা সংস্কৃত পুঁথি থেকে মন্ত্রগুলি খুঁজে পেতে বের করে নিয়েছে। সংস্কৃত বই আমাদের দেশে যা আমরা পাই তার সারবস্তু বহুদিন পূর্বে জার্মানীতে চলে গেছে।

'তোমরা ভাবছ তা কেমন করে হলো?' চিন্তামণি মাস্টার বালকদের প্রশ্ন করেন ও মৃদু হেসে নিজেই তার উত্তর বলে দেন, 'পুরাকালে ভারতবর্ষে তিন ভাই ছিল, তাদের নাম শর্মণ, বর্মণ, জর্মণ। শর্মণ ও বর্মণ এই দেশেই থেকে যায়, তাদের বংশধরদের বলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। জর্মণ দেশান্তরে চলে যায়, তার বংশধর হচ্ছে জার্মান। যাবার সময় জর্মণ কি শুধু হাতে গেছল? না, তা অবিশ্বাস্য। জর্মণ নিশ্চয়ই বস্তা বস্তা সংস্কৃত পুঁথির মন্ত্রতন্ত্র সরিয়েছিল। তাই থেকে আজ ওরা বানাচ্ছে যন্ত্র! ঐ যাকে এরোপ্লেন বলছে ওটা আমাদের পুষ্পক-রথ ছাড়া আর কী।'

নেপাল ভূপাল ভরত, এমন কি নির্মল, এমন কি চঞ্চলের বন্ধু 'পণ্ডিত' দাদা সগর্বে প্রতিধ্বনি করে, তা ছাড়া আর কি!

একা চঞ্চল প্রতিবাদ করে সকলের অপ্রিয় হয়।

মধ্যরাত্রে চঞ্চলের ঘুম ভেঙে গেল, সে চেয়ে দেখল চারিদিক আলোয় আলোময়। তার গায়ে লাগল সেই আলোর তাপ। আলো নয় আগুন। আগুন দেখতে দেখতে চঞ্চলের গায়ের কাছে ছুটে এলো। সে ভয়ে বুদ্ধি হারিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠবে কি না স্থির করতে পারছে না, এমন সময় শুনল, 'পালা, পালা, প্রাণ বাঁচা।' তার কাছে যারা শুয়েছিল তাদেরও বিমূঢ় অবস্থা। তবু বাঁচতে হবে তো। দৌড়, দৌড়, ওরা সকলে গিয়ে উঠল একটা টিলার উপর, সেখানে নেপালরাও এসে আশ্রয় নিল। পালাবার সময় গায়ের লেপ কম্বল বা শাল আলোয়ান, এমন কি একখানা কোর্তা পর্যন্ত নিয়ে যেতে ভুলে গেল। কেবল 'পণ্ডিতের' গায়ে একখানা কোট। টিলার ওপর বসে পৌষের প্রখর শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে তারা দেখতে লাগল রোশনাই। দুই বাড়ীরই খড়ের চাল, নিঃশেষে পুড়তে সময় লাগবার কথা নয়। বাঁশগুলো পুড়তে পুড়তে শব্দ করছিল বিকট। আগুন ক্রমশঃ মন্থর হয়ে এলো তার রং হলো উজ্জ্বল লাল, তারপর ঘোর লাল, তারপর কালো লাল। তাপ তার মাটির মধ্যে ঢুকে অনেকক্ষণ রইল।

গৃহদাহের দেবতাকে ওদেশে বলে 'হিঙ্গুল'। শীতকালে তার আবির্ভাব কদাচ ঘটে, কাজেই তখন তাঁর পূজার সময় নয়। গ্রীষ্মকালে হিঙ্গুলাকে পলা (দধবৎ) না খাওয়ালে কি রক্ষা আছে? চঞ্চলরা এতদিন তাকে বড় একটা গ্রাহ্য করেনি শুধু যে চঞ্চলদের ও নেপালদের বাড়ী দুখানা এতদিন তিনি জিভ দিয়ে চেটে খাননি তার কারণ বোধ করি এই যে পাড়ার অন্যান্য বাড়ীর থেকে এ দুখানা বাড়ীর ব্যবধান কিছু বেশী।

ভোর হলো। কাল যেখানে দুখানা বড় বড় বাড়ী দাঁড়িয়েছিল সেখানে রইল ছাইয়ের গাদা। সব চেয়ে করুণ দৃশ্য ভস্মীভূত গোরু। গোয়ালে অন্ত যে কয়েকটি গাই গরু আধপোড়া অবস্থায় বাঁধন ছিঁড়ে বা খুঁটি উপড়িয়ে পালাতে পেরেছিল তারা আর ফিরতে চায় না ভয়ে।

কেমন করে আগুন লাগল, কেউ কি হিংসা করে আগুন দিল, কে প্রথম সে আগুন দেখল, কেউ কি সেই তিস্তাতে লোকটাকে দেখেছে—এই রকম নানা গবেষণার পর যখন ক্ষিদে পেয়ে গেল তখন মুখে দেবার মতো কিছু নিকটে পাওয়া গেল না। ময়রা-কাকা দয়া করে মিষ্টান্ন খাওয়ালেন, দূরবর্তী দয়ালু প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন।

দুঃখের দিনে নেপালের সঙ্গে চঞ্চলদের ভারি বন্ধুতা হয়ে গেল। তারপর সে বন্ধুতা স্থায়ীও হলো। দুই পরিবারের কর্তারা স্থির করলেন পাকা বাড়ী বানাবেন। প্ল্যান এষ্টিমেট তৈরী করতে চঞ্চলের এক কাকাকে তাঁর কলেজের ছুটীতে বলা হলো। তাঁর হিসাবে ছয় শো টাকা খরচ করলে ছোট একখানা পাকা বাড়ী হয়। কাজ আরম্ভ করে দেখা গেল যে ছয় শো টাকা ধার করা গেছল তাতে একেবারে কুলায় না। বছরের পর বছর যায়, কোথাও কিছু ধার পাওয়া গেলে কাজ চলে নইলে বন্ধ থাকে। নেপালের

বাবা টাকা সংগ্রহ না করতে পেরে কেবল ভিত্তি স্থাপন করে ক্ষান্ত দিলেন। চঞ্চলের বাবা হাল ছাড়লেন না, বছর চারেক পরে তাঁর বাড়ীতে কোনো মতে ছাদ উঠল। নেপালদের যে ঈর্ষা না জন্মালো তা নয়। তারা বলল, ধার করে দালান দেওয়া সোজা। তবে সে দালান কার ভোগে লাগবে সেইটে আগে থেকে জানা শক্ত—মালিকের না মহাজনের?

মহাযুদ্ধের মজা বছর না ঘুরতেই মালুম হলো। কোনো পক্ষই হারবার পাত্র নয়, দুপক্ষে অন্যান্য দেশ যোগ দিল। এদিকে সব জিনিষের দাম গেল বেড়ে। না আছে বাড়ী, না আছে যথেষ্ট খাদ্য। দামী কাপড়ের দাম দেওয়া যায় না বলে চঞ্চলের বাবা ওদের মস্ত মোটা খদ্দর করিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে খদ্দরের চলন ভদ্রসমাজে হয়নি, চঞ্চলরা লজ্জায় মনমরা হয়ে থাকে। এসব দুঃখ-দুর্দশার চেয়ে চঞ্চলের কাছে বড় ছিল তার পুড়ে যাওয়া লাইব্রেরীটির অভাব। লাইব্রেরীর নোঙর না থাকাতে তার জীবন ভাসমান নৌকার মতো নিরাশ্রয় হলো।

বৃন্দাবন থেকে একদিন এক বাবাজী এলেন, তিনি বললেন, 'তোমরা রোজ ভোরে উঠে গুরুজনকে প্রণাম করো যদি, তবে মাসান্তে তোমাদের একটি খোল পুরস্কার দেবো এবং বাজাতে শেখাব।' পরদিন ভোরে গুরুজনরা ভাবলেন, হলো কী? নেপাল ভূপাল চঞ্চল নির্মল শুধু যে নিজ বাপ মা'কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে তা নয় যেখানে যাকে পাচ্ছে তার পথ আটকে তার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ! তাঁরা শুনলেন প্রতাপগড়ে কে এক যুক্তি সাধু এসেছেন, তাঁর এই শিক্ষা। সাধুকে তাঁরা খুব আদর আপ্যায়ন করে একটা মঠের মোহন্ত করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাস যখন পুরল তখন, 'কই বাবাজী, খোল কই?' শুনে বাবাজী বললেন, 'খোলের জন্য আমি তোমাদের বলেছি, তাঁরা চাঁদা দিলেই আমি কিনে দেবো।' যাক, খোল যদি বা চাঁদার টাকায় হলো, 'এখন বাজাতে শিখিয়ে দিন' বলে দুবেলা তাঁর আস্তানায় হাজিরা দিতে দিতে বইপত্র খোলবার সময় থাকল না।

বাবাজী ততদিনে একটা কীর্তনের দল গড়েছেন এবং সুগায়ক বলে জনপ্রিয় হয়েছেন। চঞ্চলরা তার দলে ভিড়ে গেল ও প্রতি সন্ধ্যায় নগরকীর্তন করতে গিয়ে পথে পথে বাহু তুলে নাচতে শুরু করে দিল। 'গোরা গোরা গোরা' বলে তারা গলা ছেড়ে এমন গান জুড়ল স্কুলের মাস্টার মশাইরা তাদের পড়াশুনার আশা ত্যাগ করলেন। কেবল হেড মাস্টার মশাই তাদের দেখলে টিপে টিপে হাসেন। তার মনোভাবটা এই যে প্রমোশনের দিন যদি বাহু তুলে নাচতে পারো তবে জানব তোমার হরিভজন খাঁটি।

প্রতাপগড় যখন স্বাধীন রাজ্য ছিল তখন তার ছিল বহু সহস্র পদাতিক বা পাইক। করদ রাজ্য হবার পর থেকে যুদ্ধবিগ্রহ নেই, পাইকরা নিষ্কর জমি চাষ করতে করতে যুদ্ধবিদ্যা ভুলেছে। তবে তারা সম্পূর্ণ ভোলেনি তাদের রণনৃত্য। গোড়াতে যা রণনৃত্য ছিল তার সঙ্গে রূপকথা ও পুরাণ যোগ দিয়ে তাকে করেছে লোকনৃত্য। এই লোকনৃত্যকে

বলে ছউ নাচ। এতে গান নেই, আছে বাজনার তালে তালে পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গী। এতে কথাও নেই, আছে ভাবাভিনয়। গ্রামে গ্রামে ছউ নাচের দল একদা ছিল, অধুনা লোপ পাচ্ছে। অত্যন্ত কায়িক শক্তিসাপেক্ষ এ আমোদ। পাইকরা গরীব চাষা, তাদের খাটতে হয় সারাটা দিন। রাত্রে বাড়ী ফিরে কঠিন নৃত্য করতে কি পা ওঠে? তা ছাড়া চাষেও এমন লাভ নেই পেট ভরে খেয়ে শরীরটাকে কঠিন কসরতের উপযুক্ত করে গড়বে।

মাঝখানে রাজার আগ্রহে ও অর্থব্যয়ে তারা নাচ দেখিয়েছিল। তখন প্রত্যেক রাত্রে চঞ্চল যেত রাজবাড়ীতে। কোনো দিন হরধনুভঙ্গ, কোনোদিন রাম-রাবণের যুদ্ধ, কোনো-দিন বিদ্যাসুন্দর। পালা তার অজানা বা অদেখা নয়—কিন্তু নৃত্যবাদ্যের ছন্দ অভিনব। বার বার দেখে তৃপ্তি হয় না। এ ধরনের জিনিষ কোথাও আর দেখতে পাওয়া শক্ত। তবে এর আভাস আছে উদয়শঙ্করের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি নৃত্যে।

॥ নয় ॥

রাজবাড়ীর অতিথি হলেন শ্রীশ্রীভূমানন্দ ভারতী।

ইনি সন্ন্যাসী নন, সন্ন্যাসিনী। বেশভূষা সন্ন্যাসীরই মতো, কেবল মাথায় বড় বড় চুল—তবে মেয়েদের চুলের মতো লম্বা নয়। এঁর পায়ে সারাক্ষণ খড়ম খট্ খট্ করছে। খড়ম পায়ে দিয়ে দাঁড়ালে এঁর উচ্চতা হয় প্রায় ছয় ফুট। সুপরিপুষ্ট শরীর। বয়স যদিও পঞ্চাশের কোটায় তবু দিব্য বলিষ্ঠ গড়ন। আশ্চর্যের বিষয় এই ভদ্রমহিলা বাঙালী। শুধু তাই না, ইনি ভারতবর্ষের প্রায় ভাষাই জানেন, অধিকন্তু জানেন ইংরাজি। এঁর সঙ্গে যে লাইব্রেরীটি ঘুরছে সেটি সামান্য নয়। আর এঁর সঙ্গে ঘুরছেন এঁর কন্যা সুনন্দা দেবী। সুনন্দা দেবী মা'র কাছে পড়াশুনা করেন। তার এক জোড়া ডাম্বেল আছে। সেই ডাম্বেল হাতে নিয়ে সামনে চার্ট ঝুলিয়ে তিনি কসরৎ করেন। তিনি খানকয়েক কবিতার বইও লিখেছেন, ছাপা হয়েছে।

চঞ্চলের বাবা ভারতী মহাশয়ার সঙ্গে আলাপ করে এসে তাঁদের সম্বন্ধে এই সব সংবাদ যখন দিলেন তখন চঞ্চল বলল, 'আমি আলাপ করব।'

চঞ্চলকে তার বাবা ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার এই ছেলেটি খুব পড়ে, দেশ-বিদেশের খবর রাখে খুব।'

ভারতী তার হাত দুটোতে মোচড় দিতে দিতে বললেন, 'এমন দুবলা পাতলা কেন? দেখ গিয়ে তোমার পিসীমা ডাম্বেল করেন।'

পিসীমার বয়স বছর পঁচিশ হবে। এঁর জীবন বড় দুঃখের। ভুলতে চেষ্টা করছেন। চঞ্চলকে তাঁর ভাম্বেল আর লাইব্রেরী দেখালেন। বললেন, 'তুমি মাঝে মাঝে এসো, চঞ্চল। এসে যা খুশি পোড়ো।'

চঞ্চল ভাবছিল রোজ আসতে পারলে বেশ হতো, কিন্তু ইনি তো বললেন 'মাঝে মাঝে।' এর পর বেশী আসা ভালো দেখায় না। কিন্তু বইগুলির উপর এমন লোভ হচ্ছিল! ইতিমধ্যে সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আবিষ্কার করেছিল। সুনন্দা দেবী আর একজন কবিকে চিনিয়ে দিলেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন। বাংলা মাসিকপত্র তিনি পেতেন ও নিতেন রাশি রাশি। চঞ্চল সেগুলির পাতা উল্টায় আর মরীয়া হয়ে ওঠে। কত পড়বার আছে, জানবার আছে, শেখবার আছে, দেখবার আছে। তবু ইনি বলেন, মাঝে মাঝে। এত ছবি, এত গল্প, এত কবিতা, এত ভ্রমণ-কাহিনী, এত বড় বড় বিষয়ে প্রবন্ধ—চঞ্চল যেন পাগল হয়ে যাবে।

সুনন্দা দেবী মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি ওর যতগুলি বয়ে নিয়ে যেতে পারো বাড়ী নিয়ে যাও, কিন্তু আমার কাছে পড়ার পরীক্ষা দিতে হবে।'

তা হলে তো বিপদ। চঞ্চল কোনটা কোনটা নেবে, বাছাই করতে লাগল। একটার একটুখানি পড়ে দেখে, নাঃ। বোঝা যায় না। শিলালিপি, তাম্রশাসন, এসব কথার মানে কী! গীজো ও গিবন—এরা কি মানুষ না বানর। সনেট—সনেট বোধ হয় এক রকম ফল। তা নইলে পরিপক্ক লিখেছে কেন? বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ—ওটা নাকি একটা ছোট গল্প। 'না, পিসীমা', চঞ্চল মনে মনে প্রণাম করে বলল, 'আমার মাইন, সাবমেরিন, ট্রেঞ্চ এর চেয়ে অনেক সোজা।'

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চঞ্চলের রুচি অন্য জাতের হয়ে উঠেছিল। ডিটেকটিভ উপন্যাস পেলে সে খেতে শুতে হেলা করত। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়তে পড়তে সে ভাবত সে নিজেই যেন উপন্যাসের বীর। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক পড়ে সে বীরত্বের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত।

তা নয় তো 'পুরবৈয়াঁ!' 'সনেট' ফল। তাম্রশাসন। কী একটা উপন্যাস—তাতে যুদ্ধ নেই, ষড়যন্ত্র নেই, খুন নেই, ধরপাকড় নেই।

চঞ্চল নিজেই একটা হাতে লেখা মাসিকপত্র বার করল। তার সহায় হলো অম্বর, নির্মল, ভরত, নেপাল ইত্যাদি সমবয়সীগণ। সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখল চঞ্চল স্বয়ং। 'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে'—'আমরা জিজ্ঞাসা করি জার্মানী লুসিটেনিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দেয় কেন?' ইত্যাদি পাকা পাকা কথা। মাসিকপত্রটিতে গল্প কবিতা নাটক ইত্যাদিও থাকে। বেশীর ভাগই এখান থেকে তর্জমা, ওখান থেকে চুরি। বিজ্ঞাপনও থাকে—অন্যান্য মাসিক থেকে টুকে নেওয়া। তা ছাড়া চঞ্চলের অলিখিত

গ্রন্থ, নেপালের অনারব্ধ উদ্ভাবন, অম্বরের বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা—'অম্বর এণ্ড কোং লিমিটেড।' চঞ্চল মনে মনে যে সব বই লিখে ফেলেছে সেগুলির মধ্যে নাটকই বেশী। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসও কম নয়। 'চিত্তোবপূর্ব, দিল্লীশ্বর, সায়েস্তা খাঁর শাস্তি, হত্যাকারী কোথায়? জাল উমিচাঁদ।'

এ এক মন্দ তামাসা নয়। একদিন এই সাহিত্য পরিষদের এক বৈঠকে নেপাল বলল, 'আমাদের এমন প্রতিভা, এ কি হাতে লেখা মাসিকপত্রে পাড়ার মধ্যে আবদ্ধ রইবে?'

পণ্ডিত বললেন, 'একটা পকেট প্রেস কেনা যাক। পাঁজিতে দেখেছি বাংলা পকেট প্রেস পাওয়া যায়।'

ইতিমধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠন ভি-পি-তে আনিয়ে চঞ্চল ভালো রকম পিটুনি খেয়েছে। পকেট প্রেসের কথা শুনলে বাবার পকেট থেকে কিল চড় বেরিয়ে আসবে।

চঞ্চল বলল, 'না, না। পকেট প্রেস নয়। ছাপাখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। আমাদের মাসিকপত্র অন্যান্য মাসিকপত্রের থেকে কোন অংশে হীন?'

ভবত বলল, 'আমি প্রস্তাব সমর্থন করি।' ছাপাখানাকে কত টাকা দিলে এমন একটি মাসিকপত্রের কয় কপি ছাপবে এবং সে টাকা কোথা থেকে আসবে, এ সম্বন্ধে আলোচনা চলল।

চঞ্চল বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক যাঁরা অগ্রিম দু'টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁদের কাছ থেকে পুরো তিন টাকা নেওয়া হবে না। নিশ্চয়ই দু'তিন হাজার গ্রাহক জুটে যাবে দেখতে দেখতে। সেই টাকায় আমরা কাগজ ছেপে বার করব।'

সকলে বলল, সাধু সাধু সাবাস হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

মাসিকপত্র লিখে চঞ্চল দুটি বছর পড়াশুনায় অমনযোগী হলো। কোন মতে ক্লাসে উঠল বটে, কিন্তু অপরে হলো তার কর্ণধার। ওদিকে তার বন্ধু রতনলাল একজন প্রচণ্ড বক্তা হয়ে উঠছে। সে যখন বক্তৃতা দিতে ওঠে তখন থেকে তালি পড়তে আরম্ভ হয়। সে যখন সম্বোধন করে বলে, 'Friends, Pratapgarhins Countrymen' তখন কারুর হাত চুপ মানে না। জীবে দয়া, নগর ভালো না গ্রাম ভালো, মাস্টার হবো না হাকিম হবো—ইত্যাদি সামান্য বিষয়েও রতনলাল টেবিলের উপর মুষ্টাঘাত করে ছাদ ফাটিয়ে সিংহনাদ ছাড়ে। বক্তৃতা যখন শেষ হয় রতন বলে, 'I pause for a reply.' রতনকে বাগ্মিতায় হারাতে না পেরে হোস্টেলের ছেলেরা চক্রান্ত করে স্কুলের সমিতির সহকারী সম্পাদক করল না। রতন জোগাড়ে ছেলে। সবাইকে বোঝালো, যারা হোস্টেলে থাকে না তাদের আত্মসম্মান বজায় রাখতে হলে স্কুলের সমিতিকে বয়কট করে স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপন করতে হয়। হোস্টেলের বাইরের ছেলেরা ক্ষেপল। স্কুলের

সমিতি বয়কট করে রতনদের পাড়ায় সভা করল। সভায় সাব্যস্ত হলো, নতুন একটা সমিতি স্থাপিত হোক, তার সম্পাদক হোক শ্রীযুক্ত রতন আর—সর্বসম্মতি ক্রমে—সম্পাদক হোক, শ্রীমান চঞ্চল।

চঞ্চল তো অবাক। সে একজন অতি নিঃশব্দ বক্তা, বলতে দাঁড়ালে 'সভাপতি মহাশয়' বলেই চোখে সর্ষে ফুল দেখে। 'আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই' বলে বসে পড়ে। সবাই মিলে তাকে রতনের সহকারী করে দিয়ে সম্মান দেখাল, না, অপমান করল?

ঠিক হয়ে গেল নতুন সমিতিতে নানা রকম মাসিকপত্র নেওয়া হবে। চাঁদা উঠল। মাসিকপত্রের অফিসে চিঠি গেল। ভি-পি এলো। চঞ্চলের উপর ভার পড়ল সভ্যগণকে মাসিকপত্র ইস্যু করবার ও তাদের পড়া হয়ে গেলে ফেরৎ নেবার। এই উপলক্ষে চঞ্চল মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করল রোজ। সুনন্দা দেবীরা চলে যাবার পর দু'বছর কেটে গেছে। চঞ্চলের বুদ্ধি বেড়েছে। এখন সে তাম্রশাসন ও শিলালিপির অর্থ আন্দাজ করতে পারে। সনেট দেখে ভয় পায় না। পূববৈয়া নামটি যেমন হোক গল্পটি মধুর। চঞ্চল অমন গল্প খুঁজে পড়ে। প্রকৃত সাহিত্য যে কী জিনিষ তা সে যেন একটু বুঝতে পারে।

চঞ্চল যখন ফোর্থ ক্লাসে উঠল তখন রতনের সমিতি ভেঙে গেল। রতন হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলল। চঞ্চলও দেখল যে পুরোনো সমিতিতে হেড মাস্টার মশাই নিজের নেওয়া অসংখ্য মাসিকপত্র দান করে তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছেন। আপোষে স্থির হলো যে নামে সহকারী সম্পাদক না হলেও কার্যত চঞ্চল মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করবে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, সবুজ পত্র, মানসী ও মর্মবাণী, গৃহস্থ—ওঃ আরো কত মাসিক যে চঞ্চলকে প্রতিদিন প্রলুব্ধ করল! সে কেবল ভাবে কখন টিফিনের ঘণ্টা পড়বে, কখন পড়ে-ওঠা মাসিকগুলি ফেরৎ দিয়ে না-পড়া মাসিক বাড়ী নিতে পাবে। ঠিক সেই সময়টাতে বাংলা মাসিকপত্রে বিশ্বভাবের বন্যা এসেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পিঠ পিঠ। ভারতী এসেছে মণিলাল ও সৌরেন্দ্রমোহনের হাতে। ফরাসী ও রাশিয়ান গল্পের তর্জমা চলেছে। সবুজ পত্রে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল মজলিশ জমিয়ে রেখেছেন। গৃহস্থে বিনয়কুমার সরকার পাঠকের চিত্তকে সাথী করে পৃথিবী পরিক্রমা করছেন।

চঞ্চল বিহ্বল হয়ে পড়ে। পড়ে বিহ্বল হয়।

চঞ্চল ছিল গোড়া থেকে খুব গোঁড়া। ঠাকুমা'র সঙ্গে কার্তিক মাসে রাত থাকতে স্নান করতে যেত। শীতের পরোয়া রাখত না। একাদশীতে উপবাস করতে যেত, বাধা পেলে বিরক্ত হতো। তখন তার জন্য একটা নতুন বিধান আনাতে হতো—সে উপবাসও করবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফলারও করবে। দুর্গোৎসবে ও সরস্বতী পূজায় সে যত্ন করে ফুল তুলে আনত। ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিত। কালীপুজায় সে দীপালি জ্বালত, শিবরাত্রিতে সে রাত জাগত। দোলের জন্য বাঁশের পিচ্‌কারী পনেরো দিন আগে থেকে বানিয়ে রাখত।

রক্তসংক্রান্তিতে বাঁশের দোলা খাটিয়ে আমগাছে দুলত। গোব্রাহ্মণে ছিল তার সমান শ্রদ্ধা, গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে তার ভারি পবিত্র বোধ হতো। ঠাকুরের প্রসাদী ফুল পকেটে নিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতো, রাস্তার ভুল দিকে পাখী বসেছে দেখলে তাকে উড়িয়ে অন্য দিকে বসিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতো। চোখের পাতা ভুল ভাবে কাঁপলে সে ভেবে আকুল হতো। মুখে মুখে অনেক শ্লোক শিখেছিল, মনে মনে আওড়াতো।

মোট কথা, সে ছিল অতি মাত্রায় নৈষ্ঠিক। তার নিষ্ঠা আন্তরিক না কৃত্রিম সে বিষয়ে তাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। খুব শুষ্ক চামড়ার উপরে পরিষ্কার বাতাসা রেখে সবাইকেই খেতে দেওয়া হলো, খেলে কিছু দক্ষিণারও আশা ছিল, চঞ্চল কিছুতেই খেল না। অন্য সকলে—পণ্ডিত দাদাও—নির্বিকার ভাবে খেলো। কোথায় সবাই চঞ্চলকে প্রশংসা করবে, না, যে শুনল সেই বলল ছেলেটা বোকা।

তা হোক, ভিন্ন ধর্মের লোকের সম্বন্ধে চঞ্চলের ছিল সত্যিকার কৌতূহল। এক মুসলমান মাস্টার ছিলেন, তিনি বড় ভালোমানুষ, চঞ্চলদের সঙ্গে তাঁর বাড়ী গেলে তাঁর স্ত্রী মুরগীর ডিম সিদ্ধ করে খাওয়াতেন। খোলা ভাঙতেই যখন মার্বেলের মতো সাদা জিনিষটি দেখা দিত আর সাদার পর্দা তুলতে যখন কদম্ব কোরকের মতো হলদে জিনিষটি বেরিয়ে আসত তখন চঞ্চলের মনে থাকত না যে মুরগীর সঙ্গে এটার কোনো সম্বন্ধ আছে। তার পর কেউ যদি বলে, এই বুঝি তোমার পুণ্য কর্ম? তখন চঞ্চল ভারি অপ্রস্তুত হতো। তাই তো পরকালে তার কী দশা হবে!

আর একজন মুসলমান ছিলেন, তাঁর নাম বোখারী সাহেব। তাঁর পূর্বপুরুষের দেশ বোধ হয় বোখারা সমরকন্দ। তিনি আনতেন পীরের শিন্নী, কিছু চাঁদা নিয়ে যেতেন। শিন্নীতে আমিষ না থাকায় পরকালের ক্ষতি করত না। আর আত্মাহার মিঞা পাঠাতেন হালুয়া। সে অতি স্বর্গীয় সামগ্রী। অন্যান্য মুসলমানেরা কেউ দিতেন পেস্তা বাদাম আখরোট, কেউ দিতেন মেওয়া ফল। প্রতিবেশী মুসলমান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার ভাব ছিল। একজন তাকে ঘুড়ি বানিয়ে দিত, নানা রঙের ঘুড়ি। একজন তাকে বাগানের ফুলটা ফলটা দিত। ওরা যে মুসলমান বলে অন্যজাতের হিন্দুর থেকে আলাদা একথা মনে আসত না। চঞ্চল যে হিন্দু বা কোন্ জাতের লোক যে হিন্দু, তাই চঞ্চল জানত না। হিন্দু কাকে বলে তাই আবিষ্কার করতে চঞ্চলের অনেক বয়স লাগল, ততদিনে সে মহাযুদ্ধের খবর রাখতে শিখেছে। হিন্দু এই শব্দটাতে কেমন একটা ম্লেচ্ছ গন্ধ পেয়ে চঞ্চলের তার উপর অশ্রদ্ধা হয়েছিল।

মুসলমানদের সঙ্গে চঞ্চলদের যেমন আদান প্রদান ছিল খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তেমন নয়। তারা যেন একটু দূরে দূরে থাকতে ভালোবাসত। যদিও প্রতিবেশী। কেবল পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গে হতো হাসি-তামাসা। তাঁর মনে স্বাতন্ত্র্যের অভিমান ছিল না। আর

সেই য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব মাঝে মাঝে এসে হাতে-পায়ে মোচড় দিয়ে ভয় দেখিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে কৌতুক করে যেতো। তার বাড়ীতে গেলে পাওয়া যেতো বিজাতীয় কেক। কেককে চঞ্চল পরকালের পরম শত্রু বলে গণ্য করত। সর্বনাশ! কেক খেলে কি আর স্বর্গে জায়গা হবে? ওতে যে কী মেশান রয়েছে কে জানে? মদ— ভয়ঙ্কর জিনিষ! মদ আছে ওতে! সাহেবরা যে মদ খায় এই একটি দোষে ওরা চঞ্চলের ঘৃণার পাত্র হয়েছে।

বাবার ব্রাহ্ম বন্ধুর ওখানে গেলেও কেক খেতে পাওয়া যায়। তার উপর তিনি যে ঠাকুর দেবতা মানেন না এমন কথাও চঞ্চল শুনেছিল। একবার ভেবে দেখ, জগন্নাথ বলরাম মদনমোহন চন্দ্রশেখর এরা সব মিথ্যা! কী সর্বনাশ। এঁরা যে বিষম রাগ করে না জানি কী মহা ক্ষতি করবেন। কুষ্ঠ রোগ পাঠাবেন কি ওলাউঠায় ওপারে টেনে নেবেন।

কথাটা কিন্তু চঞ্চলের মন থেকে গেল না। বছরে বছরে তার বয়স বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে, ভাবনা বাড়ে। ধীরে ধীরে কেমন করে তার ধারণা হলো যে ভগবান নিরাকার, তাঁর কোনোরকম মূর্তি থাকতে পারে না, মূর্তিকে প্রণাম করা ভোগ দেওয়া নৌকায় চড়িয়ে হাওয়া খাওয়ানো রথে চড়িযে হুড় হুড় করে টানা এসব ছেলেখেলা।

চঞ্চলের আর এসব কাজে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। তবে সকলের সঙ্গে সেও জুটে যায়, হৈ হৈ করে, ফুল তুলে আনে, পুষ্পাঞ্জলি দেয়, প্রসাদ খায়। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না তার বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়েছে। তার নিষ্ঠার কমতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ হাসলেও ওটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে ভয় করে না। উঠতি বয়সের ছেলেরা উপবাস করবে সেই এক অনাসৃষ্টি। এটা খাবে না ওটা ছোঁবে না, সেই এক অকালপক্কতা।

গোঁড়ামি যখন চলে গেল তখন চঞ্চল সবদিক থেকে মুক্ত বোধ করল। সে ধ্যান করল বিশাল পৃথিবীর। তার ইচ্ছা করল দেশে দেশে বেড়াতে, নতুন নতুন বিষয়ে শিখতে, নানা রকমের কৃতী হতে। কত ছেলে জাহাজে কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গেছে, সেখানে বাসন মেজেছে, কাপড় কেচেছে, বাড়ী চুনকাম করেছে, ড্রেন সাফ করেছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ হয়েছে, উন্নতি করেছে। বিদেশী ছেলেদের গল্প পড়ে চঞ্চল ভাবে, আমিও মানুষের ছেলে। ওরা যা করতে পেরেছে, যা হতে পেরেছে, আমিও কেন তা পারব না?

তার মধ্যে এই উতলা ভাব দিন দিন বাড়তে থাকল। তার দেহ থাকে এক স্থানে, তার মন বেড়ায় বিশ্বময়! কখনো জাপানে, কখনো আমেরিকায়, কখনো কোনো অধিবাসীহীন দ্বীপে যেখানে সে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে।

এমন সময় আমেরিকা থেকে ফিরলেন তার সহপাঠী বন্ধুর আত্মীয়। তিনি যে পথ দিয়ে মোটরে করে যাবেন চঞ্চলরা সেই পথের একধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মোটর যখন এল তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। ভালো করে দর্শন করতে হবে সেই বীরকে, self-made manকে। মোটর এত জোরে ছুটে গেল যে কোনটি যে তিনি

চঞ্চলরা তা অনুমান করতে পারলে না। মোটরের পিছু পিছু দৌড়িয়ে তারা যখন তাঁর দাদার বৈঠকখানায় পৌঁছল সেখানে তখন বিরাট ভিড। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিতে দিতে তারা এগিয়ে গিয়ে দেখলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি সহজ মানুষ। পনেরো বছর পরে ফিরেছেন বলে ভাঙা ভাঙা ভাষায় কথা বলছেন। জিজ্ঞাসা করছেন, ও কেমন আছে, সে কোথায়, ঐ সব বাড়ী কবে তৈরী হোল, একে তো আমি চিনতে পারছি নে, ওঃ তুমিই সেই, এরি মধ্যে এত বড হয়েছ।

পনেরো বছরে কত মানুষ মরে গেছে, কত যুবক বুড়ো হয়েছে? কত শিশু যুবক হয়েছে, কত গাছ কাটা হয়েছে, কত বাড়ী ভেঙে গেছে, কত বাড়ী পুড়ে গেছে, কত বাড়ী গড়া হয়েছে।

চঞ্চলরা তাঁকে নির্নিমেষ নয়নে দেখতে লাগল। তাঁর উপর তাঁর পনেরো বছরের বিদেশী ছাপ কি ভাবে পড়েছে। তাঁর আকৃতিতে উজ্জ্বলতা, তাঁর আচরণে আত্মবিশ্বাস, তাঁর পরিচ্ছদে মার্জিত রুচি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে চঞ্চলদের যে আগ্রহ তা ব্যক্ত করলে রতনলাল। বলল, 'আপনি একটি বক্তৃতা দিলে আমরা সকলে কৃতার্থ হবো।' তিনি স্বীকার করলেন। সময় ও স্থান স্থির হলো। চঞ্চল একটা গান লিখে ফেললে। একজন তাতে সুর দিলেন। গানের পর হলো বক্তৃতা। সকলের অনুরোধে তিনি ইংরাজীতে বললেন। সে ইংরাজীর উচ্চারণ একেবারে বিদেশী। তবু বোঝা গেল তিনি নিজের ভাগ্যের পাশা নিজের হাতে খেলেছেন। সম্প্রতি দেশেও সেই খেলা খেলবেন। সামনে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা। কারখানা খুলবেন।

একটু আড়াল পেয়ে চঞ্চল ও রতন তাঁকে জাহাজ চড়া, কাঁটা চামচ ধরে খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করল। তিনি হেসে বললেন, চোখ কান খোলা রাখলে ও সব শিখতে কতক্ষণ লাগে?

অর্থাৎ একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়। আগে থেকে অত ভেবে ফল নেই। চঞ্চল ভাবল কী করে বেরিয়ে পড়বে। ভাবল, কিন্তু ভাবনার শেষ পেল না। তার জল্পনাকল্পনার ইসারা পেয়ে রতনলাল রটিয়ে দিল যে চঞ্চল যাচ্ছে আমেরিকা। চঞ্চলের মা সে গুজব বিশ্বাস করে ভয় পেয়ে গেলেন। বাবা অথচ হেসে উড়িয়ে দিলেন। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করল, কবে যাচ্ছ, টাকা কোথায় পেলে, বিনা টাকায় যদি হয় তবে আমাদেরকেও নিয়ে চলো।

চঞ্চল ভাবে আর বই কাগজ পড়ে আর নানা অপরিচিত কোম্পানীকে চিঠি লিখে জানতে চায় জাহাজে কাজ খালি আছে কি না। হয়তো উত্তর আসেই না। নয়ত আসে· ·না।

—

কামনাপঞ্চবিংশতি

১

আমি যে ভালোবাসি
আমি কি জানি
আমি ত থাকি ভুলে ভুলে
যখন কেহ আসি
শুধায় বাণী
তখনি স্মৃতি ওঠে দুলে।

তখন মনে হয়
জীবন সারা
বেসেছি ভালো আরো ভালো
সকল প্রাণময়
দিয়েছি সাড়া
যখন বাণী যে শুধালো।

মায়ের বাণী শুনে
এসেছি নেমে
কোন সে তারালোক হতে
ভেসেছি রূপে গুণে
স্নেহেতে প্রেমে
সোদর-সোদরার স্রোতে।

অচেনা মুখগুলি
অচেনা ডাকে
আকুল করিয়াছে হিয়া
খেলা ও কাজ ভুলি
পাহারা ফাঁকে
সেধেছি 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া'

জীবনে কত এলো
গেল যে কত
সে আমি সেই আমি নই
স্মৃতি সে এলোমেলো
প্রীতি সে গত
কুমার কুমারীরা কই।

উদাস মন লয়ে
ভুবন ভ্রমি
অশোক হই শোক ভুলে
এ হেন অসময়ে
কে গো মরমী
আমার শিরে হাত থুলে।

কী বাণী আনিয়াছ
কী পূজা লবে
ব্যথার সীমা বুঝি নাই।
অদিনে আসিয়াছ
ক'দিন রবে
জাগায়ে যাবে বেদনাই।

নয়নে মোহ নাই
স্বপন ভাঙা
হতাশ হিয়া দুরু দুরু
প্রেমের কামনাই
সমান রাঙা
তা লয়ে প্রেম হোক সুরু॥

নারী

২

ওগো সুকুমার দেবতা আমার
কত রূপে দিলে দেখা

জানিলাম তবে উদার এ ভবে
আমি নই আমি একা।
আপনার পথে চরণ বাড়ায়ে
আমি যবে চলি তোমারে ছাড়ায়ে
হেরি সম্মুখে রয়েছে দাঁড়ায়ে
না জানি সে কোন নারী
অবগুণ্ঠন লুন্ঠি পুলকে
চিনে লই তারে চোখের পলকে
জীবনে মরণে দ্যুলোকে ভূলোকে
আমারি সেই আমারি।
যতই হারাই তত ফিরে পাই
তত রূপে পাই দেখা
জানিলাম তবে বিশাল এ ভবে
আমি নই আমি একা।

চির পরবাসী হতবিশ্বাসী
তোমারে জেনেছি ধ্রুব
ওগো ধ্রুবতারা এ জীবন সারা
তুমি এনে দিলে শুভ।
কত ভুল করি ভুলে যাই ভুল
কামনাসায়রে নাহি পাই কূল
সুখের লাগিয়া চির শোকাকুল
চলি অলক্ষ্য পানে
আপনারে লয়ে ছিনিমিনি খেলা
কত অযতন কত অবহেলা
স্বপনে আবেশে কোথা যায় বেলা
কিছুই না বুঝি মানে।
শত সংশয় ছেয়েছে হৃদয়
তবু মানিয়াছি ধ্রুব
ওগো ধ্রুবতারা এ জীবন সারা
তুমি এনে দিলে শুভ।

তুমি দূরে থাকি নিলে মোরে ডাকি
তব পূর্ণতা মাঝে
সেথা নাহি ভয় নাহি সংশয়
বাসনা মিলায় লাজে।
তোমার আভা সে নহে নহে ছায়া
অনাদি অনলে গড়া তব কায়া
তাহে কোটি ভানু মিশায়েছে মায়া
তুমি তিল উত্তমা
তব এলোচুল ঢেকেছে দুকূল
আকাশে করেছে তম সঙ্কুল
তারি মাঝে তুমি বহ্নি মুকুল
সৌরভিয়াছ অমা।
তোমার নিখিলে আমারে ডাকিলে
পদ্ম কেশর মাঝে
ওগো মোর নারী সুবাসে তোমারি
বাসনা মিলায় লাজে॥

দর্শন

৩

আরো কিছুখন সমুখে আমার রহ
ওই মুখ পরে এই আঁখিযুগ বহ।
না জানি তোমাতে কোন মরীচিকা আছে
সত্য কি তুমি রয়েছ আমার কাছে
তুমি ত আমার আঁখি-বিভ্রম নহ?
আরো কিছুখন আঁখিতে আমার রহ।

এত শোভা ছিল এত চারু এ ভুবনে
এত সুখ ছিল আমার এক জীবনে।
হে রত্ন তুমি ভুবন আলোকি রাজ'
আমি অভাগ্য নাহি জানিতাম আজো

আপনি জানালে আপন শুভ লগনে
এ রতন ছিল মণিময় এ ভুবনে।

কামনাতীর্থে কামনা আমার নাই
দরশন দিয়া দিয়াছ যা আমি চাই।
জানায়েছ মোরে তুমি আছ তুমি আছ
এ দুটি আঁখিরে সারা দেহে চুমিয়াছ
ভুবনে রয়েছ ভাগ্য আমার তাই
ভবনে পাবার কামনা আমার নাই।

সুন্দরী নারী কেন তুমি সুন্দর
কোনখানে তব গোপন কুসুমশর।
চাহনি আমার অঙ্গুলি সম সুখে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে তব তনুবীণা বুকে
কত ঝঙ্কার বিঁধে অঙ্গুলিভর
তার মাঝে তব কোনটি কুসুমশর।

সে কি ওই তব আপনার মনে হাসা
সে কি ওই তব স্বপনমগন ভাষা?
মৃদুল চলন চরণরঙ্গ সে কি
হংসী উপম গ্রীবা বিভঙ্গ সে কি
সে কি ওই তব চাহনি সর্বনাশা?
সে কি তবে তব আপনাপাসরা হাসা।

আরো কিছুখন সমুখে আমার রহ
ওই দেহময় এই আঁখিযুগ বহ।
হয়ত বুঝিব কেন তুমি অতুলনা
এমন ভুবনে এমনটি মিলিল না।
নহ তুমি মম আঁখি-বিভ্রম নহ
আরো কিছুখন আঁখিতে আমারে রহ॥

১৯২৯

প্রণাম

৪

যে নারী পুরায় বাঞ্ছা অন্তরযামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় বিভবলুব্ধা সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।
ঊর্ধ্ব হতে বর্ষে সুখ কল্পতরু প্রায়
স্বর্গ হতে পারিজাত শিয়রে ঝরায়
আপনি লুকায়ে থাকে সলজ্জ দামিনী
তাহারে প্রণাম।
প্রণাম হাসিয়া লয় যে ঊর্ধ্বগামিনী
তাহারে প্রণাম।

সহস্র বর্ষের তপে সে ক্ষণিকপ্রভা
ক্ষণকাল উরে
চঞ্চলা লক্ষ্মী সে আনে বৈকুণ্ঠের শোভা
প্রেমিকের পুরে।
দিয়ে যায় যুগান্তের প্রার্থিত দর্শন
নিঃস্বের করামলকে দুর্বহ কাঞ্চন
আপনারে দিয়ে যায় সুচির দুর্লভা
ক্ষণযুগ জুড়ে।
অসহ্য সৌভাগ্য দিলে অমর্ত্য বল্লভা
মনোবাঞ্ছা পুরে।

যে লক্ষ্মী কামনাযজ্ঞে সহিতগামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় প্রসাদভিক্ষু সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।
নূতন তপস্যা দানি' সহস্র বর্ষের
সমাপন করি' যায় ক্ষণিক হর্ষের

গুণ্ঠন টানিয়া দেয় নিঠুরা স্বামিনী
তাহারে প্রণাম।
কোথা সে লুকায়ে যায় ক্ষণসৌদামিনী
তাহারে প্রণাম॥

১৯২৯

আকস্মিক

৫

না চাহিতে দিলে কেন দুখানি চুম্বন
কহিলে না ডেকে
নয়নের নিদ গেছে নিদের স্বপন
মসীরেখা এঁকে।
লাজে করি নাই মানা
বলি নাই ছি ছি না না
কিছু কি ভাবিলে মনে পরে কিছু খন
হাতে মুখ ঢেকে?

এখনো রয়েছে যেন শ্রীমুখের ছাপ
নামাবলীসম
কপোলে দাগিয়া গেছে কী মধুর পাপ
সুকলঙ্ক মম।
আরো আরো আরো যদি
দিতে আহা নিরবধি
আমার মুছিয়া যেত সব মনস্তাপ
ওগো প্রিয়তম।

তনুখানি সঁপে দিতে খেদ মোর নাই
তুমি যদি চাহ
মুখমদ বরিষণ দাও গো, নিবাই
প্রাণভরা দাহ।

শিহরণে শিহরণে
মরিব সুখ মরণে
চুমি চুমি দাও তুমি তড়িৎ প্রবাহি'
কবি অবগাহ।

হায় রে লালসাতুর হৃদয়ের ভাষা
শেষ নাহি তার
একবার যদি পায় কিছু ভালোবাসা
চায় শত বার।
যে দিল আপনি দিল
দানের স্মৃতি ভুলিল
তাহারে শুনাই কেন কামনার ভাষা
একান্ত আমার॥

১৯২৯

অভিমান

৬

তুমি যা দিবে প্রিয়ে আপন হাতে তুলে
তাহাই লব আমি সকল দাবী ভুলে।
তোমার দানখানি
শিরে ছোঁয়াব লাজে
তোমার দুটি পাণি
ছাড়িয়া দিব না যে।
দুলিছে অভিমান হিয়ার কূলে কূলে
তাহাই লব তবু যা দিবে হাতে তুলে।

এত অবল প্রেম এত সে অসহায়
যতেক বল তার পরের করুণায়।
কাল তোমার মুখে
কী যে করুণা হেরি

এসো আমার বুকে
জোয়ার সাহসেরি
এখনো রেশ তার হৃদয়ে শোনা যায়
আজ করুণা কই ? প্রেম যে অসহায় ।

তুমি বুঝিবে না গো দাবীর লাজ কত
প্রেমের দাবী সে যে সরমে থতমত ।
কিসের জোরে হায়
চায় সে সবখানি
নিলাজ দুরাশায়
মানে না মানামানি ।
মাগিলে বিনিময় রহে মূকের মত
দিবার নাই যার পাবার দাবী কত ।

দাও তা হলে তাই যা দিতে হাত ওঠে
তাহাই লব আমি কপালে যাহা জোটে ।
তোমার দানখানি
শিরে ছোঁয়াব লাজে
তোমার দুটি পাণি
ছাড়িয়া দিব না যে ।
ফুলিছে অভিমান হিয়ার তটে তটে
তাহাই লব তবু যা দিতে হাত ওঠে ॥

১৯২৯

অপেক্ষা

৭

আমি চেয়েছিনু একটি কণিকা সুখ
তুমি দিয়ে গেলে কত না সুখের কণা
লজ্জায় আমি কোথায় লুকাব মুখ
ওগো কহ আমি এত কি করিব সোনা ।
উল্লাসে যদি বিদরে আমার বুক-
মুগ্ধের মত সকলি কি হারাব না ?

আমি কহেছিনু, 'সময় কি আজ হবে ?'
তুমি কহিলে যে, 'কাল হতে আছি জাগি।'
চরণ চুমিতে কর বাড়াইনু যবে
দুটি কর নিলে কোলের উপর মাগি।
বিদায়ের রবি নিবিল যখন নভে
মিলনগোধূলি তখনো রহিল লাগি।

কে কবে পেরেছে বিদায়েরে দিতে বাধা
যত বাধা দিই তত কাঁপি তার ডরে
সহসা কহিলে, 'আজিকে রহিল আধা
বাকী আধা হবে কোটি জনমের পরে।'
নয়ন মুদিয়া রুধিনু উছল কাঁদা
চেয়ে দেখি তুমি কখন গিয়াছ সরে।

একটি রজনী তোমারে করেছি ধ্যান
জপ করিয়াছি তোমার প্রতিটি কথা
অবোধের মত করিয়াছি অভিমান
কেন তুমি মোরে দিলে বিদায়ের ব্যথা।
কোটি জনমের হয়নি কি অবসান
কোটি তারকা কি হয়নি অস্তগতা ?

তোমার ভাবনা আমার ভরেছে মন
তোমার বিরহ আমার হয়েছে হাসি
তবুও কেমনে করিব বিস্মরণ
তুমি যে আমারে দিয়েছ সুখের রাশি।
ধন্য গো তুমি বদান্যতম জন
মোরে রেখে গেছ তোমার আশার আশী।

সেই আশা লয়ে উন্মুখ মম হিয়া
মেঘ ঢাকা দিনে সূর্যমুখীর মত
কোটি দিন যদি যায় হেন দুখ দিয়া
দিবে না ত দুখ তুমি সুখ দিলে যত।

তেমনি প্রচুর দানের আশায় প্রিয়া
বিরহ আমার মধুর হয়েছে কত।

১৯২৯

বিরহমিলন

৮

শয়নের শেষ চিন্তা
প্রভাতের প্রথম ভাবনা
আজ তারে পাব কি পাব না।
যদি পাই তবে
সে কি কাছে রবে?
যদি কাছে রয়
কথা নাহি কয়?
যদি কয় যে কথা চাইনি
সারাক্ষণ মনে হবে
তারে আমি পেয়েও পাইনি।

যদি তারে নাহি পাই—
সে যে নারী, সে যে মরীচিকা
তার ভালে 'নাই' 'নাই' লিখা
—তবু তারি কাছে
মন পড়িয়াছে।
তারি পদধ্বনি
নিজ বুকে গণি।
যতক্ষণ বাহিরে চেয়েছি
ততক্ষণ অন্তরের
অন্তঃপুরে না পেয়ে পেয়েছি।

আধেক সে একা মোর
স্বজন সে একাকী আমার
আধেক সে তার আপনার।

যে আমার জন
ভরিয়াছে মন।
যে আমার নহে
কাঁদায় বিরহে।
দোঁহারে বেঁধেছি দুই হাতে
যে রমণী দূরে আর
যে রমণী ঘুরে মোর সাথে।

এই ভালো এই ভালো
এ আমার বিরহমিলন
মুখে হাসি মরমে জ্বলন।
পাই, নাহি পাই
গান গেঁথে যাই।
সুরটি আমার
কথাগুলি তার।
পরাই এ মালাখানি কা'রে ?
আধা তার আপনারে
বাকী আধা আমার তাহারে॥

১৯২৯

৯

তুমি যে আমা'রে ভালোবাসো সে কি
তুমিও জানো
ধনীর স্মরণে কখনো রহে কি
কণিকা দানও।
আমি ভেবেছিনু আমি একা জানি
কী ধন আমারে দিয়াছেন রাণী
আজ মনে হয় তব নয়নে কি
নয়নবাণ ও।

তবে কি তুমিও সকলি জানিতে
যত যা দিলে

জানিতে কি তবে কবে অজানিতে
ভালোবাসিলে।
তবে কি নিদয় চাহি বিনিময়
নীরবে চেয়েছ আমার হৃদয়
দীনের সেটুকু পারিবে না নিতে
কেড়ে না নিলে।

তোমার দানের তুল্য আমার
দেওয়া কি সাজে।
আপনি যে তুমি রয়েছ তোমার
দানের মাঝে।
তুমি রানী আমি সামান্য জন
কেমনে ফিরায়ে দিব চুম্বন
সাহসী অধর ফিরে বার বার
ভয়ে ও লাজে।

তুমি যে আমারে ভালোবাসো, যদি
তুমিও জানো
কেন গো আমার না দেওয়া অবধি
ধৈর্য মানো।
লও যাহা লবে দস্যানী সম
মুখে টানি লও চুম্বন মম
সকল অঙ্গে মম নিরবধি
অস্ত্র হানো॥

১০

আমি যারে চাই তারে চাই গো
আর কারে নাহি চাই
তোমরা আমারে ছাড়ো ভাই গো
ছাড়িও আমারে ভাই
তোমাদের কারে আরতি দিয়া
যদি ফিরে লয়ে থাকি এ হিয়া

ফিরে চেয়ো না গো আর নাই গো
এ হিয়া আমার নাই।
আমি যারে চাই তারে চাই গো
হিয়া মোর তারি ঠাঁই।

আমি যারে চাই তারে চাই গো
আর কারে নাহি চাই
তোমরা আমারে ভুলো ভাই গো
ভুলিও আমারে ভাই।
তোমাদের কেহ করুণা করে
যদি ভালোবেসে থাকো গো মোরে
আরো দয়া কোরো—ভুলো তাই গো
ভুলিও করুণাটাই।
পিছু ডেকো না গো যবে যাই গো
যবে প্রিয়-পাশ যাই।

আমি যারে চাই তারে চাই গো
আর কারে নাহি চাই
তোমরা আমারে ক্ষমো ভাই গো
ক্ষমিও আমারে ভাই।
তোমাদের কারো হৃদয়খানি
যদি লয়ে থাকি হৃদয়ে টানি
চলিতে উঠিয়া ফেলে যাই গো
ক্ষমিও সে ব্যথাটাই।
ব্যথা দিতে আমি ব্যথা পাই গো
না দিলেও ব্যথা পাই॥

১১

যে আমারে ভালোবাসে সে যদি বা কাঁদে
সে আমার সাথী
আমি যারে ভালোবাসি সে যদি ফিরায়
সেই মোর প্রিয়া।

সাথীটি আমারি মত কেশ নাহি বাঁধে
বৃথা জাগে রাতি
প্রিয়া সে গম্ভীর মৌন বিভাবরীপ্রায়
সুগুষ্ঠিত হিয়া।

যে আমার পিছু লয়, কর হানে বুকে
সে আমার সাথী
আমি যার পশ্চিমের ছায়াতে মিশাই
সেই মোর প্রিয়া।
সাথীটি আমারি মত অনির্বাণ সুখে
বৃথা জালে বাতি
প্রিয়া সে আপন ধ্যানে জ্যোতির্লোক বাহি
চলে মুক্ত হিয়া।

যে আমার গুণ গায় রূপেরে ধেয়ায়
সে আমার সাথী
আমি যার গান রচি হইব অমর
সেই মোর প্রিয়া।
সাথীটি আমারি মত সাড়া নাহি পায়
রয় কান পাতি
প্রিয়া সে জানে না মম গানের খবর
সমাহিত হিয়া॥

১২

ওরে পথিক এইবারে তোর অলঙ্ঘ্য বাধা
বনে বনে ওড়না ওড়ায় রঙ্গিণী রাধা।
চেরীর কায়ার বাঁকে বাঁকে
শুক্লাভরণ লাখে লাখে
নর্তকী সে একটি পায়ে মঞ্জীর বাঁধা।
এবার তোমার ভাগ্যে আছে কোকিল কাঁদা।

চরণ ধরে সাধে কারা, 'না যেয়ো যেয়ো।'
প্রিমরোজ্ ডাফোডিল্ হায়াসিন্থ্ ব্লুবেল সেও।

কতই নিবি গো ছাড়িয়ে
কতই যাবি গো মাড়িয়ে
এবার তোমায় থামতে হবে থাকতে হবেও।
বরতে হবে ঘর বাঁধানো সুন্দরীকেও।

কুলায় বাঁধার পর্ব চলে মুক্ত আকাশে
এবার তোমার শক্ত হলো বাইরে থাকা সে।
স্টার্লিঙেরা ব্ল্যাকবার্ডেরা
দিকে দিকে গাঁথল ডেরা
থ্রাশের নীড়ে স্প্যারোর নীড়ে নামল শাখা সে
কী কলরব সারা দিবস ভাসল বাতাসে।

ওরে পথিক এই দেশে তোর চরণ থামা
এই জনমের মত এবার পসরা নামা।
মিলেছে জন মিলেছে মন
সাক্ষী রবে সর্ব কানন
পুষ্প শেষে বরে নেবে পুষ্পিত বামা।
যাত্রাশেষে রাত্রি আসুক সুঅভিরামা॥

১৩

তোমারে যত দিয়াছি গান প্রেমের মধুমাসে
তাহাতে তুমি নাই
দিয়াছি মধুমক্ষিসম গুঞ্জরিত শ্বাসে
আপন বাসনাই।
দিয়াছি কোটি পাখীর সাথে দক্ষিণ বাতাসে
ওরা যা দেয় তাই
একটি সুরের একটি কথা অসংখ্য আভাসে
'চাই গো আমি চাই।'

চাবার পালা ফুরাল আজ, পাবার যত পেনু
তাহাতে তুমি নাই
পেয়েছি মধুমক্ষিসম তোমার দেহরেণু
আপন বাসনাই।

চৈত্র গেছে সাথীরা নাই থেমেছে বীণাবেণু
আমিও যদি যাই
যাবার আগে জানায়ে যাব কিসের লাগি এনু
কী লভিনু ছাই।

যে-তুমি থাক আপন মনে স্বপনবিহারিণী
সে-তুমি নাই গানে
আমার মনের আলিঙ্গনে ছন্দিতে পারিনি
তোমার মনের ধ্যানে।
অচেনা নারী অঙ্কে যেন বঞ্চিনু যামিনী
চাহিনি তার পানে
জাগিয়া যেন শুধাই তারে, আনন্দরূপিণি,
কে তুমি কও কানে।

হে একাকিনী কে বা জেনেছে সত্য পরিচয়
কে বা জানাবে গানে
ভক্ত আপন মনের মত মূর্তি বিরচয়
আপন তৃষ্ণা হানে।
যেই অমৃত দিলে বন্ধু দিলে গো প্রাণময়
সেই প্রসন্ন দানে
স্পর্শ তোমার রইল লেগে। হে চিরবিস্ময়
তুমি গো কোনখানে!

১৯২৯

১৪

অনন্ত সুষমাময় নৈশ নভ পথ
পথ বেয়ে চলে মোর কামনার রথ।
চলিতে চলিতে দলে তারকার কুচি
রমণীর মত তারা রমণীয় রুচি
হৃদয়ের মত তারা সুকুমার শুচি
দলিতে দলিতে চলে কামনার রথ।

কেমনে বাঁচাব যারা পড়ে চক্রমুখে
বিরহের শোকে কিংবা মিলনের সুখে ?
মথুরার পথে তারা গোপিকার মত
আপনি ছুটিয়া এসে হলো আত্মহত ।
স্মরণে আমার আমি বহিব সে কত
পিপাসার শোকে কিংবা পরিতৃপ্তি সুখে ।

বিচিত্র বেদনাময় কার এ চক্রান্ত
কেন ভালোবাসি যদি ভুলিব একান্ত ।
কত নাম ধরে ডাকা কত মিঠি সুরে
শত চুমা মুখে আর কপোলে চিকুরে
সীমন্ত সাজায়ে দেওয়া সযত্ন সিন্দূরে
এত ভালোবাসি তবু ভুলিব একান্ত ।

উতলা করেছে মোরে রূপের ইঙ্গিত
যত হেরি তত মোর উথলে সঙ্গীত ।
কে নারী এমন আছে যে হেরাবে সীমা
এই যে ধরণী এও বিগতমহিমা
চকোর পরাণে খুঁজি প্রেমের পূর্ণিমা
যত উড়ি তত মোর উথলে সঙ্গীত ॥

অতৃপ্ত

১৫

কোন রমণী আমার একার
কোন রমণীর একা আমি
এই খুঁজেছি দিবসযামী ।
হায় রে দিবস ব্যর্থ বিবশ
হায় রে যামী শূন্যগামী
পেলেম কি তার দেখা আমি !
হায় গো প্রিয়ে তোমায় নিয়ে
অন্তরেতে একা আমি ।

কতবার যে হলো মনে
এই বুঝি বা এই বুঝি বা
এমনিতর রাত্রি দিবা।
কেউ রূপসী কেউ প্রেয়সী
কেউ দেবতা অপ্সরী বা
আমার তাতে তৃপ্তি কিবা!
আপন মানুষ যাচে যে জন
কী হবে তার লক্ষ্মীই বা!

নাই রূপেতে নাইক গুণে
কিছুতে নাই তৃপ্তি মম
পদ্মিনী গো আমায় ক্ষম।
পদ্মিনী গো মুগ্ধ অলি
বন্দী অলি জানায় নম।
মুক্তিসুখলুব্ধে ক্ষম।
আপন মানুষ মিলল না যার
দুঃখী কেবা তাহার সম॥

১৯২৯

১৬

অনেক বার ত হলো জানা
পথের ডাকে বাহির যে জন
কোথাও তারে থামতে মানা।
এক জনারই নয়ন জলে
আরেক জনার বিম্ব ঝলে
তাইত আমি চলতি প্রেমে
আসছে প্রেমের পাই ঠিকানা।
সবার প্রেমে বাহির যে জন
একটাই তার থাকতে মানা।

অনেক বার ত হলো বোঝা
আরামে নয় বিরামে নয়
সংগ্রামে মানসীর খোঁজা।

এক প্রেয়সীর হৃদয় ভাঙে
আর প্রেয়সীর হৃদয় বাঙে
আমার হৃদয় দীর্ণ করে
প্রেমের সনে প্রেমের যোঝা ।
আরামে নয় বিরামে নয়
সংগ্রামে মানসীর খোঁজা ॥

অকৃতজ্ঞ

১৭

তোমায় পাবার পরে পাবার
রইল কি বাকী
কেন যে কার ভালোবাসার
আশাতে থাকি ।
কে আমারে আঁখির ঠারে
ভোলাতে পারে
তোমার রূপের তুলনা ফের
পাবে কি আঁখি ।

শুকতারা গো নিত্য জাগো
চিত্ত শিয়রে
আমার জীবন পরে গোপন
আশির বিহরে ।
হে কল্যাণী তোমার বাণী
নিরভিমানী
তাই ত যাবার বেলায় আমার
চরণ শিহরে ॥

১৮

এ দেশও আমার দেশ এ ধরণী এও সেই ধরণী
ঘরে ঘরে আছে মোর ঘরণী ।

কেন ভাবি এ কোথায় আসিনু
এ কারে নূতন ভালোবাসিনু
কোনখানে কে দিয়াছে কী মানা
দেশে আর দেশে কই সীমানা
দিকে দিকে প্রিয়াপুরসরণি।

ও হিয়া খোলো গো প্রিয়া নব নব ভাবে মোরে ডাকো গো
রূপের মুকুর ধরে রাখো গো।
হেরিতে দাও গো মোর আপনা
ইহাতে নাই গো গ্লানি পাপ না
আমারে হেরিতে দাও তুমি কী
তুমি কি সেই গো সেই তুমি কি ?
তুমি এক তবু তুমি লাখো গো॥

চাওয়া ও পাওয়া

১৯

চাওয়া যখন নিরাশ হয়ে
সত্য করে থামবে
পাওয়া তখন আসমানী ফুল
স্বর্গ হতে নামবে।
তপ্ত দিনের অবশেষে
নামবে বাদল ধারার বেশে
বাষ্প হয়ে যা ছিল তা
বন্যা হয়ে নামবে
পূর্ণ হিয়া ভাববে প্রেমের
এ পাওয়া কি থামবে।

যে কামনা জলছে প্রাণে
ক্লান্ত হয়ে ঢলবে
তখন বাতায়নের পথে
জ্যোৎস্না এসে ঝলবে।

উচ্ছ্বসিত আলোর জোয়ার
ভরবে গৃহ ভাঙবে দুয়ার
তৃষ্ণা হয়ে যা ছিল তা
তৃপ্তি হয়ে ঝলবে
দীপ্ত হিয়া ভাববে প্রেমের
এ শিখা কি চলবে !

১৯২৯

২০

উর্বশীরে পাবার ত নয় দিনের পরে দিন
সারা জীবন ধরে।
জীবনে যে বারেক এসে বাঁধালো মোর বীণ
দিনে দিনে শুধব রে তার একটি দিনের ঋণ
সারা জীবন ধরে।
'গিয়াছে সে' এই কথাটি বাজাব ঝিন ঝিন
সারা জীবন ধরে।

জীবনে মোর কল্যাণী নাই যাদের আছে থাক
সারা জীবন ধরে।
ধনে জনে যত্নে তাদের আঙন ছেয়ে যাক
পাবার মত যা কিছু সব নিত্য তারা পাক
সারা জীবন ধরে।
'আছে' 'আছে'—তিন সন্ধ্যা বাজাক তারা শাঁখ
সারা জীবন ধরে।

আমার ছিল উর্বশী আর আমার আছে ঋণ
সারা জীবন ধরে।
আমার প্রাণে আনন্দ আর আমার হাতে বীণ
আনন্দ ঋণমুক্তি আসে দিনের পরে দিন
সারা জীবন ধরে।
'আছিল সে' এই কথাটি বাজাই ঝিন ঝিন
সারা জীবন ধরে॥

২১

আমারে যারা বাসনি ভালো
কহ গো তোরা কহ
বাসরে মম নাই যে আলো
তাই কি দূরে রহ ?
আঁধার ঘরে সঙ্গোপনে
যত্নে রচা সিংহাসনে
তোদের লাগি রইল জাগি
একান্ত বিরহ ।

আমারে যারা বাসনি ভালো
আমার তোরা নহ
এই সকরুণ ব্যর্থতা লো
জীবনে দুর্বহ ।
আমার যে নয় তারই আমি
স্বয়ংবৃত হৃদয়স্বামী
তারই লাগি রইল জাগি
অনন্ত বিরহ ॥

অতিথি

২২

আমার জীবনে তুমি এসেছিলে কোন তৃষাবিধুরা
সুন্দরী সুদূরা ।
কেহ কি দেখনি তোরে অলোভরা চাহনিটি
প্রেমসঙ্কেত দিঠি
মধুরা ।

একখানি চুমা মোর দিত কি সজল আঁখি মুছায়ে
সব খেদ ঘুচায়ে ।
কেহ বুঝি সাথী নাই বোঝে না মনের ব্যথা
কহিতে কি সেই কথা
বুঝায়ে ।

যেদিন সবার ছিনু সেদিন রাখিনি কোনো তালিকা
বিলায়েছি মালিকা।
চাহিতে ও না চাহিতে চুম্বন নিল লিখি
যে আসিল যুবতী কি
বালিকা।

একের জনতা আজ এব মাঝে কেন এলে হারাতে
শুধু ভিড় বাড়াতে।
যে নারী কোথাও নাই সে মোব জুড়েছে আঁখি
সেই একা আছে আঁখি-
তাবাতে।

তোমারে ফিরায়ে দিনু এ জীবনে ঠাঁই নাই, বলিতে
শোক মানি বলিতে।
কে তুমি বাসনাময়ী মোবে ভালোবেসেছিলে
কোন দেবী এসেছিলে
ছলিতে।

১৯৩০

২৩

হে বালিকা প্রিয়া বড় হয়ে পরে
মোর এ কবিতা পড়িবে যবে
না রহিল নাম তবু আপনারে
চিনিতে তোমাব ভুল না হবে।
এ দিনের কথা সেদিনের কানে
কহিয়া রাখিনু শপথ দিয়া
একটি চুমা যে দিইনি সে মোর
কঠিন আত্মজয় গো প্রিয়া।

একটি চুমাতে যৌবনে জাগি
পুতুল খেলারে মানিতে ভ্রম
আপনারে লখি চমকি চমকি
নিত্য করিত গা ছম ছম।

নিখিলের দুখ তোমার একার
নয়ন হইতে হরিত নিদ
মাতা ভাবিতেন কোথা গেল মোর
দস্যি মেয়ের যতেক জিদ।

তখন সকলে খুঁজিতে খুঁজিতে
ধরিয়া ফেলিত কারণটা যে
উদ্বাহে যদি না মরিতে তবে
উদ্বন্ধনে মরিতে লাজে।
মোর কথা যদি জিজ্ঞাসা কর
একখানি চুমা কতখানি বা
তার লাগি আমি আপনা হারাতে
ভাবি অন্তত লক্ষ দিবা।

অসমাপিতা

২৪

তোমারে সমাপিবার বাকী
তব তরে তাই ঝুরে আঁখি
পুনরায় দেখা যদি হয়
তবে তুমি ফুরাইবে না কি ?

তখন আসিলে অবসাদ
তাই লয়ে করিবে বিবাদ।
বিদায় লয়েছ বলে ব্যথা
না লইলে নিবে যেত সাধ।

দূরে রহি হও গো অশেষা
মরীচিকামনোহরবেশা
আমার চাতক চোখে সখি
লেগে থাক সুদূরের নেশা।

পথ চলা রীতি

২৫

এইমতো আসুক প্রণয়
এইমতো যাক
বহুদিন জমানো আরাম
পুড়ে হোক খাক
শুধু মোর প্রণয়কামনা
এইমতো থাক।

তার সনে কত রূপে দেখা
যে আমার জন
আঁখি তারে চিনিবার আগে
চিনিয়াছে মন
তার সনে সকলি সমান
বিরহ মিলন।

রূপছায়া নীরবে মুছায়
নিঠুর বিস্মৃতি
তাই তারে নব রূপে হেরি
উথলায় প্রীতি
পেতে পেতে হারাতে হারাতে
পথ চলা রীতি॥

—

নূতনা রাধা

রাখী □ একটি বসন্ত □ খোঁজা

১

মুখখানি ভুলে গেছি ভুলিনি চুম্বন
হে অর্ধবিস্মৃতা।
অধর নেহারে যবে অধর স্বপন
আঁখি ঝুরে বৃথা।
জীবনের আর পারে তুমি গেছ ভেসে
বাহিতে লাগিছ পথ দেশ হতে দেশে
আমার অধরে ওগো তোমার উদ্দেশে
আজো জ্বলে চিতা॥

তনুখানি ভুলে গেছি ভুলিনি চুম্বন
হে অর্ধবিস্মৃতা।
অধরে জড়ায় যবে অধর স্বপন
বাহু ঝুরে বৃথা।
কবে তুমি এসেছিলে কবে তুমি গেলে
অলখিতে একবার কবে চুমি' গেলে
আমার অধরে ওগো কখন সাজিলে
আমার বনিতা॥

নামখানি ভুলে গেছি ভুলিনি চুম্বন
হে অর্ধবিস্মৃতা।
অধর নেহারে যবে অধর স্বপন
মন ঝুরে বৃথা।
মধু মোরে দিয়ে গেছ কোন কুসুমের
আমার মন সে মিছে দিশা খোঁজে এর
আমার অধরে ওগো পদ্মিনী জনের
এ যে স্বাদান্বিতা॥

২

চোখে চোখে কথা নয় গো বন্ধু
আগুনে আগুনে কথা।
অবাক নয়নে মোরা চেয়ে থাকি
জ্বলে যায় চটুলতা।
তোমার চাহনি আমার চাহনি
এ কী নিগূঢ় দোঁহার দাহনি
ছাই হয়ে যায় চেতনা বেদনা
আকুলতা ব্যাকুলতা॥

মুখে মুখে কথা নয় গো বন্ধু
আগুনে আগুনে কথা।
অবাক অধরে মোরা ছুঁয়ে থাকি
জ্বলে যায় মুখরতা।
তোমার পরশ আমার পরশ
এ কী নিগূঢ় দোঁহার হরষ
ছাই হয়ে যায় বাসনা যাতনা
অধীরতা মদিরতা॥

বুকে বুকে কথা নয় গো বন্ধু
আগুনে আগুনে কথা।
অবাক অধরে মোরা রয়ে থাকি
জ্বলে যায় মত্ততা।
আমার মরণ তোমার মরণ
এ কী নিগূঢ় দোঁহার বরণ
ছাই হয়ে যায় নিঠুর নিলাজ
ক্ষুধালোল তপ্ততা॥

৩

কেমনে কহিব হৃদয়ে বহিব
তোমার আননখানি গো রাণি
তোমার আনন-ছায়া?

ভালোবাসিয়াছি হৃদয় দিয়াছি
তবু কি হৃদয় জানি গো রাণি
আপন হৃদয়-মায়া ?

সাধ যায় বলি তোমার সকলি
সব তুমি নিয়ো নিয়ো গো প্রিয়
নিয়ো মোর নিয়ো মোরে।
আমারে ভুলায়ে আমার কুলায়ে
আপনারে ভরে দিয়ো গো প্রিয়
রহিও পরাণ ভরে।

সকল জীবন করি' অর্পণ
মরণ বরণ মালা গো বালা
জনম জনম সঁপি।
ওই তব নাম জপি' অবিরাম
জুড়াই মরম জ্বালা গো বালা
অনন্ত কাল জপি।

সাধ যায় তবু বলিব না কভু
বলিব না হেন বাণী গো রাণি
রহিব মৌন পারা।
ভালোবাসিয়াছি হৃদয় দিয়াছি
তবু কি আপনা জানি গো রাণি
আমি যে আপনা-হারা।

প্রথমা

প্রথম কালের প্রিয়াটিরে হায়
কেহ তো রাখে না মনে
তেয়াগে কুঞ্জবনে।

নিশার স্বপন বাসি হয়ে যায়
মধ্যদিনের রণে
জীবন মরণ ক্ষণে।

কর হতে খসে বাঁশরি যখন
করপুটে আসে অসি
কেমনে রহিব বসি'।
রথের অশ্ব হলে উন্মন
সমরাঙ্গনে পশি'
বিদায় লই রূপসী।

কত না ঝঞ্ঝা কত না অশনি
কত যন্ত্রণা হানে
চির অশান্তি-বাণে।
চরণে চরণে অবসাদ গণি
মরণ-দলন প্রাণে
সংগ্রাম মাঝখানে।

একাকী দিনের বেদনা বাসনা
একা একা যায় ভোলা
হৃদয়-দুয়ার খোলা।
কে হরে কখন পিপাসার কণা
দেয় ক্ষণিকের দোলা
তরঙ্গ-কলরোলা!

প্রথম কালের প্রিয়াটিরে হায়
কেমনে রাখিব মনে
যৌবন জাগরণে!
বনে যে বাঁশরি সাধিয়াছি, তা'য়
রাখিয়া এসেছি বনে
ভাঙা স্বপনের সনে।

৫

আমার মনের মেঘ
নেমে গেছে আকাশের দিকে
শতায়েছে পর্বত চূড়ায়।
সকলের উর্ধ্বে আমি
চলিয়াছি নিমিখে নিমিখে
পূর্ণতা হইতে পূর্ণতায়।
শত লক্ষ দুঃখ মোর
পক্ষ লয়ে ছেয়েছে অম্বর।
সেই মেঘে ঢেকে গেছে আলো
স্বচ্ছোদ হ্রদের মুখে
লেখা মোর স্বচ্ছন্দ অন্তর।
—ওরা মোর হৃদয় জুড়ালো;
ওরা মোর ভার নিল
পথিকের বোঝা নিল তুলে—
ও আকাশ ওই যে পর্বত।
আমার চরণ হতে
শ্রান্তি নিল ভ্রান্তি নিল খুলে
শুভ্র করি' দিল মোর পথ।
শ্যামল কোমল দূর্বা,
ধেনু চরে, পাখী করে খেলা,
নিরালায় ঝিমায় কুটীর।
ধরণীর এক প্রান্তে
হেথায় অলস কাটে বেলা
ত্বরা নাই দিন রজনীর।
এই খানে রেখে যাই
কালিকার যতেক বেদনা
অতীতের যতেক সঞ্চয়।
এরা ভালোবাসি' লবে
আমার রক্তের প্রতি কণা
এরা হবে আরো শোভাময়।

পূর্ণতা হইতে মোরে
মুক্তি দেবে পূর্ণতার পথে
পথিকের মিত্র এরা সব।
আমার সর্বস্ব লয়ে
আমারে বসায়ে দিলে রথে
ধন্ত হবে ধরার উৎসব।
মরণে মরণে আমি
প্রতি দিন নামাইব মেঘ
আঁখি হতে হানিব বরষা।
এই মৃত্তিকার মর্তে
ঢেলে ঢেলে স্বর্গের আবেগ
বার বার করিব সরসা।

৬

তোমরা দাঁড়ায়েছিলে রহিলে দাঁড়ায়ে
আমি ছুটে এসেছিনু চলিনু ছাড়ায়ে।
হে অচল হে অটল হে মৌন পাষাণ
তোমরা জুড়িয়া বহ শূন্তের শ্মশান।
মেঘ-ধবলিত জটা ওগো বনস্পতি
তোমরা করহ তপ স্থিরমনা যতি।
আমি সূর্যসুত, আমি দুরন্ত যৌবন
এই ছায়া অপ্সরার রাখি নিমন্ত্রণ।
আমারে ভুলাবে বলে কত এর ছলা।
সব হেরি লবো তাই অবিশ্রান্ত চলা।
আমার ভেঙেছে ধ্যান লাগিবার আগে
বল্কল গিয়াছে খসি' পরম বিরাগে।
মোর তরে নহে নহে অন্ধ বিভাবরী
আমি চলি সারা পথ রৌদ্র হাতে করি।
আমি সূর্যসুত, আমি জ্বলন্ত যৌবন
আমারে দিয়াছে ডাক সর্ব প্রলোভন।
এই রূপসীর সরে'-সরে'-যাওয়া বাস

আঁখির চুম্বন যাচে আমার সকাশ।
তাই আমি এসেছিনু চলিনু ছাড়ায়ে
তোমরা দাঁড়ায়েছিলে রহিলে দাঁড়ায়ে

৭

ছুটেছি পর্বত পৃষ্ঠে আমরা ক'জন
সাথে সাথে ছুটিয়াছে অতল মরণ।
হয় তো এখনি হবে জীবনের শেষ
চকিতে করিবে সীতা পাতাল প্রবেশ।
জীবনের মরণের মাঝখানে কাঁপে
মুহূর্ত একটি মাত্র। তবু কী প্রতাপে
আমরা চালাই রথ! আমরা উদ্দাম,
সেটুকু মুহূর্ত নাই মোদের বিশ্রাম।
কোথা মরণের ভয়? মোরা হেসে খেলে
ছুটেছি দুর্গম পথ অতি অবহেলে।
হে তাপস, কার লাগি' কর তুমি শোক।
আমরা এ জগতের কোটি কোটি লোক
কাহারো তো কোনো দুঃখ নাই? আমরা যে
থামিব না জীবনের মরণের মাঝে
একটিও সামান্ত নিমেষ, সেই দুখে
দুঃখ হলো বনবাসী। তপস্বীর বুকে
দুঃখ সে লভিল গুহা, রহিল একাকী
জগতের পানে তার মুদি' দিয়া আঁখি।
মোরা কোটি কোটি প্রাণী চলি হেসে খেলে
সূর্য তারকার মতো অতি অবহেলে।
সাথে চলে অপার শূন্যতা, মোরা তবু
কোনো খানে মধ্যপথে হারাবো না কভু।

৮

এ তো মিথ্যা নয়
মন মোর ছড়ায়েছে ত্রিভুবনময়।

তাই বাসি ভালো
হ্রদের মুকুর পরে পর্বতের কালো।
বনানীর শ্যাম
নিবিড় অঞ্জন সম নেত্রের আরাম।
ওই যে প্রপাত
বাঁধিয়াছে আকাশের অবনীর হাত
সেও মোর প্রিয়।
আঁখিতে বাঁধিয়া দিল কিসের রাখী ও?
বিহঙ্গের মেলা
জলের বুদ্বুদসম জলে করে খেলা।
তা'রা মোর চিত্তে
এক হয়ে মিশে গেছে একই শোণিতে।
আর ওই তরী
আলস্যমন্থর সুখে চলেছে সন্তরি'
সেও মোর প্রাণ।
নহিলে আমার প্রাণে কেন জাগে গান?
কেন লাগে নাচ?
আছি গো আছি গো বন্ধু সকলের কাছ।
নহে, মিথ্যা নহে
সবার আনন্দ লভি সবার বিরহে।
যদি ভুলে যাই,
কাল যদি মনে নাহি রয় এই ঠাঁই,
তবু জানি স্থির
সব ঠাঁই ব্যাপিয়াছে আমার শরীর।
আমার অজ্ঞাতে
যেথায় যে-কেহ আছে আমি আছি সাথে

ঋণ

১

দস্যু হরি' লয় ধন
তার তরে আছে কারাগার

আমি হয়ে লই শোভা
মোরে দণ্ড কী দিবে ইহার !
ওগো দণ্ডধর,
আমি পরাক্রান্ত দস্যু
ধরা দিতে নাহি মোর ডর ।

এ রাজপুরীতে মম
আঁখি দুটি দু'মুঠা ভরিল
কত দীঘিকার নীলা
ভূধরের রজত হরিল ।
তবু ক্ষান্তি নাই—
যত পাই তত মোর
বাড়িয়া চলিছে দুরাশাই ।

তুমি রাখিয়াছ খোলা
তোমার এ ভাণ্ডারের দ্বার
তারি হতে আমি দস্যু
আমি লভি ঐশ্বর্য আমার ।
দিনে দিনে দিনে
আপন বৈভব অর্জি
তোমার অজস্রতম ঋণে ।

ভক্ত দিয়ে যায় পূজা
তার তরে আছে পুরস্কার ।
আমি দিয়ে যাই প্রেম
মোরে মূল্য কী দিবে ইহার ।
ওগো মহারাজ,
আমি অযাচক ভক্ত
মোরে মিথ্যা নাহি দিয়ো লাজ ।

এ রাজপুরীতে মম
আঁখি হতে যে সুধা ঝরিল

তুষারে সে দিল তাপ
　　তৃণ বৃন্তে আরো শুভ্র দিল।
　　সে যে কত ঠাঁই
কত চিহ্ন রেখে গেল
　　আমি তার কিছু জানি নাই।

আমি রাখিয়াছি খোলা
　　আমার এ হৃদয়ের দ্বার
তারি হ'তে যত পাবো
　　তুমি লও পূজা আপনার।
　　দিনে দিনে দিনে
আপনারে প্রিয় করো
　　আমার অজস্রতম ঋণে।

১০

এবার এসেছি নরলোকে। এও ভালো।
প্রকৃতি ভুলায়েছিল মানব দুলালো।
আমি মানবের কবি। এই তো আমার
আপনার দেশ। এই মোর তপস্যার
উদার অরণ্য। অশান্ত জনতা লয়ে
এর নির্জনতা শান্তি আনে এ হৃদয়ে।
যেথা যাই আপন জনের দেখা পাই।
ওরা যেন প্রতীক্ষিয়াছিল পথ চাহি'
আমাকেই। চলি যবে, ওরা সাথে চলে।
আমারে শুনাতে কথা শত কণ্ঠে বলে
শত কানে। অসম্বৃতা এ মহানগরী
এর অঙ্গময় কত কৃষ্ণ তিল ধরি'
এমন সুন্দরী! আমার এ তপোবনে
এই যেন মেনকা দাঁড়ায়ে কাল গণে
ক্লান্তমুখী আকুল লোচনা। ইঙ্গিতেই
ঢলিয়া পড়িবে বক্ষে, দ্বিধালেশ নেই।
সব ভালো লাগে হেথা—যত মিথ্যা কাজ;

যে বিপুল ব্যস্ততায় জীবনের মাঝ
মৃত্যু করে আনাগোনা, স্মৃতি দেয় মুছি' ;
যত অশুচিতা ক্রমে হয়ে ওঠে শুচি
আপনারে ধুয়ে মেজে ; যত ক্রূর প্রেম
ভস্ম করে ধরিত্রীর বক্ষ-চেরা হেম
বিনিদ্র উৎসব কক্ষে নির্লজ্জ তাণ্ডবে ;
যে নিষ্প্রেম দৈন্য বয়ে গৃহহারা সবে
শীতে কাঁপে ভিক্ষা হাঁকি', যত তুচ্ছ ছল ;
কপোলের রঙে ঢাকা যত অশ্রু জল ;
অধরের রঙে আঁকা যত মিথ্যা হাস ;
ভুরু যুগ আকর্ণিয়া যে নেত্র বিলাস ;
মুখখানি কাছে আনি' যত চাটু কথা ;—
ভালো লাগে মানবের সব দুর্বলতা।
আমি মানবের কবি ; এই তো আমার
নায়ক নায়িকাগুলি ঘিরে' চারিধার।
ইহাদের ভালোবেসে হেরি দিন যামী
তৃপ্তিহীন অনিমেষ। পুণ্য নরলোক
আমার তপস্যা লয়ে পুণ্যতর হোক।

এই সৃষ্টি

১১

এই সৃষ্টি অতুলা সুন্দরী
আমি এর প্রিয়।
এই পৃথ্বী উর্বশী অপ্সরী
অনির্বচনীয়।
কোটী যুগ কোটী কল্প ধরি
এই সৃষ্টি এমনি সুন্দরী
কোটী যুগ কোটী কল্প ভরি'
আমি এর প্রিয়।
এই পৃথ্বী উর্বশী অপ্সরী
অনির্বচনীয়।

আমি আছি তাই তো এ আছে
আছি দুই জনা।
এত মোরে ভালোবাসিয়াছে
শ্যামা সুরাঙ্গনা।
অরুণ সিন্দূর পরিয়াছে
আমি আছি তাই সতী আছে
সুনীলিম শূন্যতার মাঝে
আছি দুই জনা।
এত মোরে ভালোবাসিয়াছে
শ্যামা সুরাঙ্গনা।

এক খানি স্বপনের মতো
দু'খানি জীবন।
মরণে মরণে অব্যাহত
গাঢ় আলিঙ্গন।
কে জানে যে কাল যায় কত
একখানি স্বপনের মতো
পাশাপাশি ঘন তন্দ্রাহত
দু খানি জীবন
মরণে মরণে অব্যাহত
গাঢ় আলিঙ্গন।

ওগো শুধু তুমি আর আমি
আর নাহি কেহ।
একা মোরা নারী আর স্বামী
রচিয়াছি গেহ।
ভরিয়াছি দিবা আর যামী
ওগো শুধু তুমি আর আমি
কোনো খানে কেহ নাই থামি'
আর নাহি কেহ।
একা আছি সখী আর স্বামী
বিরচিয়া গেহ।

১২

ব্যথার ব্যথী গো, বেদনা আমার
তুমি কি পারিবে বুঝিতে!
আমি যে রয়েছি এই অমরার
অরূপ রতন খুঁজিতে।
মধুর জীবন মধুর মরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যুগল চরণ
ছুটি মুঠি মোর করেছি ভরণ
দুঃখ সুখের পুঁজিতে।
তবু পাই নাই অরূপ রতন—
এ ব্যথা পারিবে বুঝিতে!

ব্যথার ব্যথী গো বেদনা আমার
তুমি কি পারিবে দুরাতে!
আমি যে রয়েছি এই বসুধার
সুধা ভাণ্ডার পূরাতে।
বিতরি গীতিকা বিলাই গন্ধ
ছবির সঙ্গে মিলাই ছন্দ
যে দিকে ছড়াই যত আনন্দ
অঞ্জলি নারি ফুরাতে।
তবু দিই নাই সুধা অমন্দ—
এ ব্যথা পারিবে দুরাতে!

ব্যথার ব্যথী গো, বেদনা আমার
তুমি কি পারিবে বহিতে!
আমি যে রয়েছি বিশ্বজনার
আত্মীয়তম হইতে।
আকুল করেছে অন্তর মম
কোটী মানবের আশা নির্মম
তরঙ্গদলে চন্দ্রমা সম
মিনতি যে নারি সহিতে

তবু হই নাই আত্মীয়তম—
এ ব্যথা পাবিবে বহিতে।

ব্যথাব ব্যথী গো, বেদনা আমাব
তুমি কি পাবিবে বাড়াতে।
আপনি রয়েছি আমি আপনাব
বেদনাব সীমা ছাড়াতে।
কবে তুলে লই কব বন্ধন
বুকে সকলেব সব ক্রন্দন
নিখিলেব তবে তন মন ধন
চলি যে হাবাতে হাবাতে।
তবু বচি নাই নন্দন বন—
এ ব্যথা পাবিবে বাড়াতে।

মবণ

১৩

বাজায়ে বাজায়ে যৌবন জয় শাঁখ
মবণে দিয়াছি ডাক।
কভু আতঙ্কে দুর্ভাবনায়
কভু অপবেব শুভ কামনায়
কভু আনন্দে কভু বেদনায়
বাজায়ে বাজায়ে শাঁখ
মবণে দিয়াছি ডাক।

বলেছি বলেছি এসো হে অচেনা মিতা
জ্বালাতে অকাল চিতা।
যেতে আমি তিল বিলম্ব কবিব না
বিলাপে প্রলাপে গগন বিদবিব না
রেখে নাহি যাবো চবম চিহ্ন কণা
এসো হে অচেনা মিতা
জ্বালাতে অকাল চিতা।

ভালোবাসি আমি প্রাণপণে বাসি ভালো
প্রাণের প্রদীপে আলো।
ভালোবাসি মোর প্রতি কান্না ও হাসি
মান অপমান কলঙ্ক রাশি রাশি
ভালোবাসি মোর শত ভালোবাসাবাসি
প্রাণ ভরে বাসি ভালো
প্রাণের প্রদীপে আলো।

দাও যদি দেবে নিবায়ে সে আলোটুক
দেখি সে কেমন সুখ।
সে কেমন সুখ—নিমেষে নিবিয়া যাওয়া
ছুঁয়ে যাবে যবে একটি ফুঁয়ের হাওয়া
হাতে হাতে পাবো সব চাওয়া সব পাওয়া
নিবাও এ আলোটুক
দেখি সে কেমন সুখ।

অথবা ইহাতে অনল আহুতি দেবে
পূর্ণ করিয়া নেবে।
দীপ্ত শিখায় জ্বলে যে প্রদীপ খানি
তৃপ্ত তাহারে করিবে চিতায় আনি
অনলোৎসবে তারে বুভুক্ষু মানি'
অসীম অনল দেবে
তৃপ্ত করিয়া নেবে।

বাজায়ে বাজায়ে যৌবন জয় শাঁখ
মরণে দিয়াছি ডাক।
বলেছি কখন আসিবে শীতল জরা
তখন আমার কী হবে কী হবে মরা
সে লজ্জা হতে বাঁচাও আমারে ত্বরা
বাজায়ে বাজায়ে শাঁখ
মরণে দিয়াছি ডাক।

আমি স্রষ্টা, আমি বুঝি বেদনা তোমার।
ওগো স্রষ্টা, এই সৃষ্টি মোদের দোঁহার
চির বেদনার লীলা। আমরা দু'জনা
দুই ঠাঁই গড়ি বসে একই খেলনা।
বাসনার রুদ্ধবাষ্প চিত্ত বিদারিয়া
অঙ্কুরি' পল্লবি' ওঠে। প্রসবার্ত হিয়া
নভোনীল হয়ে রয় তবু বাষ্পাকুল।
যত ফুল ফুটাইতে চায় তত ফুল
ফোটে না তো? তারা নীহারিকা থেকে যায়!
সেই সব আকাশ কুসুম লয়ে, হায়,
আমরা সতত পূর্ণ। কোটি সম্ভাবনা
কোনো মতে বাষ্প হতে ফুল হইল না,
রহে গেল জনম এড়ায়ে। এ যে ব্যথা,
তোমার আমার এ অপূর্ণ সম্পূর্ণতা,
কারে ক'বো? কে শুনিবে? ওই যারা হাসে,
ওই যারা কাঁদে, ওই যারা অবিশ্বাসে
মাথা নেড়ে যায়, ওরা কভু জানে না তো
একটি কুসুমশিশু রহিলে অজাত
কী অক্ষম বাসনায় মোরা মরে যাই!
ওগো স্রষ্টা, সে মৃত্যুর তুলা নাই, নাই!
সে মৃত্যুর শেষ নাই। নীল বাষ্পাকুল
এই যে আকাশ, এ শ্মশানে কোটী ফুল
দগ্ধ হয় অজাত অ মৃত। সে দাহনি
অনুক্ষণ বক্ষে বহি' দিতে হয় গণি'
যে কটি কুসুম, সেই কটি দুর্লভ খেলনা
অনুক্ষণ ভাঙি গড়ি আমরা দু'জনা।
ওগো স্রষ্টা, এ বেদনা নয় বোঝাবার;
আমি স্রষ্টা, তাই বুঝি বেদনা তোমার।

১

কামনা আমার নহে বেশী।
এই এতটুকু পথ
এত ছোট এ জগৎ
তুমি পরদেশিনী গো আমি পরদেশী
এই এতটুকু ক্ষণ
এত ছোট এ জীবন
মিলন নিমেষ যেন বিদায় নিমেষ-ই॥

ক্ষণেক বসো গো, প্রিয়ে, পাশ।
মাথাখানি কোলে লও
শিয়রে জাগিয়া রও
কান পেতে শোনো মোর মরমের ভাষ
কত কথা কহিবার
কত ব্যথা বহিবার
সাথীহীন জীবনের আশা ও নৈরাশ॥

কী হবে শুনায়ে কোনো কথা?
মিছে মিছে মিছে হায়
মুখে যাহা বাহিরায়
সত্যেরে রুধিয়া রাখে ক্রূর নীরবতা।
নীরব রহিলে, প্রিয়,
বুঝে নিও বুঝে নিও,
আমার সত্যের সেই প্রকাশাকুলতা॥

কী আমার দিব পরিচয়?

বিশ্বের আদিম পান্থ
পথিক বধূর কান্ত
নাই মোর জরা ব্যাধি জনমের ভয়।
তারা হতে তারকায়
আমার রথাশ্ব ধায়
রথচক্ররেখা মোর ছায়াপথময়॥

কোটী যুগ কোটী দেশ ভ্রমি'
প্রথম হেরিনু তোমা
আজিকার প্রিয়তমা
আসঙ্গ লভিনু তব বিস্ময়ে প্রণমি'।
কোটী যুগ কোটী দেশ
এখনো হয়নি শেষ
এই দেখা শেষ দেখা হে মোর মরমী॥

আহা এ যে হরিষে বিষাদ।
মুখে হাসি চোখে জল
শিশিরিত টলমল
ফুলন্ত হৃদয়টির মিটিল না সাধ।
অলির পরশ মাত্র
পুলকে শিহরে গাত্র
দলগুলি ঝরে যায় অজস্র অবাধ॥

ক্ষণেক বসো গো তবু কাছে।
মাথাখানি কোলে লও
শিয়রে জাগিয়া রও
এখনো তো পরক্ষণ পরক্ষণে আছে।
কাঁপে হিয়া দুরু দুরু
আবার পথের সুরু
পথিক প্রাণের কানে ডাক আসিয়াছে॥

আমার কামনা নহে বেশী।
এই এতটুকু কোল
তাহে তুমি দিবে দোল
তুমি পরদেশিনী গো আমি পরদেশী।
এই এতটুকু বেলা
তব সাথে হেলা ফেলা
মিলন নিমেষটুকু বিদায় নিমেষ-ই॥

২

তুমি জানিবে না প্রিয়ে কী তুমি স্মরাও
কেন যে নয়নে মোর সলিল ভরাও।
তোমারে চাহিয়া রহি চাতকের প্রায়
বাদল ঘনায়ে আসে লোচন সীমায়।
তুমি কোথা ছিলে, প্রিয়ে, আমি ছিনু কোথা
সহসা কুড়ায়ে পেনু পথে এ দেবতা।
এত সুখ দিলে তুমি এত সুখাতুরে
তবু কী কাঁদন বাজে বুকে বুকে সুরে?
এমনি কাজল সাঁঝ এমনি একাকী
পশ্চাতে রাখিয়া এনু দুটি কালো আঁখি।
সে দুটি আঁখির শোক ভুলেছিনু কবে
কে কাহারে মনে রাখে দিনের আহবে?
তুমি আজ এলে, প্রিয়ে, সেই শোক বহি'
একের মিলনে আমি অন্যের বিরহী॥

কাছে ও দূরে

৩

কত কাছে আছো তুমি তবু কত দূর
সেথায় প্রবেশ মানা যেথা তব পুর।
গলাটি বেড়িয়া ধরি মুখ রাখি মুখে
খুলিয়া দেখিতে নারি কী রেখেছ বুকে

কেশগুলি নাড়ি চাড়ি আঙুলে জড়াই
মনেরে বাড়ায়ে হাত নাগাল না পাই।
দেহময় খুঁজে ফিরি গেহের কুঞ্চিকা
ক্লান্তিতে কখনো ভাবি তুমি প্রবঞ্চিকা।
যা তুমি দিয়েছ, প্রিয়ে, প্রচুর সে কত
প্রাণ তবু তাই চায় না দিয়েছ যত।
কাছে থেকে এত দূর, তাই মনে লয়
দূরে গিয়ে পাব কি নিকট পরিচয়?
যাব কি অন্তের কাছে তোমারে খুঁজিতে
সেথায় পাব কি তোরে আপনারি চিতে?

৪

যদি কোনো দিন আমি দুঃখের ঝঞ্ঝায়
ছিন্নমূল ভেঙে পড়ি বনস্পতি প্রায়
বিধাতারে অভিশাপ দিব না দিব না
আপনারে ধিক ধিক তাও বলিব না।
তখন স্মরিব তোমা হে অ মার লতা
নিশিদিন যে সোহাগ দিয়েছ সর্বথা।
এত সুখ দিলে তুমি, নিজ হতে দিলে
এত কাঁদাইলে তুমি, সুখে কাঁদাইলে।
এর পরে আসে যদি আসুক ঝটিকা
নিঃশেষে মুছিয়া দিক চুম্বনের টীকা
তুলে নিক পুলকের দুর্বহ সম্ভার
তৃপ্তি হতে মুক্তি দিয়ে করুক সংহার।
ধন্য করিয়াছ প্রাণ হে আমার লতা
প্রাণ দিয়ে জানাইব প্রাণের ধন্যতা॥

৫

সোনা হয়ে গেছে অঙ্গ সোহাগে সোহাগে
অমৃত হয়েছি আমি তব অনুরাগে।
যারা মোরে চেয়ে দেখে তারা দেখে কী-বা

ধাঁধায় তাদের চোখ আমার এ বিত্ত।
তুমি মোরে ছুঁয়ে দেখ তুমি দেখ সব
তুমি জানো আমি নই নিতান্ত মানব।
তোমারি সে ছোঁয়া লেগে আমি দীপ্যমান
আদিত্য সভায় খুঁজি আমার সমান।
প্রতি চুম্ব প্রতি অংশু প্রতি অঙ্কে মম
প্রতি আলিঙ্গন তপ্ত বৈশ্বানর সম।
এ তনুমণ্ডলে নাই হেন তুচ্ছ স্থল
যারে তুমি করো নাই উত্তাপ-উজ্জ্বল।
অয়ি স্বয়ম্বরা নারী, তব মাল্যলতা
আমাতে ছুঁয়ায়ে দিল আমার যোগ্যতা॥

৬

তুমি মোর ব্রিটানিয়া। তুমি মৌন হাসি'
অন্তরে রুধিতে জানো ভীম ঝঞ্ঝারাশি।
তুমি শঙ্কাহীনা, তুমি উন্নতললাট
ভাগ্য সহ ভাগ করো সিংহাসন পাট;
তোমার সে কেশ নহে উদ্যত কেশর
প্রসাধনলেশ তরে নাই অবসর।
ভাস্করখোদিত মুখ কুঞ্চনরহিত
ভাবের মুকুর নহে, ভাবশিখান্বিত।
আমার গোপন শ্রদ্ধা মানে-অভিমানে
তোমারে আত্মীয় জানি স্বগৌরব মানে।
মহার্ঘ তোমার সঙ্গ, তোমার হৃদ্যতা,
তোমার নিঃস্বার্থ স্নেহ, তব বদান্যতা,
সহজ মহত্ব তব, অয়ি সুমঙ্গলে,
স্মরিব জীবনভর ব্রিটেনের বলে'॥

৭

আমারে ঘিরিয়া করে তীর্থ পরিক্রমা
কোটী তারা কোটী যাত্রীসমা।

দিনে থাকি আনমনা রাত্রে অচেতন
ওরা হানে কপালে কঙ্কণ।

আমার নাসার পাশে ফিরে অহরহ
ত্রিদিবের ধূপগন্ধবহ।
দিনে থাকি আনমনা রাত্রে অচেতন
দীর্ঘ শ্বসে দক্ষিণ পবন।

আমারি মধুর নাম অষ্টোত্তর শত
বিহগেরা জপে অবিরত
দিনে থাকি আনমনা রাত্রে অচেতন
ওরা করে অরণ্যে রোদন।

আমি ভাবি আমি তুচ্ছ আমি সৃষ্টিছাড়া
মোর কাছে কেবা চায় সাড়া।
দিনে থাকি আনমনা রাত্রে অচেতন
বহে যায় দুর্লভ জীবন।

৮

ওগো এ জগৎ এত সুন্দর কেন?
নিমেষ নামে না নয়নের পর কেন?
আঁখিপথে মোর মন চুরি যায়
আমি চেয়ে দেখি এত অসহায়!—
আমারি শোভায় শোভে চরাচর যেন।

ওগো এ জগৎ এত সুন্দর কেন?
চরণ চলে না— এত মন্থর!—কেন?
তনু বেঁধে রেখে মন কেড়ে লয়
দস্যুরা মোর এমন নিদয়
আমারি সে ধনে ধনী চরাচর যেন।

ওগো এ জগৎ এত সুন্দর কেন ?
কাজ করিবার নাই অবসর কেন ?
দিন চলে যায় ফুল বনে বনে
মন চলে যায় পাখীদের সনে
আমি নাই, শুধু আছে চরাচর যেন ।

ওগো এ জগৎ এত সুন্দর কেন ?
তোমারেও ভুলি প্রহর প্রহর কেন ?
প্রেমিকার থেকে প্রেমিকে ছিনায়
আপনারে ফিরে ফিরে সে চিনায়
আমারি প্রিয়াতে প্রিয় চরাচর যেন ॥

৯

আর কভু আমি কহিব না কটু কথা
অধরে আমার মাখায়েছ মধুরতা
তোমার চুমার স্বরে
কথাগুলি মোর শান্ত কোমল
বাজিবে জীবন জুড়ে ।
তোমারি সোহাগভরা
কথাগুলি মোর চুমার মতন
পুলকি তুলিবে ধরা ।

আর কভু আমি ভাবিব না কুভাবনা
মনেতে আমার মিশায়েছ মধুকণা
তোমার মনের মতো
ভাবনাগুলিরে শুভ্র সুরভি
সাজাইব অবিরত ।
তেমনি গভীর স্নেহে
ভাবনাগুলিরে ডালির মতন
পাঠাইব গেহে গেহে ।

আর কভু আমি করিব না হীন কাজ
তোমার শকতি আমার বাহুর মাঝ।
পরম পরশ লেগে
আমার দেহেতে আমার দেবতা
কখন উঠেছে জেগে।
তেমনি প্রেমের স্পর্শ
প্রতি কাজে আমি প্রতিবার দিয়ে
বিশ্বে জাগাবো হর্ষ॥

১০

আকাশে রয়েছি চেয়ে
আকাশেরি মতো অনিমেষ
বর্ণনার বাক্য খুঁজি
খুঁজে আর পাইনে উদ্দেশ।
এ যেন অবর্ণ-বর্ণ
অচিত্রিত কিরণমার্জিত
তপনকেশর পদ্ম
পূর্ণমুক্ত অনন্তশায়িত।
এ যেন স্ফটিকময়
ময়সৃষ্ট ইন্দ্রপ্রস্থপুর
দীপাধারে রবি জ্বলে
আভা চলে দিকপ্রান্ত-দূর।

যেন একখানি ছত্র
ধরা ধরিয়াছে নিজ শিরে
বর্ণের বর্ষণ নেমে
জমে জমে রয় তারে ঘিরে।
যেন সম্মিলিত আঁখি
জগতের যত রূপসীর
একদৃষ্টে কারে চায়
সে চাহনি আয়ত গভীর।

নীল কাজলেতে লেখা
যেন খোলা চিঠি একখানি
কে কারে জানায় তার
নিলাজ বাসনাময়ী বাণী ॥

১১

আমার প্রেমের সাধনা কি তবে
আমার একার সাধনা ?
প্রিয়া, প্রিয়া গো !
আমার প্রাণের বাসনা কি নয়
তোমারো প্রাণের বাসনা ?
প্রিয়া, প্রিয়া গো !

আমারে যে সুখ দিয়াছ, দিতে কি
তুমি সেই সুখ পাওনি ?
প্রিয়া, প্রিয়া গো !
আমারে তৃপ্ত করেছ বলে কি
তৃপ্ত তোমার চাহনি
প্রিয়া, প্রিয়া গো !

আমি ক্ষুধা লয়ে গিয়াছি যখন
তুমি সুধা তুলে দিয়াছ
প্রিয়া, প্রিয়া গো !
শুধাতে ভুলেছি, তোমার ক্ষুধা কি
কোনো দিন মিটাইয়াছ ?
প্রিয়া, প্রিয়া গো !

দীর্ঘ জীবন তাই সব জন
সাথী খুঁজে মরে আপনা,
প্রিয়া, প্রিয়া গো !

কারে সাধিবে না, ওগো অভিমানী
কেমনে সহিবে বেদনা ?
প্রিয়া, প্রিয়া গো।

আজি বসন্তে বিহগী বিহগে
ওই শোনো সাধা সাধনি
প্রিয়া, প্রিয়া গো।
নিখিলে কেবল তোমার আমার
বেসুর বাজিছে কাঁদনি
প্রিয়া, প্রিয়া গো।

কারো নীড় বাঁধে কারো শুধু কাঁদে
বাঁধা পড়িবে না কিছুতে
প্রিয়া, প্রিয়া গো।
কত বসন্ত এসে চলে যায়
কারো পড়ে রয় পিছুতে
প্রিয়া, প্রিয়া গো।

১২

দুঃসহ ব্যথার মাঝে
তোমার আমার হলো বিয়ে
ওগো প্রিয়ে
যাতনার হুলুরব দিয়ে।

তিমিরাবরণ তলে
চারি চোখে জলে চারি তারা
মৌন পারা
বাসর শয়নে নিদ্রাহারা।

ত্রিজগতে মোরা একা
মোরা দুটি বধূ আর বর
সকাতর
বেদনার মাঝে করি ঘর।

সম্ভোগবাসনা মম
এতদিনে পূর্ণ হলো, প্রিয়ে
সেবা দিয়ে
পীড়িতার পীড়াভাগ নিয়ে।

১৩

ওগো সখি তুমি হও আবার দুর্লভা
ফিরে যাও যেথা তুমি ছিলে
সম্মিলিত অঙ্গ-দেহ ভঙ্গ হোক সভা
কেড়ে লও যে আসঙ্গ দিলে।
ওগো সখি তুমি হও অজানিত পর
প্রথম দেখার সেই তুমি
ভেঙে যাক রাতেকের এ বাসর ঘর
আবার রাজুক মরুভূমি।
খোলো শঙ্খ মুছে দাও সীমন্তসিন্দূর
ওগো হও শাশ্বত কুমারী
যে নারী কাহারো নয় যে নারী সুদূর
তুমি হও সেই সুরনারী।
মনের মানসী হয়ে পরশ এড়াও
দরশ এড়াও ক্ষণে ক্ষণে
বনের উর্বশী হয়ে বনেতে লুকাও
বিক্রম ফিরিবে বনে বনে।
তোমারে পাবার সুখ আর বার পেতে
তোমারে হারাবো ওগো সখি
চমক লাগিবে যবে নব চুম্বনেতে
ভাবিব, সে আবার এলো কি?
আবার এলো কি মোর পঁচিশী বসন্ত
হাতে লয়ে রাশি রাশি সুখ
জীবন গেলেও নাই পুলকের অন্ত
সুখ যেন একমাত্র দুখ!

ওগো সখি হের হের বসন্ত যে যায়
সে কি যাবে নীরবে একেলা ?
এক সাথে এসেছিলে এক সাথে, হায়,
ভেঙে যাও ক'দিনের মেলা ॥

অবসাদ

১৪

প্রেমের দেউটি মিটি মিটি জ্বলে
ঘনায়ে এলো কি অবসাদ ?
এরি মাঝে এলো অবসাদ !
এই তো এখনি এলে তুমি কোলে
কেন হারাবার জাগে সাধ !
মুক্তি লভিতে জাগে সাধ !
প্রেমের কমলদল খুলি, আর
যত খুলি তত বন্ধন
কান্ত কোমল বন্ধন।
অবশ-অঙ্গ ভৃঙ্গ আমার
আনন্দে করে ক্রন্দন
বন্দী সে, তাই ক্রন্দন।
মুক্তি যখন দুর্বহ ছিল
বন্ধন ছিল অভিরাম
ক্রন্দন ছিল অবিরাম।
চিত্ত যখন তৃপ্তি লভিল
তবু সেই এক পরিণাম !
এ কী বিচিত্র পরিণাম !
মনোবিহঙ্গ দৃপ্ত স্বাধীন
নীড় হেরি' হলো লুব্ধ
শ্রান্তিমোচন লুব্ধ।
দুর্গমপুরে নির্গমহীন
অনুরাগ-অবরুদ্ধ
কাঁপে আজ শ্বাসরুদ্ধ।

হেথা পক্ষের বিস্তার নাই
হেথায় আকাশ অনুদার।
অধীরের প্রতি অনুদার
কালপারাবার পারাপার নাই
দিবস রাত্রি একাকার
অসহন রীতি হেথাকার।
প্রেমের মাঝারে মন নাহি রয়
প্রেমের সে চির অপরাধ
অথবা মনের অপরাধ।
তাই বলে ওগো স্নিগ্ধহৃদয়
তোমারে দিব না অপবাদ
তুমি গো অতীত-অপবাদ।

সমাপিকা

১৫

তুমিই কি মোর সমাপিকা
চরম ভালোবাসা গো
তুমিই কি মোর এই জনমের শেষ?
মিটালে যে সকল মম
অতৃপ্ত পিপাসা গো
তুমিই কি মোর তৃপ্তিকরা
পরম ভালোবাসা গো
পথিক প্রাণের অন্তিম উদ্দেশ?

এই বারে মোর যাত্রা সারা
জাগলে সন্ধ্যাতারা গো
স্বপ্ন হয়ে জাগলে শয়নেতে।
তন্দ্রাবতীপুরে আমার
নামলো আঁধিয়ারা গো
সেই আঁধারে জাগলে আমার

স্বপ্নবতী তারা গো
জাগলে আমার নিমীল নয়নেতে।

এই চির সৌন্দর্যলোকে
সুন্দরী-উত্তমা গো
আজকে রাতে তুমি আমার সাথে
চিনাও মোরে অন্ধকারের
উদ্ভিন্ন সুষমা গো
অন্তরালের বার্তা শুনাও
সুন্দরী-উত্তমা গো
লোকান্তরে পৌঁছে দিও প্রাতে॥

নিমন্ত্রণ

কারো চক্ষে বিশ্ব যেন নৃত্যপরা যুবতী অপ্সরা
প্রাণ যেন তারি নৃত্যকলা
কান পেতে শোনে কেহ প্রাণ যেন বাণী অসম্বরা
বিশ্ব যেন বাঙ্ময়ী কমলা।
আমি জানি মোর বিশ্ব বিশাল ভয়াল পারাবার
মোরে তার নিত্য আকর্ষণ
বিপদের বীচিভঙ্গে জর্জরিত হই যত বার
প্রাণভরে করি সন্তরণ।
ঘূর্ণীতে চূর্ণিতে নারে, অন্তঃস্রোত বৃথা দেয় টান
অশান্তি যে সেই মোর শান্তি
বাধায় বাহুর স্ফূর্তি, ব্যর্থতা তো সিদ্ধির সোপান
মরণেও নেই রণক্লান্তি।
তবে তুমি এসো বন্ধু ঝঞ্ঝা হয়ে এসো বিশ্বে মোর
তোমারে করিনু নিমন্ত্রণ
এ'প্রাণ তোমারে লয়ে দুই হাতে অমানিশিভোর
কঠিন সুন্দর সন্তরণ।

(১৯৩০)

ক্রীড়ো

মনের কথা মনের মতন করে
কইব আমার মনের মতনকে
কবি হবার নাই দুরাশা ওরে
সার মেনেছি সত্য কথনকে।
দৈব যদি হয় রে অনুকূল
আয়ুস যদি আশার মতো হয়

ফুটিয়ে যাব সকল ক'টি ফুল
জানিয়ে যাব পূর্ণ পরিচয়।
যশ অপযশ এখন হতে কেন?
হয়নি আজো চরম দানের দিন
কীর্তিরে ভাই ভুলতে পারি যেন
নইলে আমার কীর্তি হবে ক্ষীণ।
মিথ্যা করিস শক্তি পরিমাপ
মোর তুলনা খুঁজিস বৃথা রে
একটি প্রাণে রইলে প্রাণের ছাপ
ঐ তো আমার কুশলিতা রে।
সবার মাঝে না যদি হই বড়
একটি হিয়ার শ্রদ্ধা যেন লভি
প্রিয়ার কাছে হইলে প্রিয়তর
হলেম আমি যা হতে চাই সবি।

(১৯৩১)

প্রেমিকের প্রার্থনা

প্রিয় রমণীরে প্রিয়তর বাসিবার
শক্তি আমারে দেহ প্রভু অনিবার।
সোহাগে সোহাগ ডুবাইতে যেন পারি।
আকাঙ্ক্ষা যেন পুরাইতে নাহি ছাড়ি।
ত্যাগের মূল্য যেন দিই মমতায়
প্রিয় হতে যেন বেদনা সে নাহি পায়।
আপনারে তার মনোমতো করিবার
শক্তি আমারে দেহ প্রভু অনিবার।

(২৩শে মার্চ, ১৯৩১)

পাঠকের প্রতি লেখক

প্রথম আলোর বন্ধু শিশু রইবে না নীড়ে
পাড়ায় পাড়ায় কইবে ডেকে, 'আয় না বাইরে।
আমার খুশির ইঙ্গিতে হোক তোদের খুশির রঙ্গ
মোদের খুশির ছন্দে কাঁপুক ঈথর তরঙ্গ।'

তেমনি, পাঠক, আমার খেলা তোমায় খেলিয়ে
বানাই খুশির খেলনী রোজ লেখনী দিয়ে।
তথ্য বড়ির নই কবিরাজ, গোসাঁই তত্ত্বের
প্রজাপতি ধরতে শেখাই চিত্রিত সত্যের।

(১৯৩৩)

বরভীক্ষা

যে আনন্দ দিবানিশি দিশি দিশি চলেছে বহিয়া
আদিহীন অন্তহীন স্বরাহীন রহিয়া রহিয়া
সৌর করে চান্দ্র নভে উদয়াস্ত সন্ধিতে সন্ধিতে,
প্রাণধারণের ছলে প্রাণী যারে বিকশে সঙ্গীতে,
সে যেন আমার কাব্যে ধরা দেয় আপন গৌরবে
মানসপ্রসূন মম ভ'রি' দেয় নিসর্গসৌরভে।

(১৯৩৩)

কবির প্রার্থনা

(১)

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ূখচ্ছটা, শতবর্ণ মেঘ,
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি, বনস্পতি পবমায়ু, মৃত্তিকার রস,
শিশিরের স্বচ্ছন্দতা, শিশুর শুচিতা, পশুদের নিরুদ্বেগ,
সর্বশেষে শর্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ।

(২)

সহজ সরল হোক বাণী মোর সূর্যালোকসম
কেহ না জানুক তার কত জ্বালা আদিতে অন্তরে।
অদৃশ্য ছায়ার মতো সাথে থাক কলাবিদ্যা মম
সকলের চিত্ত আমি আকর্ষিব যে যাদু মন্তরে।
সরস সবুজ হোক বাণী মোর দূর্বাদলসম
কেহ না জানুক তার কী আবেগ অঙ্কুরে শিখরে।
অদৃশ্য বীজের মতো কোষে থাক অমরত্ব মম
ভবিষ্যের চিত্তে আমি প্রস্ফুটিব যে কুহকভরে।

(১৯৩৪)

পরিশিষ্ট

তৃষ্ণার জল

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম ছয় টাকা

উৎসর্গ—ডক্টর বিবেক সেনগুপ্ত
শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্ত
করকমলে

রাজ অতিথি

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম সাত টাকা

উৎসর্গ—শিবরাম চক্রবর্তী প্রিয়বরেষু

লেখকের ভূমিকা নিচে দেওয়া হল—

'প্রসাদ' মাসিকপত্রের শারদীয় সংখ্যার জন্যে একটি উপন্যাসিকা রচনার অনুরোধ জানাতে আসেন শ্রীপ্রণব বিশ্বাস। সীমা নির্দেশ করেন ৬৪ পৃষ্ঠা। সেই পরিসরের মধ্যে উপন্যাসিকা আমি কখনো লিখিনি, লিখতে অক্ষমতা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রণববাবু কিছুতেই ছাড়বেন না। শেষে এই মর্মে রফা হয় যে আমি আরো কম পরিসরে বড়ো গল্প লিখতে পারব। তবে লিখতে লিখতে সেটা যদি ৬৪ পৃষ্ঠার উপন্যাসিকা হয়ে যায় তা হলে তিনি পরিতৃপ্ত হবেন।

কিন্তু লিখতে লিখতে দেখা গেল বড়ো গল্প সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে উপন্যাসিকার জন্যে নির্দিষ্ট পরিসরও অতিক্রম করেছে। তখন আশঙ্কা হলো 'প্রসাদ' হয়তো বলবে সংক্ষেপিত করতে। সেটা তো সম্ভব হতো না। 'প্রসাদ' বিনা বাক্যেই গ্রহণ করে। বাদসাদ না দিয়েই ছাপে। এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

সচরাচর শারদীয় সংখ্যার উপন্যাসিকা পল্লবিত হয়ে পরে উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয়। আশঙ্কা ছিল 'রাজ অতিথি'র বেলাও অনুরূপ অনুরোধ আসবে। সুখের বিষয় আমার প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরীর শ্রীগোপালদাস মজুমদার বা তাঁর ভ্রাতা শ্রীঅমূল্য-গোপাল মজুমদার তেমন কোনো অনুরোধ জানাননি। চেষ্টা করলে কাহিনীটাকে আরো বাড়ানো যেত। কিন্তু তা হলে সেটা হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। পাঠকের মনে থাকত না যে ত্রিভুজটা আসলে যে তিনজনকে নিয়ে তাদের একজন হচ্ছে একটি শিশু, আরেকজন তার মা, আরেকজন তার ঠাকুমা। পুঁথি বাড়ানোর জন্যে হয়তো শেষপর্যন্ত আসরে নামাতে হতো গোলাপ পিসির সপত্নীকে। যমে মানুষে কাড়াকাড়ির আগে স্বামী বেচারাকে নিয়ে দুই সতীনে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। একই সঙ্গে দুই নারীকে বিধবা করে দু'জনকেই চরম শিক্ষা দেওয়া ছিল আমার মুঠোর মধ্যে। কিন্তু এ কাহিনীর রস সেখানে নয়। কোথায়, সেটা পাঠককেই খুঁজে নিতে হবে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

চতুরালি

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য দেড় টাকা

উৎসর্গ—শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী করকমলে।

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬২

ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

আমার প্রথম নাটিকা ছাপা হয়েও প্রকাশিত হয়নি। পরে হারিয়ে যায়। নাম ছিল আপদ বিদায়। এটা ১৯২৮ সালের ঘটনা। অবশিষ্ট চারটি নাটিকা মিলে চতুরালি হলো। সূচীপত্র ও রচনাকাল—দম্পতী (১৯৩৮) / ওলট পালট (১৯৪২) / হাসব না কাঁদব (?) / হাওয়া বদল (১৯৫৪)।

পাহাড়ী

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য পাঁচ টাকা

রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪।

উৎসর্গ—অভয়াশঙ্কর / রাজরাজেশ্বরী / অন্নদাশঙ্কর / ব্রজেন্দ্রমোহিনী-কে বড়দাদা

প্রথম প্রকাশ ১৯৪৪

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭

রচনাবলীতে বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

গ্রন্থে লেখকের যে ভূমিকা ছিল তা নিচে দেওয়া হল—

নিবেদন

এই কাহিনীটি 'মৌচাকের' অঙ্কে ধারাবাহিক ভাবে লেখা হয়েছিল তেরো-চোদ্দ বছর আগে। পুরাতন 'মৌচাক' থেকে এটিকে উদ্ধার করেছেন সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্রবধূ কল্যাণীয়া শ্রীমতী পার্বতী সরকার। তাঁকে ধন্যবাদ। আমার খুব ইচ্ছা ছিল এটিকে আর একটু বাড়াবার। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে হবে কি, মাঝখানে

একটা যুগের ব্যবধান। এখনকার লেখা তখনকার লেখাব সঙ্গে মিলবে না। সেইজন্তে বিশেষ কোনো পবিবর্তন না করে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ কবতে দিচ্ছি। প্রচ্ছদের নক্‌সাটি শ্রীমতী লীলা রায়ের।

জানুয়ারী ১৯৪৭ অন্নদাশঙ্কর রায়

কামনাপঞ্চবিংশতি

শ্রী অন্নদাশঙ্কব রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেবী
৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদে কোন চিত্র নেই, শুধু নামাঙ্কন। নামাঙ্কন শ্রীমতী লীলা বায়ের।

দাম আট আনা

গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলির রচনাকাল ১৯২৯-৩০।

উৎসর্গ—শ্রীকালিন্দীচবণ পাণিগ্রাহী কবিকবকমলেষু।

প্রথম প্রকাশ ১৩৪১

গ্রন্থেব অংশবিশেষ নুতনা বাধা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

নূতনা রাধা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদাব
ডি. এম. লাইব্রেবী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদ—লেখকেব ভাষায় 'প্রচ্ছদেব পরিকল্পনাটি শ্রদ্ধাস্পদ শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের'।

দাম দুই টাকা

এই গ্রন্থটি একটি সংকলন গ্রন্থ। এই সংকলনে আছে প্রথম স্বাক্ষর, রাখী, একটি বসন্ত, কামনাপঞ্চবিংশতি, কালের শাসন, লিপি, নীড়, জার্নাল ও ক্রীড়ো: এই কটি গ্রন্থ বা পর্যায়ের সমস্ত বা নির্বাচিত কিছু কবিতা।
এর মধ্যে প্রথম স্বাক্ষর, কালের শাসন, লিপি, নীড় ও জার্নালের সমস্ত কবিতা এবং রাখী

ও একটি বসন্তের নির্বাচিত অংশ রচনাবলীব দ্বিতীয় খণ্ডে ছাপা হয়েছে। কামনাপঞ্চবিংশতির সমগ্রটাই পৃথক গ্রন্থ রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বচনাবলীব এই খণ্ডে। ফলে রাখী ও একটি বসন্তের অবশিষ্টাংশ ও ক্রীড়ো নূতনা রাধার রচনাবলী সংস্করণ হিশেবে এখন এখানে ছাপা হল।

উৎসর্গ—স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা পর্যায়গুলি বিভিন্ন ব্যক্তিকে উৎসর্গ কবা হয়েছিল বলে এই সংকলন গ্রন্থটি আর আলাদা ভাবে কাককে উৎসর্গ কবা হয়নি। ক্রীড়ো শ্রীবিষ্ণু দে কবিকবকমলেষু এইভাবে উৎসর্গীকৃত।

প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯

গ্রন্থে লেখকেব এই ভূমিকা ছিল—

নিবেদন

আমার কয়েকখানি কবিতাব বই ছাপা হয়েছে, কয়েকখানি হয়নি। ছাপা বইও বাজাবে পাওয়া কঠিন। বইগুলি এবাব একত্র কবে গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করতে দিচ্ছি। কাগজের দাম বুঝে অনেক কবিতা বাদ দিতে হলো। কোনো কোনো কবিতা ছেঁটে ছোট কবেছি তা ছাড়া নিজেব পবিবর্তিত রুচিব সঙ্গে মিলিয়ে বহু স্থলে পবিবর্তন করেছি

এসব কবিতা প্রায় বাবো বছব ধবে লেখা। বারো বছব তো একটা যুগ। আমার জীবনের সেই যুগটিকে চিহ্নিত করবাব জন্যে এই সংগ্রহেব নাম বাখলুম 'নূতনা রাধা।' পরবর্তী কালেব কবিতা এ নামেব যোগ্য নয়। সেই কাবণে 'উড়কি ধানেব মুড়কি' এই সংকলনেব বাইবে।

প্রচ্ছদেব পরিকল্পনাটি শ্রদ্ধাস্পদ শিল্পী শ্রীযামিনী বায়েব।

১৯শে জুলাই, ১৯৪২ — অন্নদাশঙ্কব বায়

=

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

১ম খণ্ডে আছে : উপন্যাস—অসমাপিকা, আগুন নিয়ে খেলা / ভ্রমণকাহিনী—পথে প্রবাসে / প্রবন্ধগ্রন্থ—তারুণ্য

২য় খণ্ডে আছে : উপন্যাস—সত্যাসত্য ১ম খণ্ড : যার যেথা দেশ / সত্যাসত্য ২য় খণ্ড : অজ্ঞাতবাস / ৭টি কাব্যগ্রন্থ

৩য় খণ্ডে আছে : উপন্যাস—সত্যাসত্য ৩য় খণ্ড : কলঙ্কবতী / সত্যাসত্য ৪র্থ খণ্ড : দুঃখমোচন / ২টি গল্পগ্রন্থ

৪র্থ খণ্ডে আছে : উপন্যাস—সত্যাসত্য ৫ম খণ্ড : মর্তের স্বর্গ / সত্যাসত্য ৬ষ্ঠ খণ্ড : অপসরণ / উপন্যাস—পুতুল নিয়ে খেলা

৫ম খণ্ডে আছে : উপন্যাস—রত্ন ও শ্রীমতী [৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ]

৬ষ্ঠ খণ্ডে আছে : উপন্যাস—না, কন্যা, সুখ, বিশল্যকরণী

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ [পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ]

বিনুর বই [আত্মজীবন ও আত্মশিল্প মূলক]

সংস্কৃতির বিবর্তন [২য় সংস্করণ]

সাহিত্যিকের জবানবন্দী [১ম সংস্করণ]

ছড়া-সমগ্র [২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ]

সাত ভাই চম্পা [নতুন ছড়া সংকলন]

শ্রেষ্ঠ কবিতা [২য় সংস্করণ]

শ্রেষ্ঠ গল্প [২য় সংস্করণ]

না [উপন্যাস]

রত্ন ও শ্রীমতী [উপন্যাস / অখণ্ড সংস্করণ]